"নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ।"

শ্রীরাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় এম্‌-এ-বি-এল,
শ্রীবারাণসীবাসী মুখোপাধ্যায় এম্‌-এ-বি-এল,
শ্রীঅর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এম্‌-এ-বি-এল,
} সম্পাদকগণ

প্রকাশক—শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্‌ এ,

পন্থাকার্য্যালয়, ১৩নং ব্রজনাথ মিত্রের লেন, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়,

মেট্‌কাফ্‌ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌,

৩৪ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩২০

"হরগৌরী।"

উঠ মা আনন্দময়ী, খোল মা কুটীর দ্বার।
আঁধারে হেরিতে নারি, এ সংসার পারাবার॥
তারস্বরে ডাকি গো মা, তারা তোমায় কতবার।
স্নেহময়ী হয়ে মাগো, একি হেরি ব্যবহার
দীন শিশু আমি তব, কার কাছে এবে যাব।
তুমি বিনা কে হরিবে, অধম অকৃতি-ভার॥
খেলায় মত্ত ছিলাম ব'লে, এ অধমে ফাঁকি দিলে।
একবার চাও মা সন্তান ব'লে, খেলিতে যাব না আর॥

আমাদের ষোড়শ বৎসর।

আমরা মহাজন পদ্ধতি ও পূর্ব্বরীতিক্রমে পন্থার গতবৎসরের কর্ম্মফল সর্ব্বাত্মক শ্রীশ্রীবাসুদেবের চরণ-কমলে অর্পণ করিলাম। হরি ওঁ তৎসৎ।

গত বৎসর নানা কারণে পন্থা এক সংখ্যা ব্যতীত আর প্রকাশিত হয় নাই। প্রথমতঃ ব্রহ্মবিদ্যা-প্রচারিণী সভার সভ্যগণ মধ্যে ধর্ম্ম ও নীতি লইয়া বিষম গোলযোগ উপস্থিত হয়। এই তুমুল সংগ্রামের ঘূর্ণীবায়ুর মধ্যে পড়িয়া গিয়া আমি ও আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু বিদ্বান্ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বিভিন্ন দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছি। পন্থার দুর্ভাগ্যবশতঃ আজ আমরা হীরেন্দ্র বাবুর সুযোগ্য সম্পাদকতা হারাইয়া দুর্ব্বল ও শক্তিশূন্য হইয়া পড়িয়াছি। যাঁহার অলৌকিক প্রতিভায় দুর্ব্বোধ্য শাস্ত্ররহস্য গুলি সাধারণের পক্ষে সহজ ও সুগম বলিয়া বোধ হইত, সেই হীরেন্দ্রনাথকে সম্পাদক কার্য্যে না পাইলে যে পন্থার ও তাহার গ্রাহকগণের সমূহ ক্ষতি তাহাতে সন্দেহ নাই। ভাই হীরেণ, ভগবানের ইচ্ছাবশতই জীবগণ বাতাহত পত্রের ন্যায় কখন সংযুক্ত কখন বা বিযুক্ত হইয়া খেলা করে, এ খেলার সমস্ত কর্ম্মফলের ভোক্তা ও কর্ত্তা শ্রীভগবান্। যাঁহার ইচ্ছাতে ব্রহ্মবিদ্যা-সমিতির রঙ্গমঞ্চ মধ্যে একদিন একই স্থানে দাঁড়াইয়া কত খেলা উভয়ে খেলিয়াছিলাম, আজি তাঁহারই ইচ্ছায় সেই রঙ্গমঞ্চের পৃথক্ স্থান অধিকার করিয়া খেলিতে হইতেছে। [illegible] ঘূর্ণায়মান পত্রের গতিতে যেমন বায়ুরই মহিমা প্রকটিত হয় [illegible] ব্যাপারেও যেন আমরা মত, পক্ষ, ইত্যাদি ভুলিয়া গিয়া সেই অমোঘ-বীর্য্য

ভগবানের করুণাময় হস্ত দেখিতে পাই; যেন তাই যন্ত্রের গতি প্রভৃতি লক্ষ্য করিতে গিয়া যন্ত্রীকে না ভুলিয়া যাই।

ঘুরে ঘুরে যথা তথা পথে দেখা পথে কথা।
তুমি কোথা, আমি কোথা, আবার কোথা দেখা হয়।
অসার সংসার কেহ কারো নয়॥

দ্বিতীয় কারণ এই যে দৈববিপাকে আমি আজ দুই বৎসর যাবৎ নানা প্রকার গুরুতর পীড়াক্রান্ত হইয়া পন্থার কার্য্য পরিদর্শনে এবং পাঠকগণের যথাশক্তি সেবা করিতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিলাম। তৃতীয়তঃ পন্থার ভূতপূর্ব্ব কার্য্য-কারকগণের সুপরিচালন ব্যবস্থার ক্রটী, শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ দত্ত মহাশয়ের কিঞ্চিৎ ভুল আর অন্যান্য দৈবদুর্বিপাক বশতঃ পন্থাকে নানা প্রকার অসুবিধাতে ও আর্থিক সঙ্কটে পতিত হইতে হইয়াছিল। এই সকল এবং পূর্ব্বোক্ত কারণ সমূহের নিমিত্ত পন্থা নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতে পারে নাই।

আর একটি বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া আমরা মূল প্রবন্ধের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। পন্থা এতদিন ব্রহ্মবিদ্যা-সমিতির পত্ররূপে জনসাধারণের সেবায় প্রবৃত্ত ছিল। ব্রহ্মবিদ্যা সমিতি যে সার্ব্বজনীন উদার উপদেশ প্রভৃতির দ্বারায় এই জগতের নানা স্থানের ধর্ম্ম মাত্রের উন্নতি ও সংস্কার সাধন করিয়া আসিতেছিলেন, আজ কলির প্রতাপে সেই সার্ব্বজনীনতা "মত" ও "দলের" ক্ষুদ্র সংস্কারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে বলিয়া অনেকের মনে হয়। আমাদের ভয় হয় যে পাছে এই কলিযুগের গঙ্গাচক্র তিরোধানরূপ সন্ধিস্থলে ব্যক্তিগত ভাবের প্রকোপে বিদ্যার উদার মত ও মহান্ ভাব দুষ্ট হইয়া যায়। সেইজন্য আর পন্থা আধুনিক ভাবে পরিচালিত ব্রহ্মবিদ্যা-সমিতির প্রতিনিধি স্বরূপে কার্য্য করিতে সক্ষম হইতে পারিবে না।

এখন শ্রীশ্রীজগন্নাথচক্র প্রবর্ত্তিত। উহার তিনটী মূলমন্ত্র। যে তিন মহামন্ত্র উচ্চারণে শ্রীমৎ মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অমিয় প্রেমের প্রবল বন্যায় ভারত একদিন প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল, সেই তিন মহাধর্ম্মই শ্রীশ্রীজগন্নাথচক্রে মানবজাতির ভিতর প্রচারিত হইবে :—

"জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব সেবন
এই তিন ধর্ম্ম কহি শুন সনাতন ॥"

এই তিনটীকে আপাতত স্বতন্ত্র বলিয়া মনে হইলেও, কোন কোন ধর্ম্মে ইহাদের মধ্যে অন্যতনটীকে বিশেষরূপে উপদিষ্ট হইলেও, তিনটিই শ্রীভগবৎতত্ত্বে পর্য্যবসিত। ভগবানকে পরোক্ষ বা অপরোক্ষ ভাবে বাদ দিয়া কেহ কেহ বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব স্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু ঐরূপভাবে ভ্রাতৃভাব কখন স্থায়ী হইতে পারে না। নীতি, বিজ্ঞান, দর্শন বা যোগ শক্তির সাহায্যে উচ্চ ও উচ্চতর স্বত্ত্বার স্থাপনা হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে ভেদের নাশ হয় না। কেবল শ্রীজগন্নাথদেবেরই সন্নিধানে ও কৃপাতে পুণ্যতম শ্রীক্ষেত্রে হিন্দু বিধবাগণও ধর্ম্মের বিধিবন্ধন অতিক্রম করিয়া জাতিভেদ ভুলিয়া গিয়া নীচ জাতির স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করিতেও কুণ্ঠিত হন না। তদ্রূপ মানব নিজ হৃদয়ক্ষেত্রে শ্রীভগবানের বিকাশ জানিতে পারিয়া, তৎপরে সর্ব্বভূতে যখন সেই পরমাত্মার লীলাভূমি দেখিতে পান তখনই সেই একৃকে ভালবাসিয়া 'সর্ব্বকে' ভাল বাসিতে পারেন। নচেৎ যতই চেষ্টা করুন না কেন, তাঁহাকে ভেদভাবেই অবস্থিত হইতে হয়। অপরিজ্ঞাত ভাবেও তাঁহার চৈতন্য স্রোত তাঁহার পরিচ্ছিন্ন আমিত্বেরই স্থাপনা করিতে ব্যাপৃত থাকে।

ভক্ত্যা মাং অভিজানাতি যাবান যশ্চামি তত্ত্বতঃ (গীতা)

এই একত্ব বা ভগবানে অহৈতুকী প্রেমই সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাবের মূল ভিত্তি—ইহার সাধনেই ভাগবতের ভাবাদ্বৈত সাধন। যথা :—

কার্য্যকারণবস্ত্বৈক্যদর্শনং পটতন্তুবৎ।
অবস্তুত্বাদ্বিকল্পস্য ভাবাদ্বৈতং তদুচ্যতে ॥ ৭।১৫।৬৩

এক ব্রহ্মবস্তুই ওতঃপ্রোতভাবে তন্তু বিস্তার করিয়া পটরূপে জগৎ ও জীবরূপে পরিদৃশ্যমান, বাস্তবিক বিকল্প বা দ্বিতীয় ভাবেরস্থান নাই, তুমি আমি নাই, উচ্চ নীচ নাই, একই অখণ্ড একরস আনন্দঘন চৈতন্যই বস্তু বা সত্তা। তবে আধার ভেদে সেই সত্তাই যেন জ্ঞান ও অজ্ঞানরূপে জগতে প্রকাশিত হন। তিনিই আসুরিক যোনিতে অসুর এবং দৈবসম্পৎ যুক্ত সাধকের হৃদয়ে আনন্দময়ীরূপে প্রকটিত হন।

সর্ব্বস্য চাহম্ হৃদি সন্নিবিষ্টো।
মত্ত স্মৃতি জ্ঞান মপোহনঞ্চ॥ ১৫।১৫ (গীতা)

"আমিই সর্বাত্মকা ভাবে সর্ব্বরূপী জগৎ বস্তু মাত্রেরই হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট এবং আমা হইতেই জ্ঞান ও স্মৃতি বা তদ্‌বিপরীত মোহ উৎপন্ন হয়। যখন জীব দেহ কোষাদি অতীত এবং তাহাদের ক্রীড়ার বিরাম বা আলয় স্থান (Laya centre)রূপ 'আমি' কে ভুলিয়া গিয়া ক্ষুদ্র আমিত্বের বা ব্যক্তিত্বের স্থাপনা বা উপাসনা করে, তখন সে গুণ-প্রবাহে পতিত হইয়া সত্ত্বাদির উৎকর্ষে দেবতা মানব বা দৈত্যাদি যোনি প্রাপ্ত হয়। বস্তুতই মানব আপনার উন্নতি বা অবনতির নিয়ামক, সেইজন্য ভগবান্ বুদ্ধদেব বলিয়াছেন

Ask not of the helpless gods
Within yourself deliverance must be sought
—Light of Asia.

আপনার আমিটিকে যতই পরিচ্ছিন্ন বিভিন্ন বা ছোট করিবে ততই একত্বের অপলাপ হইয়া ভেদ ভাবে পর্য্যবসিত হইবে। কিন্তু এই একত্ব নিত্য শুদ্ধ, মায়া বা জগৎ ভাব দ্বারা অপরামৃষ্ট। আবার জগতের সঙ্গে খেলিবার সময় এই ভগবানই সাধুগণের সংবর্দ্ধনা বা পরিত্রাণ অসাধুগণের বিনাশ এবং ধর্ম্ম (organic unity) সংস্থাপন জন্য অবতীর্ণ হইয়া অসুরগণকে বিনাশ করেন :—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

ভাই। ব্রহ্মবিদ্‌গণ জগতের সঙ্গে পুরা দস্তুর কারবার করিবে, নূতন জাতি ও সভ্যতা সংস্থাপনের জন্য প্রয়াস পাইবে, ব্যক্তিগত ভাবে ব্যক্তি বিশেষের অনুসরণ করিবে, অথচ পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্মের ভেদ মানিবেনা—এটা কতটা যুক্তিসিদ্ধ? ত্রিগুণ অতীত পথে বিচরণ করিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ন্যায় আপামর চণ্ডালকে প্রেম বিতরণের জন্য যদি সন্ন্যাসী হও, যদি সর্ব্বত্যাগী হইয়া শ্রীমদ্ বুদ্ধদেবের বা শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় সন্ন্যাসী হইয়া অমিতাভ ব্রহ্মের জ্যোতি বিকীর্ণ করিতে অধিকার হইয়া থাকে, তাহা হইলে পাপ পুণ্যাদির দ্বন্দ্বের উপরের কথা তোমাদের মুখে সাজে। নহেতো সংসারের দোকানদারিতে

ব্যাপৃত, ভেদাত্মক 'আমি' ভাবে অবস্থিত জীবের দ্বারা প্রকৃত ভ্রাতৃভাব কখন স্থাপিত হইতে পারেনা। শ্রীমদ্ জগন্নাথের প্রসাদ ভিন্ন একত্বের অনুভূতি হয় না এবং একত্বের অনুভূতি না হইলে নির্দ্দোষ অহঙ্কার শূন্য প্রেম বা ভ্রাতৃভাব প্রকটিত হইতে পারেনা। 'সর্ব্ব' শব্দে বহুত্ব সূচিত হয় না। সর্ব্ব (pronoun) বা সর্ব্বনাম। উহার বৃত্তিই লক্ষণা দ্বারা অনির্দ্দেশ্য ভগবানের মহিমা ব্যঞ্জনা। সেই জন্য বলি যে বিশিষ্ট নাম (name) বস্তু বা স্বত্বা না ভুলিলে, "সর্ব্ব" নামের সাধনা হয় না। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের জ্ঞানঘন "সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম" কে ভগবৎ প্রেমে পুটিত করিলেই শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর "জীবে দয়ায়" উপনীত হওয়া যায়।

এই ভাবাদ্বৈত সাধনা না হইলে নামে রুচি হইতে পারে না। ভগবান্‌কে বাদ দিলে নাম বা প্রকাশের কোনই মূল্য থাকে না। নাম ও রূপ ক্ষণভঙ্গুর ও পরিণামী। স্বামীতে প্রেম জন্মিলে স্বামী কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট সামান্য দ্রব্যাদিও প্রবাসস্থিত স্বামীর প্রেম ও সত্বা স্ফুরণ করিতে সক্ষম হয়। ভগবানের একত্ব ও সর্ব্বাত্মিকা মহিমা ভুলিয়া গিয়া বৈষ্ণব শাক্ত প্রভৃতি সম্প্রদায় ভেদ দুষ্ট হইয়াছে। তবে ভাই, অবতারীকে ভুলিয়া গিয়া আন্‌কোরা নূতন অবতারের প্রেমে এত হাবুডুবু কেন? পিতার কোমল হস্ত স্পর্শে মোহিত হইয়া চৈতন্যময় পিতাকে ভুলিয়া শুধু তাঁহার অঙ্গুলিগুলির উপাসনায় প্রবৃত্ত কেন?

মহাত্মা বা বৈষ্ণব সেবন—সাধনার তৃতীয় স্তর। এক্ষণে মহাত্মা বা বৈষ্ণব কাহাকে বলে? অনেকেরই বিশ্বাস যে অত্যাশ্চর্য্য শক্তিসম্পন্ন মানব মাত্রেই মহাত্মা, এবং তিলক-ফোঁটা-কাটা নামাবলী শোভিত ব্যক্তি মাত্রেই বৈষ্ণব। কিন্তু অলৌকিক শক্তির সহিত ব্রহ্মবিস্তার বা বিস্তার কোনই বিশেষ সম্বন্ধ নাই। এ বিষয়ে আমরা পুনরায় শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর স্মরণ গ্রহণ করিব। তাঁহার মতে :—

"যাঁহারে হেরিলে মুখে আসে কৃষ্ণ নাম।
তাঁহারে জানিবে তুমি মহান্ত প্রধান॥"

যাঁহাকে ব্যবহারিক জগতের মধ্যে মায়ার খেলার মাঝেও হেরিলে জীব-হৃদয় ভগবান্ ব্যতীত অন্য কিছু বিশিষ্ট ভাব উপলব্ধি করিতে পারে না, যাঁহার আহার, ব্যবহার, সম্ভাষণ, সমস্তই আর নিজের ভেদাত্মক আমির প্রকাশের জন্য নহে, যিনি স্বতত, পরতঃ ও সর্ব্বতোভাবে কেবল ভগবান্‌কে মনে করাইয়া দিবার জন্য

কার্য্য করেন, সেই ভগবদ্‌রূপী পুরুষকেই মহাত্মা বা বৈষ্ণব বলে। ভাগবতে শ্রীশুকদেবকে 'সর্ব্বভূতহৃদয়' বলিয়া লক্ষিত করিয়াছেন। মহাপুরুষগণ হৃদয়গ্রন্থি শূন্য এবং তাঁহাদের চিত্তে ভগবানের আমি ভিন্ন অন্য আমি ফুটিতে পারে না। তাঁহারা সর্ব্বভূতে ভগবান দর্শন করেন বলিয়াই মহাত্মা।

"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি"।

সুতরাং, ভাই তুমি যে ব্যক্তিত্বের মোহে মহাত্মা রূপগণকেও ভেদ ভাবশীল ব্যক্তি বলিয়া মনে কর এবং উক্ত প্রকার কল্পিত মহাপুরুষের প্রসাদ পাইবার জন্য অন্তরাত্মা ভগবানেরও বাণী অগ্রাহ্য করিয়া কার্য্য করিতে উদ্যত হও, যে মহাত্মা দর্শন করিতে গিয়া তোমার ক্ষুদ্র আমিত্ব বিলুপ্ত হয় না অপরন্তু ভেদাত্মক অহং ভাবে মহাপুরুষকেও প্রতিস্থাপিত করিয়া সাধনার ঘর কন্না করিতে যাও, তোমার সে স্বকপোলকল্পিত মহাপুরুষে ভগবানের মহান্ ভাব না থাকায় তদ্দ্বারা তোমার প্রকৃত কোন কার্য্য হইতেই পারে না। উহা কেবল সাধনার পুতুল খেলা মাত্র।

গুরুকে ভগবদ্‌ভাবে দেখিবার উপদেশ গুলি স্বার্থপর ব্রাহ্মণগণের অত্যুক্তি নহে। উহা চৈতন্যের স্বভাব মূলক আত্মপ্রসাদের দ্বার স্বরূপ। সৃষ্টির মূলে ভগবানের আমি মাত্র অবস্থিত ছিল, সৃষ্টির মধ্যেও সেই একমাত্র আমিই সম্পূর্ণভাবে অবস্থিত রহিয়াছে এবং পরেও তাহাই থাকিবে, মাঝের ছোট আমি গুলিও আপাততঃ বিভিন্ন মনে হইলেও সেই প্রকৃত আমি ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। সেই আমি প্রকৃত আমির অংশ কলারূপে কল্পিত; ইহাই সনাতন ধর্ম্ম।

সনাতন ধর্ম্মের মূল ভিত্তিই ঈশ্বর চৈতন্য। হিন্দু জানেন—

"যা দেবি সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে॥" চণ্ডী

আজ ২।৩ বৎসর হইতে আমরা বিদ্যাতত্ত্বের অর্থ যথা সাধ্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছি। গতবারে বৈশাখ মাসের সংখ্যায় বৃহদারণ্যক উপনিষদের আচার্য্য কৃত ভাষ্যের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখিয়াছি যে বিদ্যা সর্ব্বদাই একত্বের প্রকাশিকা! যে চৈতন্যের বিকাশে আমরা বহুর সঙ্গে খেলা করিয়াও একনির্দ্দোষ সমরূপী আমিকে দেখিতে পাই, তাহার নাম বিদ্যা। "যদক্ষরম্ অধি-গম্যতে" যদ্দ্বারা অক্ষর আমির প্রকাশ হয়, তাহাই মাত্র বিদ্যা।

ভেদবুদ্ধিস্তু সংসারে বর্ত্তমানা প্রবর্ত্ততে।
অবিদ্যেয়ং মহাভাগ বিদ্যাচ তন্নিবর্ত্তনং॥"

দেবীভাগবত। ১।১৮।৪২

সুতরাং ভেদগত ব্যক্তিত্বভাবে ভেদগত ব্যক্তিত্বের উপাসনা প্রভৃতির দ্বারা বিদ্যা প্রকাশ হইতে পারে না।

তবে বিদ্যা কি? ইহা কি বিশেষ শাস্ত্র, দর্শন, বা বিজ্ঞান পাঠে লব্ধ জ্ঞান? ইহা কি সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর লোকের পরিজ্ঞান? অনেকে বিদ্যা শব্দের অর্থ ঐরূপ ভাবে করেন বলিয়াই শুধু বিদ্যা শব্দ প্রয়োগ না করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেন। যেন ব্রহ্মবিদ্যা, স্থপতিবিদ্যা প্রভৃতির সহিত এক জাতীয় পদার্থ; ভেদাত্মক আমিকে বহু প্রয়াসে উহা লাভ করিতে হয়। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মূল রহস্য কথঞ্চিৎ ভাবেও বুঝিতে পারিলে তাঁহাদের এই ভ্রমে পতিত হইতে হইতনা।

"যতো ভূতান্যশেষানি দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি।" গীতা

ইহাই বিদ্যা।

সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম সকল স্তরেই, সকল বর্ণেই, এই ব্রহ্মাত্মিকা ব্রহ্মযোনি বিদ্যার সাধনে প্রবৃত্ত। এই সর্ব্বাত্মকা অবিশেষ ভাবের উপর বর্ণ, আশ্রম, আচার প্রভৃতি স্থাপিত রহিয়াছে। আমি যে শুধু আমার জন্য নহি তাহা বুঝাইবার জন্য এবং সর্ব্বপ্রকার সৃষ্ট প্রাণীর মধ্যে যে চৈতন্যঘন একত্ব সর্ব্বদা বিরাজমান, তাহা অলক্ষিত ভাবে নির্দ্দেশ করিবার জন্য, পঞ্চযজ্ঞের ব্যবস্থা করা হইয়াছে; শৌচ, সন্তোষ, আর্জ্জব প্রভৃতি গুণ গুলি, এই একত্বের প্রকাশের সহায়তা করিবার জন্য উপদিষ্ট হইয়াছে। হিন্দু জানেন যে সৃষ্টির পূর্ব্বে একই ছিল, মধ্যে একেরই প্রকাশ হয় এবং অন্তে সেই সচ্চিদানন্দময় একত্বে বহুত্ব লীন হয়। এই একত্বের পিপাসা সর্ব্ব হৃদয়ে নিহিত। দুই দেহে ক্ষণিক একত্বের সাধনের নাম কাম। বাহিরের বস্তুর বিরুদ্ধভাব ভুলিয়া গিয়া ঐ বস্তুকে চৈতন্যে মিশাইয়া দেওয়ার নাম জ্ঞান। সর্ব্বদা ভিতর হইতে সেই একত্ব জীবের সহিত কথা কহিতেছে; কিন্তু জীব বিশিষ্ট আমিত্বের মোহে, ঐ একত্ব কে দেখিতে না পাইয়া জগৎ-বস্তু সকলকে বিশিষ্ট আমির সহিত সংযুক্ত করিয়া দেখিতে চেষ্টা করে। ইহাই অহঙ্কার।

সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের এই পরম তারকে স্মরণ করিয়া পন্থা আজি হইতে নব আকারে কার্য্যে ব্রতী হইল। যে চৈতন্যে বহু ভাবাত্মক জগৎ অচিন্ত্য ভাবে এক রূপে লীন হয়, যে চৈতন্যের একত্ব প্রকাশিনীর বা মহাযোগিনী শক্তি, কলাবিদ্যা বা জ্ঞানরূপে অবস্থিত, সেই চিদানন্দঘনের আনন্দ স্বরূপা বিদ্যা দেবীর শরণাগত হইয়া, তাঁহারই মহিমা প্রকাশের জন্য পন্থা সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিবে। এস ভাই সকল, এস পন্থার কর্ম্মকর্ত্তৃগণ, এস পন্থার গ্রাহক এবং পাঠকগণ, এস সকলে সেই চৈতন্যময়ীর দিকে লক্ষ্য স্থির করিয়া সেই যন্ত্রীরূপাকে নানা যন্ত্রে প্রণাম করি।

নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে।
নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে॥
নমস্তে জগদ্বন্দ্য পদারবিন্দে।
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥১॥

নমস্তে জগতচিন্ত্যমানস্বরূপে
নমস্তে মহাযোগিনি জ্ঞানরূপে।
নমস্তে চিদানন্দানন্দ স্বরূপে
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।২॥

প্রণমি করুণাময়ি! শরণদায়িনি।
জগত ব্যাপিনি শিবে বিশ্বরূপিণী।
ত্রিভুবন পূজে তব শ্রীপদ নলিনী
নমি দুর্গে। ত্রাণ কর জগত্তারিণি॥১॥

নিখিল জগদচিন্ত্যস্বরূপ তোমার
প্রণমি চরণে তব নমি অনিবার,
তুমি মা মহাযোগিনি জ্ঞানস্বরূপিণী
প্রনমি তোমারে মাগো জগত জননী।
সদানন্দ হৃদে তুমি আনন্দ রূপিণী
নমি দুর্গে ত্রাণ কর জগত তারিণি॥২॥

(গোবিন্দলালের অনুবাদ)।

পুনবায় এই বিদ্যাতত্ত্বের বিশদ আলোচনা করিতে বাসনা রহিল। এক্ষণে এস ভাই পুনরায় নমস্কার করি।

আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি,
গায়ত্রীচ্ছন্দাংশ, মাতঃ ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তুতে।

এস পুনবায়—নমস্কার

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

রাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়।

হরগৌরী।

হরগৌরী নিত্য অভিন্ন; তাই একাসনে মহাযোগেশ্বর দেবাদিদেব শঙ্কর ও মহাযোগেশ্বরী কৈলাসাচলবাসিনী ভগবতী উমা সাধকের ধ্যানের বিষয়। শক্তি ও শক্তিমানে অভেদ বলিয়াই তন্ত্রে—

ন শিবেন বিনা শক্তি র্ন শক্তিরহিতঃ শিবঃ।
অবিনাভাবসম্বন্ধ স্তয়োরানন্দরূপয়োঃ ॥

শিব বিনা শক্তি থাকিতে পারেন না, শক্তি ভিন্ন শিবও থাকিতে পারেন না। আনন্দরূপ শিব ও আনন্দ রূপিণী শিবার অবিনাভাব সম্বন্ধ। তিলার্দ্ধ বিচ্ছেদ নাই—নিত্য মিলন। তবে কোথায় শক্তি প্রসুপ্তাবস্থায় এইমাত্র প্রভেদ—যেখানে শক্তি যোগনিদ্রায় সেই অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি বলেন—

ন সৎ নচাসৎ শিব এব কেবলঃ। শ্বেত ৪। ১৮
প্রশান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং
মন্যন্তে স আত্মা বিজ্ঞেয়ঃ ॥ মাণ্ডুক্য।

সে অবস্থায় কেবল এক রস, শান্ত, নির্গুণ সত্তা মাত্র; যেন স্থির ধীর গম্ভীর বীচিবিক্ষোভবিহীন অনন্ত মহাসমুদ্র। সে ভাবে "আমি" "তুমি" প্রভৃতি কোন ভাবের খেলা নাই, জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তির অভিব্যক্তি নাই, দেশ কাল নিয়মের অস্তিত্ব নাই কেবল—

নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যনিরঞ্জনং।

"নেতি নেতি" সেই অবস্থার জ্ঞাপক। তিনি সৎ কি অসৎ, চিৎ কি অচিৎ কিছুই বলা যায় না। তাই দেবগণ সদাশিবের নমস্কার উপলক্ষে বলিতেছেন—

নমস্তে সত্যরূপায় নমস্তেঽসত্যরূপিণে
নমস্তে বোধরূপায় নমস্তেঽবোধরূপিণে
নমস্তে সুখরূপায় নমস্তেঽসুখরূপিণে—॥ সূত সংহিতা।

এই নির্গুণ অপ্রকট সদাশিব প্রকট হইলেই হরপার্ব্বতী রূপে প্রকট হন। তখনই তিনি "মায়িনন্তু মহেশ্বর"। শক্তির প্রসুপ্তাবস্থায় তিনি নির্গুণ, শক্তির জাগ্রতাবস্থায় তিনি সচ্চিদানন্দ। তখনই যুগলরূপ, তখনই শিব ও শক্তির প্রকাশজ্যোতি। তখনই প্রকাশস্বরূপ ভগবানের অঙ্কে যোগিনী জ্ঞানশক্তি, তখনই অদ্বিতীয় একতার বিশিষ্ট একতারূপে প্রকাশ, তখন তাঁহা হইতে সৃষ্টি স্থিতি সংহার, তাঁহা হইতে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব—স্বভাবতঃ নির্গুণের মায়া উপাধি অঙ্গীকারই সগুণ ভাবে প্রকট—এই সদ্‌গুণ ব্রহ্মই—সমস্ত কল্যাণগুণের আধার। জীবের উপাস্য কারণ সগুণ ব্রহ্মে যে বৃত্তি-প্রবাহ তাহাকেই উপাসনা বলে—

সগুণব্রহ্মবিষয়কমানসব্যাপারাণি উপাসনানি।

ত্রিগুণময়ী মায়াজালে আবদ্ধ জীবের নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা বড়ই দুরূহ। ভগবানই বলিয়াছেন—

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাং অব্যক্তাসক্তচেতসাং। গীতা।

সেই জন্যই ভেদাত্মক দেহধারী জীবের পক্ষে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণবিশিষ্ট পরমেশ্বরে ভক্তিই যুক্ততম বলিয়া গীতায় উক্ত আছে—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতা স্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥ গীতা ১২।২

প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সাধনা-পদ্ধতির ভিতর দিয়া এই এক তত্ত্বের দিকে যাহাতে জীবের গতি হয় তাহাই উপদিষ্ট আছে। বৈষ্ণবগণ যে তত্ত্বকে

"বর্হাপীড়াভিরামং মৃগমদতিলকং কুণ্ডলাক্রান্তগণ্ডং।"

বলিয়া ধ্যান করিতেছেন,

শাক্তগণ যে তত্ত্বকে মহোল্লাসে—

"শ্যামবর্ণাং চতুর্ব্বাহুং শ্মশানালয়বাসিনীং"

বলিয়া আরাধনা করিতেছেন, সৌরগণ যে তত্ত্বকে "সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোস্মি দিবাকরং" বলিয়া প্রণাম করিতেছেন, গাণপত্যগণ যে তত্ত্বকে গুণিবরাগ্রগণ্য বিনায়ক রূপে পূজা করিতেছেন, শৈবগণ সেই তত্ত্বকেই—

"বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং"

রূপে ধ্যান করিতেছে। সেই এক তত্ত্বের দিকে সকলেরই গতি, সকলেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবে। তাঁহারই বাণী—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং তথৈব ভজাম্যহং ॥

তাঁহারই বাণী—

সৌরাশ্চ শৈবগাণেশাঃ বৈষ্ণবাঃ শক্তিপূজকাঃ।
মামেব তে প্রপদ্যন্তে বর্ষাম্ভঃ সাগরং যথা ॥ পদ্মপুরাণ।

সেই অভয় বাণীর আশ্বাসে সাহসে বুক বাঁধিয়া উজান পথে অগ্রসর হই, ঊর্দ্ধবাহু হইয়া "বম্ বম্" শব্দে ঐ চরণের দিকে যাইবার প্রয়াস পাই, দেখি ভেদবুদ্ধি ধুইয়া যায় কি না, দেখি মনের মলিনতা দূরে যায় কি না, দেখি দুর্ব্বার ইন্দ্রিয়ের অধীনতা হইতে রক্ষা পাই কিনা, দেখি বজ্রতুল্য কঠিন হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া জ্ঞানের শুভ্র জ্যোতি, প্রেমের বিমল উচ্ছ্বাস বাহির হয় কিনা। হে ভূতভাবন ত্রিলোকনাথ! ভুবনেশ্বরী মা! একবার স্বপ্রকাশ হও, দীনজনে করুণা বিতরণ কর, যুগলরূপ সন্দর্শনে ধন্য হই—গললগ্নীকৃতবাসে চরণে লুণ্ঠিত হই আর বলি—

কস্তূরিকা চন্দনলেপনায়ৈ শ্মশানভস্মাঙ্গবিলেপনায়।
সৎকুণ্ডলায়ৈ ফণিকুণ্ডলায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥
মন্দারমালা পরিশোভিতায়ৈ কপালমালা পরিশোভিতায়।
দিব্যাম্বরায়ৈ চ দিগম্বরায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥
চলৎক্বণৎকঙ্কণনূপুরায়ৈ, বিভ্রৎফণাভাস্বর নূপুরায়।
হেমাঙ্গদায়ৈ চ ফণাঙ্গদায় নমঃশিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥
বিলোলনীলোৎপললোচনায়ৈ বিকাশপঙ্কেরুহলোচনায়।
ত্রিলোচনায়ৈ বিষমেক্ষণায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥
প্রপন্নপ্রষ্টে সুখদাশ্রয়ায়ৈ, ত্রৈলোক্যসংহারকতাণ্ডবায়।
কৃতস্মরায়ৈ বিকৃতস্মরায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥

চাম্পেয়গৌরার্দ্ধশরীরকায়ৈ কর্পূরগৌরার্দ্ধ শরীরকায়।
ধম্মিল্লবত্যৈ চ জটাধরায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥
অম্ভোধর শ্যামল কুন্তলায়ৈ বিভূতিভূষাঙ্গ জটাধরায়।
জগজ্জনন্যৈচ জগদেকপিত্রে নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥
সদাশিবানাং পরিভূষণায়ৈ সদাশিবানাং পরিভূষণায়।
শিবান্বিতায়ৈ চ শিবান্বিতায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়।

শঙ্করাচার্য্যকৃত হরগৌর্য্যাষ্টকম্।

শ্রীমণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের পূর্ণ অবতার—ভারতের ইহা মজ্জাগত বিশ্বাস। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" ভাগবতের এই বাণী ভারতের অন্তরে অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট। ভারতবাসী আহারে বিহারে শয়নে ব্যসনে সকল সময়েই জনার্দ্দন, পদ্মনাভ প্রভৃতি নামে শ্রীকৃষ্ণকেই স্মরণ করিয়া থাকেন। তাই মহাকবি নবীনচন্দ্র বলিয়াছেন,—"ভারতের গৃহে গৃহে কৃষ্ণপূজা, মুখে মুখে কৃষ্ণনাম।"

শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র ও এমন কি তাঁহার ঐতিহাসিক অস্তিত্ব সম্বন্ধে নানাবিধ অভিযোগ শ্রুত হইলেও, শ্রীকৃষ্ণ-উপাসনা ভারতের প্রাণে এরূপ ভাবে স্থান পাইয়াছে যে তাঁহার উপাসনাস্রোত ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত না হইয়া দিনে দিনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। এমন কি সেই প্রেমবন্যা পৃথিবীকে প্লাবন করিয়া একদিন জগৎকে ধন্য করিবে বলিয়া আশা করা যায়। নতুবা সুদূর আমেরিকার চিকাগো মহানগরীতে শ্রীকৃষ্ণ-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবে কেন?

শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব বুঝিতে হইলে পুরাণাদি শাস্ত্র সাহায্যেই আমাদিগকে জানিতে হইবে। কেবল আমাদের ভেদশীল বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা সেই গভীর তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা বড়ই দুরূহ। যে কোন বিষয়ের জ্ঞান, জ্ঞাতার বোধোপযোগী শক্তি নির্ভিন্ন হওয়ার উপর নির্ভর করে। আমাদের ইন্দ্রিয় বুদ্ধি মন, এমন কি অহংকারও আপাততঃ ভেদভাবাত্মক; সুতরাং তাহা দ্বারা সেই অদ্বয় তত্ত্বের

উপলব্ধি হইতে পারেনা। যাঁহারা সাধনা এবং ভক্তি বলে অভেদাত্মক আত্মজ্ঞানে অবস্থিত, যাঁহাদের হৃদয় হইতে বিশিষ্ট বস্তু বা শক্তি বা কেন্দ্রের মোহ অপসারিত, যাঁহাদের জ্ঞান, জ্ঞেয় জ্ঞাত এই ত্রিপুটী দূরীভূত হইয়া চিত্ত কেবল ভগবানে ন্যস্ত, সেই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের হৃদয় ও বাক্যই আমাদের এ বিষয়ের পথপ্রদর্শক। তাঁহারা সর্ব্বাশ্রয় ভগবানের চরণকমল আশ্রয় করিয়া "দুঃখালয়মশাশ্বতং" এই দুস্তর ভবার্ণব স্বয়ং উত্তীর্ণ হইয়া, জীবের মঙ্গলের জন্য অপ্রকট ভগবত্তত্ত্ব বর্ণ সংযোজনায় শাস্ত্রাদিসাহায্যে প্রকট করিয়া গিয়াছেন।

যে সকল পুরাণ বা ইতিহাস শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র প্রকট করিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবত তাহাদের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান। কারণ পরাশরনন্দন ব্যাসদেব নানা পুরাণ শাস্ত্র দ্বারা চিত্তের শান্তিলাভ করিতে অসমর্থ হইয়া ভক্তশ্রেষ্ঠ নারদের উপদেশে ভগবদ্গুণ-বর্ণন-প্রধান ভাগবতশাস্ত্র প্রণয়নে চিত্তের শান্তিলাভ করেন। শাস্ত্রোল্লিখিত বিহিত ক্রমে অধ্যয়ন করিলে যে শাস্ত্র দ্বারা ভগবান্ স্বরূপতঃ সদ্য চিত্তে প্রকটিত হন, তাহাই ভাগবত শাস্ত্র। ইহা সকল বেদ ও ইতিহাসের সার—

"সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতং"। ভাঃ ১।৩।৪২

পুরাণ কল্পের ইতিহাস। ইহাতে দশটি বিষয় বর্ণিত থাকে বলিয়া পুরাণের দশ লক্ষণ। এই দশটি লক্ষণ—

"অতঃ সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ॥" ভাঃ ২।১০।১

সর্গ—গুণ বৈষম্য হেতু পরমেশ্বর হইতে বিশ্বকর্ত্তৃগণ ও ভূতাদির বিরাটরূপে জন্ম। বিসর্গ—পুরুষরূপী বৈরাজ ব্রহ্ম ও তৎকর্তৃক সৃষ্টি। স্থান—সৃষ্ট পদার্থের তত্তৎ মর্য্যাদা পালন দ্বারা উৎকর্ষ বিধান, ঈশানুকথা—ভগবৎ প্রসঙ্গ।

নিরোধ—যোগ-নিদ্রার পর উপাধি সহ শয়ন বা প্রলয়।

মুক্তি—অবিদ্যা দ্বারা অধ্যাসিত কর্তৃত্বাদি পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপে ব্রহ্মরূপে অবস্থিতি। আশ্রয় অর্থে ভাগবত বলেন—

"আভাসশ্চ নিরোধশ্চ যতোহস্ত্যধ্যবসীয়তে
স আশ্রয়ঃ পরং ব্রহ্ম পরমাত্মেতি শব্দ্যতে"॥২।১০।৭

যাহা হইতে সৃষ্টি স্থিতি ও লয়, সেই পরম ব্রহ্ম বা পরমাত্মাই আশ্রয় শব্দের অর্থ। আশ্রিততত্ত্ব সেই আশ্রয় তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া থাকে। সৃষ্টি হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত

নয়টী আশ্রিততত্ত্ব মূল তত্ত্ব পরম ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া আছে। তাঁহাকে স্বতন্ত্র রাখিয়া আশ্রিত তত্ত্বের পৃথক্ সত্ত্বা থাকিতে পারে না। তাই শ্রীধরস্বামী আশ্রতাশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরম ধামকে পুরাণের দশমলক্ষণ বলিয়া সর্ব্ব প্রথমে তাঁহাকেই নমস্কার করিতেছেন। সেই তত্ত্বকে নমস্কার না করিলে জীবের গত্যন্তর নাই। নমস্কার অর্থে মন বুদ্ধি অহংকার ও চিত্তকে তাঁহার চরণে সমর্পণ বা ছাড়িয়া দেওয়া বুঝায়। গীতায় যেমন অর্জ্জুন—"শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম" বলিয়া আপনাকে তাঁহার চরণ কমলে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, শ্রীধরস্বামীর নমস্কারও সেইরূপ।

বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরম ধামই জীবের লক্ষ্য বা আশ্রয়স্থান। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—"পরং ব্রহ্ম পরংধাম পবিত্রং পরমং ভবান্"। ধাম অর্থে আলয় বা লয়স্থান, বা প্রকাশের নিবৃত্তি স্থান, সেই নিবৃত্তিস্থানই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব। ধাম শব্দে জ্যোতি বা দ্যোতনশীল পদার্থও বুঝায়। "তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্ব্বং।" বৈষ্ণবেরা এই ধামকে পরব্যোমের অতীত বলিয়া বর্ণনা করেন।

"পরব্যোম উপরি কৃষ্ণ লোকের বিভূতি।"

ভগবান্ গীতাতেও এই ধামের কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছেন, যে ধামে গমন করিলে জীবের আর পুনরাবৃত্তি হয়না—

"যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।"

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দেব সনাতনকে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সংক্ষেপে উপদেশ করিয়াছিলেন—

কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন।
অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব ব্রজের ব্রজেন্দ্র নন্দন।
সর্ব্বাদি সর্ব্ব অংশী কিশোর শেখর।
চিদানন্দ দেহ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বেশ্বর। চৈতন্য চরিতামৃত।

ভাগবতও এই অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্বের উল্লেখ করিয়াছেন—

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং,
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ ১।২।১১

তত্ত্ববিদেরা তাহাকে তত্ত্ব বলিয়া থাকেন তাহাই বস্তুতঃ অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব। শ্রীধর স্বামী টীকায় লিখিয়াছেন—

এবং তস্যৈব তত্ত্বস্য নামান্তরৈরভিধানাদিত্যাহ। ঔপনিষদৈ "ব্রহ্মেতি" হিরণ্যগর্ভৈঃ পরমাত্মেতি সাত্বতৈঃ ভগবানিতি শব্দ্যতে অভিধীয়তে।" অর্থাৎ সেই এক অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বকে বেদবাদিরা ব্রহ্ম, হিরণ্যগর্ভ-উপাসকেরা পরমাত্মা, এবং ভক্তেরা ভগবান শব্দে অভিহিত করেন। অদ্বয় জ্ঞান স্বরূপ স্বয়ং ভগবানই যে শ্রীকৃষ্ণ ইহা ভাগবত তারস্বরে জানাইয়াছেন—

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" ১।৩।২৮

শ্রীকৃষ্ণবতারকে বরাহাদি অবতারের পর্য্যায়ে উল্লেখ করিয়া পুনরায় বিশেষ করিয়া বলিতেছেন যে, সকল অবতারই পুরুষের কলা ও অংশ, কেবল শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। শ্রীধরস্বামী বলিতেছেন—

"অত্র বিশেষমাহ এতেচিতি। পুংসঃ পরমেশ্বরস্য কেচিদংশাঃ কেচিৎ কলাঃ বিভূতয়ঃ তত্র মৎস্যাদিনামাবতারত্বেন সর্ব্বজ্ঞত্বে সর্ব্বশক্তিমত্ত্বেপি যথোপযোগমেব জ্ঞানক্রিয়াশক্ত্যাবিষ্করণং। কুমার নারদাদিষ্বাকাবিকেষু যথোপযোগমংশকলাবেশঃ। তত্রকুমারাদিষু জ্ঞানাবেশঃ পৃথ্বাদিষু শক্ত্যাবেশঃ কৃষ্ণস্তু সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণ এব আবিষ্কৃতঃ সর্ব্বশক্তিত্বাৎ। অর্থাৎ কোন কোন অবতার তাঁহার বিভূতি কোন কোন অবতার পরমেশ্বরের অংশ। মৎস্যাদি অবতারে সর্ব্বজ্ঞত্ব এবং সর্ব্বশক্তিমত্ব থাকিলেও যথোপযোগী জ্ঞান ও ক্রিয়া শক্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কুমার চতুষ্টয় ও নারদে অধিকারী অনুসারে কলার অংশের আবেশ হইয়াছিল। কুমারাদিতে জ্ঞানের আবেশ ও পৃথ্বাদিতে শক্তির আবেশ। *শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান নারায়ণ, কারণ তাঁহাতে সর্ব্বশক্তি আবিষ্কৃত* হইয়াছিল। কেহ কেহ এই শ্লোকের অন্যরূপ অর্থ করিয়া বলিয়া থাকেন যে—

পরব্যোম নারায়ণ স্বয়ং ভগবান
তিঁহো আসি কৃষ্ণরূপে করেন অবতার।

কিন্তু এই শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য্য এইরূপ বলিয়া বোধ হয় না; কারণ অলঙ্কার-শাস্ত্রমতে প্রথমে অনুবাদ না বলিয়া বিধেয় বলিলে অলঙ্কারে দোষ পড়ে—

অনুবাদ মনুক্ত্বাতু ন বিধেয় মুদীরয়েৎ
নহ্যলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠাত।

একাদশীতত্ত্বে ধৃত ন্যায়।

জ্ঞাত বিষয়কে অনুবাদ এবং অজ্ঞাত বিষয়কে বিধেয় বলে; যেমন এই বিপ্র বিদ্বান্—এই উক্তিতে বিপ্রত্ব জ্ঞাত সুতরাং অনুবাদ; বিদ্যাবত্তা সকলের জ্ঞাত নহে, অতএব বিধেয়। কবিরাজ গোস্বামী এই স্থানটী বিশেষ ভাবে বিচার করিয়াছেন।

এতে শব্দে অবতারের আগে অনুবাদ
পুরুষের অংশ পাছে বিধেয় সংবাদ।
তৈছে কৃষ্ণ অবতার ভিতরে হৈল জ্ঞাত।
তাহার বিশেষ জ্ঞান সেই অবিজ্ঞাত।
অতএব কৃষ্ণ শব্দ আগে অনুবাদ।
স্বয়ং ভগবত্ত্ব পিছে বিধেয় সংবাদ॥
কৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্ত্ব ইহা হৈল সাধ্য।
স্বয়ং ভগবানের কৃষ্ণত্ব হৈল বাধ্য॥
কৃষ্ণ যদি অংশ হৈত অংশী নারায়ণ।
তবে বিপরীত হইত সুতের বচন॥
নারায়ণ অংশী যেই স্বয়ং ভগবান।
তেঁই শ্রীকৃষ্ণ ঐছে ব্যাখ্যান॥ চৈতন্যচরিতামৃত।

ভাগবত আপ্তবাক্য; তাহাতে প্রয়োগে কোনরূপ দোষ থাকিতে পারে না, যেহেতু

ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপটব।
আর্ষ বিজ্ঞ বাক্যে নাহি এইসব দোষ।

ভ্রম—মিথ্যাজ্ঞান, প্রমাদ—অনবধানতা, বিপ্রলিপ্সা—চিত্তের অন্তরবিক্ষেপ, করণা-পটব—ইন্দ্রিয়ের অপটুতা, এই সকল দোষ আপ্তবক্তের হইতে পারে না।

সুতরাং "কৃষ্ণ এক সর্ব্বাশ্রয় কৃষ্ণ সর্ব্বধাম।
কৃষ্ণের শরীরে সর্ব্ববিশ্বের বিশ্রাম॥"

জীব সেই সর্ব্বাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে? সকল অবতার তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই আবির্ভূত হয়। এ বিষয়ে শ্রীমতী ব্লাভটস্কী বলেন—There is a principle in nature called Mahavishnu which is different from the god of that name and which is the

seed of all Abatars. Secret Doctrine vol.1 তিনি অবতারী হইয়াও অবতার হয়েন। তিনি—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি গোবিন্দঃ সর্ব্ব কারণ কারণং॥ ব্রংস ৫।১

পরম শব্দ ঈশ্বরের বিশেষণ রূপে প্রয়োগ করায় বৈষ্ণব শাস্ত্রানুসারে শ্রীকৃষ্ণ "স্বয়ং রূপ" বলিয়া উক্ত। স্বয়ং রূপ অর্থে স্বতঃসিদ্ধরূপ। ভাগবত তাহাকে "অন্ত-সিদ্ধং" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পূজ্যপাদ রূপ গোস্বামী বলিয়াছেন—

অনন্তাপেক্ষি যদ্রূপং স্বয়ংরূপ স উচ্যতে। লঘুভাগবতামৃত।

স্বয়ং বা স্বতঃসিদ্ধরূপ কি? অন্যান্য সবরূপ পূর্ব্ব পূর্ব্বরূপ হইতে কর্ম্মবশে প্রসূত এবং কর্ম্মবশে পশ্চাৎ অন্যরূপের উৎপত্তি করে। আমার রূপ, পিতা, পূর্ব্বজগণ ও পিতৃ আদি অন্যান্যরূপ হইতে প্রসূত। তাহার ইতিহাস আছে; তাহার ক্রম আছে কিন্তু অবতারের রূপ পূর্ব্ব কোনরূপের উপর নির্ভর করে না; এবং তাহা হইতে পশ্চাৎ অন্যরূপ উৎপন্ন হয় না। সেই জন্য বিদুষী শ্রীমতী ব্লাভ্যাট্স্কী অবতারের রূপকে "an illusion within the illusion of the world" বলিয়াছেন। এইভাবে বুঝিলে "সম্ভবামি আত্মমায়য়া" কথার অর্থ বুঝায়।

সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অর্থে তিনি সৎস্বরূপ চিৎস্বরূপ আনন্দ-স্বরূপ—

সচ্চিদানন্দ পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিনরূপ

বৃহদারণ্যক উপনিষদ এই তিনটী বিভাবকে পৃথক্ করিয়া উপদেশ করিয়াছেন-

প্রজ্ঞা ইত্যেনদ্ উপাসীত
সত্যম্ ইত্যেনদ্ উপাসীত
আনন্দ ইত্যেনদ্ উপাসীত

মৈত্রী উপনিষদ বলেন—

সর্ব্ব পূর্ণ স্বরূপোস্মি সচ্চিদানন্দ লক্ষণঃ। ৬।১২

তিনি অনাদি অর্থাৎ হেতুশূন্য। হেতু শূন্য হইলেও সকল কারণের কারণ। শ্রুতিও বলেন—

স কারণং করণাধিপাধিপো

ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা নচাধিপঃ। শ্বেত ৬।৯

তিনিই কারণ এবং করণাধিপতিগণের অধিপতি, তাঁহার কেহ জনকও নাই অধিপতিও নাই। গীতায় এই তত্ত্বকে "ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহং" বলা হইয়াছে। সেই আদিতত্ত্ব বস্তুতঃ পূর্ণভাবে পূর্ণ শক্তিপ্রকাশ লইয়া জন্মগ্রহণ করিতে পারেন না, কারণ সমস্ত কুহকের নিরস্তকারী সত্তার নিকট মায়ার বা উপাধির আবরণ ধ্বংস হইয়া যায়। তবে এই অবতার প্রসবের ভিত্তি কোথায়? শ্রুতি বলিয়াছেন—

অজায়মানো বহুধা বিজায়তে।

গীতাতেও তিনি বলিয়াছেন—

অজোঽপি সন্ অব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৪ ৬

আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—

"বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন ॥

শ্রীধরস্বামী টীকায় লিখিয়াছেন—

ঈশ্বরোপি কর্ম্ম পারতন্ত্র রহিতোপি সন্ স্বমায়য়াসম্ভবামি সম্যক্ অপ্রচ্যুত জ্ঞান বলবীর্য্যাদি শক্ত্যৈব ভবামি ॥ নন্বু তথাপি ষোড়শকলাত্মক লিঙ্গদেহ শূন্যস্য চ তব কুতোজন্ম।

ইত্যত উক্তং স্বাং শুদ্ধা-শক্ত্যাত্মিকাং প্রকৃতিমধিষ্টায় স্বীকৃত্য বিশুদ্ধোর্জ্জিতসত্ত্ব মূর্ত্যা স্বেচ্ছয়া রভবামিত্যর্থঃ। অর্থাৎ ঈশ্বর কর্ম্মাধীন না হইলেও স্বীয় মায়াদ্বারা জ্ঞান বল-বীর্য্যাদি শক্তি পূর্ণভাবে রাখিয়া বা সংযমন করিয়া দেহীরূপে প্রকট হন। শাস্ত্রানুসারে জন্ম ষোড়শকলাত্মক লিঙ্গদেহ আশ্রয় করিয়া ঘটিয়া থাকে; ভগবান্ কেবল স্বীয় শুদ্ধাত্মিকা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বমূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে অবতীর্ণ হন। ভাগবতেও দেখা যায় যে যখন বসুদেব-গৃহে ভগবান্ জন্ম গ্রহণ করেন তখন বলিয়াছিলেন—

অদৃষ্ট্বান্যতমং লোকে শীলৌদার্য্যগুণৈঃ সমং।

অহংসুতো বামভবং পৃশ্নিগর্ভ ইতি শ্রুতঃ ॥

তয়োর্ব্বাং পুনরেবাহ মদিত্যামাস কশ্যপাৎ।

উপেন্দ্র ইতি বিখ্যাতো বামনত্বাচ্চ বামনঃ ॥

তৃতীয়েঽস্মিন্ ভাবেঽহং বৈ তেনৈব বপুষাথবাং।
জাতো ভূয়স্তয়োরেব সত্যং মে ব্যাহৃতিং সতি॥ ১০।৩।৪৩

আমি লোকে শীলৌদার্য্যাদিগুণে আমার সমান কাহাকেও না দেখিয়া পৃশ্নি পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করি। দ্বিতীয় জন্মেও আবার কশ্যপের ঔরসে ও অদিতি-গর্ভে জন্ম গ্রহণ করি। ইন্দ্রের কনিষ্ঠ বলিয়া উপেন্দ্র এবং খর্ব্ব বলিয়া বামন নামে বিখ্যাত হই। এই জন্মেও আমি তোমাদিগের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইলাম। আবার অন্যত্রও তিনি যে জন্ম কর্ম্ম রহিত তাহাও বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখা উদ্ধব বৃন্দাবনে গিয়া নন্দ ও যশোদাকে বলিয়াছিলেন—

মা খিদ্যতং মহাভাগৌ দ্রক্ষথঃ কৃষ্ণমন্তিকে।
অন্তর্হৃদি স ভূতানাং আস্তে জ্যোতিরিবৈধসি
নহ্যস্যাস্তি প্রিয়ঃ কশ্চিন্নাপ্রিয়ো বাস্ত্য মানিনঃ।
নোত্তমনাধমো বাপি সমানস্যাসমোঽপিবা॥
ন মাতা ন পিতাতস্য ন ভার্য্যা ন সুতাদয়ঃ।
নাত্মীয়ো ন পরশ্চাপি নদেহো জন্ম এবচ।
ন চাস্য কর্ম্ম বা লোকে সদসদ্মিশ্র যোনিষু।
ক্রীড়ার্থঃ সোপি সাধূনাং পরিত্রাণায় কল্পতে॥ ১০।৪৬।৩৯

এক্ষণে আপনারা আর দুঃখ করিবেন না, শ্রীকৃষ্ণকে শীঘ্রই নিকটে দেখিতে পাইবেন। কাষ্ঠের অন্তর্নিহিত অগ্নির ন্যায় তিনি ভূতগণের হৃদয়ে বিদ্যমান। তিনি সকলের প্রতি সমান, তাঁহার প্রিয়াপ্রিয় নাই, উত্তম নাই। তাঁহার সমানও কেহ নাই। দেহ জন্ম কর্ম্ম কিছুই নাই। ক্রীড়ার্থ সাধুদিগের পরিত্রাণার্থ সদসদমিশ্র যোনিতে আবির্ভূত হন মাত্র।

এই জন্মগ্রহণ সাধারণ জীবের ন্যায় নহে। সাধারণ জীব ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলে জন্মগ্রহণ করে; কিন্তু যিনি ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত ভূতের ঈশ্বর, যাঁহার ইচ্ছামাত্রে জগতে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সাধিত হয়, সেই পরম পুরুষ স্বেচ্ছাক্রমে স্বীয় বৈষ্ণবী মায়াকে আশ্রয় করিয়া আপনাকে প্রকট করেন, ইহাতে আশ্চার্য্য কিছুই নাই। সেই অখিল আত্মার আত্মা শ্রীকৃষ্ণ জগতের হিতের জন্য দেহীর ন্যায় প্রতীত হন। ইহাতে বিচিত্রতা কিছুই নাই।

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাং।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহী বাভাতি মায়য়া॥ ভা ১০।১৪।৫৫

সাধারণ জীব মায়াধীন, ভগবান্ মায়াধীশ। সাধারণ জীব কর্ম্মপরতন্ত্র দেহ ধারণ করে, ভগবানের দেহ তাঁহার ইচ্ছানুরূপ। শুদ্ধ সত্ত্বে তাহার প্রকাশ। সচ্চিদানন্দ ভগবানের সৎ অংশে সন্ধিনী শক্তি, এই সন্ধিনীর সার-অংশই শুদ্ধসত্ত্ব। সেই শুদ্ধ সত্ত্বে ভগবান্ প্রকাশিত হন। বসুদেবের একটী অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব—

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তেতত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবঃ
অধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে॥ ভা ৪।৩।২৩

বিশুদ্ধং সত্ত্বং অন্তঃকরণং সত্ত্বগুণা বা বসুদেবশব্দিতং বসুদেব শব্দেন উক্তং কুতঃ যৎ যস্মাৎ তত্র তস্মিন্ সত্ত্ব পুমান্ বাসুদেবঃ ঈয়তে প্রকাশতে অপগত মাবৃত্ত মাবরণং যস্মাৎ সঃ। অয়মর্থঃ—বাসুদেব ভবতি প্রতীয়তে ইতি বাসুদেব পরমেশ্বর প্রসিদ্ধ স চ বিশুদ্ধ সত্ত্বে প্রতীয়তে। অতঃপ্রত্যয়ার্থেন প্রসিদ্ধেন প্রকৃত্যর্থ নির্দ্ধার্য্যাত॥—শ্রীধর।

সর্ব্বাবরণ উন্মুক্ত বাসুদেব শুদ্ধসত্ত্বেই প্রকাশিত হয়, এই শুদ্ধ সত্ত্বাশ্রয়ই অবতার প্রসঙ্গ। অবতারশব্দ অব+তৃ ধাতু নিষ্পন্ন অর্থ অবতরণ। স্বয়ং ভগবান্ কিংবা কলা বিশ্বকার্য্যার্থে অপ্রপঞ্চ হইতে প্রপঞ্চে সামান্য ভাবে স্বপ্রকাশে যেন সন্তুষ্ট না হইয়া শুধু চিদ্‌ভাবে স্বীয়সত্ত্বা প্রকট করিয়া বিশেষরূপে প্রকাশকে আমাদের কাছে অবতরণের ন্যায় বোধ হয়।

সৃষ্টিহেতু যেই মূর্ত্তি প্রপঞ্চে অবতরে।
সেই ঈশ্বর মূর্ত্তি অবতার নাম ধরে॥

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং রূপ এবং অবতারী হইলেও স্বেচ্ছাক্রমে এবং ভক্তের প্রতি কৃপার্থ আপনাকে প্রকট করেন। ভাগবত তাঁহাকে স্বেচ্ছাময়স্য (১০।১৪।২) ভক্তেচ্ছোপাত্তদেহায় (১০।২৭।১১) প্রভৃতি বাক্যদ্বারা সেই তথ্যের ইঙ্গিত করিতেছে। বরাহ পুরাণে আছে যে সেই হরির সর্ব্ব বিধ দেহই নিত্য হইয়াও পুনঃ পুনঃ জগতে আবির্ভূত হয়েন। ইহা হানোপাদান রহিত এবং প্রকৃত জাত নহে। ঐসকল দেহই ঘনীভূত "পরমানন্দ চিদেকরস, সর্ব্ববিধ গুণযুক্ত এবং সর্ব্ব বিধ দোষবর্জ্জিত।

সর্ব্বে নিত্যাঃ শশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ।
হানোপাদানরহিতা নৈবপ্রকৃতিজাঃক্বচিৎ
পরমানন্দসন্দোহা জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্ব্বতঃ।
সর্ব্বে সর্ব্বগুণৈঃপূর্ণা সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতাঃ ॥

নারদপঞ্চরাত্রে দেখা যায় যে, বৈদুর্য্যমণি যেমন স্থানভেদে নীল পীতাদি ছবি ধারণ করে, তদ্রূপ ভগবান্ অচ্যুত উপাসনাভেদে স্ব স্বরূপকে বিবিধাকারে প্রকাশিত করেন—

মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ।
রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাৎ তথাচ্যুতঃ ॥

তবে অবতার প্রসঙ্গে অংশ বা পূর্ণ এইরূপ বাক্যের সার্থকতা কি? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে সর্ব্বেশ্বরতাহেতু সকল অবতার পূর্ণ হইলেও সেই সকল অবতারে সমস্ত শক্তির প্রকাশের আবশ্যকতা হয় নাই। যাঁহাতে সর্ব্বদা শক্তির অল্পপরিমাণে প্রকাশ হয় তাহাকে অংশ এবং যাঁহতে স্বেচ্ছাক্রমে নানা শক্তির প্রকাশ হয় তাকে অংশী বা পূর্ণ বলা হয়। শক্তির অভিব্যক্তির তারতম্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই এইরূপ বলা হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ দাস

মহামায়ার খেলা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"দিদি। আর বাঁচিবার আশা নাই। আমার কপাল পুড়িয়াছে। এত অজ্ঞান থাকা অবস্থা নয়! এমনত কখন দেখিনি।"

"হতাস হ'য়ো না বোন্। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ"।

"আর শ্বাস কোথায় দিদি, দেখছো না চোখের পলক নাই, নাকের কাছে হাত দিয়ে, তুলো দিয়ে দেখলাম একটুও বাতাস বইছে না।

"এতো নতুন নয়, পূর্ব্বেও ত হয়েছে"।

পূর্ব্বে হয়েছে বলেই ত ডাক্তার কবিরাজ ডাকা হল না। তাই আপশোষ রয়ে গেল, গ্রামের লোক জনকে খবর দেওয়া হল না, শ্বশুর ঠাকুরই বা মনে ক'রবেন কি?"

"আমি ত রাত্রি ৯টা ১০টার সময় বল্লেম লোকজন ডাকা যাক্; তুমি বল্লে এমন হয়ে থাকে, লোকজন ডাক্‌লে তিনি রাগ করবেন। তা না হলে ত গ্রামের লোকদের ডাকাই হত।"

"আমি কি জানি এমন হবে। অন্যান্য সময়েও দেখেছি তিনি এক ঘণ্টা দুঘণ্টা পর্য্যন্ত স্থির হয়ে বসে আছেন" এই বলিয়া হেমলতা কাঁদিতে লাগিল। তাহার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। তাহার দিদি নানা কথায় প্রবোধ দিতে লাগিল। এইরূপ কাঁদিতে কাঁদিতে উভয়ে রাত্রি প্রভাত করিল। প্রাতঃকালে গ্রামস্থ লোককে সকল কথা বলা হইল।

গ্রামে একটা হৈ হৈ রৈ রৈ পড়িয়া গেল। অনেক লোক হেমলতার বাটীতে উপস্থিত হইল। আদ্যোপান্ত শুনিয়া নির্ম্মলকুমারের প্রশান্ত পলকবিহীন মূর্ত্তিখানি দেখিয়া অনেকে ভাবিল যে লোকটী কোনরূপ "ক্রিয়া" করিতে গিয়া প্রাণ হারাইয়াছে। কেহ বলিল এ মৃত্যু নয়। কুম্ভক করিয়া এরূপ ভাবে দশ দিন থাকা যাইতে পারে? কেহ বলিল হরিদাসের কথা জানইত মাটীর নীচে প্রোথিত থাকিয়াও মৃত্যু হয় নাই। কেহ বলিল ইহার তথ্য আমরা বুঝি না। জগতে বহু বিষয়ের জ্ঞান এখনও মানুষের অজ্ঞাত রহিয়াছে জানইত—"There

are more things in heaven and earth than are dreamt of in your philosophy" অবশেষে তাহাদের যুক্তিতে এবং হেমলতা ও তাহার দিদির একান্ত অনুরোধে একজন ডাক্তার ডাকা হইল।

ডাক্তার আসিয়া নির্ম্মলকুমারের পূর্ব্ব ইতিহাস শুনিলেন, হাত টিপিলেন, চোখে আঙ্গুল দিয়া কি দেখিলেন। কি একটা বুকে দিয়া খানিকক্ষণ পরীক্ষা করিলেন। তিনি বাহিরে আসিয়া "বড়ই দুঃখিত" বলিয়া চলিয়া গেলেন। একজন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন অনেকক্ষণ হইল মৃত্যু হইয়াছে। লোকটীর বোধ হয় "হিষ্টিরিয়া" ছিল। "Heart এর weaknessই মৃত্যুর কারণ। তবে যে লোকটী বসিয়া আছে বোধ হয় rigor mortis" হইয়া থাকিবে। আপনারা মৃত্যু বিষয়ে সন্দেহ করিবেন না।

তখন সকলে মিলিয়া সৎকারের আয়োজন করিতে লাগিল। ইঁহাদের মধ্যে একটী বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ইহজীবনের অতীত সূক্ষ্মাতীত জীবনে বিশ্বাস করিতেন, এবং সেই জীবনের সহিত ইহজীবন এক সুরে বাঁধিবার জন্য যোগ-যাগ প্রাণায়ামাদির অভ্যাস করিতেন। লোকটী লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। "বিদ্যা অর্থকরী" না হইয়া ইঁহার পক্ষে অন্যরূপ হইয়াছিল। তিনি সকলকে বলিলেন "বাপু হে ইহাকে কুসংস্কারই বল আর যাই বল, ইনি উচ্চশ্রেণীর সাধক, সন্দেহ নাই। মৃত্যুকালে সুখাসনোপবিষ্ট হইয়া এইরূপ ভাবে দেহত্যাগ, একি সহজ কথা! তোমরা ইঁহাকে দগ্ধ করিও না। আমি যতদূর শুনিয়াছি তাহাতে এইরূপ ভাবে দেহ ত্যাগ করিলে সমাধির ব্যবস্থা করিতে হয়।" দুই এক জন এ কথায় সম্মতি প্রকাশ করিলেন। হেমলতাও তাহাদের কথায় সম্মতি জানাইলেন, ভাবিলেন সমাধি-স্থান দর্শন করিয়াও প্রাণে একটু শান্তি আসিতে পারে। তাহাদের একটী বাগান ছিল; সেই স্থানে সমাধি দেওয়া হইল।

অপরাহ্নে দুই ভগ্নী আঁচল পাতিয়া শুইয়া আছে। হেমলতা মনে মনে নির্ম্মলকুমারের জীবন্তমূর্ত্তির চিত্র আঁকিয়া হৃদয়ে দেখিবার চেষ্টা করিতেছেন। কখনও বা সে চিত্র পূর্ণভাবে প্রকটিত হইতেছে; কখনও বা ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। হেমলতার বয়স উনিশ বৎসর, যৌবনের পূর্ণতায় পদার্পণ করিয়াছে মাত্র; দেখিতেও পরমাসুন্দরী। নির্ম্মলকুমার ধনীর সন্তান, হেমলতার পিতাও একজন

ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু দরিদ্রের দুঃখ দেখিলে তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যাইত; তাই যথাসর্ব্বস্ব দরিদ্রের ভরণ-পোষণে ব্যয় করিয়া মৃত্যুকালে কেবল বসতবাটী ও একখানি বাগান ব্যতীত আর কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। বাটী-খানিও বন্ধক দিয়া তাঁহার মাতা হেমলতার বিবাহে ব্যয় করিয়াছেন। আজ একমাস হইল হেমলতার মাতা করাল কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। সহায় সম্পদ আশ্রয় ভরসা কেহই নাই। নিকটবর্ত্তী গ্রামে দূরসম্পর্কীয়া একটী ভগিনী আসিয়া হেমলতার তত্ত্বাবধান করিতেছেন। নির্ম্মলকুমার শাশুড়ীর শ্রাদ্ধসময়ে আসিয়া এইখানেই ছিলেন।

নির্ম্মলকুমার শিক্ষিত যুবক; বাল্যকাল হইতেই তিনি সংসারে উদাসীন ও ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হইলেও ধর্ম্মপ্রাণ। জপ তপ পূজা লইয়াই তিনি সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিতেন। সাংসারিক জীবনে যতটুকু কর্ম্ম না করিলে নয় ততটুকু কর্ম্ম ভগবানে অর্পণ করিয়া করিতেন। অবশিষ্ট সময় ধর্ম্ম-কথা ও শাস্ত্রাদি অধ্যয়নে কাটাইতেন। একজন মহাপুরুষের নিকট তিনি দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশক্রমেই তিনি যোগাদি ক্রিয়া অভ্যাস করিতেন। মধ্যে মধ্যে তাঁহার তন্ময়তা আসিত, বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইত, আবার সংজ্ঞা হইত। সেই জন্যই হেমলতা কাহাকেও সংবাদ দেন নাই, ভাবিয়াছিলেন এবারও সেইরূপ হইয়াছে কিন্তু এবার আর সংজ্ঞা হইল না। নির্ম্মলকুমার সহধর্ম্মিণীকে ধর্ম্মকথা উপদেশ দিতেন। পৌরাণিক সারগর্ভ উপাখ্যানাদি শুনাইতেন এবং যাহাতে সস্ত্রীক ধর্ম্মাচরণ করিতে পারেন তদুদ্দেশ্যে হেমলতাকে নানারূপে শিক্ষা দিতেন।

নির্ম্মলকুমারের বিবাহে আদৌ ইচ্ছা ছিল না; তিনি পিতার একমাত্র সন্তান অনেক দিন হইতে তাঁহার পিতা মাতা পুত্রবধূ মুখ সন্দর্শনার্থ উৎসুক ছিলেন; কিন্তু পুত্রের অমতে বিবাহ দেন নাই। একদিন নির্ম্মল স্বপ্নে দেখিলেন যে তাঁহার গুরুদেব একটী সুন্দরী বালিকা সঙ্গে লইয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। নির্ম্মলকুমার স্বপ্নাবেশেই বলিলেন "একি প্রভু"। গুরুদেব বলিলেন "ইহার নাম হেমলতা বাড়ী বনগ্রাম বিধবার কন্যা, ইহাকেই বিবাহ করিও।" এই কথা বলিয়াই তিনি অদৃশ্য হইলেন। স্বপ্নও ভাঙ্গিয়া গেল নির্ম্মল ভাবিলেন "স্বপ্ন সত্য কি মিথ্যা। সত্যই কি আমাকে বিবাহ করিতে হইবে? সত্যই

কি বনগ্রামে হেমলতা নামে কোন বিধবার কন্যা আছে ?" এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইল। তিনি গোপনে কোন এক বিশ্বস্ত বন্ধুকে সংবাদ আনিতে বনগ্রাম পাঠাইলেন। অবশেষে যখন জানিতে পারিলেন যে সংবাদ সত্য, তখন গুরুদেবের আদেশ জ্ঞানে পূর্ব্ব সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া বিবাহের কথা জানাইলেন। পিতামাতা এ সংবাদে আনন্দিত হইলেন। দরিদ্রের ঘরে বিবাহে পিতামাতার অনিচ্ছা থাকিলেও পুত্রের সম্মতি জানিয়া সেইখানেই বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল। হেমলতার মাতাও নির্ম্মলকুমারের ন্যায় জামাতা পাইয়া আপনাকে ধন্য মনে করিলেন, কিন্তু অল্প দিনের ভিতরেই কি বিপর্য্যয়! কোথায় হেমলতার মাতা আর কোথায় বা তাঁহার আদরের নির্ম্মলকুমার ? কন্যা হেমলতাই বা কি করিতেছেন ? কমনীয়-কায় নির্ম্মলকুমার আজ ধরণীগর্ভে শায়িত, এ নিদ্রা আর ভাঙ্গিবে কি ?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

হেমলতা কি করিতেছেন ? নয়নকোণে আধ ঘুমঘোর যেন লাগিয়া আছে। আবেশভাবে নয়নপল্লব অবনত হইয়া পড়িয়াছে। ইহা জাগরণ, না নিদ্রা, না তন্দ্রা ? হেমলতার স্মৃতি-প্রাঙ্গণে স্বামীর সজীব চিত্র যেন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; তাঁহার প্রাণে কত পুরাতন কথা, কত প্রেমের অভিমান, কত আদর, কত সোহাগ, কত ভালবাসার অনন্ত নিদর্শন যেন জাগিয়া উঠিতেছে। পতিপ্রাণা হেমলতার হৃদয়ে, স্বামীর পুণ্যময় স্নেহময় লাবণ্যময় মধুর মূর্ত্তি কত খেলাই খেলিতেছে। আবার সে ঘোর যেন চলিয়া গেল, সে সুখস্বপ্ন অন্তর্হিত হইল; হেমলতা যেন দেখিতেছেন যেন অকূল অনন্তে তিনি একাকী ঝাঁপ দিলেন। বেলাহীন অনন্ত সাগরের মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণ আশ্রয়হীনা ভাবিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন; অবলম্বনহীন নিরবচ্ছিন্ন অনন্ত শূন্য দেখিয়া তাঁহার প্রাণ হতাশ হইয়া পড়িল।

এমন সময়ে কে যেন কোমল হস্ত প্রসারণ করিয়া বলিল "ভয় কি, ভগবানে নির্ভর কর, তিনিই সর্ব্বাশ্রয়, তিনি স্বামীর স্বামী—পতির পতি, তিনিই

একমাত্র গতি।" শুনিবামাত্র হৃদয়ে বল আসিল অবসাদ দূরে গেল, শুষ্কবদন প্রফুল্লিত হইল, মলিন শশাঙ্ক যেন উজ্জ্বল হইল। ক্ষণেক পরেই আবার আত্ম-বিস্মৃতি হৃদয় অধিকার করিল, সাহসের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। তখন হেমলতা নিজের ক্ষুদ্র দেহাত্মভাবে আপনাকে ক্ষুদ্র মনে করিয়া আপনার মনে বলিতে লাগিল "আমার সর্ব্বস্ব মাটিতে মিশিয়া গেল আমাকে লইয়া আমি কি করিব? কি আছে আমার? কিসের যত্ন! কিসের আত্মাদর! কিসের আত্মরক্ষা। আমার আমাতে কাজ কি? আমার এই অস্ফুট যৌবন লইয়া আমি কি করিব? আমার ধ্যান জ্ঞান জপমালা যখন হারাইয়াছি, তখন এ ছার জীবনে প্রয়োজন কি? আমার দেহরথের সারথী, জীবন-তরণীর কর্ণধার, হৃদয়-রাজ্যের রাজরাজেশ্বর মনোমন্দিরের দেবতা যখন নাই, তখন এ শূন্যহৃদয়, শূন্যদেহ, শূন্যরাজ্য এবং শূন্যমন্দির লইয়া কি করিব? আবার যেন সহসা কাহার প্রেমালিঙ্গনে হৃদয়ে অমিয়ধারা বহিতে লাগিল, ধমনীতে তড়িৎ-প্রবাহ সঞ্চালিত হইল, প্রাণের ভিতর কে যেন সুধাকলস ঢালিয়া দিল, মর্ম্মে মর্ম্মে, লোমকূপে লোমকূপে যেন অপরিজ্ঞাত আনন্দের উৎস ছুটিতে লাগিল। হেমলতা যেন সত্যই দেখিতে পাইল যে তাহার স্বামী তাহার পার্শ্বে উপবিষ্ট। হেমলতা স্বপ্নাবস্থায় ভাবিতে লাগিল একি? স্বপ্ন না সত্য? মরি মরি একি অপরূপ মূর্ত্তি। প্রাণের উচ্ছ্বাসে হেমলতা বলিতে লাগিল "স্বামিন্। তবেনা তোমার মৃত্যু হইয়াছে, তবেনা তুমি ইহধাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছ? তবেনা তোমার সুকুমার দেহ ধরণীগর্ভে প্রোথিত? স্বপ্নই হউক কিংবা যাহাই হউক, নির্ম্মলকুমার দৃঢ় এবং গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিল "প্রিয়তমে কতদিন তোমাকে বলিয়াছি আত্মার বিনাশ নাই, দেহ পরিবর্ত্তন করে মাত্র।" কতদিন তোমাকে পড়িয়া শুনাইয়াছি—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং
ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥"

কতদিন তোমাকে বলিয়াছি।" স্বামী স্বামী বলিয়া প্রিয় নয়, আত্মার জন্য প্রিয়। এই আত্মা—

নিত্যঃ সর্ব্বগতস্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।

প্রিয়তমে! রূপের আসক্তি ত্যাগ কর; কামনার সাধ বিসর্জ্জন দাও, মোহ পরিত্যাগ কর, দেখিবে যে স্বামী তোমার মরে নাই। দেখ হেমলতা! স্বামীর স্বামী ভগবান তিনিই জগৎস্বামী। তিনিই স্বামীরূপে পুত্ররূপে পিতারূপে খেলা করিতেছেন"! বাহিরের এই সাজকরা রূপের ভিতরে এক তিনিই বর্ত্তমান। তাঁহাকে আশ্রয় করো, দেখিবে শোক নাই, ভয় নাই, মোহ নাই। মনে রাখিও—

"যার কেহ নাই তার সব আছে।
সমস্ত জগৎ মুক্ত তার কাছে॥"

অকস্মাৎ সে রূপ অন্তর্হিত হইল, বালার্করাগে উদ্ভাসিত অতুলনীয় সৌন্দর্য্য যেন হঠাৎ লুকাইল; বুকের ভিতর যেন তোলাপাড়া করিতে লাগিল। হেমলতা হঠাৎ জাগ্রত হইয়া পড়িল, দেখিল যে এতক্ষণ স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছি সবই অলীক। চক্ষু চাহিয়া দেখিল তাহার দিদি তাহার পার্শ্বে বসিয়া বাতাস করিতেছে।

"দিদি। আমায় বাতাস কর্ত্তে হবে না" তাহার দিদি বলিল "তুই কি স্বপ্ন দেখ্‌ছিলি? হাঁস্‌ছিলি কেন"?

"হাঁ দিদি! স্বপ্ন দেখছিলাম তিনি যেন আমায় আদর করে কত কথা বলছিলেন, কত উপদেশ দিচ্ছিলেন, ঠিক যেন বেঁচে আছেন। তিনি বল্লেন "ভয় নাই ভগবানে নির্ভর কর।" এই বলিয়া হেমলতা কাঁদিতে লাগিল।

"এই বুঝি উপদেশের মান্য করা হচ্ছে; তিনিত ঠিকই বলেছেন ভগবানে নির্ভর কর। তিনি ভিন্ন উপায় কি আছে"?

"বুঝলাম ত সব; কিন্তু মন যে মানে না। প্রাণের ভিতর কি যেন কচ্ছে।"

এমন সময়ে নির্ম্মলকুমারের ভৃত্য রামদয়াল আসিয়া বলিল "হাঁগো তোমরা কি রাতদিন কেঁদে কেঁদে মারা যাবে। কাঁদলে কি আর ফিরবে। উঠ, সন্ধ্যা হল ঘরে আলো দাও, চৌকাটে জল দাও, আর শুধুই কেঁদে কি হবে?

হেমলতার দিদি উঠিয়া সন্ধ্যা দিলেন। অনেক পীড়াপীড়িতে হেমলতা একখানি বাতাসা খাইয়া একগ্রাস জল খাইলেন। একখানি কম্বলে শয়ন করিল, কেবল

ভাবিতে লাগিল এ স্বপ্ন না সত্য, মনে ভাবিতে লাগিল সত্যই হয়ত তিনি বাঁচিয়া আছেন, হয়ত পরলোক সত্যই আছে ; সেইখানে হয়ত তিনি এখন আছেন। ঘুম এলে হয়ত তাঁহার সঙ্গে আবার দেখা হবে! তাই ঘুমের জন্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু নানা চিন্তায় ঘুম সহজে আসিল না। তাহার দিদি হেমলতার ভবিষ্যৎ ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রিত হইলেন।

(ক্রমশঃ)

মৈত্রেয়ী।*

পূর্ণ-যৌবনা ঋষি-কন্যা বিদুষী মৈত্রেয়ী এক তাপস-কুমারকে পতি-রূপে নির্ব্বাচন করিয়াছেন। একমাস পরে তাঁহাদের বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পর ধ্রুবতারা, অরুন্ধতী ও সপ্তর্ষি সন্দর্শন পূর্ব্বক বিবাহের পরিচ্ছদ সূর্য্যাসুক্তাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দান করিয়া তিনি বধূবেশে শ্বশুরালয়ে পদার্পণ করিলেন। শ্বশুর-শাশুড়ীর ও পতির সেবা করিয়া, গিরি, নদী, বন, উপবনের সৌন্দর্য্য দেখিয়া, প্রাণ ভরিয়া স্বামীকে ভালবাসিয়া, পতির আত্মীয়দের মধ্যে আপনার হৃদয় ঢালিয়া দিয়া, পতির সংসারে ঘোর সংসারী হইয়া মৈত্রেয়ী স্বচ্ছন্দে তিন বৎসর কাটাইলেন। শ্বশুরবাড়ীর সকলেই মৈত্রেয়ীগত প্রাণ। মৈত্রেয়ীও সেবা, সৌজন্য, সহানুভূতি, স্নেহ, ভক্তি, শ্রদ্ধায় সকলকে বশ করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

সহসা মৈত্রেয়ীর ভাবান্তর ঘটিল। শ্বশুর-গৃহে দিবারাত্র তত্ত্বালোচনা হইত। মৈত্রেয়ী প্রতিদিন শ্বশুরের নিকট তত্ত্ব-বিষয়ে উপদেশ লইতে লাগিলেন। ক্রমশঃ সংসারে আর তাঁহার মন বসিল না। হৃদয়ের পূর্ণ প্রেম-ভক্তি তিনি বিশ্বহৃদয়ে অর্পণ করিলেন। দুই বৎসরের মধ্যে মৈত্রেয়ী গৃহের মধ্যে আসিয়া সম্পূর্ণ বৈরাগ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন। সংসারের চিন্তা ছাড়িয়া তিনি তখন আত্মচিন্তা লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার স্বামী মৈত্রেয়ীর এইরূপ ভাবান্তর দেখিয়া একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমাকে আর সংসারের কার্য্যে মনোযোগ দিতে দেখি না। রাত্তদিন বসিয়া বসিয়া তুমি কি চিন্তা কর?" মৈত্রেয়ী উত্তর

* গুর্জ্জর-দেশস্থ পুরাণ-সার অবলম্বনে লিখিত।

করিলেন—"প্রভু! যে চিন্তা সকলের চিন্তা হওয়া উচিত আমি তাহারই চিন্তা করি—যখন নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ, নিরাকার, নিরুপাধি ব্রহ্মকে খুঁজিতে গিয়া কুল-কিনারা পাই না, তখন সগুণ ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন, সাকার উপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্মের উপাসনায় মনোনিবেশ করি।" ঋষি তখন তাঁহাকে সাগ্রহে বলিতে লাগিলেন—"একই বস্তু কিরূপে একবার সগুণ এবং একবার নির্গুণ হইতে পারে? ব্রহ্মসম্বন্ধে যাহা কিছু জান আমায় বল—আমি তোমার প্রেম-বিহ্বল ভাবপূর্ণ হৃদয়োচ্ছ্বাস তোমার মধুর কণ্ঠ দিয়া শুনিতে ইচ্ছা করি। ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী! বল বল মৈত্রেয়ী। ব্রহ্মতত্ত্ব আমায় শোনাও।" মৈত্রেয়ী বলিতে লাগিলেন—"প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মের গুণও নাই, আকৃতিও নাই, কোন বিশেষও নাই, উপাধিও নাই; আমরা কেবল অবিদ্যা বশতঃ উপাসনা করিবার জন্য তাঁহার উপর উপাধি সকল আরোপ করিয়া থাকি। বর্ণহীন স্বচ্ছ কাচখণ্ডে যেমন লোহিতাভা নিপতিত হইয়া উক্ত কাচখণ্ডকে লোহিতবর্ণে রঞ্জিত করে অথচ তন্নিমিত্ত উহাকে লোহিতবর্ণ বিশিষ্ট জ্ঞান করা যেমন ভ্রান্তিমূলক, সেইরূপ নির্গুণ পরব্রহ্মকে অবিদ্যাজনিত উপাধিবিশিষ্ট মনে করা আমাদের ভ্রান্তি বই আর কি বলা যাইতে পারে? পরব্রহ্ম বস্তুতঃ নির্গুণ, নিরাকার, নির্ব্বিশেষ ও নিরুপাধিক। ব্রহ্ম স্থূলও ন'ন, সূক্ষ্মও ন'ন, ক্ষুদ্রও ন'ন, বৃহৎও ন'ন। তিনি অস্পৃশ্য, অশ্রাব্য, অদৃশ্য ও অবিনাশী। তৎসম্বন্ধে যাহা কিছু কল্পনা করা যায় তাহাই 'নেতি' 'নেতি-'প্রমুখ (তিনি অচিন্তনীয়)। ফলতঃ, যাহা আমরা জানি তিনি তাহা ন'ন, যাহা আমরা জানি না—তিনি তাহাও ন'ন। বাক্য ও মন তাঁহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসে।

একান্তই যদি তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে হয়, তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে তিনি সৎ-স্বরূপ। তাঁহার অস্তিত্ব নাই একথা বলা যাইতে পারে না; কিন্তু যুক্তি সাহায্যে তাঁহার বিদ্যমানতাও প্রতিপন্ন হয় না। লবণের আস্বাদ যেমন সম্পূর্ণ লবণাক্ত, উহার মধ্যে অন্য কোন বস্তুর আস্বাদ সংমিশ্রিত নাই, তদ্রূপ পরব্রহ্ম বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ অর্থাৎ জ্ঞান ব্যতিরিক্ত তিনি আর কিছুই ন'ন। জ্ঞান-বিরহিত অস্তিত্ব যেমন কল্পিত হইতে পারে না, তদ্রূপ অস্তিত্ববিরহিত জ্ঞানও কল্পনার অযোগ্য। তিনি আছেন স্বীকার করিলে তিনি জ্ঞানস্বরূপ হইয়া আছেন একথা স্বীকার

করিতে হইবে। কখন কখন তাঁহাকে আনন্দস্বরূপ বলা গিয়া থাকে। দুঃখের অভাবই আনন্দ। কথিত আছে যাহা ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন তাহাই দুঃখময়; সুতরাং ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে।

যাবতীয় পদার্থনিচয়ের অন্তঃসত্ত্বরূপে পরব্রহ্ম বিরাজ করিতেছেন। তিনি চিন্তার সম্পূর্ণ অতীত। চিন্তা দ্বারা তাঁহাকে অবগত হওয়া অসম্ভব। তবে তিনি সকল পদার্থের মূলে বিদ্যমান আছেন বলিয়া তাঁহা অপেক্ষা সত্য আর কিছুই নাই। যিনি স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ তিনি কদাপি জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারেন না। তিনি সমস্ত জানিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে জানিতে পারা যায় না। বহির্জগৎ হইতে ইন্দ্রিয়সকলকে আকর্ষণপূর্ব্বক অন্তরাত্মায় সংযমিত করিয়া 'সংরাধনাবস্থা' (সম্যক্ শান্তি) প্রাপ্ত হইলে, যোগী ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকে। যখন আমি ও ব্রহ্ম এক হইয়া যাই, নাম ও রূপ যখন অস্তিত্ব বিবর্জ্জিত হয়, তখন আমি মুক্ত হইয়া যাই।

নিরতিশয় সঙ্কল্প-আরোপ দ্বারা পরব্রহ্ম অপরব্রহ্মে পরিণত হয়। যেখানে যেখানে সঙ্কল্প, গুণ, আকৃতি অথবা বিশেষত্বসম্পন্ন ব্রহ্ম উক্ত হইয়া থাকে, সেই সেই স্থানে উক্ত ব্রহ্মকে অপর-ব্রহ্ম বুঝিতে হইবে। এইরূপ ব্রহ্ম কেবল উপাসনার জন্য কল্পিত হইয়া থাকে। এই উপাসনা বা এতৎসংসৃষ্ট কর্ম্মের ফলে স্বর্গলাভ হয়; কিন্তু, ইহা হইতে সংসার-গণ্ডির বাহিরে যাওয়া যায় না। যাহা হউক, অপরব্রহ্মের উপাসনায় মৃত্যুর পর দেবযান পথ অতিক্রম করিয়া স্বর্গৈশ্বর্য্য লাভ পূর্ব্বক সম্যগ্ দর্শন লাভ করিতে পারা যায়, এবং সম্যগ্ দর্শন-লাভ করিয়া পরিশেষে পূর্ণবিমুক্তি সংঘটিত হয়। ইহাকে ক্রমবিমুক্তি বলে। পূর্ণবিমুক্তি ক্রম-বিমুক্তির অব্যবহিত ফল নয়; যেহেতু, ক্রমবিমুক্তিতে সাধকের অজ্ঞান সম্পূর্ণরূপ অন্তর্হিত হয় না। অজ্ঞানই পরব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করিতে গিয়া তাঁহাকে অপরব্রহ্মে পরিণত করে। বর্ণবিশিষ্ট অন্য কোন পদার্থ সহযোগে অনুরঞ্জিত হইয়া স্ফটিকের স্বচ্ছতা যেমন বিনষ্ট হয় না, আকাশস্থিত একই সূর্য্য জলস্রোতে প্রতিবিম্বিত হইয়া বহু-সূর্য্যরূপে প্রতিভাত হইলেও প্রকৃত সূর্য্যের যেমন তাহাতে কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না, তদ্রূপ অবিদ্যা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইলেও পরব্রহ্ম কিছুমাত্রও পরিবর্ত্তিত হয় না। অপরব্রহ্ম তিন শ্রেণী দ্বারা তিনরূপে কল্পিত হইয়া থাকে। এক শ্রেণী তাঁহাকে 'বিশ্বাত্মা' বা জগদাত্মা, অন্য শ্রেণী জীবাত্মা এবং অপর শ্রেণী তাঁহাকে ঈশ্বররূপে কল্পনা করিয়া থাকে।

কখন কখন তাঁহাকে সর্ব্বনিষ্পন্নকারী, ইচ্ছাময়, প্রাণময়, আস্বাদময় অর্থাৎ সমস্ত কার্য্য ও সমস্ত ইন্দ্রিয়জ্ঞানের মূল কারণরূপে বিবৃত করা হয়। তিনি শান্ত ও অচঞ্চলভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন। চন্দ্র-সূর্য্য তাঁহার চক্ষুর্দ্বয়, আকাশ তাঁহার শ্রুতি এবং বায়ু তাঁহার নিঃশ্বাস। তিনি সমস্ত জ্যোতির আকর; স্বর্গের বাহিরে, অন্তরের অভ্যন্তরে তিনি জ্যোতিঃস্বরূপ। তিনি ব্যোম্-রূপী জীবনরূপী—তাঁহা হইতে জীবন সকল সমুদ্ভূত হইয়া নাম ও রূপের বিশেষত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। বিশ্বসংসার তাঁহাতেই চলিতেছে, ফিরিতেছে। কোন কোন স্থলে এই অত্যাশ্চর্য্য আত্মার ক্ষুদ্রায়তন কল্পিত হইয়াছে। তিনি এই দেহাবাসে অবস্থান করিতেছেন, তিনি হৃৎপদ্মে বিরাজ করিতেছেন ইত্যাদি। এই সকল কল্পনা অবশেষে চূড়ান্ত আকার ধারণ করিয়া ব্রহ্মকে ঈশ্বরত্বে দাঁড় করাইয়াছে। এরূপ ঈশ্বর কল্পনা বড় একটা দেখা যায় না। আমাদের পুনর্জ্জন্ম পরিগ্রহ ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন; তাঁহারই অনুগ্রহে আমরা মুক্তির কারণ-স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া থাকি। বৃষ্টিবিন্দু যেমন প্রত্যেক বীজ হইতে বীজানুরূপ বৃক্ষ বর্দ্ধিত করে, সেইরূপ ঈশ্বরও পূর্ব্বজন্মানুরূপ কর্ম্মান্তিক ফল প্রদান করিয়া থাকে। আমাদের পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান দ্বারাই ব্রহ্মের ঈশ্বরত্ব নিষ্পন্ন হয়। এই জ্ঞান অবিদ্যা-জনিত; সুতরাং ঈশ্বরত্ব অপ্রতিপাদনীয়।

দেখুন—জ্ঞান দ্বিবিধ। ব্যবহার-লব্ধ জ্ঞান দ্বারা এক প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। সেই সিদ্ধান্তে ব্রহ্ম উপাধি-সংশ্লিষ্ট জীবাত্মা সকল সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সেই সকল আত্মা পুনঃ পুনঃ কর্ম্মজন্য জন্ম পরিগ্রহ করিতেছে এরূপ প্রতীয়মান হয়। আবার চিন্তা ও ব্যবহারাবস্থা অতিক্রম করিয়া, মনো-বৃত্তিনিচয়কে পশ্চাতে রাখিয়া এক জ্ঞান-রাজ্য আবিষ্কৃত হইয়া থাকে; সে এক অভিনব, অচিন্তনীয় রাজ্য। সেখানে ব্রহ্ম ও জগতের পার্থক্য বিদ্যমান নাই—অসংখ্য জীবসমন্বিত জগৎ ব্রহ্মত্বের মধ্যে কোথায় লুক্কায়িত হইয়া যায়। বহুত্ব তিরোহিত হইয়া একত্বে পরিণত হয়। সেখানে জগতের সৃষ্টিও নাই, স্থিতিও নাই এবং আত্মারও দেহান্তর প্রাপ্তি নাই। যেখানে যেখানে বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ আছে তাহার সকল স্থানেই এই দ্বিবিধ জ্ঞান স্বতন্ত্র ভাবে কথিত হয় নাই। প্রধানতঃ, পারমার্থিক ভাবেই উপদেশ প্রদত্ত হইয়া থাকে; তা' বলিয়া ব্যবহার-মূলক উপদেশ একেবারে বর্জ্জিত হয় নাই। ব্যবহারাবস্থার জ্ঞান নিদানতত্ত্ব

সম্বন্ধে স্বতঃ অপরাবিদ্যার নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। সুতরাং অনেক স্থলে বিশ্বতত্ত্বসম্বন্ধীয় উপদেশে সৃষ্টিবিষয়ক আলোচনা প্রশ্রয় পাইয়াছে। এই আলোচনায় যতদূর সম্ভব জগতের স্বতন্ত্রতা প্রকাশ পাইয়াছে। আবার পুনঃ পুনঃ এমনও উক্তি দেখিতে পাওয়া যায় যদ্দ্বারা অনুমান করিতে পারা যায় যে ব্রহ্ম ও জগতের একত্ববাদের সমর্থনার্থ এই সৃষ্টিবাদ সাহায্য করিতেছে। সকল স্থলেই কারণবাদ একত্ববাদের স্থান অধিকার করিয়াছে মাত্র। মনস্তত্ত্ব হিসাবে ব্রহ্ম ও জগতের একত্ববাদ সম্পূর্ণরূপ সংরক্ষিত হইয়াছে, এবং এই তত্ত্বের আধ্যাত্মিকতার নিকট নিদানতত্ত্বের ব্যবহারাবস্থামূলক উপদেশ পরাস্ত হইয়াছে। সময়ে সময়ে পরমার্থমূলক শিক্ষা ব্যবহারমূলক শিক্ষার নিকটও পরাভূত হইয়া থাকে; কিন্তু ব্যবহারমূলক মনস্তত্ত্বের সুস্পষ্ট প্রচার দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই তত্ত্বের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে ব্রহ্মতত্ত্ব ও নিদানতত্ত্ব সম্বন্ধীয় শ্রেষ্ঠ জ্ঞানকে, বিশ্বতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব বিষয়ক শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের সহিত এক অখণ্ড্য পারমার্থিকতত্ত্ব হইতে হইবে, এইরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব ও নিদানতত্ত্ব সম্বন্ধীয় নিম্নস্তরের জ্ঞানেরও, বিশ্বতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব বিষয়ক নিম্নস্তরের জ্ঞানের সহিত এক অখণ্ড্য নিম্নজ্ঞানসাধ্য ব্যবহারমূলক তত্ত্বে পরিণত হওয়া আবশ্যক। পরব্রহ্ম কদাপি সৃষ্টিকার্য্যে নিয়োজিত হইতে পারেন না; সৃষ্টিকার্য্য অপরব্রহ্মসাধ্য; যেহেতু, সৃষ্টিকার্য্যে ব্যাপৃত হইতে একাধিক বৃত্তিকে নিয়োজিত করিতে হয়; কিন্তু, অপরব্রহ্ম ব্যতীত পরব্রহ্মে কদাপি মনোবৃত্তি আরোপ করা যায় না।" এইরূপ বলিতে বলিতে মৈত্রেয়ী ভাবে গদ্‌গদ হইয়া গেলেন। তাঁহার আর বাক্যস্ফুরণ হইলনা। নয়ন নিমীলিত করিয়া তন্ময় হইয়া বসিয়া রহিলেন। পতি পত্নী উভয়েই নীরব।

এই ঘটনার পর হইতে মৈত্রেয়ীর সম্পূর্ণ সংসার-বৈরাগ্য হইল। আর কেহ কখনও তাঁহাকে ব্রহ্মকথা ভিন্ন অন্য কিছু কহিতে শোনে নাই।

শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ।

অবধূত-গৌরচন্দ্র

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ ।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥"

শ্রীভাগবত—১১।৫।৩২

(নবপর্য্যায়—ষোড়শ বর্ষ ।)

মায়া—বিদ্যা ও অবিদ্যা ।

(১)

আমরা যথাবিধি চৈতন্যময়ী ঈশ্বরচৈতন্যের অনুগত হইয়া যথাশক্তি ও যথাজ্ঞান বিদ্যাতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। পূর্ব্বাচার্য্যগণের সহিত যদি কোন স্থানে পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তাহা সহৃদয় পাঠক আমাদেরই ভ্রমপ্রমাদোত্থিত বলিয়া গ্রহণ করিবেন।

বিদ্যা ও অবিদ্যা, জ্ঞান ও অজ্ঞান, এই চারিটী শব্দের (terms) উপর বলিতে গেলে হিন্দুর সমস্ত দর্শন ও শাস্ত্র পরিস্থাপিত। আমাদের মনে হয় এই শব্দ সকল দ্বারা শাস্ত্র যে তত্ত্ব লক্ষিত করেন তাহা না বুঝিলে সনাতন বা হিন্দু ধর্ম্মের সম্যক্ পরিজ্ঞান সম্ভবে না। অনেকের বিশ্বাস যে এই দুই এর অতীত "মূলপ্রকৃতি" বলিয়া ব্রহ্ম বা ভগবানের প্রকৃতি আছে; কিন্তু এই মতটী শাস্ত্র-সঙ্গত ও সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। দেবী-ভাগবতে মায়াকেই

"মূলপ্রকৃতি রেবৈষা সদা পুরুষসঙ্গতা।
ব্রহ্মাণ্ডং দর্শয়ত্যেষা কৃত্বা বৈ পরমাত্মনি" ।।৩।৩।৫৫

এই রূপে বর্ণনা করেন। ইনিই মূলপ্রকৃতি সর্ব্বদা পুরুষে সঙ্গত এবং ইনিই পরমাত্মাতে ব্রহ্মাণ্ড সকল সৃষ্টি করিয়া পরমাত্মার মহিমার ব্যঞ্জনার জন্য যেন তাঁহাকেই দেখান। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে এই জন্য মায়াকে "দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্ণিগূঢ়াম্" বলিয়া লক্ষিত করা হইয়াছে। শ্রীমদাচার্য্য এই শ্রুতির ভাষ্যে বলিয়াছেন:—"দেবস্য দ্যোতনাদিযুক্তস্য মায়িনো মহেশ্বরস্য পরমাত্মনঃ

আত্মভূতামস্বতন্ত্রাং ন পৃথগ্ভূতাং স্বতন্ত্রাং শক্তিং কারণমপশ্যন্। ...অথবা, দেবাত্মশক্তিমিতি দেবশ্চ আত্মা চ শক্তিশ্চ যস্য পরস্য ব্রহ্মণোঽবস্থাভেদাস্তাং প্রকৃতি পুরুষেশ্বরাণাং স্বরূপ ভূতাং...পরাৎপরতরাং শক্তিং কারণম-পশ্যন্নিতি।" অস্যার্থঃ—ব্রহ্মবাদীরা স্বপ্রকাশ স্বরূপের, দেবের মায়ী মহেশ্বর পরমাত্মার, আত্মভূত অর্থাৎ যাহা পৃথগ্ভূত বা স্বতন্ত্র নহে, তদ্রূপ শক্তিকে জগৎকারণ বলিয়া অবগত হইয়াছিলেন। অথবা, দেব আত্মা ও শক্তি যে পরব্রহ্মের অবস্থাভেদ তাঁহার ঈশ্বর, পুরুষ (জীব) ও প্রকৃতি রূপ ব্রহ্মস্বরূপভূতা পরাৎপরা শক্তিকে জগৎকারণ বলিয়া অবগত হইয়াছিলেন।

এই আত্মশক্তি সম্বন্ধে শ্রীমদ্‌ভাগবতে মৈত্রেয় ঋষি বলেনঃ—

"ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ।
আত্মেচ্ছানুগতাবাত্মা নানামত্যুপলক্ষণঃ।
সা বা এতস্য সংদ্রষ্টুঃ শক্তি সদসদাত্মিকা।
মায়া নাম মহাভাগা যয়েদং নির্ম্মমে বিভুঃ।" ৩।৫।২৩—২৫।

"ইদং বিশ্বমগ্রে সৃষ্টেঃ পরমাত্মা ভগবান্ এক এব আসীৎ... নান্যদ্‌দ্রষ্টৃ দৃশ্যাত্মকং।...আত্মেচ্ছা যা মায়া তস্যা অনুগতৌ লয়ে সতি। সাবৈ দ্রষ্টৃদৃশ্যানুসন্ধানরূপা; সদসদাত্মিকা কার্য্যকারণরূপা। যদ্বা সৎ দৃশ্যম্, অসৎ অদৃশ্যম্ আত্মা স্বরূপম্ তয়োবাত্মাযস্যা স্তদুভয়ানুসন্ধানরূপাৎ।"(শ্রীধর।) সুতরাং তত্ত্বদর্শী শ্রীধরস্বামীর মতে মায়া ভগবানের আত্মশক্তি। তিনি ভগবানের ইচ্ছা, সুতরাং চৈতন্যস্বরূপিণী। তিনি দ্রষ্টা এবং দৃশ্য রূপে আপাততঃ প্রতীয়মান চৈতন্যবিভাগদ্বয় সর্ব্বদা জ্ঞানরূপে এক করিয়া রাখেন বলিয়া তাঁহাকে দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের অনুসন্ধানরূপা বলিয়া লক্ষিত করা হইল। দেবী-ভাগবতে স্বয়ং দেবী বলিতেছেন—"তস্য চেচ্ছাস্যাহং দৈত্য সৃজামি সকলং জগৎ। স মাং পশ্যতি বিশ্বাত্মা তস্যাহং প্রকৃতিঃ শিবা"॥৫।১৬।৩৬॥" হে দৈত্য। আমি তাঁহার ইচ্ছা। এবং (তাঁহাতে) সকল জগৎ সৃজন করি। বিশ্বাত্মা (সর্ব্বাত্মভাবে) আমাকে দর্শন করেন এবং আমি তাঁহার শিবা (পরা) প্রকৃতি।" নীলকণ্ঠ এই শ্লোকের ভাষ্যে শিবসূত্র হইতে উদ্ধার করিয়া বলেন—"ইচ্ছাশক্তিঃ উমাকুমারী"। উমা ভগবানের ইচ্ছাশক্তি। ইনি ভগবৎচৈতন্য-

ক্ষেত্রে ভগবানের আত্মলীলার জন্য ভগবানকে অবলম্বন করিয়া সর্ব্বাত্মিকাভাবে জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

অতএব বুঝা গেল অচিন্ত্যরূপী, অচিন্ত্যশক্তি ভগবানের চৈতন্যরূপিণী আত্মশক্তিই মায়া। যেন ভগবান্ আপন স্বরূপ উপভোগ করিবার জন্য আপনাতেই আপনাকে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তাঁহাতে বাস্তবিক বহুত্ব নাই। তাঁহার দ্রষ্টাও তিনি, দৃশ্যও তিনি, অথচ দুইই নহেন; কেবল চিদানন্দঘন স্বরূপ মাত্র। সেই জন্য প্রকটিত বিশ্ব, প্রকৃত পক্ষে তাঁহার নিকট মিথ্যা স্বরূপ, যেন মনোবিলাসের ঐন্দ্রজালিক প্রকাশ মাত্র।

"যস্যাদ্ভুতং কল্পিতং ইন্দ্রজালং চরাচরং ভাতি মনোবিলাসং॥

মায়া যে ঈশ্বরের চৈতন্য বিভাব, সে বিষয়ে দেবী-ভাগবত বলেন—

সা চ মায়া পরে তত্ত্বে সম্বিদ্রূপেঽস্তি সর্ব্বদা।
তদধীনা প্রেরিতা চ তেন জীবেষু সর্ব্বদা॥
ততো মায়াবিশিষ্টাং তাং সম্বিদং পরমেশ্বরীম্।
মায়েশ্বরীং ভগবতীং সচ্চিদানন্দরূপিণীম্ ধ্যায়েৎ॥৬৩১।৪৮,৪৯।

সেই মহামায়া পরতত্ত্ব ভগবানে সম্বিদ্রূপে সর্ব্বদা অবস্থিত। (তাই তিনি চৈতন্যময়ী এবং ব্রহ্মের স্বরূপিণী) এবং ভগবৎ কর্তৃক জীবে প্রেরিতা হয়েন। সেই জন্য মায়াবিশিষ্টা পরমেশ্বরী চৈতন্যস্বরূপা সচ্চিদানন্দরূপিণী ভগবতী সর্ব্বদা ধ্যেয়। ব্রহ্ম বা ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। যেমন অঙ্ক কষিতে গেলে একই অঙ্ককে বিভিন্ন স্তরের (steps) মধ্যে আনিয়া কষিতে হয়, তদ্রূপ সৃষ্টি মানসে ভগবৎ চৈতন্য আপনা আপনি যেন বিভক্ত হইয়া, একতা ও অদ্বিতীয় ভাবে প্রকাশিত হন। তাঁহার স্বরূপ চৈতন্যের একতা ভাবে, তিনিই "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। অদ্বিতীয় স্বরূপ ভাবে তিনি "সোঽহংরূপী"। তাঁহার অদ্বিতীয় অহং ভাবে স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ নাই। সে অদ্বিতীয়তায়—

"আপূর্য্যমানমচলংপ্রতিষ্ঠং, সমুদ্রমাপো প্রবিশন্তি যদ্বৎ॥ গীতা

যেমন অসংখ্য অথচ জলরূপে একরস, কিন্তু নাম রূপে বিভিন্ন নদী সকল সমুদ্রে পতিত হইলে সেই অচল প্রতিষ্ঠ সমুদ্রের কোন রূপ তারতম্য হয় না, তদ্রূপ ভগবানের পরিপূর্ণতা ও অদ্বিতীয়তা হইতে অসংখ্য জীবরূপী বিশিষ্ট অদ্বিতীয়তার প্রকাশ এবং তাঁহাতে লয় হইলে সেই পরিপূর্ণতার কিছু তারতম্য

হয়না। সেইজন্ত তাঁহার নাম "পূর্ণ"। সেই জন্য সেই অদ্বিতীয় অহং তত্ত্বকে শাস্ত্র "পূর্ণ" এবং "পরিপূর্ণ" বলিয়া ইঙ্গিত করেন। তথাচ "পরিপূর্ণভবাবে" ;

"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।

পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।"

ভেদবুদ্ধি. ব্যক্তজীবে এই পরিপূর্ণতার চিহ্ন এখনও নষ্ট হয় নাই। সেই জন্যই সে সমস্ত বিশ্ব অধিকার করিয়া থাকিতে চায়। অহঙ্কার-তত্ত্ব পর্য্যালোচনে ইহা পরে বিবৃত করা যাইবে। ভগবানের একতা ভাব হইতে সর্ব্বাত্মিকা ভাব প্রসূত হইয়াছে। যেন তিনি "আমি এক কি না" তাহা বুঝিবার জন্য 'সর্ব্ব' রূপে প্রকট হইয়া, তাহাদিগকে পুনরায় 'সম'রূপে অনুসন্ধান করিয়া স্বীয় মহিমার প্রকাশ করিতেছেন। তাই গীতা তাঁহাকে 'সম'রূপে দর্শন করিবার উপদেশ দিয়াছেন।

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরং।

বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃপশ্যতি স পশ্যতি ॥

পুনশ্চ— যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।

তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ ন মে প্রণশ্যতি ॥

"সর্ব্ব"শব্দে সতত বিশেষের অতিরিক্ত উচ্চস্তরের সত্তা ও শক্তির ইঙ্গিত করা হয়। উহা বহুত্ব বাচক নহে। এ কথা পরে বিবৃত করা যাইবে। ভগবানের একতা ভাবে প্রকাশকে আমরা বোধ হয় মায়া নামে অভিহিত করিতে পারি। তাঁহার যে চৈতন্য "মাত্রায়" তিনি এক হইয়াও সর্ব্বরূপী হয়েন, এবং যদ্দ্বারা সর্ব্বরূপী হইয়াও পুনরায় একভাবে আছেন, তাহারই নাম মায়া। সেই একত্বের ব্যঞ্জনার জন্যই মায়া-শক্তির বিকাশ। "স ঐক্ষত একোহহং।" তিনি সংকল্প করিলেন আমি এক। অমনি ঐ ইচ্ছা, প্রকাশ-ক্ষেত্র বা বৃত্তের দিকে "বহুস্যাম প্রজায়েয়ম্" রূপে প্রবর্ত্তিত (polarised) হইল।

মায়া ভগবানের "সর্ব্বজ্ঞ" ও "সর্ব্বরূপী" ভাবের মতি। অঙ্কশাস্ত্রের পণ্ডিতের চৈতন্যে যেরূপভাবে বিশিষ্ট অঙ্ক গুলি নিহিত থাকে, সেইরূপ সর্ব্বরূপী ভগবানের চৈতন্যে বিশিষ্ট নাম-রূপের ভাব লীন হইয়া থাকে। পণ্ডিতের স্মৃতিতে দুই চারিটী বিশিষ্ট অঙ্কের ছায়া থাকিতে পারে। কিন্তু যখন তাঁহার অঙ্ক শাস্ত্রের স্মৃতির উদ্রেক হয় না, তখন অঙ্কশাস্ত্র-লব্ধ শক্তিও (Capacity) সুপ্ত হইয়া

যায়। তাহাতে তখন বিশিষ্টের কোন নিদর্শনই পাওয়া যায় না। ঐ সামান্য-রূপী (abstract) শক্তি হইতে, তিনি অনন্ত নূতন নূতন অঙ্ক প্রকট করিতে পারেন ; তাহাতে শক্তির হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না। তদ্রূপ ভগবানের সর্ব্বাত্মিকা চৈতন্যাংশ অবিশেষ ও সামান্যরূপী। উহাতে পূর্ব্ব কল্পের বিশিষ্ট জীব ও বস্তু নাই। কেবল লিঙ্গ (index) মাত্র থাকে। যেমন Anএ nটী অবিশেষ শক্তি মাত্রা মাত্র ; উহার মূল্য বা মান একও হইতে পারে, দুইও হইতে পারে, হাজারও হইতে পারে, তদ্রূপ পূর্ব্ব কল্পের জীবের অদৃষ্ট ও কর্ম্ম লিঙ্গমাত্র রূপে চৈতন্যের সহিত একরস হইয়া ভগবানে লীন থাকে। তাঁহার চৈতন্যে ব্যক্ত বিশেষের কোন পরামর্শ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এষা সংহৃত্য সকলং বিশ্বম্ ক্রীড়তি সংক্ষয়ে।

লিঙ্গানি সর্ব্বজীবানাং স্বশরীরে নিবেশ্য চ॥ দেবী-ভাগবত ৩।৩।

ইনি সমস্ত বিশ্বকে সংহরণ করিয়া প্রলয়ে ক্রীড়া করেন। তখন সমস্ত জীবের লিঙ্গ বা চিহ্ন তাঁহার শরীরে নিবেশিত হয়। সেই জন্য ভাগবত বলিয়াছেন—

যর্হ্যেবোপরতা দেবী মায়া বৈশারদীমতিঃ।

সম্পন্ন এবেতি বিদুর্মহিম্নি স্বে মহীয়তে॥১৩।৩৪

"তথাপি ভগবন্মায়ায়াঃ সংসৃতিকারণভূতায়া বিদ্যমানত্বাৎ কথং ব্রহ্মতা, তত্রাহ যর্হীতি অসন্দেহে সন্দেহবচনং যদি বেদাঃ প্রমাণং স্যুরিতিবৎ। বৈশারদী বিশারদঃ সর্ব্বজ্ঞঃ ঈশ্বরস্তদীয়া দেবী সংসারচক্রেণ ক্রীড়ন্তি এষা মায়া যত্র্যুপরতা ভবতি। কিমিত্যুপরতা ভবেৎ তত্রাহ মতিবিদ্যা। অয়ং ভাবঃ—যাবদেবাহ-বিদ্যা আত্মনা আবরণবিক্ষেপৌ করোতি তাবান্নোপরমতি। যদাতু সৈব বিদ্যা-রূপেণ পরিণতা তদা সদসদ্রূপং জীবোপাধিং দগ্ধা নিরিন্ধনাগ্নিবৎ স্বয়মেবোপরমে-দিতি। তদাসম্পন্নঃ ব্রহ্মস্বরূপং প্রাপ্ত এবেতি বিদুঃতত্ত্বজ্ঞাঃ। কিমতঃ? যদ্যেবং স্বে মহিম্নি পরমানন্দস্বরূপে মহীয়তে পূজ্যতে বিরাজতে ইত্যর্থঃ॥" (শ্রীধর) ভগবানের মায়া সংসৃতির কারণ হইলেও, তাঁহার ব্রহ্মতা কিরূপে হইতে পারে, এই সন্দেহ নিরাকরণের জন্য ভাগবত বলিতেছেন—বিশারদ (omni-potent and expert)ঈশ্বরের দেবী অর্থাৎ অবিদ্যা রূপে সংসার-চক্রে প্রকাশ-মানা কিন্তু বিদ্যারূপে ঈশ্বরকে প্রকাশশীলা, এই মায়া যখন উপরতা হয়েন (কিরূপে উপরতা হয়েন ?) মতি বা বিদ্যারূপে। তখন জীব সম্পন্ন বা সর্ব্বাত্মিকা ভাবে

সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্ম স্বরূপে আপন পরমানন্দরূপ মহিমাতে মহীয়ান্ হয়েন। ভাব এই যে, যাবৎ ঈশ্বরচৈতন্যরূপা মহামায়া দেবী জীবের ভেদজ্ঞান বশতঃ অবিদ্যা (প্রাদেশিক বা ঐকদেশিক জ্ঞান) ভাবে ক্রীড়া করিয়া আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি দ্বারা সংসাররূপে ব্রহ্মবস্তুকে প্রকাশ করেন, তাবৎ উপরতি হয় না। কিন্তু যখন দেবী সর্ব্বাত্মিকা ভাবে, গায়ত্রীরূপে, পরিণতা হয়েন—তখন জীব-হৃদয়ে ক্ষুদ্র অহং জ্ঞানের স্থানে বিশ্বাত্মিকা (universal) জ্ঞান প্রকটিত হয়। তাহাতে সদসদ্রূপ অহংকার বা জীবোপাধি দগ্ধ হইয়া যায়, এবং কাষ্ঠ শূন্য অগ্নির ন্যায় বিদ্যাও নির্ব্বাপিতা হয়েন। অর্থাৎ সর্ব্বাত্মিকা ভাবের সংসিদ্ধির সহিত জীব "সর্ব্বকে" অহং রূপে দেখিতে পাইয়া বিশিষ্ট অহংবুদ্ধি পরিত্যাগ করতঃ ব্রহ্ম স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। সেই জন্য ভাগবত পুনরায় বলিতেছেন—

এবং গুরূপাশনয়ৈকভক্ত্যা, বিদ্যাকুঠারেণ শিতেন ধীরঃ।

বিবৃশ্চ জীবাশয়মপ্রমত্তঃ, সম্পদ্য চাত্মানমথ ত্যজাস্ত্রম্। ১১।১২।২৪।

অতএব এই প্রকারে একান্ত ভক্তি সহকারে গুরূপাসনা সম্ভূত ভক্তি যোগে তীক্ষ্ণীকৃত বিদ্যা-কুঠার দ্বারা অপ্রমত্ত ভাবে জীবোপাধি হৃদয়-গ্রন্থি ছেদন পূর্ব্বক আত্মভাবে সম্পন্ন হইয়া তখন বিদ্যারূপ অস্ত্র ত্যাগ কর।

আমরা বুঝিলাম যে মায়া ভগবানের চৈতন্যের এক অনির্ব্বচনীয় ভাব; এবং উহাতে কোন এক অপরিজ্ঞাত ভাবে "সর্ব্বের" ভেদহীন লিঙ্গ মাত্র অবশিষ্ট থাকে। উহা তাঁহার জ্ঞান বা সম্বিৎ "মাত্রা"। সেই জন্য পাতঞ্জল-সূত্রে প্রকৃতি বা জৈবীক মায়াকে "বিশেষ" ও "অবিশেষ" গুণপর্ব্বযুক্তা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

"বিশেষলিঙ্গমাত্রালিঙ্গানি গুণপর্ব্ব্যাণি॥" ২।১৯।

মহত্তত্ত্ব পর্য্যন্ত বিশেষের লিঙ্গ দৃষ্ট হয়; কিন্তু প্রধান বা প্রকৃতি ভাবে তাহা থাকে না। এই জন্য উক্ত সূত্রের ভাষ্যে ব্যাসদেব বলেন—যৎ তৎ পরমবি-শেষেভ্যো লিঙ্গমাত্রং মহত্তত্ত্বং তস্মিন্নেতে সত্তামাত্রে নিঃসদস্ত নিরসৎ অব্যক্তমলিঙ্গং প্রধানং তৎ প্রতীয়ন্তীতি।"

আমাদের ক্ষুদ্র পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের অনুশীলন করিলেও কথঞ্চিৎ ভাবে অনির্ব্বচনীয় মায়া শক্তির আভাষ লাভ হইতে পারে। পূর্ব্বোদ্ধৃত অঙ্ক শাস্ত্রের উদাহরণে দেখা যায়, যে বিশিষ্ট অঙ্কগুলি এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে,

প্রথমে "কৌশল" বা "চাতুর্য্য"রূপে পণ্ডিতেরই চিত্ত ক্ষেত্রে লীন হইয়া থাকে। ঐ চাতুর্য্য বা কৌশল-বিশিষ্ট অঙ্কগুলিকে স্বীয় চৈতন্যে সম্যক্ ভাবে পরিণতির ফল মাত্র; এবং উহা অবিশেষ হইলেও উহাতে বিশেষ রূপে প্রকাশ হইবার প্রবৃত্তি বা গতি (tendency) আছে। কিন্তু যখন ঐ পণ্ডিত বিষয়ান্তরে চিত্ত স্থির করেন তখন ঐ অবিশেষ শক্তিও লীন হইয়া যায়, এবং তাহার কোনও নির্দ্দেশও করিতে পারা যায় না। ঐ জ্ঞান তাঁহার লব্ধ অঙ্ক শাস্ত্রের জ্ঞানরূপে তাঁহার সঙ্গে "তুল্য জাতীয়," অথচ বা ভেদরূপে প্রকাশের বিবক্ষা তাহাতে আছে বলিয়া শুদ্ধ অহং জ্ঞানের "অতুল্য জাতীয়।" সেই জন্য পঞ্চশিখাচার্য্য বলিয়াছেন "অয়ন্তু খলু ত্রিষু গুণেষু কর্ত্তৃষু অকর্ত্তরি চ পুরুষে তুল্যাতুল্যজাতীয়ে চতুর্থে তৎক্রিয়াসাক্ষিণি উপনীয়মানান্ সর্ব্বভাবানুপপন্নানানুপশ্যন্নদর্শনমন্যচ্ছঙ্কতে" অর্থাৎ গুণত্রয় রূপ কর্ত্তা এবং অকর্ত্তা চতুর্থ গুণত্রয়ের সাক্ষী পুরুষের মধ্যে তুল্যাতুল্য জাতীয় ভাব আছে এবং পুরুষ চৈতন্য যে বাস্তবিক সর্ব্বভাবানুপন্ন অথচ কূটস্থ ইহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না। ইহা হইতে আর একটি ভাব বুঝা গেল:—প্রকৃতি বা মায়া চৈতন্যের সহিত একান্ত ভিন্ন পদার্থ নহে; তবে ধর্ম্মে বা প্রবৃত্তিতে ভিন্ন বলিয়া অন্য জাতীয় বলিয়া মনে হয়। উহা বিশিষ্ট নহে, বলিয়া "অন্য জাতীয়" শব্দ প্রয়োগ হইল। সামান্য (Common) অধিকরণ (Substratum) কখন ভিন্ন জাতি হয় না। বুঝা গেল, যে মায়া প্রকাশ ভাবে তিনরূপে অবস্থান করেন, এই তিন রূপকে লক্ষিত করিবার জন্য ভাগবত বলেন—

"স বৈ বিশ্বসৃজাং গর্ভো দৈবকর্ম্মাত্মশক্তিমান্।
বিবভাজাত্মনাত্মানমেকধা দশধা ত্রিধা॥
সাধ্যাত্মঃ সাধিদৈবশ্চ সাধিভূত ইতি ত্রিধা
বিরাট্ প্রাণো দশবিধ একধা হৃদয়েন চ।" ৩।৬।৭ ও ৯।

তাঁহাতে উল্লিখিত মহদাদি তত্ত্ব সকলের কার্য্যস্বরূপ গর্ভ—দৈবশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও আত্মশক্তি (মায়া) বিশিষ্ট হইয়া এক দশ ও তিন প্রকারে বিভক্ত হইল। অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি দ্বারা হৃদয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য-স্বরূপে এক প্রকার, এবং ক্রিয়াশক্তিদ্বারা প্রাণ রূপে দশ প্রকার, আর আত্মশক্তি রূপে অধ্যাত্ম অধিভূত ভেদে আপনাকে তিন তিন প্রকার করিল। এই আত্মশক্তি উপনিষদের "দেবাত্ম শক্তি।" সগুণ ভাবে আত্মশক্তি (মায়া) বিশিষ্ট হইয়া এক, দশ ও তিন প্রকারে বিভক্ত হইল,

অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি দ্বারা হৃদয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যস্বরূপে এক প্রকার, ক্রিয়া-শক্তি দ্বারা প্রাণরূপে দশ প্রকার, আর আত্মশক্তি দ্বারা, অধ্যাত্ম, অধিদৈব, ও অধিভূত ভেদে আপনাকে তিন প্রকার করিল। সগুণ ভাবে প্রকাশে ইনি=দেব+আত্ম (জীব)+শক্তি; এবং নির্গুণ ভাবে ইনি দেবের আত্মভূতা শক্তি। সগুণ ভাব অবিদ্যার ক্ষেত্র, ও নির্গুণ ভাব বিদ্যার ক্ষেত্র। এই বিদ্যাকেই প্রকট ভাবে হৃদয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য (যাহাতে চৈতন্যের একত্বের কখনও অপলাপ হয় না) বলিয়া ইঙ্গিত হইয়াছে। এই তিন ভাব ও তাঁহার মধ্যস্থিত "সম" রূপী "সৎ" কে ইঙ্গিত করিয়া শ্রুতি কহেন—

"ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং।

এই বিষয়টি পরে বিশেষ রূপে বিবেচিত হইবে।

উক্তশক্তি ভগবানের সর্ব্বাত্মিকা ভাবে চৈতন্যমাত্রাই মায়া, ইহা বোধ হয় কথঞ্চিৎ বুঝা গেল। উহাতে বিশেষ লিঙ্গমাত্র রূপে থাকে। যেমন পণ্ডিতের হৃদয়ে বিবিধ শাস্ত্র জ্ঞান বিভূতি রূপে প্রকাশ পায়, তদ্রূপ সর্ব্বাত্মভাবের চৈতন্যই ভগবানের বিভূতি। "বিভূতি" শব্দের মধ্যে শাস্ত্র এই নিগূঢ় তত্ত্ব রাখিয়া গিয়াছেন। বিভূতি শব্দে শক্তি, (Capacity or power) উহাতে বিশিষ্ট ভূত ভাব সকল ভুক্ত অন্নের ন্যায় এক রসে পরিণত হয়। এই বিভূতিই উপনিষদের 'অশনা'। কিন্তু "বিভূতির" আর এক অর্থ আছে,—যাহাতে ভূত ভাব নাই, যাহা দগ্ধবস্ত্রাবভাসের ন্যায় সত্তা শূন্য হইয়াও পূর্ব্বভূত বিশিষ্ট ভাবের নিদর্শন মাত্র করে। সেই জন্যই মহাদেব—"শ্মশান-পাংশু চন্দন-চর্চ্চিত সু-কলেবর।"

এই মায়া বিদ্যা ও অবিদ্যা রূপে যেন প্রকাশিত হন। বিশিষ্ট অহং বুদ্ধি-বিশিষ্ট জীবের নিকট মায়া অবিদ্যা। ভগবানের অভিমুখী ভাবে মায়া বিদ্যা। কিন্তু উভয়ের মধ্যেই চৈতন্যের সর্ব্বাত্মিকা একত্ব প্রবৃত্তি রহিয়াছে। তবে অবিদ্যার এই প্রবৃত্তি সুপ্ত এবং বিদ্যার এই প্রবৃত্তি জাগ্রত। "অথ যত্রৈনং ঘ্নন্তীব জিনন্তীব হস্তীব বিচ্ছায়য়তি গর্ত্তমিব পততি। যদেব জাগ্রদ্ভয়ং পশ্যতি,—তদত্রাবিদ্যায়া মন্যতেঽথ, যত্র দেব ইব রাজেবাহমেবেদং সর্ব্বোঽস্মীতি মন্যতে, সোঽস্য পরমো লোকঃ॥ (বৃহদারণ্যক ৪র্থ অধ্যায় ৩য় ব্রাহ্মণ। ২০)

আচার্য্যদেব ভাষ্যে বলেন "যত্র যস্মিন্ কালে কেচন শত্রবো অন্যে বা তস্করা আসাগত্য ঘ্নন্তীতি মৃষৈব বাসনানিমিত্তঃ প্রত্যয়োঽবিদ্যাখ্যো জায়তে। তদেতদুচ্যতে

এনং স্বপ্নদৃশং ঘ্নন্তীবেতি তথা জিনন্তীব বশং কুর্ব্বন্তীব। ন কেচন ঘ্নন্তি নাপি বশীকুর্ব্বন্তি, কেবলমবিদ্যা বা মনোদ্ভব নিমিত্তং ভ্রান্তিমাত্রং, যথা হস্তী চৈনং বিচ্ছায়য়তি বিচ্ছাদয়তি বিদ্রাবয়তি ধাবতীবেত্যর্থঃ; গর্ত্তমিব জীর্ণ-কূপাদিকমিব পতন্তমাত্মানমুপলক্ষয়তি ;—তাদৃশী হি অস্য মৃষা বাসনা উদ্ভবতি। অত্যন্ত নিকৃষ্টাঽধর্ম্মোদ্‌ভাসিত অন্তঃকরণবৃত্ত্যাশ্রয়াঃ দুঃখরূপত্বাৎ, কিং বহুনা যদেব জাগ্রদ্ভয়ং পশ্যতি হস্ত্যাদি লক্ষণং।

পুনর্যত্রাবিদ্যাঽপকৃষ্যমানা, বিদ্যা চোৎকৃষ্যমানা কিং বিষয়া কিং লক্ষণা বেত্যুচ্যতে ; অথ পুনর্যত্র যস্মিন্ কালে দেব ইব স্বয়ং ভবতি দেবতাবিষয়া বিদ্যা যদোদ্ভূতা জাগরিতকালে তদোদ্ভূতয়া বাসনয়া দেবমিবাত্মানং মন্যতে স্বপ্নেঽপি তদুচ্যতে, দেব ইব রাজেব রাজ্যস্থোঽভিষিক্তঃ স্বপ্নেঽপি রাজাঽহমিতি মন্যতে রাজবাসনাবাসিতঃ, এবমত্যন্ত প্রক্ষীয়মাণাঽবিদ্যোদ্ভূতা চ বিদ্যা—সর্ব্বাত্মবিষয়া, তদা স্বপ্নেঽপি তদ্ভাবভাবিতোঽহমেবেদং সর্ব্বমস্মীতি মন্যতে, স যঃ সর্ব্বাত্মভাবঃ সোঽস্যাত্মনঃ পরমো লোকঃ, পরম আত্মভাবঃ স্বাভাবিকঃ। যত্তু সর্ব্বাত্মভাবা-দর্ব্বা-গ্বা-লাগ্রোমাত্রমপ্যন্য-ত্বেন দৃশ্যতে ,নাহমস্মীতি তদবস্থাঽবিদ্যা তয়াঽবিদ্যয়া যে প্রত্যুপস্থাপিতা অনাত্মভাবা লোকাস্তেঽপরমাঃ স্থাবরান্তাঃ, তান্ সংব্যবহার বিষয়াল্লোকানপেক্ষ্য যোঽয়ং সর্ব্বাত্মভাবঃ সমস্তোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ, সোঽস্য পরমো লোকঃ। তস্মাদপকৃষ্যমাণায়ামবিদ্যায়াং বিদ্যায়াঞ্চ কাষ্ঠাং গতায়াং সর্ব্বাত্মভাবো মোক্ষঃ। যথা স্বয়ং জ্যোতিষ্ট্বং স্বপ্নে প্রত্যক্ষত উপলভ্যতে, অথ যত্রৈনং ঘ্নন্তীব জিনন্তীবেতি। ত এতে বিদ্যাঽবিদ্যাকার্য্যে সর্ব্বাত্মভাবঃ পরিচ্ছিন্নাত্মভাবশ্চ। বিদ্যয়া শুদ্ধয়া সর্ব্বাত্মা ভবতি অবিদ্যয়া চাসর্ব্বো ভবতি, অন্যতঃ কুতশ্চিৎ প্রবিভক্তো ভবতি। যতো বিভক্তো ভবতি, তেন বিরুধ্যতে, বিরুদ্ধত্বাদ্ধন্যতে জীয়তে বিচ্ছাদ্যতে চ, অসর্ব্ব বিষয়ত্বেচ ভিন্নত্বাদেতদ্ভবতি। সমস্তশ্চ সন্ কুতো ভিদ্যতে (কেন বিরুধ্যতে); কেন বিরুধ্যেত, বিরোধাভাবাৎ কেন হন্যতে জীয়তে, বিচ্ছাদ্যতে চ। অত ইদমবিদ্যায়াঃ সতত্ত্বমুক্তং ভবতি, সর্ব্বাত্মানং সন্তম সর্ব্বাত্মত্বেন গ্রাহয়ত্যা-ত্মনোঽন্যদ্বস্ত্বন্তরমবিদ্যমানং প্রত্যুপস্থাপয়তি, আত্মনঃ সর্ব্ব-মাপাদয়তি, ততস্তদ্বিষয়ঃ কামো ভবতি ; যতো ভিদ্যতে কামতঃ ক্রিয়ামুপাদত্তে। ততঃ ফলং তদেতদুক্তং বক্ষ্যমাণং চ, যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতীত্যাদি। ইদমবিদ্যায়াঃ সতত্ত্বং সহ কার্য্যেণ প্রদর্শিতম্। বিদ্যায়াশ্চ কার্য্যং

সর্ব্বাত্মভাবঃ প্রদর্শিতোঽবিদ্যাবিপর্য্যয়েণ। সা চাবিদ্যা নাত্মনঃ স্বাভাবিকো ধর্ম্মঃ, যস্মাদ্বিদ্যায়ামুৎকৃষ্যমাণায়াং স্বয়মপচীয়মানা সতী কাষ্ঠাং গতায়াং বিদ্যায়াং পরিনিষ্ঠিতে সর্ব্বাত্মভাবে সর্ব্বাত্মনা নিবর্ত্ততে, রজ্জ্বামিব সর্পজ্ঞানং রজ্জু নিশ্চয়ে।

তচ্চোক্তং, যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূত্তৎ কেন কং পশ্যেদিত্যাদি, তস্মান্নাত্মধর্ম্মোঽবিদ্যা, নহি স্বাভাবিকস্যোচ্ছিত্তিঃ কদাচিদপ্যুপপদ্যতে সবিতুরি বৌষ্ণ্য প্রকাশয়োঃ। তস্মাত্তস্য মোক্ষ উপপদ্যতে। অস্যার্থঃ—

যে সময়ে কোন শত্রুগণ কিংবা অন্য তস্করগণ আমাকে যেন বধই করিতেছে বলিয়া মিথ্যা কামনাময় অবিদ্যারূপ প্রতীতি হয়, তৎকালের জন্য উক্ত হইতেছে যে এই স্বপ্নদর্শীকে যেন বধই করিতেছে, যেন পরাজয়ই করিতেছে। কিন্তু বস্তুতঃ কেহ বধও করে না, পরাজয়ও করে না। কেবল অবিদ্যা বা প্রাদেশিক জ্ঞানের প্রাদুর্ভাব নিবন্ধন ভ্রম হয় মাত্র। তেমনি হস্তীই যেন পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে যেন কূপাদিতে পতিত হইলাম বলিয়া আপনাকে মনে করে এবং তাদৃশী মিথ্যাবাসনার উদ্ভব হয়। পূর্ব্বসঞ্চিত ভেদভাবাত্মক অধর্ম্ম-উদ্ভাসিত অন্তঃকরণ বৃত্তি আশ্রয় করিয়া দুঃখরূপ মিথ্যা জ্ঞানের উদয় হয়। আপনাকে দেহাত্মরূপে পরিচ্ছিন্ন করে বলিয়া জীব অধিক কি জাগ্রত সময়েও যে সমস্ত ভয় হেতু দর্শন করে, স্বপ্নাবস্থায় তৎ সমস্ত না থাকিলেও ভেদ জ্ঞানের দ্বারা উপস্থাপিত ভয় উৎপন্ন হয়। কিন্তু যখন অবিদ্যা অল্প মাত্রায় এবং বিদ্যা উৎকর্ষ প্রাপ্তা হয়, সে কালে, স্বয়ং দেবতার ন্যায় হয়। তৎকালেও বাসনা বশতঃ স্বপ্নেও আপনাকে দেবতা মনে করে, সেই জন্য শ্রুতি বলিতেছেন—সে যেন দেবতাই, যেন রাজাই, অর্থাৎ স্বপ্নেও আপনাকে রাজ্যাভিষিক্ত মনে করে। এইরূপে অবিদ্যা প্রাপ্ত ক্ষয় ও বিদ্যা উদ্ভূত হইলে তাহার হৃদয়ে সর্ব্বাত্মভাব ফুটে, এবং স্বপ্নেও আমি সর্ব্ব বলিয়া আপনাকে জ্ঞান করে। এই সর্ব্বাত্মভাবই তাহার পরম লোক বা প্রকাশ ভাব। উহা আত্মার স্বাভাবিক ভাব। কারণ আত্মা এক এবং সেই জন্যই এই একতা প্রকাশের সময় সর্ব্বাত্মরূপী হয়েন। শতধাভিন্ন কেশাগ্রবৎ সূক্ষ্ম সুতরাং স্থূল বিষয়াভিমানী বুদ্ধির অগম্য আত্মাতে যে "আমি নহি" বা "মদতিরিক্ত সত্ত্বা আছে" বলিয়া ভেদ জ্ঞান হয় তাহাই অবিদ্যা। এই জন্য উদ্ধবকে উপদেশ কালে ভাগবতে শ্রীভগবান্ বিদ্যার লক্ষণ করেন—

"বিদ্যাত্মনি ভিদা বাধঃ।"

অর্থাৎ আত্মাতে ভেদ প্রবৃত্তির বাধের নামই বিদ্যা। (১১। ১৯। ৪০)

সে যাহা হউক অবিদ্যা প্রভাবে উপস্থাপিত স্থাবরান্ত লোক সকল অনাত্ম ও মিথ্যাপ্রসূত এবং সর্ব্বাত্মভাবই পরম লোক। এই রূপে অবিদ্যা ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে এবং বিদ্যা কাষ্ঠা বা পরমোৎকর্ষ লাভ করিলে যে সর্ব্বাত্মভাব ফুটিয়া উঠে, তাহাতেই মোক্ষ। স্বপ্নাবস্থায় যেরূপ আত্মা স্বয়ং জ্যোতিঃ বা স্বপ্রকাশ ও সর্ব্বাত্ম-প্রকাশ রূপে প্রত্যক্ষ হয়, তদ্রূপ বিদ্যার উৎকর্ষেরও অবিদ্যার তিরোধানের সহিত সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধি প্রত্যক্ষ হয়। বিপরীত ভাবেও বিদ্যা ক্ষীণা হইলে ও অবিদ্যার উৎকর্ষ হইলে অবিদ্যার ফল সকল প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং স্পষ্ট বুঝা গেল যে বিদ্যার ফল সর্ব্বাত্মভাব এবং অবিদ্যার ফল পরিচ্ছিন্ন বা বিশিষ্ট আত্মভাব। শুদ্ধা পাবনী বিদ্যার প্রভাবে সর্ব্বাত্মভাব, এবং অবিদ্যা প্রভাবে জীব 'সর্ব্ব' হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া "আমি অসর্ব্ব" এই মিথ্যা ভাব প্রাপ্ত হয়। যাই আপনাকে ছোট করিলাম, অমনি আমার সর্ব্বাত্মিকা গ্রহণাত্মিকা বুদ্ধি 'সমস্ত' হইতে আমাকে প্রবিভক্ত করিল। যাহা হইতে বিভক্ত করা হইল, তাহা আমার বিরুদ্ধ ভাবে স্থাপিত হইল, এবং বিরুদ্ধ ভাব আছে বলিয়াই "হত হইলাম," "বিচ্ছিন্ন হইলাম" বলিয়া বোধ হয়। অসর্ব্ব বা পরিচ্ছিন্ন ও ভেদভাব হইতে এই সকল হয়। কিন্তু আত্মা বাস্তবিক সর্ব্বরূপে এক এবং তদতীত দ্বিতীয় বস্তু নাই, সুতরাং কাহার দ্বারা বিভিন্ন হইবে? কে ইহাতে বিরুদ্ধ ভাব আনিবে? এবং বিরোধাভাবে কে ইহাকে হনন করিবে, বাঁচাইবে বা ছেদ করিবে? আমি স্বীয় অমৃত স্বরূপ বুঝিতে পারিলে, কোথায় মৃত্যু, কোথায় শোক? "কঃ শোকঃ কঃ মোহঃ, একত্বং অনুপশ্যতঃ।" অতএব বুঝা গেল, অবিদ্যা স্বরূপ এই যে, সকলের আত্মভূত আত্মাতে অসর্ব্ব বা পরিচ্ছিন্ন ভাবের প্রতীতি জন্মায়, এবং অবিদ্যমান আত্মাতিরিক্ত বস্তু সকলকে প্রত্যুপস্থাপিত (places in apparent antithesis) করে। আত্মার সর্ব্বভাবকে বিশিষ্ট সর্ব্ব বা সংখ্যারূপী অনন্ত (numerical infinity) রূপে স্থাপিত করিয়া দেয়। কিন্তু আত্মা এক এবং নিষ্কল; প্রকৃতপক্ষে বহুত্ব ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে না বলিয়াই মিথ্যারূপে প্রতিস্থাপিত, (polarised) "সর্ব্ব"ভাবের পরিণতি রূপ অনন্ত জগদ্‌বস্তুতে আত্মার "আমি" ভাব লোপ হয় না বলিয়াই, অবিরত কামনা উৎপন্ন হয়। ভেদজ্ঞান প্রযুক্ত কাম হইচ্ছে ক্রিয়ারূপী।

একত্বের প্রয়াস উৎপন্ন হয়, এবং তাহার পর ভেদ ভাবের তারতম্য অনুরূপ ফল উৎপন্ন করে। এইজন্য শ্রুতি বলেন যে যখন ঐ আত্মা যেন দ্বৈতের ন্যায় হয়, তখনই এক অপরকে দর্শন করে, শ্রবণ করে ইত্যাদি। বিদ্যার কার্য্য সর্ব্বাত্মভাব, অবিদ্যা তাহার বিপর্য্যয়; অর্থাৎ যে পর্য্যায়ে (scries) দ্বৈতজ্ঞান এক হয়, তাহার বিপরীত পর্য্যায়ে একাত্মজ্ঞান বহুরূপে এবং সর্ব্বাত্মজ্ঞান অনন্তরূপে বাহিরে প্রকটিত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অবিদ্যা আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে। যেহেতু বিদ্যার অভ্যুদয়ে পরিনিষ্ঠিত বুদ্ধিতে উহা সর্ব্বাত্মভাবে আত্মাতেই নিবর্ত্তিত হয়। এখানে বলা বাহুল্য যে সর্ব্বের মধ্যে একত্ব দেখিলেই আমাদের বিশিষ্ট বাহ্যিক সর্ব্বজ্ঞান যেরূপ অবিশেষ (abstract) জ্ঞানে এক হইয়া যায়, তদ্রূপ বিদ্যা প্রসূত একত্বে বহুত্বের, রজ্জুতে সর্পভ্রান্তির নিবৃত্ত হয়। সেই জন্য শ্রুতি বলেন যখন সর্ব্বাত্মিকা ভাব লাভ হয় তখন কে কাহাকে দেখিতে পারে? সুতরাং অবিদ্যা আত্মার ধর্ম্ম হইতে পারে না। কারণ স্বাভাবিক ধর্ম্মের কখনও উচ্ছেদ হয় না।

মনে হয় এই অবিদ্যারূপা বিশিষ্ট জ্ঞান, প্রকাশ (manifestation) ক্ষেত্রে আত্মার একত্ব-বাচক অদ্বিতীয়তার প্রতিবিম্ব মাত্র। সেইজন্য প্রকৃত বিশিষ্টতা বা অদ্বিতীয়তা (uniqueness) সৃষ্টিবিবক্ষাজন্য জীবরূপে ভেদ ভাবের বিশিষ্টতা হইয়া খেলা করে। এবিষয়টির পরে বিশদ আলোচনা করিতে প্রবৃত্তি রহিল। বিদ্যার সর্ব্বাত্মিকা ভাব কখনও নষ্ট হয় না; ইহাও পরে বিবেচ্য।

প্রত্যর্পণ ।

হৃদয় জুড়ানো ধন
সকলি জানিছ তুমি,
হৃদয়ের দু'টি কথা
শোন তবে বলি আমি.
কত যে মধুর তুমি
এ জগতে নিরুপম ।
তুমি যে অমৃতময়
জগত জীবন ধন ॥
তুমি যে সুন্দর কত
নয়ন মোহিত তা'য়,
এ বিশ্ব জুড়িয়ে শুধু
তোমারি মুরতি ভায় ।
তুমি যে জগৎময়
তোমাতে জগত ভরা
জগতের প্রতি অনু
তোমারি 'আমি'তে গড়া ॥
অসীম নীলিমাকাশে
গ্রহ তারা শশি রবি,
ফুটিয়া দেখায় যেন
তোমারি মাধুরী ছবি ।
জগতের প্রতিস্থানে
তোমারি মহিমা লেখা
প্রকৃতির আবরণে
মুরতি রয়েছে ঢাকা ॥
সেই খানে বসে বসে
লুকোচুরি খেল নিতি,
হাসি ছলে চন্দ্র-করে
ফুটিছে জোছনা জ্যোতি ॥
সৌন্দর্য্য তোমার নাথ
ছড়ানো জগতময় ;
শিখিপুচ্ছে সে রূপের
আছে কিছু পরিচয় ॥
ঢেউ গুলি বুকে তুলে
নদী গুলি বহে যায়
নাচিয়ে নাচিয়ে যেন
তোমারি মহিমা গায় ।
ঐ যে বিশাল গিরি
হিম গিরি নাম যা'র
কি সৌন্দর্য্য ঢালিয়াছ
গাহে সে তা অনিবার ॥
ঝলকিছে শৈল-শির
শুভ্র তুষার ঢাকা,
রবিকর সম্পাতে
হিরণ কিরণ মাখা ॥
নব কিশলয় সাথে
নবীন কুসুম ফোটে,
বরণে গন্ধে তা'য়
কানন উজলি উঠে ॥
অগণ্য তারকা, তাহে
গাঁথি হার সুচিকণ
সান্ধ্য-গগন থালে
প্রকৃতি সাজায়ে কেন ॥

তোমার আরতি তরে
অঙ্গে নানা উপচার
প্রকৃতি সাজান্ বিশ্বে
দিতে তোমা উপহার।
গাইছে বিহগকুল
ফুটিছে কুসুম রাজি,
প্রকৃতি সহস্র করে
ভরি উপচার সাজি—
মহানন্দে মেতেছেন
সে পদে করিতে দান।
ভক্তি প্রেম পুষ্পাঞ্জলি
আনন্দ অমৃত গান॥
(তাই) কোকিল কোমল কণ্ঠে
ধরিছে ললিত তান
রবি চন্দ্র নভঃ বায়ু
প্রেমভরে কম্পমান্॥
জলে স্থলে উঠিতেছে
আনন্দের কল তান।
বিশ্বহৃদে বেজে ওঠে
অনাদি ওঁকার গান॥
ষড় ঋতু বার মাস
তিথি, পক্ষ, নিশি, দিন,
সকলে আসিছে সেজে
হতে ওচরণে লীন॥
বহিছে মলয় বায়ু
গাছগুলি কাঁপে ধীরে
কুসুম সুরভি ঢালে
পরাণ মোহিত করে॥

সরোবরে কমলিনী
তোমারি আরতি করে,
নিশির শিশির মাথা
সেফালিকা পড়ে ঝরে।
মনে হয় যাঁ'কে তুমি
সাজায়েছ এত ফুলে,
তিনিই অঞ্জলি দেন
তোমারি চরণ তলে।
প্রকৃতি সৌন্দর্য্যসম
আমার জীবন-নাথ
সাজায়েছ কত ফুলে
(আজি) লও তা' পাতিয়া হাত॥
দাওনি নয়নভরা,
হৃদয়-রঞ্জন যাহা।
প্রীতি সোহাগের ফুল,
কোথা বল পাব তাহা,
চন্দ্রের অমৃত পাই
গগন নীলিম শোভা
সে প্রেম হৃদয়ে নাই
ফুটন্ত কুসুম বিভা।
আমাকে তা' দাও নাই
যা' দিয়েছ তাই ভাল,
রেখেছি তা' সযতনে
নেবে কি নেবেনা বল?
যা' দিয়েছ লও ফিরে
তোমারি গচ্ছিত ধন
"আমি' ও 'আমিত্ব" (এই) লহ
করি তোমা সমর্পণ॥

আমার কিছুত নাই
সকলি তোমার দেখ,
সব লয়ে যাও তুমি
শুধু এই দু'টি রেখ—
কাঁদিতে তোমার তরে
রেখ নয়নের জল,
আর্ত্তের মুছাতে অশ্রু
দিও কিছু প্রেম বল।
আর যা' সুন্দর থাকে
যাও লয়ে নিজ ধাম
আমি হেথা গাব বসে
তোমারি মধুর নাম॥

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সান্ন্যাল।

শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অবতারের প্রয়োজনীয়তা কি? বিশ্বকার্য্যই প্রয়োজন। বিশ্বকার্য্য অর্থে তত্ত্বাদির সৃষ্টি ও বিশ্বরক্ষা নিমিত্ত দুষ্টদমন শিষ্টপালন, উৎকণ্ঠিত সাধকদিগকে প্রেমানন্দ বিতরণ, বিশুদ্ধ ভক্তি প্রচার ইত্যাদি বুঝায়। গীতাতে ভগবান্ বলিয়াছেন—

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানম্ সৃজাম্যহম্॥ ৪।৭
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ৪।৮

ভাগবতেও ভগবান্ বলিয়াছেন—

ভূমের্ভারায় মাণানাং অসুরাণাং ক্ষয়ায় চ।
অবতীর্ণো যদুকুলে গৃহ আনকদুন্দুভেঃ॥ ১০।৫১।৪০

যখনি ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনি আমি প্রকটিত হই। সাধুদিগের পরিত্রাণ এবং দুষ্কৃতদিগের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম্মসংস্থাপনার্থে যুগে

যুগে অবতীর্ণ হই। পৃথিবীর ভার অপনোদনার্থ এবং অসুরদিগের বিনাশার্থ বসুদেবের গৃহে আমি অবতীর্ণ হইয়াছি।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য গীতাভাষ্যের উপক্রমণিকায় লিখিয়াছেন—"অধর্ম্মেণাভিভূয়মানে ধর্ম্মে প্রবর্দ্ধমানে চাধর্ম্মে জগতঃ স্থিতি পরিপালয়িষুঃ স আদিকর্ত্তা নারায়ণাখ্যো বিষ্ণুর্ভৌমস্য ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণত্বস্য রক্ষণার্থং দেবক্যাং বসুদেবাংশেন কৃষ্ণঃ কিলসম্ভুব।"

ভূমা ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব যাহাতে ভেদবুদ্ধি ও তজ্জনিত ক্রিয়াদি দ্বারা দুষ্ট না হয় এবং লোকমুক্ত ব্রাহ্মণগণের সর্ব্বাত্মিকা ব্রাহ্মণত্ব না নষ্ট হয়, ইহাও আচার্য্যমতে অবতারের প্রয়োজন।

সর্ব্বত্রই এক কথা। পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের জন্মের সময় আসুরিকভাব অবশ্য প্রবল ছিল। তাই দৈত্যভারাক্রান্ত খিন্না পৃথিবী গাভীরূপ ধারণ করিয়া করুণস্বরে রোদন করিতে করিতে ব্রহ্মার শরণ গ্রহণ করিলেন। ব্রহ্মা উহা শ্রবণ করিয়া দেবগণ সহ ক্ষীরসমুদ্রের তীরে গমন করিলেন। কিয়ৎকালের পর ব্রহ্মা আকাশবাণী শুনিয়া দেবতাদিগকে বলিলেন—

পুরৈব পুংসাবধৃতো ধরাজ্বরো
ভবদ্ভিরংশৈ র্যদুষু পজন্যতাম্।
যাবদুর্ব্ব্যাভ রমীশ্বরেশ্বরঃ
স্বকালশক্ত্যা ক্ষপয়ংশ্চরেদ্ভুবি॥ ভাগবত

পূর্ব্বেই পুরুষ ধরাজ্বর জানিতে পারিয়াছেন। যিনি সর্ব্বজ্ঞ তিনিত জানিবেনই। ঈশ্বরের ঈশ্বর স্বীয় মায়া ও কালশক্তি অবলম্বনে যে কালে পৃথিবী মধ্যে বিচরণ করিবেন, তোমরা তৎপূর্ব্বে আপন আপন অংশে জন্মগ্রহণ কর।

বসুদেবগৃহে সাক্ষাৎ ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ।
জনিষ্যতে তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্তু সুরস্ত্রিয়ঃ॥

পার্ষদদিগের জন্ম কেবল বিশেষরূপে ভগবানের সেবায় ও ভগবানের অদ্বিতীয় ভাবের সাধনদ্বারা জগৎকে নিঃশেষিতরূপে ভগবত্তত্ত্বে দর্শন ও তাঁহার মহিমা ব্যঞ্জনা করা। উহা ঢাক বাজাইবার জন্য নহে।

পুরুষের বিশেষণ "পর" এবং ভগবানের বিশেষণ "সাক্ষাৎ" দ্বারা তাঁহার স্বয়ং রূপত্বই সিদ্ধ হইতেছে; কারণ অন্যান্য পুরুষকে 'সাক্ষাৎ ভগবান্' বলা হয় নাই। ভূভারহরণাদি যুগধর্ম্ম তাঁহার অংশকলাদ্বারা সাধিত হইতে পারে, কিন্তু স্বয়ং ভগ-

বান্ ভিন্ন জগতে নির্ম্মল মধুর প্রেম ও অহৈতুকী জ্ঞান শিক্ষা দিতে আর কে পারে? যিনি জগতের স্বামী, যাঁহাকে জগৎ সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বলিয়া জানিবে, তিনি স্বয়ং ভগবান্ ভিন্ন আর কে হইবেন? যাঁহার প্রেমে মত্ত হইয়া "তদর্থ-বিনিবর্ত্তিত সর্ব্বকাম" গোপীগণ ধন-জন-কুলশীল ও এমন কি সাধের আমিত্বও ভুলিয়াছিল; যে প্রেমের আদর্শ, সংসারবদ্ধ জীব সম্যক্ বুঝিতে পারে নাই বলিয়া আবার শ্রীচৈতন্যরূপে "আপনি আচরি জীবে শিখাইতে" নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া সেই উন্নত উজ্জ্বল রস বিতরণ করিতে করিতে যাঁহার প্রেমে মগ্ন হইয়া প্রাণের ভিতর হইতে, মরমের নিভৃত প্রদেশ হইতে, গভীর অনুরাগে এবং দিব্যোন্মাদে মত্ত হইয়া আপনি বলিয়াছিলেন যে,—সে লম্পট প্রেমাবেশে বাহু-পাশে বন্ধন করুন, কিংবা দর্শন না দিয়া মর্ম্মাহত করুন, সে আমার প্রাণনাথ, সে আদর্শ পুরুষ, ভগবান্ ভিন্ন আর কে হইবেন?

> আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা
> মদর্শনান্মর্ম্মহতং করোতু বা।
> যথাতথা বা বিদধাতু লম্পটো
> মৎপ্রাণনাথস্তু সএব নাপরঃ॥

যাঁহার জন্য আকুল হইয়া মাধবেন্দ্রপুরী "অয়ি দীনদয়াদ্র নাথ" বলিয়া আত্ম-হারা হইয়াছিলেন, যে প্রেমময়ের প্রেমের চিত্র স্মরণ করিতে করিতে জয়দেব গোস্বামী দিব্যচক্ষে প্রত্যক্ষরূপে দেখিয়াছিলেন,—"ধীর সমীরে যমুনা তীরে বসতি বনে বনমালী"—

যে চিন্ময় চির-নূতন সর্ব্বকামতাপহারী মূর্ত্তি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া কবি বিদ্যাপতি গাহিয়াছিলেন,—"নব যুবরাজ নবীন নাগরী মিলয়ে নব নব ভাতি,"—যাঁহার প্রেমের এই অপূর্ব্ব ভাবে, শুধু মানুষ কেন, পশুপক্ষী লতা পর্য্যন্ত উন্মত্ত হইয়াছিল, তিনি কি স্বয়ংজ্যোতি স্বপ্রকাশ পূর্ণ ভগবান্ ভিন্ন আর কেহ হইতে পারেন? ভক্তপ্রাণ বিল্বমঙ্গল বলিয়াছিল,—

> সন্তবতারা বহবঃ পুষ্করনাভস্য সর্ব্বতো ভদ্রাঃ।
> কৃষ্ণাদন্য কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবেৎ॥

বাস্তবিক সেই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ভিন্নকে লতাদিকেও প্রেম দান করিতে পারে? যিনি জগতের প্রাণ, যিনি জগতের নাথ, যিনি জগতের আত্মা, তিনি ভিন্ন

অপরের এ কার্য্য সম্ভব হইবে কেন? আত্মারাম ভিন্ন জীবাত্মার সহিত আর কে রমণ করিবে? প্রাণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন জীব কাহাকে বলিবে—

তোমার চরণে আমার পরাণে বাঁধিনু প্রেমের ফাঁসি।

তিনি ভিন্ন ভেদভাবেস্থিত জীবের আর কে আপন আছে—

ভাবিয়া দেখিনু এ তিন ভুবনে কে আর আমার আছে।

জীব আর কাহাকে বলিবে—একুলে ওকুলে দুকুলে গোকুলে আপনা বলিব কায়।

শীতল বলিয়া শরণ লইনু ও দুটী কমল পায়॥

তাই স্বয়ং ভগবান্ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাই শুদ্ধসত্ত্বময় বৃন্দাবনে তাঁহার প্রকট ভাব। তিনি ত সর্ব্বভূতে আছেন, তাঁহার প্রেমেই অণু অণুকে ধরিয়া আছে, তাঁহার প্রেমেই গ্রহ চন্দ্র তারকা স্বকার্য্যে নিযুক্ত; তাঁহার সত্ত্বাতেই নরত্ব, বৃক্ষত্ব, পশুত্ব, তাঁহার সত্ত্বাতেই আমি, তুমি। তিনি সর্ব্বভূতস্থ এবং তদতীত (transcendent) ভাবে থাকিয়াও তিনি পূর্ণরূপে যেন প্রকট হইতে পারেন, ইহাই ভগবানের অচিন্ত্য ও শক্তি।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।

পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

গোস্বামী কৃত টীকায় দেখা যায়, "অদঃ অবতারিরূপং ইদং অবতাররূপং উভয় পূর্ণং সর্ব্বশক্তিমৎ। পূর্ণাৎ অবতারিরূপাৎ পূর্ণং অবতাররূপং লীলাবিস্তারায় স্বয়মুদচ্যতে প্রাদুর্ভবতি।"

ভগবদ্‌বিগ্রহের পূর্ণত্ব সর্ব্বদাই পূর্ণ, কোন রূপেই ইহার পূর্ণত্বের হানি হয় না। ভগবান্ যুগপৎ সর্ব্বব্যাপক ও পরিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত থাকিতে পারেন। ইহাই তাঁহার প্রকৃত অদ্বিতীয়তা।

ভাগবত বলিয়াছেন—

ন চান্ত ন বহির্যস্য ন পূর্ব্বং নাপিচাপরং।

পূর্ব্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো-জগচ্চয়ঃ॥

তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজং।

গোপীকোদূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা॥ ভাগবত ১০।৯।১৩।১৪

যাহার বহিরন্তর ভেদ নাই, যাহার পূর্ব্ব ও অপর নাই, যিনি জগতের অন্তর্বহির্দেশ ব্যাপিয়া বিদ্যমান আছেন এবং যিনি জগন্ময়, যশোদা, সেই অব্যক্ত,

অধোক্ষজ, নরাকার শ্রীকৃষ্ণকে, আত্মজ বোধে প্রাকৃত বালকের ন্যায়, বজ্জুদ্বারা উদুখলে বন্ধন করিয়াছিলেন।

উপরোক্ত শ্লোকে সর্ব্বব্যাপকত্ব ও অদ্বিতীয় বিশেষত্ব উভয়ই সুচিত হইয়াছে। শ্রুতি ব্রহ্মকে নিত্য-নির্ব্বিশেষ ও নিত্য-সবিশেষ বলিয়াছেন,—

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং।—কঠ ৩।১৫

সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ।—ছান্দোগ্য ৩।১৪।২

অপাণিপাদোজবনো গ্রহীতা। পশ্যত্যচক্ষুঃ সশৃণোত্যকর্ণঃ॥—শ্বেত ৩।১৯

মহাপ্রভু চৈতন্যদেবও নির্ব্বিশেষের কথায় বলিয়াছেন,—

নির্ব্বিশেষ তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
প্রাকৃত নিষেধি করে অপ্রকৃত স্থাপন॥

শ্রীমদ্ আচার্য্য তাঁহার একত্ব বা সর্ব্বময় ভাব উদ্ধারের জন্য বেদান্ত ভাষ্যে ব্রহ্মত্ব ভাব স্থাপিত করেন। মহাপ্রভু তাঁহার অদ্বিতীয় বিশেষত্ব ভাব স্থাপনা করিয়া বেদান্তের পূর্ণতা প্রতিপন্ন করেন।

শ্রীজীব গোস্বামী ভগবানকে এই দুই বিরুদ্ধ ভাবের একত্ব "গুণনিধি" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন,—ধর্ম্ম এব ধর্ম্মিত্বং নির্ভেদ এব নানা ভেদত্বং অরূপিত্বং এব রূপিত্বং ব্যাপকত্ব এব মধ্যমত্বং ইতি পরস্পরবিরুদ্ধাযত্তগুণনিধিঃ।

(ক্রমশঃ) শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস।

মহামায়ার খেলা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বীরভূম জেলায় রামপুর নামে একখানি গ্রাম আছে। সেই গ্রামে হেমন্তের শ্বশুরবাড়ী। রামপুর বমগ্রাম হইতে ২৮ মাইল। নির্ম্মলকুমারের পিতা সেই গ্রামের জমীদার। বাড়ী-ঘর সহরের মত না হইলেও পাড়াগাঁয়ের বড়লোকদের

বাড়ীর মতন, বাড়ীতে ঠাকুর-সেবা ইত্যাদিও আছে। বৈঠকখানা বা "বাংলা-ঘর" বেশ সাজান। বাটীর ভিতরে পুষ্করিণী, ঘাট বাঁধান। সম্মুখে অনেকটা জায়গা পড়িয়া আছে, সেইখানে কতকগুলি বড় বড় বলদ বাঁধা থাকে। সেই স্থানেই কয়েকটী ধানের গোলা বা "বাখার" আছে।

নির্ম্মলকুমারের পিতা পাড়াগাঁয়ের জমীদার; তাহাতে আবার সেকেলে। গ্রামে দলাদলি "ঘোঁট পাকান" প্রভৃতি নানাবিধ ব্যাপারে তিনি প্রধান নায়ক। ইহাতে তাঁহার দু'পয়সা আয়ও আছে। একে জমিদার, তাহাতে আবার মহাজনীও আছে, কাজেই লোকের একটী কথা কহিবার সাধ্য নাই। ন্যায় ও অন্যায় কোনরূপ বিচার না করিয়া অর্থ উপার্জ্জনই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য। আজ রামহরির গরু শশীচুতারের জমির দিকে গিয়াছিল। শশী কর্ত্তার অনুগত; কাঁদিয়া কর্ত্তাকে আসিয়া জানাইল; কর্ত্তা চৌকিদার পাঠাইয়া রামকে ধরিয়া আনিলেন। কোনরূপ প্রতিবাদ না শুনিয়া পাঁচ টাকা জরিমানা করা হইল। আদায়ের জন্য ভাবনা নাই, আগেই এই টাকা কাটিয়া লইয়া খাজনার টাকা জমা হইবে। আজ হরিধোপা ও নবাইমিস্ত্রি বাগের মাথায় গালাগালি করিয়াছে; উভয়ের ৪৲ টাকা করিয়া জরিমানা হইল। বিপিন "বায়েনের" বাড়ীতে সামান্য পারিবারিক গোলযোগ হইল; কর্ত্তা সুমীমাংসা করিয়া দিলেন "যে সরকারীতে দশ টাকা জমা দাও, আর ভবিষ্যতে যেন এরূপ শুনা না যায়।" টাকা-কড়ির সুদেও বেশ আয় আছে, কারণ সুদ শতকরা আট টাকা আধ আনা, অবশ্য চক্রবৃদ্ধি হারে। তার উপর হিসাবের গোল, জমিদার হিসাবে "পরব" পার্ব্বণী, ছেলের বিয়ের চাঁদা, তীর্থের খরচ, পেয়াদার রোজ তা ছাড়া "বেগাড়" আছেই। এইরূপ নানা উপায়ে তিনি অর্থ সংগ্রহ করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতেছেন। পুত্র নির্ম্মলকুমার এ সব বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। পিতার সম্বন্ধে এই সকল অভিযোগ শুনিয়া দুই একবার পিতাকে এইরূপ ব্যাপার হইতে ক্ষান্ত হইতে অনুরোধ করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে কোন সুফল ফলে নাই। তাঁহার পিতা পুত্রের ধর্ম্মশীলতা দেখিয়া হাসিতেন ও ভাবিতেন যে "বাবাজীর এখনওত সংসারের চাপ পড়ে নাই; তাই এসব পুঁথিগত ধর্ম্মাচরণ লইয়া ব্যস্ত" এবং একমাত্র পুত্র বলিয়া বিশেষ কিছু বলিতেন না।

নির্ম্মলের মাতার স্বভাব অতি স্নিগ্ধ ও মনোরম। স্বামীর আচরণ যেরূপ হউক না

কেন, তিনি স্বামীকে দেবতা জ্ঞানে পূজা ও সংসারের সকল ব্যক্তির সেবা করিতেন। স্বামী আহার না করিলে, তিনি জলগ্রহণ করিতেন না। স্বামীর পীড়া হইলে সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া নিয়ত স্বামীসেবায় রত থাকিতেন। এত ঐশ্বর্য্য ও সম্পদের অধিকারিণী হইয়াও তাঁহার মনে একটুও অভিমান ছিল না, সর্ব্বদাই সন্তুষ্টচিত্তে সুমিষ্ট বাক্যে সকলকে সন্তুষ্ট করিতেন। অতিথি ও অভ্যাগত কেহই তাঁহার নিকট হইতে ফিরিত না; দাসদাসী আত্মীয় ও কুটুম্ব সকলেই তাঁহার সদ্ব্যবহারে মুগ্ধ। বিবাহের পর হেমলতা শ্বশুরালয়ে আসিলে পর তাহার মধুমাখা অনিন্দ্যসুন্দরী মূর্ত্তিখানি দেখিয়া নির্ম্মলের মাতা পরম পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। বিবাহের কিছু দিন পরে একখানি পত্র নির্ম্মলের পিতার নিকট আসে, তাহাতে কাহারও নাম ছিল না। পত্রের সার মর্ম্ম "হেমলতা কুলটা।" বলা বাহুল্য এ কথা নির্ম্মলের মাতা আদৌ বিশ্বাস করেন নাই। নির্ম্মলকুমারও এ সম্বন্ধে দুই একখানি পত্র পাইয়াছিলেন, কিন্তু বিবাহ গুরুর আদেশে এই জ্ঞানে সে সকল কথা ভুলিয়াছিলেন। হেমলতার মাতার পীড়ার সংবাদ পাইয়া নির্ম্মলকুমার বনগ্রাম গিয়াছিলেন এবং সেখানকার ঘটনা ত পাঠক অবগত আছেন। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় "কর্ত্তা" আহারাদির পর নিদ্রা যাইবার উদ্দেশ্যে শুইয়া আছেন। মুখে গুড়গুড়ীর নল; গিন্নি তালবৃন্ত লইয়া বাতাস করিতেছেন। এমন সময়ে ভৃত্য রামদয়াল কাঁদিতে কাঁদিতে কর্ত্তার ঘরের সন্নিকটে উপস্থিত হইল। কর্ত্তা ও গিন্নি সসব্যস্তে বাহিরে আসিয়া ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলেন।

"আর ব্যাপার কি কর্ত্তা! দাদাবাবু নাই"

"সে কিরে" বলিয়া কর্ত্তা মূর্চ্ছিত হইলেন। গিন্নি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। চারিদিক হইতে দাস দাসী আত্মীয় বন্ধু সকলেই আসিয়া সশঙ্কিত হইয়া পড়িল; তুমুল কান্নার রোল পড়িয়া গেল। নির্ম্মলকুমারের অকাল মৃত্যুতে গ্রাম যেন অকস্মাৎ তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে কর্ত্তার সংজ্ঞা হইলে, ভৃত্য রামদয়াল সকল সংবাদ আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিল। প্রারব্ধের হস্তকে কেহই কখন এড়াইতে পারে না। মৃত্যুর কোন অবধারিত কাল নাই; মৃত্যুর নিকট শিশু যুবা, বালক, বা বৃদ্ধ নাই। কখন সে কাহাকে আসিয়া অধিকার করিবে, কে বলিতে পারে?

আর যেখানে বাসর-সজ্জা রচিত করিয়া অনন্ত সুখ-স্বপ্নে ভাসিতেছ, সুমধুর কল-কণ্ঠে অপ্সরাগণকেও হার মানাইয়া কত সুখ উপভোগ করিতেছ, কাল হয়ত তোমাকে কাঁদাইয়া সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গাইয়া দ্বিগুণ দুঃখের রঙ্গভূমি করিয়া তোমার আদরের জিনিষ কোথায়, অনন্তের কোন এক অনির্দ্দিষ্ট স্থানে, চলিয়া যাইবে। আজ যে সুকুমার শিশুর কমনীয় সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছ, আজ যাহার মধুমাখা হাসিতে তোমার হৃদয়-বীণায় সদা বসন্তরাগের ঝঙ্কার দিতেছে, যাহার স্বভাবসুন্দর অঙ্গভঙ্গিতে তোমার মনে কতই কল্পনালহরী উছলিয়া উঠিতেছে, কাল হয়ত তাহার ললিত-অঙ্গ শ্মশানাগ্নিতে দগ্ধ হইবে। আজ যে প্রিয়তমা প্রেয়সীর অলৌকিক লাবণ্য-মুগ্ধ তোমাকে কত অতৃপ্ত কামনার ছায়া স্মরণ পথে আকর্ষণ করিতেছে, আজ যে সরম-জড়িত অধর-পল্লবের সুধা নয়ন-কমলের পরিমল, আরক্ত গণ্ডযুগের লালিমা সন্দর্শনে কতই ব্যগ্র হইয়াছ; কাল হয়ত এই রূপরাশি চিরদিনের জন্য হারাইয়া বুকের ভিতর শেল লইয়া ঘরে ফিরিবে। শাস্ত্রকারেরা সেই জন্যই বলেন—'গৃহীত এব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ।'

সর্ব্বদা মৃত্যুর দ্বারা গৃহীত কেশ এইরূপ স্থির করিয়া ধর্ম্মাচরণ করিবে। মৃত্যুই জীবনের পরিসমাপ্তি ও স্থির-ফল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রায় দুইমাস হইল নির্ম্মলকুমারের মৃত্যু হইয়াছে। পতি-বিয়োগ বিধুরা দিবারাত্রি পতি-চিন্তায় মগ্না, এক মুহূর্ত্তও পতিপদ-চিন্তা হইতে বিরত হন নাই; এক বেলা আহার ও একবস্ত্র পরিধান। পতির পারত্রিক মঙ্গল-কামনায় ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন, আর কামনা করেন যে জন্মান্তরে ইঁহাকেই যেন পতিরূপে প্রাপ্ত হন।

এইরূপে কয়দিন অতিবাহিত হইল। শ্বশুরালয় হইতে কোন সংবাদই আসিল না। হেমলতা দুই তিন খানি পত্র দ্বারা আপনার অবস্থা জানাইলেন, কিন্তু কোন উত্তরও পাইলেন না। তাঁহার দিদি আর কতদিন থাকিবেন; তাই অবশেষে একটী বিশ্বস্তা স্ত্রীলোক রাখিয়া তিনি বাড়ী যাইবেন এই কল্পনায় জনৈক বৃদ্ধাকে হেমলতার তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করিলেন। যখন হেমলতার পিতার অবস্থা খুব

ভাল ছিল, তখন এই বৃদ্ধা ইহাঁদের অন্নেই প্রতিপালিত। বৃদ্ধারও আপনার বলিতে কেহ নাই। এ কথা শুনিয়া হেমলতা বলিল—"আমি শ্বশুর বাড়ী যাইব। শ্বশুরের ঘরই স্ত্রীলোকের স্থান; আমার সেইখানে যাওয়াই কর্ত্তব্য" দিদি বলিল—"সেই জন্যইত চিঠি লেখা গেল, কিন্তু কোন সংবাদ পাওয়া গেল না"

বৃদ্ধা বলিল—"তাতো বটেই মা। তোমার কপাল মন্দ না হইলে তোমার রাজা-স্বামী যায়। কিন্তু এমন বিপদ হয়ে গেল তোমার শশুরেরাত জানেন, যে তুমি একা মানুষ; কোথায় খাবে কোথায় থাকবে; তা'তে আবার এই বয়স।" তাঁহারা পত্র পাইয়াও কোন সংবাদ দিলেন না কেন?

হেমলতা বলিল—'দেখ দিদি, আমি আপনা হইতে গেলেও অপমান নাই। স্বামীর ঘর নিজের ঘর। স্বামীর অবর্ত্তমানে শ্বশুরই রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণ-পোষণের কর্ত্তা। তাঁহাদের সেবাই ধর্ম্ম; তাহাতে মানাপমান নাই।"

বৃদ্ধা বলিল—সে কথা কি আর বলতে, তা মা! বড়ই আঘাত খাইয়া তাঁহারা কাতর হইয়াছেন। সে যাহা হউক আমি তোমায় দিন কতক পরে রেখে আসব। তোমাদেরই খেয়ে পরেই মানুষ। আমার প্রাণ দিলেও তোমাদের ঋণ শোধ কর্ত্তে পারব না। থাকত যদি তোমার দাদা, তা'হলে কারও কাছে দাঁড়াতে হত না; কি করব মা সব অদৃষ্টের ফল।"

হেমলতা বলিল—"শুধু অদৃষ্টকে দোষ দিলে চলবে কেন? দিদি! যেমন করেছি তার ফল পাচ্ছি। তেতুল গাছ লাগিয়ে কি আম ফল পাওয়া যায়? কর্ম্মের ফল মানুষ কিছুতেই এড়াতে পারে না" এরূপে জগুদিদির এই বাটীতে থাকার কথা স্থির হইয়া গেল; হেমলতার দিদিও কয়েক দিন পরে ফিরিয়া আসিবে বলিয়া বাটী চলিয়া গেল।

বৃদ্ধাটীর নাম "যোগমায়া" কিম্বা "যোগেশ্বরী" এমনি কি একটা হইবে। লোকে তাহা'কে "জগুদিদি" বলিয়াই ডাকে। জাতিতে কৈবর্ত্ত, কিন্তু বড় সরল প্রাণ। বয়স প্রায় ষাটের উপর হইলেও শরীরে বেশ শক্তি আছে; মুখে সর্ব্বদাই হাসি। প্রায় কুড়ি বৎসর হইল বিধবা হইয়াছে; এবং দুবেলা হরিনাম করা, তিলক কাটা, প্রভৃতি অনুষ্ঠান ধর্ম্ম বৃদ্ধা যথাসাধ্য করিয়া থাকে। মোট কথা বুড়ি গ্রামের সকলেরই সুপরিচিত এবং প্রায় সকলেরই খবর রাখে। একদিন বৃদ্ধা হেমলতার বাড়ী হইতে যাইতেছে এমন সময় রাস্তায় নবকুমারের সহিত সাক্ষাৎ। নবকুমার একটু বেশী আত্মীয়তা দেখাইয়া বলিল—"কি ঠান্‌দিদি। কোথায় গিয়াছিলে।"

"এই বাবা! হিমুদের বাড়ী গিয়াছিলাম। আহা! বাছা আমার আধখানা

আর যেখানে বাসর-সজ্জা রচিত করিয়া অনন্ত সুখ-স্বপ্নে ভাসিতেছ, সুমধুর কল-কণ্ঠে অপ্সরাগণকেও হার মানাইয়া কত সুখ উপভোগ করিতেছ, কাল হয়ত তোমাকে কাঁদাইয়া সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গাইয়া দ্বিগুণ দুঃখের রঙ্গভূমি করিয়া তোমার আদরের জিনিষ কোথায়, অনন্তের কোন এক অনির্দ্দিষ্ট স্থানে, চলিয়া যাইবে। আজ যে সুকুমার শিশুর কমনীয় সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছ, আজ যাহার মধুমাখা হাসিতে তোমার হৃদয়-বীণায় সদা বসন্তরাগের ঝঙ্কার দিতেছে, যাহার স্বভাবসুন্দর অঙ্গভঙ্গিতে তোমার মনে কতই কল্পনালহরী উছলিয়া উঠিতেছে, কাল হয়ত তাহার ললিত-অঙ্গ শ্মশানাগ্নিতে দগ্ধ হইবে। আজ যে প্রিয়তমা প্রেয়সীর অলৌকিক লাবণ্য-মুগ্ধ তোমাকে কত অতৃপ্ত কামনার ছায়া স্মরণ পথে আকর্ষণ করিতেছে, আজ যে সরম-জড়িত অধর-পল্লবের সুধা নয়ন-কমলের পরিমল, আরক্ত গণ্ডযুগের লালিমা সন্দর্শনে কতই ব্যগ্র হইয়াছ; কাল হয়ত এই রূপরাশি চিরদিনের জন্য হারাইয়া বুকের ভিতর শেল লইয়া ঘরে ফিরিবে। শাস্ত্রকারেরা সেই জন্যই বলেন—'গৃহীত এব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ।'

সর্ব্বদা মৃত্যুর দ্বারা গৃহীত কেশ এইরূপ স্থির করিয়া ধর্ম্মাচরণ করিবে। মৃত্যুই জীবনের পরিসমাপ্তি ও স্থির-ফল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রায় দুইমাস হইল নির্ম্মলকুমারের মৃত্যু হইয়াছে। পতি-বিয়োগ-বিধুরা দিবারাত্রি পতি-চিন্তায় মগ্না, এক মুহূর্ত্তও পতিপদ-চিন্তা হইতে বিরত হন নাই। এক বেলা আহার ও একবস্ত্র পরিধান। পতির পারত্রিক মঙ্গল-কামনায় ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন, আর কামনা করেন যে জন্মান্তরে ইঁহাকেই যেন পতিরূপে প্রাপ্ত হন।

এইরূপে কয়দিন অতিবাহিত হইল। শ্বশুরালয় হইতে কোন সংবাদই আসিল না। হেমলতা দুই তিন খানি পত্র দ্বারা আপনার অবস্থা জানাইলেন, কিন্তু কোন উত্তরও পাইলেন না। তাঁহার দিদি আর কতদিন থাকিবেন; তাই অবশেষে একটী বিশ্বস্তা স্ত্রীলোক রাখিয়া তিনি বাড়ী যাইবেন এই কল্পনায় জনৈক বৃদ্ধাকে হেমলতার তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করিলেন। যখন হেমলতার পিতার অবস্থা খুব

ভাল ছিল, তখন এই বৃদ্ধা ইহাঁদের অন্নেই প্রতিপালিত। বৃদ্ধারও আপনার বলিতে কেহ নাই। এ কথা শুনিয়া হেমলতা বলিল—"আমি শ্বশুর বাড়ী যাইব। শ্বশুরের ঘরই স্ত্রীলোকের স্থান; আমার সেইখানে যাওয়াই কর্ত্তব্য" দিদি বলিল—"সেই জন্যইত চিঠি লেখা গেল, কিন্তু কোন সংবাদ পাওয়া গেল না"

বৃদ্ধা বলিল—"তাতো বটেই মা। তোমার কপাল মন্দ না হইলে তোমার রাজা-স্বামী যায়। কিন্তু এমন বিপদ হয়ে গেল তোমার শশুরেরাত জানেন, যে তুমি একা মানুষ; কোথায় খাবে কোথায় থাকবে; তা'তে আবার এই বয়স।" তাঁহারা পত্র পাইয়াও কোন সংবাদ দিলেন না কেন?

হেমলতা বলিল—'দেখ দিদি, আমি আপনা হইতে গেলেও অপমান নাই। স্বামীর ঘর নিজের ঘর। স্বামীর অবর্ত্তমানে শ্বশুরই রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণ-পোষণের কর্ত্তা। তাঁহাদের সেবাই ধর্ম্ম; তাহাতে মানাপমান নাই।"

বৃদ্ধা বলিল—সে কথা কি আর বলতে, তা মা। বড়ই আঘাত খাইয়া তাঁহারা কাতর হইয়াছেন। সে যাহা হউক আমি তোমায় দিন কতক পরে রেখে আসব। তোমাদেরই খেয়ে পরেই মানুষ। আমার প্রাণ দিলেও তোমাদের ঋণ শোধ কর্ত্তে পারব না। থাকত যদি তোমার দাদা, তা'হলে কারও কাছে দাঁড়াতে হত না; কি করব মা সব অদৃষ্টের ফল।"

হেমলতা বলিল—"শুধু অদৃষ্টকে দোষ দিলে চলবে কেন? দিদি। যেমন করেছি তার ফল পাচ্ছি। তেতুল গাছ লাগিয়ে কি আম ফল পাওয়া যায়? কর্ম্মের ফল মানুষ কিছুতেই এড়াতে পারে না" এরূপে জগুদিদির এই বাটীতে থাকার কথা স্থির হইয়া গেল; হেমলতার দিদিও কয়েক দিন পরে ফিরিয়া আসিবে বলিয়া বাটী চলিয়া গেল।

বৃদ্ধাটীর নাম "যোগমায়া" কিম্বা "যোগেশ্বরী" এমনি কি একটা হইবে। লোকে তাহাকে "জগুদিদি" বলিয়াই ডাকে। জাতিতে কৈবর্ত্ত, কিন্তু বড় সরল প্রাণ। বয়স প্রায় ষাটের উপর হইলেও শরীরে বেশ শক্তি আছে; মুখে সর্ব্বদাই হাসি। প্রায় কুড়ি বৎসর হইল বিধবা হইয়াছে; এবং দুবেলা হরিনাম করা, তিলক কাটা, প্রভৃতি অনুষ্ঠান ধর্ম্ম বৃদ্ধা যথাসাধ্য করিয়া থাকে। মোট কথা বুড়ি গ্রামের সকলেরই সুপরিচিত এবং প্রায় সকলেরই খবর রাখে। একদিন বৃদ্ধা হেমলতার বাড়ী হইতে যাইতেছে এমন সময় রাস্তায় নব-কুমারের সহিত সাক্ষাৎ। নবকুমার একটু বেশী আত্মীয়তা দেখাইয়া বলিল— "কি ঠান্‌দিদি। কোথায় গিয়াছিলে।"

"এই বাবা! হিমুদের বাড়ী গিয়াছিলাম। আহা! বাছা আমার আধখানা

হয়ে গিয়েছে। ওকে দেখলে চোখে জল আসে। এমন সতী সাবিত্রির হয় না।

"হিমু কি এইখানেই আছে, শ্বশুরবাড়ী যায় নি? এখানে একা থাকা ভাল নয়, দিদি।

"একা থাকবে কেন, এতদিন তার দিদি ছিল, সেও চলে গিয়েছে; এখন আমিই বাড়িতে থাকি। কি করব, আমরা ওদের অন্নেই মানুষ। দেখি, কয়দিন পরে শ্বশুর বাড়ী রেখে আসব।"

নবকুমার অতর্কিতে একটা 'হুঁ' শব্দ উচ্চারণ করিয়া চলিয়া গেল; মনে মনে বলিল, 'হেমলতা দেখা যাবে তোমার কত অহঙ্কার। আমি তোমাকে বিবাহ করিলে আজ বিধবা হইতে না। আমাকে অবজ্ঞা করিয়াছিলে। বার বার তোমার মাতার নিকট বলিয়া পাঠাইয়াছিলাম। তুমি আত্মগর্ব্বে মত্ত হইয়া আমাকে চরিত্র-হীন বলিয়া ঘৃণা করিয়াছিলে। এইবার দেখা যাইবে তোমার গর্ব্ব অহঙ্কার। আজ যদি বল-প্রয়োগে তোমাকে ধরিয়া আনি, কে তোমায় উদ্ধার করিবে? শ্বশুরবাড়ী যাইবে কি, সে পথ প্রায় রুদ্ধ হইয়াছে; সেখানের কোন আশা আছে বলিয়াই মনে হয় না। আমাকে ঘৃণা করিয়া প্রত্যাহার করিয়াছিলে, এখন দেখিব কে রক্ষা করে—দেখিব তোমার সতীত্বের তেজ কত। এতদিন পরে আমার অতৃপ্তবাসনা পূরণের সুযোগ আপনা আপনি উপস্থিত।'

এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিতে করিতে নবকুমার গৃহে প্রত্যাগত হইল। নবকুমার যুবক, বয়স সাতাইশ কিংবা আটাইশ বলিয়া অনুমিত হয়। দেখিতে সুন্দর বটে, কিন্তু হৃদয়খানি বড়ই অপবিত্র। উচ্চ জাতি ও বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও আচার ব্যবহারে সে অতি ঘৃণিত; চরিত্রের অবনতি যতদূর হওয়া সম্ভব তাহা হইয়াছিল। এরূপ হীন চরিত্রের যুবকের সহিত হেমলতার বিবাহ দিতে তাহার মাতার প্রবৃত্তি হয় নাই। দরিদ্র হইলেও এইরূপ নরাকার পশুর হস্তে প্রাণসম কন্যাকে সমর্পণ করিতে পারেন নাই। মনোরোষে নবকুমার নির্ম্মলের পিতাকে পত্রদ্বারা লিখিয়া যাহাতে হেমলতার চরিত্রে সন্দেহ উপস্থিত হয় তাহারও ক্রুটী করেন নাই। নির্ম্মলকেও যে এরূপ পত্রাদি লিখেন নাই তাহা নহে। তবে নির্ম্মল দেবহৃদয় গুরুর আদেশ জ্ঞানে বিবাহ করিয়াছেন ও হেমলতার ন্যায় পতিভক্তিপরায়ণা দেবীর চরিত্রে তিনি কিছুতে স্বপ্নেও সন্দিহান হইতে পারেন নাই। নির্ম্মলের মৃত্যুর পর পিশাচ পুনরায় অভিসন্ধি খুঁজিতে লাগিল। সকল সময়ই হেমলতাকে হস্তগত করিবার চিন্তা তাহার মনে জাগিয়া উঠে সে প্রায়ই কোন উপলক্ষ করিয়া হেমলতার বাটীর নিকট ঘুরাফেরা করিয়া থাকে কিন্তু কোনই সুযোগ উপস্থিত হয় না।

(ক্রমশঃ)

দীক্ষা-মুখে।

প্রথম অধ্যায়।*

সাধন-শৈল—বহিঃ প্রাঙ্গণ।

(রূপক)।

শিষ্য।—সম্মুখে এ কি দেখিতেছি গুরুদেব! কূলহীন, দিগন্ত প্রসারিত, মহা-শূন্যের মধ্যদেশে এক অপূর্ব্ব মহান্ গিরিবর! ইহার শিখরদেশ অভ্র ভেদ করিয়া যেন নভঃশিরকে চুম্বন করিতেছে; অধোদেশ অন্তহীন,—নিম্নভাগে কোথায় যে ইহা আত্মগোপন করিয়াছে, তাহা আমি বহু চেষ্টায়ও কিছুমাত্র নিরূপণ করিতে পারিতেছি না। এই শৈলগাত্র কোথাও বা বন্ধুর, কোথাও বা সমতল; আবার কোথাও বা নিবিড় সু-উচ্চ অরণ্যানী রোমাবলীর মত, ইহাকে আবৃত করিয়া রহিয়াছে; কোথাও বা কণ্টকতরু ও গুল্মের আচ্ছাদন আমার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার করিয়া দিতেছে। আবার এই শৃঙ্গবরকে বেষ্টন করিয়া, দীপ্তি-বিশিষ্ট কি ওই গিরি-নদীর মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া ইহার শিখরদেশে উঠিয়াছে? গিরিচূড়ার উপরে ওখানে ঐ আবার কি? যেন সুপ্রতিষ্ঠিত দেব-মন্দির উজ্জ্বল বিভায় দিগন্ত পর্য্যন্ত অপূর্ব্ব জ্যোতিরাশিতে স্নপিত করিতেছে!

যে পর্ব্বত বেষ্টনের কথা উল্লেখ করিলাম, তাহাতে ঐ আবার কি দেখা যাইতেছে? যেন কোটি কোটি জীব ঘুরিয়া,ফিরিয়া,তাহাতে আরোহণ করিতেছে। সেই জন-স্রোতের প্রারম্ভ বা অন্ত নাই। ঐ দিকে আবার কেহ কেহ, সাধারণ মার্গ পরিত্যাগ করিয়া, যেন উন্মাদের মত, পর্ব্বতে লম্বমান লতা-রজ্জু বা উদ্গত শিলাখণ্ড ধারণ করিয়া, সেই শৈলে আরোহণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। কণ্টক ও শিলা-খণ্ডে তাহাদের সর্ব্বগাত্র ক্ষত বিক্ষত হইতেছে, ইহাতে তাহাদের কিছুমাত্র দৃক্পাত নাই। কি যেন কোন মোহিনী শক্তির মোহকর আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া তাহারা পলকবিহীন-নেত্রে গিরি-শিখরের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে।

শিষ্য এই মহীয়ান্ গাম্ভীর্য্যে স্তম্ভিত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া নির্ব্বাক্ হইলেন।

---

* শ্রীমতী আনি বেসেণ্টের "In the Outer Court" পুস্তক অবলম্বনে লিখিত।—লেখক।

অজ্ঞাত ভয়ে ও বিস্ময়ে তাহার আর বাক্যস্ফূরণ হইল না। গুরুদেবের বদন-কমল স্নেহে এক মনোহর অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। তাঁহার স্মিত অধর হইতে যেন অমৃতধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি বলিতে লাগিলেন,—

গুরু।—পুত্র, কেন তুমি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছ? তুমি না আকুল চিত্তে বার বার প্রার্থনা করিয়াছিলে,—কি করিয়া মানব সাধনপথে অগ্রসর হইতে পারে? অবিদ্যার মোহে বিমোহিত ক্ষুদ্র মানব, সংসারের ধূলিখেলা ছাড়িয়া, কিরূপে ভগবানের অনন্ত করুণায় তাঁহার অনন্ত মহত্বে আপনার অহঙ্কার ও বিশিষ্টতাকে ডুবাইয়া দেয়? তোমার হৃদয়ের অভ্যন্তরে যিনি নিত্য প্রতিষ্ঠিত, ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে যিনি নিত্য বিরাজিত, সেই পুরুষপ্রধান তোমার আকুল প্রার্থনা শুনিয়াছেন। তাই এই চিত্র তোমার সম্মুখে বিদ্যমান। তাঁহার কৃপায়, তাঁহারি করুণারূপ প্রেরণায়, আমি এই দৃশ্যের পরিচয় দিব। একমাত্র মহাযন্ত্রী তিনি, আমাকে যন্ত্র করিয়া তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে আসিয়াছেন। তুমি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর।

সৃষ্টি অনাদি। অনন্তকাল হইতে ব্রহ্মাণ্ডের ও তাহার সহিত জীবের অভিব্যক্তি চলিয়া আসিতেছে। মহাকালের অঙ্কে নিহিত মানবের এই অপরিসীম অভিব্যক্তি-চিত্রখানি অবলোকন কর। ওই যে সম্মুখে অভ্রভেদী পর্ব্বত-শৃঙ্গ দণ্ডায়মান, তাহা রূপক ছলে জীব ও মানবের অভিব্যক্তি-ইতিহাস প্রচার করিতেছে। সৃষ্টি অনাদি বলিয়া, তুমি এই গিরিশৃঙ্গের মূলদেশ দর্শন করিতে পারিতেছ না। জীব-আবির্ভাব অনাদি বলিয়া, পর্ব্বত-মূল অনন্ত গর্ভে লুক্কায়িত। পর্ব্বতের গাত্রদিয়া যে জ্যোতির্ম্ময় পথ লক্ষ্য করিতেছে, তাহা শৃঙ্গ বেষ্টন করিতে করিতে তাহার শিখরদেশে আরোহণ করিয়াছে তুমি যদি যথাযথলক্ষ্য করিয়া থাক, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে, এই পথ পর্ব্বতশৃঙ্গকে লতা-বন্ধনের ন্যায়সপ্তবার বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তাহার প্রত্যেক বেষ্টনে, পথের মাঝে, সাতটি করিয়া যাত্রীদিগের বিশ্রামের স্থান আছে। পথিকেরা আরোহণ করিতে করিতে, ক্লান্ত হইয়া এক বিশ্রামের স্থানে স্বল্প বিশ্রাম করে এবং শ্রান্তি দূর করিয়া, অগ্রসর হইতে হইতে, আর এক স্থানে উপনীত হয়।

মনে কর, একটি তরঙ্গ কোনও বালুকা-দ্বীপ বিধৌত করিয়া তাহাতেই লুপ্ত হইতেছে; আবার নবোচ্ছ্বাসে সেই স্থানেই অধিকতর স্ফীত হইয়া তথায়

আবার বিলীন হইতেছে। এইরূপে সপ্তবার উচ্ছ্বাসিত ও লয় প্রাপ্ত হইয়া, সেই স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সেই তরঙ্গ অপর বালুকাদ্বীপে আসিয়া আত্মবল সঞ্চয় করিতেছে ও সেইরূপে সপ্তবার স্ফীত ও বর্দ্ধিত হইয়া ততবার আবার বালুকা গাত্রে মিশিয়া যাইতেছে। আমাদিগের সৃষ্টিক্রিয়াও তাহাই। মহাকল্পের প্রারম্ভে, জীব-তরঙ্গ; কোন একটি জগতে স্ফীত হইয়া উঠে, আবার প্রলয়ে কোথায় তাহা বিলীন হয়। এইরূপ সপ্তবার প্রবুদ্ধ ও সপ্তবার লয়প্রাপ্ত মানব-মহাযাম-তরঙ্গ, আর এক জগৎকে আশ্রয় করে। এইরূপে সপ্তজগৎকে আশ্রয় করিয়া পরে মহাপ্রলয়ে তাহা কোথায় আত্মগোপন করে।

এই যে মানবের বিরাট অভিযান ও অভিব্যক্তি, তাহা তোমার সম্মুখে বিরাজিত, আদি-অন্তহীন, পর্ব্বত-শৃঙ্গ সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিতেছে। পূর্ব্বকথিত গিরিগাত্রে অঙ্কিত জ্যোতির্ম্ময় পন্থার সপ্ত বেষ্টন, প্রত্যেক বেষ্টনে যে সপ্ত বিশ্রামস্থান পরিদৃশ্যমান হইতেছে, তাহারা এই পূর্ব্বকথিত মানব অভ্যুত্থান ও বিকাশের জটিল তথ্য চিত্রের দ্বারা অতি সহজভাবে প্রকাশ করিতেছে।

পূর্ব্ব কথিত পথের সাহায্যে উঠিতে উঠিতে, আরোহীরা অবশেষে শৃঙ্গের শিখরদেশে উপনীত হয়। সেই খানে ঐ যে রজত-শুভ্র, সর্ব্বসৌন্দর্য্যের আধার, মন্দির দেখিতেছ, যাহা হইতে সিত জ্যোতিরাশি; নীলাকাশের পবিত্র নীলিমা-মাঝে শোভা পাইতেছে, সেই মন্দিরে প্রবেশ লাভ করিবার জন্যই এই যাত্রিবৃন্দ দুর্গম পর্ব্বত পথে অধিরোহণ করিতেছে। যাঁহারা তথায় প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছেন, সেই মহাপুরুষেরা, শিষ্য, দেখ দেখ,—যদিও তাঁহাদিগের সংসার-ভ্রমণ শেষ হইয়াছে, তথাপি তাঁহারা এতদূর কঠোর পথশ্রমেও শ্রান্তি-দূর করিবার জন্য আত্মবিশ্রাম বা নিজ শান্তি চাহিতেছেন না। কোন্ যাত্রীর কি অভাব হয় তাহা মোচন করিবার জন্য, আত্মশান্তি ও আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহারা সংসারের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দণ্ডায়মান আছেন। আত্মসুখের কথা তাঁহাদের মনে আদৌ আসিতে পারে না। তাঁহাদিগের একমাত্র ইচ্ছা, তাঁহাদিগের একমাত্র চেষ্টা, কিরূপে সকল মানব তাঁহাদেরই মত হইয়া সেই পবিত্র মন্দিরে প্রবেশ লাভ করিতে পারে। তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই এই বহিঃস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঐ গর্ভমন্দিরে বিরাজিত যে পুরুষোত্তম রহিয়াছেন সেই অনন্তের আধারে; তাঁহাদিগের পৃথক্ অস্তিত্ব বিলীন করিতে পারেন

কিন্তু মানবের কল্যাণজন্য তাহা তাঁহারা করিতেছেন না। একজনকেও ছাড়িয়া, যেন তাঁহারা দেবতারও আকাঙ্ক্ষিত ও পরমবাঞ্ছিত যে শান্তি-সুখ তাহা স্বয়ং উপভোগ করিতে চাহেন না। তাঁহারা সেই মহাভক্ত প্রহ্লাদের মত যেন বলিতেছেন,—

"হে অচ্যুত। বহু সপত্নীর ন্যায় অতৃপ্তরসনা একদিকে, শিশ্ন অন্যদিকে, ত্বক্, উদর ও শ্রবণ অন্য কোনদিকে, নাসিকা ও চপলচক্ষু অপরদিকে এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়সকল কোনদিকে গৃহস্বামীকে আকর্ষণ করিয়া ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতেছে; এই সমস্ত দীন বালকদিগকে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমি মুক্তি চাহি না।"

ঐ যে মন্দির দেখিতেছ তাহার মধ্যস্থান,—যাহাকে আমি গর্ভ-মন্দির বলিয়া আসিলাম,—সেই স্থান সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র। সেই গর্ভ-মন্দিরকে বেষ্টন করিয়া চারিটী চক্রাকার প্রাঙ্গণ আছে,—একটী অপরটীর অন্তর্গত ও সমকেন্দ্রস্থিত; কিন্তু প্রত্যেকটী প্রাচীরে বেষ্টিত। সেই প্রাচীরগুলির প্রত্যেকটীতে একটী মাত্র করিয়া প্রবেশদ্বার রহিয়াছে। এক প্রাঙ্গণ হইতে অভ্যন্তরস্থিত প্রাঙ্গণে যাইতে হইলে সেই একমাত্র দ্বার দিয়া যাইতে হয়, প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইবার উপায় নাই। এইরূপ চারিটী প্রাঙ্গণ; সকলগুলিই মন্দিরের অন্তর্গত। চতুরাঙ্গণ সমন্বিত ঐ মন্দিরকে বেষ্টন করিয়া একটী বৃহত্তর মণ্ডলাকৃতি চত্বর বিদ্যমান রহিয়াছে। মন্দিরাধিগত যে মহাত্মাদিগের কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিলাম, তাঁহাদিগের সংখ্যা হইতে এই বহিঃপ্রাঙ্গণে অবস্থিত লোকের সংখ্যা অনেক অধিক। ঐ পর্ব্বত গাত্রে ঘূর্ণায়মান পথ সাহায্যে শেষোক্ত এই সমস্ত ভাগ্যবান জীবগণ পর্ব্বত বেষ্টন করিতে করিতে মন্দির-প্রান্তবর্ত্তী প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আবার দেখ সহস্র সহস্র লোক ঐ পথের মাঝে এখনও পড়িয়া আছে; তাহারা শৃঙ্গের শিখরদেশেও এখনও অধিরোহণ করিতে পারে নাই; অতি ধীরে ধীরে, পদের পর পদবিক্ষেপ করিতে করিতে, অতি সন্তর্পণে তাহারা উঠিতেছে। তাহাদিগের গতি এত মন্থর যে মনে হয় যেন তাহারা যতটুকু ঊর্দ্ধে উঠিতেছে, আবার ঠিক ততখানি নিম্নে অবতরণ করিতেছে। তাহাদিগের দেহ হেলিতেছে, চরণ নড়িতেছে, অথচ যেন তাহারা চিত্রাঙ্কিতের ন্যায় একই স্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। মানবজাতির গতি

ঊর্দ্ধাভিমুখী হইলেও মনে হইতেছে, যেন মানবতরঙ্গগুলি এক স্থানেই প্রতিঘাত করিতেছে।

যুগযুগান্তরব্যাপী, মানবজাতির এই ধীর, এই কষ্টসাধ্য, ক্রমবিকাশের এই চিত্রখানি দেখিলেই সাধারণের মনে ভয় ও নিরাশার যে সঞ্চার হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? এক একজন মানব কত যুগ ধরিয়া ঐ পথে চলিতেছে; পথমধ্যে তার কত জন্ম, কত মৃত্যু হইয়া গিয়াছে; কত জগৎ উদ্ভূত ও লয়প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে, তথাচ এখনও সে কত নিম্নে অবস্থান করিতেছে। সেই অনন্তকালব্যাপী সুদূর মহাযাত্রার যাত্রী হইবার কথা দূরে থাকুক, সেই যাত্রিগণকে দেখিলেও মনে বিষাদ আসে। তাহাদিগকে দেখিয়া একজনের মনে স্বতঃই প্রশ্ন উঠিতে পারে—কেন এত লোক অনন্তকাল ধরিয়া এই সুদূর অভিযান করিতেছে, গিরিশৃঙ্গস্থ মন্দিরে কি আছে এবং তাহারই বা কি আকর্ষণ, যাহার জন্য স্থির হইয়া মানবের একস্থানে থাকিবার শক্তি নাই?

তুমি কি বুঝিতে পারিতেছ না, কেন মানবের গতি এত মন্থর? তাহাদিগের গন্তব্য স্থান অজ্ঞাত বলিয়া এবং অজ্ঞাত পথাবলম্বনে যাইতেছে বলিয়া, তাহারা এত ধীরে ধীরে, এত সন্তর্পণে উঠিতেছে। অনেকে আবার বৃথা সময় অপচয় করিতেছে। উদ্দেশ্য-বিহীন হইয়া, কখন এইদিকে, কখন ওইদিকে, কখন এই অবস্থায়, কখন ঐ অবস্থায় আকৃষ্ট হইতেছে; একমনে অভীপ্সিত স্থানে যাত্রা করিতেছে না। বালকের মত তাহারা কখনও সম্মুখস্থ ঐ একটী ক্ষুদ্র পুষ্পাহরণ মানসে ছুটিতেছে, কখন বা অন্যদিকে একটী বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত প্রজাপতির পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবিত হইতেছে। এইরূপে উদ্দেশ্যবিহীন শৈশব ক্রীড়ায়, সময় অপব্যয় করিয়া দিবসের শেষে, রজনীর যখন ঘনান্ধকার তাহাদিগের গমন-মার্গ আচ্ছন্ন করে, তখন তাহারা দেখে যে অতি অল্পই অগ্রসর হইয়াছে।

তাহাদিগকে বিশেষরূপে অনুধাবন করিয়া দেখিলে, স্পষ্টই অনুভূত হয় যে, তাহাদিগের মধ্যে কাহারও বুদ্ধিবৃত্তি কিছু বিকশিত হইলেও, সে যে এই উন্নতি-মার্গে দ্রুততর অগ্রসর হইতেছে তাহা নহে। যাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি এখনও বিকশিত হয় নাই, প্রত্যেক জীবন-দিবসের শেষে তাহারা পূর্ব্বদিবসে যে স্থানে ছিল সেই স্থানেই নিদ্রিত হইয়া পড়ে এবং নিদ্রাভঙ্গে সেই স্থান হইতে

আবার নূতন যাত্রা আরম্ভ করে। সেইরূপ আবার যাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তির কিছু বিকাশ হইয়াছে তাহারাও পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানহীন মানবের মত অতি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে এবং প্রতি দিবসের শেষে সেই অনন্তপথের অতি অল্প অংশমাত্র অতিক্রম করিতে সক্ষম হইতেছে।

শিষ্য।—মানবের এই বৃথা শ্রম ও আয়াস লক্ষ্য করিয়া এবং দুরূহ পথের অধিরোহণে তাহাদিগের যে মহাক্লান্তি তাহা অনুভব করিয়া আমার চিত্ত অভিভূত হইয়া যাইতেছে। গুরুদেব, হায় কেন তাহারা একবার নয়ন উত্তোলন করিয়া দেখিতেছে না তাহাদিগের গন্তব্য স্থান কোথায়!

পিতঃ! তাহারা যে ভুলক্রমে, অজ্ঞানতাবশতঃ, সংসারের মায়া মরীচিকায় লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া, আত্মহারা হইতেছে, তাহাতাহাদিগের মনে আসিতেছে না কেন? আবার এই জনপ্রবাহের মধ্য হইতে কেহ কেহ যে বায়ুরোগাক্রান্ত, চিন্তাহীন, আপন বিপদের প্রতি লক্ষ্যহীন মানবের মত, সাধারণমার্গ স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া বিপদসঙ্কুল, ভৃগুমান, কণ্টকময় পর্ব্বত গাত্র সাহায্যে উপরে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে, এই সমস্ত মানবদিগেরই বা গতি কোথায়? কোন্ মায়াবীর প্রলোভনেই বা তাহারা এইরূপ আত্মহারা হইয়া ঘুরিতেছে?

(ক্রমশঃ)

শ্রীকিশোরী মোহন চট্টোপাধ্যায়।

ভাবলহরী।

কাম

আসঙ্গ-অচলোদ্ভবা কাম-তরঙ্গিণী
চলিয়াছে ধীর পদে মন্থর-গামিনী
সলজ্জ বধূর মত। সুখ দুখ তার
দু'টি কূল, আলোকিত, ছায়া-সমন্বিত;
একে ভাঙে, গড়ে আর। বর্দ্ধিত-আকার,
বিষয়ের বক্ষ বাহি' অতি ত্বরান্বিত
ধায় যবে বেগভরে চটুল চরণে
মদোন্মত্তা, রচি' বক্র ঘূর্ণাবর্ত্ত শত
লোল নেত্রে, লাস্যে হাস্যে বিলাসীর মনে
জাগা'য়ে অতপ্ত তৃষা, মুগ্ধ মন্ত্র-হত
ঝাঁপাইয়া পড়ে জীব আপনা পাসরি'
বক্ষে তার;—অমনি সে মায়ার সরিৎ
ছায়া সম অকস্মাৎ যায় অপসরি',
লুটে ভ্রান্ত বালু মাঝে হারা'য়ে সম্বিৎ।

ক্রোধ

শৃঙ্খলিত শার্দ্দূলের নেত্র-হুতাশন
জ্বলে তার বিস্ফারিত নয়ন-যুগলে;
মন্ত্র-বদ্ধ বিষধর ভুজঙ্গ মতন
নিষ্ফল গর্জ্জনভরে করয়ে বিকলে
দংশন আপন দেহ; নিজ কলেবর
উদগীরিত হলাহলে করে সে জর্জ্জর।
বাসনার বিফলতা, দৃপ্ত অহঙ্কার,
উভয়ের সংঘর্ষণে চিত্ত হ'তে তার
তাড়িৎ-তরঙ্গমালা ধায় তনুময়,
প্রতি রোম-কূপ তাহে কণ্টকিত হয়,
ঘন ঘন বহে শ্বাস, তিক্ততা- সঞ্চার
রসনাগ্রে। টুটে যবে, পশ্চাতে তাহার
রহে শুধু অনুতাপ ধিক্কারে কেবল;—
হেন ক্রোধ-বশ নর নহে কি পাগল?

লোভ

সাফল্য-ঔরসে জন্মি' গর্ভে কামনার,
লোভ-শিশু অতি ক্ষুদ্র কলেবর ধরি'
মনের সংকীর্ণ কোণ করে অধিকার।
সামান্য হবির কণা অন্তরে আহরি'
বাড়ে যথা হুতাশন। তেমতি তাহার
রূপাদি বিষয় পঞ্চ করি' পরশন
নিমিষে নিমিষে দেহ বর্দ্ধিত-আকার,
অনন্ত গগন জুড়ি' গ্রাসে ত্রিভুবন
লালসার লোল রসনায়। কালানল
নেত্র হ'তে স্ফুরি' তার পুষ্পিত কানন
পোড়ায় পলকে কত; নিঃশ্বাসে প্রবল
শুকায় অগাধ সিন্ধু রতন-ভবন,
তবু তার নাহি তৃপ্তি। তৃষা অনির্ব্বাণ।—
হেন দৈত্যে কেন জীব দেহে দেয় স্থান?

মোহ

মায়ার মোহন দূত মোহ যাদুকর
যাদু-দণ্ড ধরি' করে, মানস-ভুবন
বিহরিছে নিশিদিন। গণ্ডীর ভিতর
আনে যবে জীব-চিত্ত করি' আকর্ষণ,
স্তম্ভিত রহে সে ক্ষণ, পতঙ্গের প্রায়
ঝাঁপাইয়া পড়ে শেষে অনল-শিখায়
আত্মহারা, বাহ্য রূপে হ'য়ে বিচলিত।
প্রজ্বলন্ত মরণের শত ঘন পাকে
আলিঙ্গিত জড়ীভূত দলিত মর্দ্দিত
আপনারে করে বিসর্জ্জন। সে বিপাকে
নিস্তার লভে সে যদি, তবু মুগ্ধ-প্রাণ
দগ্ধ-পক্ষ পশে পুন ভুলি' লব্ধ জ্ঞান।
অহো ভ্রান্তি! কোথা হতে আসে এ বিকার?—
আপনাতে রচে জীব ধ্বংস আপনার।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

জগন্নাথ দেবের রথ যাত্রা।
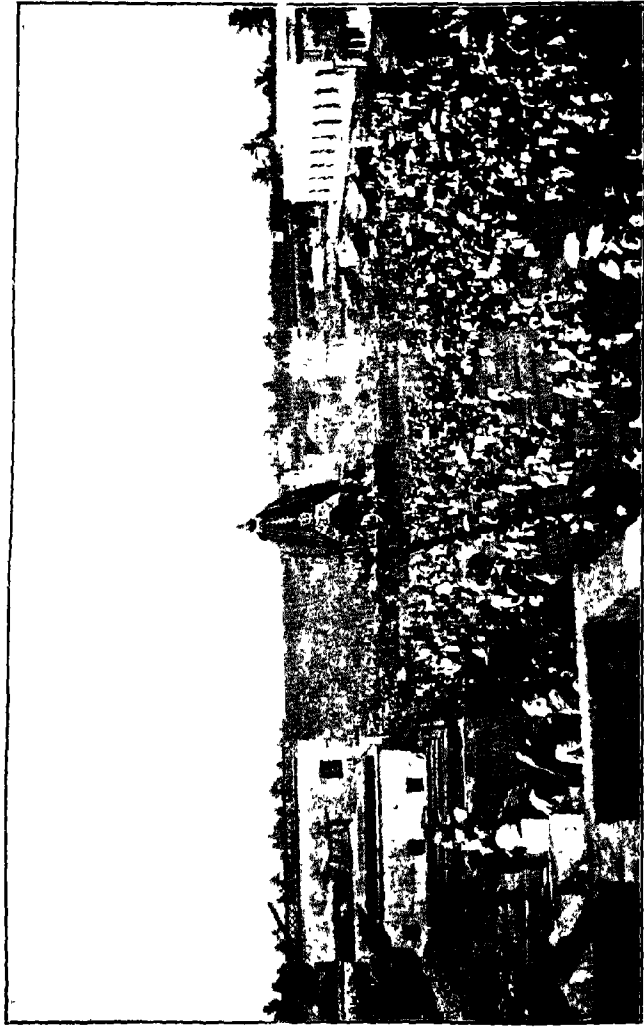
আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু।

রথেতু বামনং দৃষ্টা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।

(নবপর্য্যায়—ষোড়শ বর্ষ।)

মায়া—বিদ্যা ও অবিদ্যা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৩)

পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা মায়াতত্ত্ব আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছি যে, মায়া 'স্বরূপতঃ ভগবানের সর্ব্বাত্মিকা মতি। ঐ মায়া ভগবানে বিভূতিরূপে থাকে, তাহারও উল্লেখ করা হইয়াছে। এক্ষণে বেদার্থের পরিপূর্ণতা সাধন জন্য পুরাণ কি বলেন তাহা দেখা যাউক। শ্রীমদ্‌ভাগবতে দশম স্কন্ধে, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে মায়াতত্ত্বের ইঙ্গিত আছে। ভগবান্ ব্রহ্ম মায়া-বালক রূপে ভগবানের মহিমা দর্শন করিবার জন্য গোপ-বালক ও বৎসগণকে অন্তর্হিত করিয়া রাখিলেন। ভগবান্ পূর্ণব্রহ্ম ব্রহ্মার এই কার্য্য বুঝিতে পারিয়া আপনাকে বৎস ও পালকাদিরূপে উভয়ভাবে ব্যাকৃত করিলেন। "উভয়ায়িতমাত্মানং চক্রে বিশ্বকৃদীশ্বরঃ" ১০।১৩।১৮ এই স্বরূপ অভিব্যক্তিতে প্রকট গো বালকাদিবিশিষ্ট ব্যক্ত চিহ্নগুলি সকলই পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত হইল।

> "যাবদ্‌বৎসপবৎসকাল্পক বপুর্যাবৎ করাঙ্‌ঘ্র্যাদিকং।
> যাবদ্‌যষ্টি বিষাণবেণুদলশিগ্‌যাবদ্বিভূষাম্বরম্॥
> যাবচ্ছীলগুণাভিধাকৃতিবয়ো যাবদ্বিহারাদিকং
> সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং গিরোঙ্গবদজঃ সর্ব্বস্বরূপো বভৌ॥ ১০।১৩।১৯

যে বৎসের ও বৎসপালের যে রূপবিশিষ্ট শরীর প্রমাণ, যে রূপবিশিষ্ট হস্ত-পদাদি, যেরূপ যষ্টি, শৃঙ্গ, বেণুদল, ও শিক্য, যেরূপ বসন-ভূষণ, যেরূপ

শীল, গুণ, আকৃতি, বয়স ও আহার-বিহারাদি তদ্রূপ বিশিষ্টরূপে আপনাকে প্রকটিত করিয়া ব্যক্তভাবে "সর্ব্ববিষ্ণুময়" বা "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বেদ-বাক্যের সার্থকতা করিবার জন্য পূর্ণব্রহ্ম সংখ্যারূপী সর্ব্বরূপে প্রকাশিত হইলেন। পাঠক লক্ষ্য রাখিবেন, এই মায়িক প্রকাশ তাঁহার সর্ব্বময় বা সর্ব্বাত্মিকা ভাবের অভিব্যক্তি। এইরূপ ভাবে যে বিশেষ প্রকট রূপ উৎপন্ন হইল, তাহার প্রত্যেকের মধ্যে ব্যবস্থিত সর্ব্বাত্মিকাভাবের আভাস দিবার জন্য ভাগবত বলেন যে, ঐরূপে বিশিষ্ট বালকগণ আপনাপন বিশিষ্ট স্বভাব-কর্ম্মাদি পূর্ব্বানুরূপভাবে প্রকট করিতে লাগিল। গাভী ও বৎসগণ স্বীয় স্বভাবানুরূপ দুগ্ধ দান ও পানাদি করিতে লাগিল।

"ইত্থমাত্মাত্মনাত্মানং বৎসপালমিষেণ সঃ।
পালয়ন্ বৎসপো বর্ষং চিক্রীড়ে বনগোষ্ঠয়োঃ॥ ১০।১৩।২৭

এইরূপে ভগবান্ আত্মাতে আত্মাদ্বারা আপনাকে বৎস ও পালক রূপে সৃষ্টি করিয়া আপনি আপনাকে এক বৎসর যাবৎ পালন করিয়া গোষ্ঠে খেলা করিতে লাগিলেন। তাঁহার অদ্বিতীয় বিশিষ্টভাব এমনি প্রভাব যে, সর্ব্বাত্মিকা ভাবে মায়া দ্বারা অভিব্যক্ত পরিচ্ছিন্ন বিশিষ্ট রূপগুলি কল্পিত হইলেও আমাদের সত্য বস্তুর সমস্ত ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছিল। গাভীসকল বৎসগতা হইয়াছিল। অর্থাৎ মায়া কল্পিত হইলেও আমাদের সত্য গাভীগণের ন্যায় তাহাদের বৎসাদিও হইয়াছিল। তাত হইবেই। অব্যর্থ সঙ্কল্প ভগবানের সৃষ্টিবিবক্ষার মতিদ্বারা অব্যক্ত লিঙ্গ গাভীও বৎসভাবগুলি সর্ব্বাত্মিকা ভাবে বিশ্বতোমুখী হইয়া প্রত্যেকে স্বভাব-ধর্ম্মাদি ভাবে পরিণত হইয়াছিল। ব্রহ্মাসৃষ্ট মায়িক বৎসাদি হইতে এই বৎসগণের বিশেষত্ব আছে। ভগবানের সৃষ্ট্যভিমুখী ইচ্ছাতে তাঁহার চৈতন্য বা সংবিদাংশই প্রধান। ব্রহ্মা আপনিও এই সংবিদাংশের প্রকাশ। সেই জন্য তাঁহার অভিব্যক্ত জগতে ও জগদ্বস্তুতে ভগবানের স্বরূপভূত আনন্দ ও অদ্বিতীয়ত্বাব সত্বানুভাব পূর্ণরূপে হইতে পারে না। ব্রহ্মার প্রকটিত, মনোবিলাস রূপ জগতের ভগবানের স্বরূপ স্ফূর্ত্তি ঐকদেশিক বলিয়াই শাস্ত্র-জগৎকে ভগবৎ স্বরূপে অঙ্কিত ও স্থাপিত করিতে উপদেশ দেন। বাস্তবিক পক্ষে ঐ মনোবিলাসের মধ্যে ভগবৎ স্বরূপ পূর্ণভাবে রহিয়াছে। তবে ঐ অদ্বিতীয়তা গূঢ় ও সূক্ষ্মভাবে আছে বলিয়া সহজে তাহার পরিজ্ঞান হয় না। যেমন সাধুপুরুষদিগের আহার-ব্যবহারাদি সাধারণ মানুষের ব্যবহারাদির সহিত এক জাতীয় বলিয়া আপাততঃ

মনে হইলেও, ভক্তিদ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত দৃষ্টিতে ঐ সামান্য ভাবের ভিতর সাধুভাবের বিশিষ্টতার নিদর্শন পাওয়া যায়, তদ্রূপ জগদ্বস্তুর মধ্যে কাষ্ঠে বহ্নির ন্যায় গূঢ়রূপে অবস্থিত ভগবৎ স্বরূপের নিদর্শন পাওয়া যায়। তিনি 'সর্ব্বভূতেষু গূঢ়'ও 'সূক্ষ্মত্বাৎ অবিজ্ঞেয়' হইলেও ভেদভাব হইতে প্রত্যাহৃত মন, বুদ্ধি দ্বারা সুধীগণ তাঁহার পদচিহ্ন দেখিতে পান। "দৃশ্যতে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ"—ইতি কঠশ্রুতি ৩।১২। কিন্তু যখন ভগবান্ পূর্ণস্বরূপে হ্লাদিনী আদি শক্তি সমন্বিত হইয়া বৎসাদিরূপে প্রকট হইলেন, তখন ভগবানের জ্যোতি দ্বারা আলোকিত চিত্ত গোপ ও গাভীগণ, গোপবালক ও গো-বৎসগণের প্রতি প্রেম ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল বলিয়া বুঝিতে লাগিল। তাহারা জানিত না যে, কেন এই মধুর ভাবের উৎকর্ষ হইতেছে। কিন্তু বলদেব ভাবিলেন—

"কিমেতদদ্ভুতমিব বাসুদেবেঽখিলাত্মনি।
ব্রজস্য সাত্মনস্তোকেষ্বপূর্ব্বং প্রেম বর্দ্ধতে।" ১০।১৩।৩৬

একি আশ্চর্য্য! পূর্ব্বে অখিলাত্মা বাসুদেবের প্রতি ব্রজবাসীদের যেরূপ প্রেম বৃদ্ধি পাইত, এখন তাহাদের আপন আপন পুত্রদিগের প্রতি সেইরূপ প্রেম বৃদ্ধি পাইতেছে কেন?

শুধু তাহাই নহে। যেমন আমাদের শরীরাদির ইতিহাস আছে, যেমন শরীররূপ বিশিষ্ট ভাবগুলিকে পূর্ব্বপুরুষগণের শরীরের সহিত এবং সন্তানদিগের সহিত অন্বিত করিয়া তাহার বিশিষ্ট অভিব্যক্তি বা ক্রমোন্নতি লক্ষিত করা যায়, তদ্রূপ ঐ গো-বৎস ও বালকাদি মায়িক অভিব্যক্ত অহংকার-তত্ত্বের শক্তিকেন্দ্র ভাবে দেখা যায়। ঐ ভাবে তাহারা ভগবৎ-পার্ষদ ঋষ্যাদিগণের অভিব্যক্তি। কিন্তু এই অভিব্যক্তি বা ক্রমোন্নতি ভাবটীও পরিচ্ছিন্ন অহংভাবের দ্বারা দুষ্ট। উহাতে স্বরূপের পরিপূর্ণতা শুদ্ধভাবে প্রকাশ হয় না বলিয়া উহাও পরিত্যাজ্য। রোগী মুক্তিকে পরিচ্ছিন্ন আমির সহিত সংযুক্ত করিয়া দেখে বলিয়া তাহার মধ্যে, চিকিৎসকের ন্যায়, সর্ব্বাত্মিকা ভাবের প্রকাশ দেখিতে পায় না। চিকিৎসক বিশিষ্ট রোগের ব্যাপারাদির দ্বারা ঐ রোগের সর্ব্বাত্মিকা ধর্ম্ম বা স্বরূপ বুঝিতে পারে। তদ্রূপ যাঁহারা মায়ামুগ্ধ হইয়া ভেদভাবে

পরম বিশেষ বা অদ্বিতীয় ভগবানকে বুঝিতে যান, তাঁহারা অবিদ্যা প্রভাবে জীবে ঋষি প্রভৃতি বিশিষ্ট ভাবের অভিব্যক্তি বা ক্রীড়া দেখিয়াই জীবকে বিশিষ্ট পিতৃ ও ঋষি বা দেবতাজ্ঞানে দেখিয়া ভগবানের একত্ব ও অদ্বিতীয়তা ভাব হইতে চ্যুত হয়েন। সেই জন্য বলদেব বলিতেছেন—

"নৈতে সুরেশা ঋষয়ো নচৈতে ত্বমেব ভাসীশ ভিদাশ্রয়েঽপি।

সর্ব্বং পৃথক্‌ত্বং নিগমাৎ কথং বদেত্যুক্তেন বৃত্তং প্রভুণা বলোঽবৈৎ" ॥

ভাঃ ১০।১৪।৩৯

আমি পূর্ব্বে জানিতাম যে, এই সকল বৎস ঋষিদিগের এবং বৎসপালগণ দেবতাদিগের অংশ প্রকাশ। কিন্তু এক্ষণে তাহাদিগকে তোমার সামান্য রূপ বলিয়া দেখিতেছি। উপরন্তু আরও দেখিতেছি, বস্তুসকলে ভেদের আশ্রয় বলিয়া প্রতীত হইলেও সকলেতেই একই রূপ তুমি বর্ত্তমান রহিয়াছ। অথচ কিরূপভাবে পৃথক্ পৃথক্ হইয়া রহিয়াছ? বলদেবের এই উক্তির মধ্যে আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহার চিত্তে অবিদ্যাপ্রসূত দেবতাদি বিভিন্ন জ্ঞান মায়া দ্বারা একই ভগবদ্রূপে পরিণত হইল এবং তৎপরে ঐ একতাজ্ঞানের ভিতর দিয়া শ্রীভগবানের অদ্বিতীয়, অপ্রাকৃত, বিশেষ ও বিশ্বাতীত ভাবের স্ফুরণ হইল। বহুত্বরূপী অবিদ্যামায়া ভগবানের রূপজ্ঞানে বিদ্যামায়ায় পরিণত হইল। এবং বিদ্যামায়া হইতে মহাবিদ্যা চৈতন্যময়ীভাবে পরিণত হইয়া পরমাদ্ভুত, অপ্রাকৃত অদ্বিতীয়তার ব্যঞ্জনা করিল।

অনন্তর পদ্মযোনি ফিরিয়া আসিয়া দেখেন যে বৎস ও বালকগুলি পূর্ব্বভাবেই রহিয়াছে। তিনি অনেক বিচার করিয়াও "সত্যাঃ কে কতরে নেতি জ্ঞাতুং নেষ্টে কথঞ্চন।" (১০।১৪।৪৩) কোনগুলি সত্য এবং কোনগুলি মিথ্যা তাহা কোন প্রকারে স্থির করিতে পারিলেন না।

অনন্তর দেবের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া নিবৃত্ত হইলেন। যেমন খদ্যোত দিবসে পৃথক্ প্রকাশ হইতে পারে না, তদ্রূপ নীপ মায়া ভগবানে প্রযুক্ত হয় না। এই রূপে নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মা দেখিলেন:—

"তাবৎ সর্ব্বে বৎসপালা! পশ্যতোঽজস্য তৎক্ষণাৎ।

ব্যদৃশ্যন্ত ঘনশ্যামাঃ পীত কৌশেয় বাসসঃ।" ১০।১৩।৪৬

যে কি বৎস, কি বৎসপালগণ, কি যষ্টি-শৃঙ্গাদি—সকলেই মেঘের ন্যায়

শ্যামবর্ণ,—সকলেরই পরিধান পীতবস্ত্র, সকলেই চতুর্ভুজ ভগবদ্‌স্বরূপ। সকলেরই অনিমাদি মহিমা, অজ প্রভৃতি শক্তি, সকলেরই তত্ত্বাদিতে ব্যাপ্তি। তাহার পর দেখিলেন, সকলেই কাল-কর্ম্ম-স্বভাবাদি দ্বারা উর্জ্জিত সৃষ্টি। কিন্তু দেখিলেন, 'সর্ব্বেষাং মূর্ত্তিমত্ত্বেঽপি বিশিষে মাহ' সকলেরই মূর্ত্তিমৎ হওয়ায় আর এক পরম বিশিষ বা অদ্বিতীয় ভাব আছে।

সত্য জ্ঞানানন্তানন্দ মাত্রৈকরস মূর্ত্তয়ঃ।
অস্পৃষ্ট ভূরি-মাহাত্ম্যা অপি হ্যপনিষদদৃশাং॥
এবং সকৃৎ দদর্শাজঃ পরব্রহ্মাত্মনাখিলম্।
যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি স চ বাসবং॥ ৫৪।৫৫

অজ ব্রহ্ম দেখিলেন যে, (সর্ব্ব) সকলেই সত্য জ্ঞান ;অনন্ত এবং আনন্দরূপ এবং সর্ব্বপ্রকার বিজাতীয় ভেদ বর্জ্জিত; দেখিলেন, সকলেই একরস ও সদৈক রূপ, দেখিলেন সকলেই সত্য জ্ঞানাদিমাত্র সত্বে একরূপ একরস ব্রহ্ম,সকলেই উপনিষৎ-চক্ষু অর্থাৎ সকলেরই আত্মজ্ঞানই চৈতন্য। সকলেরই 'ভূরি-মাহাত্ম্য স্পর্শযোগ্য নহে অর্থাৎ সকলেই অব্যবহার্য্য মাহাত্ম্য স্বরূপ। যে ব্রহ্মের জ্যোতিতে বা সর্ব্বাত্মিকা প্রকাশে যাবতীয় বিশ্ব প্রতিভাত, সেই পরমব্রহ্মরূপে এককালেই একযোগে জগৎ বা বিশিষ্ট সর্ব্বকে দেখিতে পাইলেন। এইরূপে মহাবিদ্যার সাহায্যে একে বহু এবং বহুতে একরস দর্শন করিয়া ব্রহ্ম স্তিমিতেন্দ্রিয় হইয়া জ্ঞানশূন্য হইয়া আর দেখিতে পাইলেন না। কারণ, কোন্ ব্যক্ত জীব 'সেই ব্রহ্মাদ্বয়ং পরমনন্ত মগাধবোধং'কে বাহিরে ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা দেখিতে পারে? কে অদ্বয় অনন্ত অগাধবোধ পরব্রহ্মকে লক্ষিত করিতে পারেন। 'পশ্যেতাত্মিকাত্মানং' কেবল আত্মা দ্বারাই পরমাত্মা বিজ্ঞাত হন।

ভাগবতের উপাখ্যান-শাস্ত্র কি অপূর্ব্ব কৌশলে শ্রীভগবানের অদৃষ্ট মায়া সর্ব্বাত্মিকা স্বরূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন—তাহা গ্রহণ করিতে পারিলে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রাধান্য ও উৎপত্তি আপনা-আপনি প্রতিপন্ন হয়। মায়ারূপ সর্ব্বাত্মিকা চৈতন্যই একরস ভগবান্‌কে জগৎ ও জীবরূপে প্রকট করিয়া পরে তাঁহাতেই তাহার অদ্বিতীয় বিশ্বাতিগ্ ভাবে লীনা হন। সেইজন্য মহামায়া কাত্যায়ণিদেবীর দয়া না হইলে ভগবানকে লাভ করা যায় না। (ক্রমশঃ)

সম্পাদকয়োঃ—

ভাব-লহরী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মদ

বিষয়-মদিরা পানে সতত বিহ্বল ,
উদ্ধত উপেক্ষা-ভরা নেত্র উর্দ্ধ-তার ;
দম্ভে পদ যেন নাহি পরশে ভূতল ;
গর্ব্ব-বিস্ফারিত বক্ষ ; স্ফীত মত্ততার
উৎকট হরষ জাগে আনন-মণ্ডলে ;
অবজ্ঞায় করে হেলা সমগ্র সংসার ;
অহঙ্কারে ধরা যেন ধরে করতলে ;
ভাবে মনে—সেই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বিধাতার ;
সেই ভোক্তা, সেই কর্ত্তা , জগৎ সৃজন
তাহারি সম্ভোগ তরে ! কিন্তু যবে হায়,
অকস্মাৎ হয় তার চরণ স্খলন
ঘটনার ঘূর্ণাবর্ত্তে, নেশা টুটে যায়,
দেখে সে—সে নহে উচ্চ, অতি তুচ্ছ সেহ ;
এ হেন উন্মাদ-ব্যাধি কেন ধরে দেহ ?

মাৎসর্য্য

শীর্ণ তনু, অতি ক্ষুদ্র নয়ন-বর্ত্তুল
জ্বলে যেন অন্ধকারে আলেয়ার প্রায় ;
বৈফল্য-বিশুষ্ক তালু অতৃপ্ত তৃষায়
নীরস রসনা ; গ্রাসে যক্ষ্মা অনুকূল
ঈর্ষা-সঙ্কুচিত ক্ষীণ হৃদ্-যন্ত্র তার ;
চিত্ত-স্রোত অবরুদ্ধ সংকীর্ণ পঙ্কিল,
বহে তাহে অসূয়ার সমল সলিল

বিষ-পূর্ণ। নাহি পশে অন্তরে তাহার
নিরাশার পুঞ্জীভূত অন্ধকার টুটি'
ক্ষীণ রেখা আনন্দ-ভানুর। বিধাতার
ধরে দোষ পদে পদে ; রহে সদা লুটি'
অন্ধকূপে, আলোকের পাইলে দর্শন
নাহি জ্যোতি ভাবে মুদি' আপন নয়ন।

রিপু-সংহার

বিষয়-বিমুখ ক্রমে হ'য়ে অন্তর্মুখ
ইন্দ্রিয়নিচয় তব স্বরূপ-চিন্তায়
কর যদি নিয়োজিত, ক্ষণ বাহ্য-সুখ
পরিহরি' অহেতুকী আনন্দ-ধারায়
রহ যদি নিমজ্জিত, ষড়রিপু তোর
না রবে অরাতি আর ; সদা মিত্রবৎ
মায়া-পাশ করি' নাশ টুটি' কর্ম্ম-ডোর
প্রদীপ্ত করিয়া সূক্ষ্ম অন্তর জগৎ
আত্মজ্ঞান-উদ্দীপনে হইবে সহায়।
তত্ত্ব-জ্ঞান স্ফুরে যদি বিবেক হিয়ায়
কাম মায়ানদী হবে শম-প্রস্রবন,
ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ক্রোধ, জ্ঞান-তৃষা লোভ,
মদ আত্ম-বোধ, মোহ আনন্দ অক্ষোভ,
নিস্পৃহতা রূপে হবে মাৎসর্য্য স্ফুরণ।

রিপু-সমন্বয়

বিষয়-ব্যাহত তব ইন্দ্রিয়-নিকর
কর রে আনন্দ-ঘন আত্ম-পুর-বাসী
মায়ারে ডুবা'য়ে রাখ জ্ঞানের ভিতর,
কামনারে কর তাঁর চরণের দাসী।

ক্রোধ হো'ক মূর্ত্তিমান বিষয়-বিদ্বেষে ;
লভিতে আনন্দকণা লোভ লালায়িত ;
প্রেমে হো'ক পরিণত মোহ অবশেষে
পুড়ি' চিদ্-বহ্নি মাঝে ; মদ অহঙ্কৃত
জীব-শিব-অভিন্নতা করিয়া বিচার ;
অবিদ্যার শক্তি হেরি মৎসর হৃদয়
করুক সতত চিন্তা অলীকতা তার ;
বিবেক প্রবুদ্ধ তাহে হইবে নিশ্চয়।
জগতে বিষয়-ভোগে শত্রুরূপী যারা,
আত্মার আস্বাদ-যোগে চির মিত্র তারা।

পুরুষ-কার

কে বলে পুরুষ-কার সদা কবলিত
কর্ম্ম-চক্রে বিদলিত পিষ্ট অনিবার,
অদৃষ্ট-সিন্ধুর দৃঢ় মুষ্টির মাঝার
আবদ্ধ বালুর বেলা নিত্য বিচলিত ?
নহে—নহে ; তুমি যে'রে পুরুষ প্রবর
নিত্য মুক্ত অনাবদ্ধ জন্ম-মৃত্যু-হীন ;
জগৎ-প্রপঞ্চ মাত্র মায়ার অধীন,
নহ তুমি। মোহ-নিদ্রা ভাঙ্গহ সত্বর
প্রবোধ-পুরুষকারে, করম-বন্ধন
কর ছিন্ন ; মায়া-পাশ জ্ঞানের কুঠারে
টুটি' বীর। তুলি শির করহ দর্শন
অনন্ত অনাদিকল্প সত্য আপনারে।
যেই মায়া করে ইহ সৃষ্টি স্থিতি লয়,
তাহারে পুরুষকার করে পরাজয়।

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

দাক্ষিণাত্যে-তীর্থদর্শন।

(১)

চিদম্বরম্।

ভূমিকা—সর্ব্বভূতে একত্ব দর্শন।

শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" এই সমস্তই ব্রহ্মময়। সৃষ্টির প্রাক্কালে লীলাময়ের ইচ্ছা হইয়াছিল "একোহম্ বহুস্যাম" এক আমি বহু হইব। তাই তিনি স্বীয় ত্রিগুণাত্মিকা মায়োপাধি গ্রহণ করিয়া স্বরূপতঃ নির্গুণ হইয়াও সগুণ হইলেন। তাঁহার ইচ্ছাতেই দেব, দৈত্য, ঋষি, মানব, কীট পতঙ্গ, সাগর পর্ব্বত, তৃণ লতা দৃশ্যাদৃশ্য লোক সমূহ প্রকাশিত হইল, সুতরাং কার্য্যকারণাত্মক যাহা কিছু সমস্তই তাঁহার প্রকাশক—তাঁহার অপ্রকট শক্তির প্রকট ভাব। অনন্ত সাগরে যেমন অসংখ্য উর্ম্মিমালা অহরহ উঠিতেছে আবার যেন তাহাতেই মিশাইয়া যাইতেছে, সেইরূপ সেই নাম রূপের অতীত সর্ব্বভূতময় হইতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, তাঁহাতেই স্থিতি আবার তাঁহাতেই লয়। তাই বিদ্যাপতি বলিতেছেন,—

কত চতুরানন মরি মরি যাওত ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহি জনমি পুন তোহি সমায়াত সাগর লহরী সমানা॥

স্বর্ণ এবং স্বর্ণগঠিত অলঙ্কারে যেরূপ পার্থক্য নাই, ব্রহ্ম এবং ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন জগদাদিরও সেইরূপ পারমার্থিক দৃষ্টিতে পার্থক্য নাই।

অংশী অংশো অভেদত্বাৎ। অংশী এবং অংশ মূলতঃ একই বস্তু। সুতরাং সমস্তই সেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সত্তারই অবস্থান্তর মাত্র। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

"অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এবচ।" (গীতা ১০।২০)

হে অর্জ্জুন! আমি ভূতগণের অন্তরে (নিয়ন্তৃরূপে) অবস্থিত পরমাত্মা। আকাশাদি ভূতগণের সৃষ্টি, স্থিতি, সংহারও আমি।

(অর্থাৎ আমিই ভূত সমূহের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের হেতু)

শিবপুরাণে মহাদেব বলিতেছেন।—

অহং শিব শিবশ্চাহম্ ত্বঞ্চাপি শিব এবচ।
সর্ব্বং শিবময়ং ব্রহ্ম শিবাৎ পরং ন কিঞ্চন॥

আমি শিব, তুমিও শিব, সমস্তই শিবময়, শিব ভিন্ন আর কিছুই নাই।

"ময়াতত মিদং সর্ব্বং জগদব্যক্ত মূর্ত্তিনা॥" (গীতা)

আমার অব্যক্ত মূর্ত্তিদ্বারা এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত আছে। এইরূপ অসংখ্য শ্লোক শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে যে, হিন্দু-শাস্ত্রের চরম উপদেশ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।"

মহাভারত বা পুরাণের যে কোন দেবতার স্তোত্র পাঠ করিয়া দেখুন, সর্ব্বত্রই সকল দেবতাকেই বলা হইতেছে—"তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি মহেশ্বর।" শাস্ত্রই বলেন একই ভগবান্ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের নিমিত্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

সৃষ্টি স্থিত্যন্ত করণাদ্ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাত্মিকাম্।
স সংজ্ঞাং যাতি ভগবান্ এক এব জনার্দ্দন॥ "বিষ্ণুপুরাণ"

সুতরাং সমস্ত স্তোত্রেরই উদ্দেশ্য সেই এক ব্রহ্মেরই উপাসনা ; কারণ তিনিই ভিন্ন ভিন্ন দেবতারূপ বপু ধারণ করিয়া থাকেন। দেবতাগণ যে শক্তি দ্বারা কার্য্য করেন, তাহা সেই ব্রহ্মেরই শক্তি, ব্রহ্মশক্তির বলেই দেবতারা বলীয়ান্। ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ সেই মহান্ পরম সত্বার প্রকাশের কেন্দ্র মাত্র, তাঁহারা ব্রহ্ম সত্বাতিরিক্ত পৃথক্ সত্বা নহেন। শ্রুতি বলিয়াছেন,—

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণ মগ্নি মাহু।
রথো দিব্যঃ সুপর্ণো গরুত্মান।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।
অগ্নি যমং মাতরিশ্বান মাহুঃ॥ (ঋগ্বেদ ১৫৪।৪৬)

একই মতে বিপ্রগণ ইন্দ্রাদি বহুভাবে বর্ণনা করেন।

কেবল দেবতার কথা বলি কেন, হিন্দুর বিশ্বাস, জগতে যে কোন কার্য্য বা যে কোন শক্তির খেলা চলিতেছে, সমস্তই সেই ব্রহ্মেরই শক্তি। তাই হিন্দু, বৃক্ষ, পর্ব্বত, মনুষ্য, পশু সকলকেই পূজা করিয়া থাকেন। ইহা জড়বাদীর জড়

পূজা নহে। জড়োপাধির মধ্য দিয়া যে পরম ব্রহ্মের শক্তির খেলা হইতেছে, ইহা সেই শক্তিমানেবই পূজা।

বট বৃক্ষ যে অনন্ত শক্তির প্রভাবে ক্ষুদ্র বীজ হইতে বৃহৎ মহীরুহে পরিণত হইয়া জীব-জগতের অসীম মঙ্গল সাধন করিতেছে। বট বৃক্ষের পূজা কালে হিন্দু এই শক্তির অধীশ্বর নারায়ণকেই পূজা কবেন। সুতরাং হিন্দুব বৃক্ষাদি জড় বস্তুর পূজা, জড়োপাসনা নহে। হিন্দু জানেন যে, এক অনাদি অনন্ত পবমেশ্বর অগ্নি জলাদি সমস্ত পদার্থে অন্তর্যামীরূপে বিবাজমান আছেন। ইহা কল্পনা নহে, শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত। হিন্দু অগ্নি জলাদিব অন্তর্যামী সেই পবমাত্মাবই উপাসনা করেন। যে কোন দেবতা পূজাব মন্ত্র ও স্তোত্রগুলি কিঞ্চিৎ মনোযোগ সহকারে পাঠ কবিলেই পাঠক তাহা বুঝিতে পাবিবেন।

বোগ প্রতিকাবার্থ ঔষধ খাইবার সময়ও হিন্দু বলে—

ব্রহ্মাত্বমেব বিষ্ণুশ্চ, রুদ্রশ্চ সহ দুর্গয়া।
আর্ত্তস্য ব্যাধিনাশায় প্রত্যক্ষ ভব ভেষজঃ॥

হে ঔষধ, তুমিই শক্তি-সমন্বিত ব্রহ্মা, তুমিই বিষ্ণু এবং তুমিই রুদ্র। বোগীর ব্যাধি নাশার্থ তুমি প্রত্যক্ষ হও, অর্থাৎ জড় ভেষজ পদার্থেব অভ্যন্তর হইতে হে ত্রিমূর্ত্তিধারী ভগবান্! তোমাব বোগনিবাবণী-শক্তি আবিভূর্ত হইয়া আর্ত্তের ব্যাধি নাশ করুক, অজ্ঞানান্ধ জীবেব বিভিন্ন সত্তাব ভিতব দিয়া এই একত্বানুভূতি সহজে হয় না। ক্রমশঃ অবিদ্যাব আববণ মুক্ত হইলে "সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পবমেশ্বরং।" সর্ব্বের মধ্যে সমরূপী ভগবান্ দর্শন এই ভাব জীবের হৃদয়ঙ্গম হয়। তখন জীব আপনাকে আব ভেদাত্মকবিশিষ্ট দেহধাবী রূপে না না বুঝিয়া মন, বুদ্ধি, অহঙ্কাব এমন কি, চিত্তেব অতীত আপনাকে সম্যক্ বুঝিতে পারে। শ্রীশঙ্করাচার্য্য এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন

"মনো বুদ্ধ্যহঙ্কার চিত্তাদিনাহং
নচ শ্রোত্র জিহ্বে নচ ঘ্রান নেত্রে।
নচ ব্যোম ভূমির্ণ তেজো ন বায়ু
শ্চিদানন্দ রূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥"

বৈষ্ণব-সাধক এই ভাবকে ইঙ্গিত কবিয়া বলিতেছেন "যাঁহা যাঁহা নেত্রে পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।"

"মহাভাগবৎ দেখে স্থাবর জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তার শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরণ।
স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তাঁর মূর্ত্তি
সর্ব্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব স্ফুর্ত্তি॥"

"চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা," অষ্টম পরিচ্ছেদ।

যতদিন এই সর্ব্বভূতে ভগবদ্ দর্শন বা সর্ব্বত্র ইষ্টদেব স্ফুর্ত্তি হইবে না, ততদিন আমরা জন্ম-মরণ চক্র হইতে উদ্ধার পাইব না।

তাই উপনিষদ গম্ভীর স্বরে বলিতেছেন—

যত শ্চোদেতি সূর্য্যোঽস্তং যত্র চ গচ্ছতি।
তং দেবাঃ সর্ব্বে অর্পিতা স্তদুনাত্যেতি কশ্চন।

এতদ্বৈতৎ॥

যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।
মনসৈ বেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুঙ্গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥

"কঠোপনিষদ, ৪র্থ বল্লী"।

যাঁহা হইতে সূর্য্য উদিত হন, আর যাঁহাতে অস্ত যান, তাঁহাতে সমস্ত দেবতা স্থিত রহিয়াছেন, তাঁহাকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। ইনিই সেই (ব্রহ্ম) যিনি এখানে, তিনিই সেখানে ; যিনি সেখানে তিনিই এখানে। যে ইঁহাকে নানা রূপে দেখে সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর অধীন হয়), মনদ্বারাই ইনি প্রাপ্তব্য। ইঁহাতে নানা ভাব কিছুই নাই। যে ইহাঁকে নানারূপে দেখে সে পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর অধীন হয়।

সর্ব্বভূতে একত্ব দর্শন করিলে জনন-মরণ শোক দুঃখ আর কিছুই থাকে না। "তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ একত্ব মনুপশ্যতঃ।"

সুতরাং সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শনই প্রকৃত সাধনার লক্ষ্য, কিন্তু যতদিন আমাদের ভেদবুদ্ধি তিরোহিত না হয়, জন্ম জন্মান্তরীন অনেক জন্মসঞ্জাত সংস্কার হইতে উৎপন্ন ভেদরূপ অজ্ঞানতম দূরীভূত হইয়া যতদিন আমাদিগের কর্ম্ম দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি ক্রমে জ্ঞান নিষ্ঠা না হয়, তত দিন সর্ব্বভূতে একত্ব দর্শন সুকঠিন।

অর্জ্জুনের ন্যায় ভগবানের সখা ও ভক্তই সর্ব্বভূতে ব্যাপ্ত ভগবানের সেই অপ্রতিম প্রভাব বিরাট স্বরূপের দর্শন লাভ করিয়াও ভীত হইয়া ভগবানকে কাতর স্বরে বলিয়াছিলেন—হে বিশ্বমূর্ত্তি, তোমার এই ভীষণ রূপের পরিবর্ত্তে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ কর। আমি তোমার কিরীট-সমলঙ্কৃত গদালাঞ্ছিত সেই আমার উপাস্য রূপ দর্শনের অভিলাষী হইয়াছি।

ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী যাহাকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ "পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়" রূপে উল্লেখ করিয়াছেন, সেই আদর্শ নরাবতার ভগবৎ-সখা বিরাট রূপ দর্শনে চিত্ত স্থির রাখিতে পারেন নাই, তখন সর্ব্বদাই ভেদাত্মক ভাবে অবস্থিত জীবের সম্বন্ধে বলিবার আর কি আছে? তাই সাধনার প্রথমাবস্থায় শ্রীভগবানের কোন একটী বিভূতিতে কোন একটী অভিব্যক্ত পদার্থে অবলম্বন করিয়া সেই সকল পদার্থে অনুস্যূত ব্রহ্ম সত্বার উপাসনা করিতে শাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন। ইহাকেই প্রতীক উপাসনা বলে, প্রতীক শব্দের অর্থ অঙ্গ বা অবয়ব, সমস্ত বস্তুই বিরাটরূপী পরম পুরুষের অংশ। "সমস্ত বস্তুই পরমাত্মার শরীর, ইহা অন্তর্যামী ব্রাহ্মণে স্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে যে কোন পদার্থ তাঁহার উপাসনায় অবলম্বন রূপে পরিগৃহীত হইতে পারে।" * এই উদ্দেশ্যেই গীতার দশম অধ্যায়ে ভগবান্ আত্ম-বিভূতির বর্ণনা করিয়াছেন, শ্রীধর স্বামী টীকা মুখে বলিতেছেন—

ইন্দ্রিয় দ্বারতঃ শ্চিতে বাহির্ধাবতি সত্যাপি
ঈশ দৃষ্টি বিধানায় দশমে বিভূতি বব্রবীৎ॥

আমাদের অন্তরের বুদ্ধি-পদ্মে ভগবান্ অবস্থিত রহিয়াছেন, কিন্তু আমাদের চিত্ত তাহাতে আসক্ত না হইয়া ইন্দ্রিয়-দ্বার দিয়া বহির্মুখীন ভাবে ধাবিত হইতেছে, সেই জন্য সর্ব্বত্র ব্রহ্ম-দর্শন অভ্যাস জন্য দশম অধ্যায়ে ভগবান্ বিভূতি উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ এ জগতে যাহা কিছু দেখা যায় অথবা শুনা যায়, অন্তরে ও বাহিরে সমস্ত ব্যাপিয়া সেই এক নারায়ণ দেব অবস্থিত আছেন।

যচ্চ কিঞ্চিৎ জগৎ সর্ব্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তেৎ পিবা।
অন্তর্বহিশ্চতৎ সর্ব্ব ব্যাপ্য নারায়ণ স্থিতঃ॥ নারায়ণ উপনিষৎ।

---

* মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার ফেলোসিপের লেক্‌চার। ২য় বর্ষ, ৫৫ পৃঃ।

সত্রবধাস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরোস্তাৎ, সঃ দক্ষিণতঃ সঃ উত্তরতঃ স এবাদ্য স উশ্চ। যখন সর্ব্বভূত ব্রহ্মময়, তখন কোন একটী ভূতে ব্রহ্ম ভাবনা কবিয়া উপাসনা করা যুক্তিবিহীনও নহে, তাই মহানির্ব্বাণ তন্ত্র বলিতেছেন,—

একমেব পরং ব্রহ্ম জগদাবৃত্য তিষ্ঠতি।
বিশ্বার্চ্চয়া তদর্চ্চা স্যাৎ যতঃ সর্ব্বং তদন্বিতম্॥

শাস্ত্র বলেন ভগবান্ অনন্ত দয়ার সাগর, তিনি ক্ষুদ্র জীবের প্রতি কৃপা করিয়া যেখানে যত ক্ষুদ্র বস্তুতেই তাঁহাকে ধারণা করা যায়, তিনি তাহাতে প্রকটিত হইয়া ভক্তের অভিলাষ পূর্ণ করেন। স্ফটিক-স্তম্ভ বিদারণ করিয়া প্রহ্লাদের প্রার্থনায় তিনি প্রকটিত হইয়াছিলেন। তিলে তৈলের ন্যায়, দধিতে ঘৃতের ন্যায় সকল পদার্থের অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্নভাবে ভগবান্ অবস্থান করিতেছেন ; সাধক ভক্ত ধ্যান ও সাধনার বলে তাঁহাকে সর্ব্ব বস্তুতেই দেখিতে পান এবং তিনি কৃপা করিয়া সাধকগণের তৃপ্তির জন্য নানা রূপ ধারণ করিয়া দেখা দেন। তিনি গুণাতীত জ্যোতিরূপ হইলেও নানা রূপ ধারণ করিয়া থাকেন, তাই হিমালয় মহাদেবের স্তোত্রে বলিতেছেন,—

ত্বং ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তাচ ত্বং বিষ্ণু পরিপালক।
ত্বং শিব শিবদোনন্ত সর্ব্ব সংহারকারক॥
ত্বমীশ্বরো গুণাতীত জ্যোতিরূপ সনাতন।
প্রকৃতঃ প্রকৃতিশ্চ প্রাকৃতঃ প্রকৃতেঃ পরঃ॥
নানা রূপ বিধাতাত্বং ভক্তানাং ধ্যানহেতবে।
যেষু রূপেষু যৎপ্রীতিস্তদ্রূপং বিভর্ষিচ॥

"ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ড"।

হে মহাদেব ! তুমি ব্রহ্মারূপে জগতের সৃষ্টি করিতেছ, বিষ্ণুরূপে পালনকর্ত্তা, শিবরূপে মঙ্গলদায়ক, তুমি অনন্ত স্বরূপ এবং প্রলয় কালে তুমিই সর্ব্বসংহারকারক। তুমি পরমেশ্বর, তুমি ত্রিগুণাতীত, তুমি স্বয়ং জ্যোতি স্বরূপ এবং সনাতন বা নিত্য পদার্থ, তুমি মায়ার অধীশ্বর আবার প্রকৃত পদার্থও তোমার

---

* তিনি অধোতে, তিনি উপরে, তিনি সম্মুখে তিনি দক্ষিণে, তিনি উত্তরে, তিনি বর্ত্তমানে তিনি পরবর্ত্তী কালে অর্থাৎ তিনি সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বকালে।

স্বরূপ। তুমি প্রকৃতি হইতে অতীত বস্তু। তুমি ভক্তগণের ধ্যানের নিমিত্ত নানা প্রকার আকৃতি ধরিয়া থাক—মানবগণ যে যে রূপে প্রীতি প্রাপ্ত হয়, তুমি তাদৃশ রূপই ধারণ করিয়া থাক।

জগত পঞ্চভূতে গঠিত এই পঞ্চ ভূতই যে কোন একটীতে ঐশী-শক্তির ইঙ্গিত দর্শন করিয়া উপাসনা করা হয়। আমরা ভূতে ঈশ্বরত্ব আরোপ সূচক কয়েকটী মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

ক্ষিতি— "সমুদ্রবসনে দেবি পর্ব্বতস্তনমণ্ডিতে।
তং মাতা সর্ব্বলোকানাং পাদস্পর্শ ক্ষমস্বমে।"

হে পৃথিবী দেবী। সমুদ্র তোমার বসন স্বরূপ এবং পর্ব্বত তোমার স্তনস্বরূপ তুমি সর্ব্বলোকের মাতা, আমার পাদস্পর্শ ক্ষমা কর।

মৃত্তিকে হরমে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্।
ত্বয়া হতেন পাপেন জীবানি শরদশতম্ ॥

হে মৃত্তিকে! (অর্থাৎ বসুন্ধরা,) আমি যে দুষ্কার্য্য করিয়াছি তজ্জন্য আমার পাপ তুমি হরণ কর। তোমা কর্ত্তৃক পাপমুক্ত হইয়া আমি যেন শত বর্ষ জীবিত থাকি।

অপ্ বা জল—

আপো হিষ্টা ময়োভুব,—স্তান উর্জ্জেদধাতন।
মহে রণায় চাক্ষসে ॥ (বৈদিক সন্ধ্যা)

হে জল সকল! যে হেতু তোমরা সুখদায়ক হও, সেই হেতু তোমরা আমাদিগকে অন্নে স্থাপিত কর, যেন আমরা মহৎ ও রমণীয় ব্রহ্মকে দেখিতে পারি।

তেজ বা অগ্নি—

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুয়োধ্যস্মজ্জুহুরাণ মেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম ॥
ঈশ।১৮।

হে অগ্নি! আমাদিগকে রয়ি অর্থাৎ অভিষ্ট-সিদ্ধির উপযোগী অন্নের নিমিত্ত সুপথে লইয়া যাও; হে দেব! তুমি সমুদায় কর্ম্ম জ্ঞাত আছ। আমাদিগের মন হইতে কুটিল পাপ দূর কর। তোমাকে বার বার নমস্কার করি।

মরুৎ বা বায়ু—নমস্তে বায়ো।

যদুত্তমে মরুতো মধ্যমে বা, যদ্বাবমে সুভগাসো দিবিষ্ট

অতো নো রুদ্রাঃ। উত বায়ু॥

ময়োভুব যে অমিতা মহিত্বা। (ঋগ্বেদ ৫।৬০।৬)

হে মরুদ্‌গণ! তোমরা স্বর্গের উর্দ্ধ মধ্য ও অধোদেশে অবস্থান কর। তথা হইতে আইস। হে মরুদ্‌গণ! তোমরা কল্যাণকারী এবং মহিমায় তোমরা অপরিমিত।

ব্যোম আকাশস্ত লিঙ্গাৎ।

সুতরাং কোন একটী ভূতে ঈশ্বরত্ব উপলব্ধি করিবার জন্য অথবা কোন পদার্থ দ্বারা গঠিত মূর্ত্তিতে পরমাত্মার উপাসনা করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ বা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। এবং হিন্দু মূর্ত্তিপূজক বলিয়া জড়োপাসক নহে। হিন্দু মূর্ত্তির মধ্যে সেই সর্ব্ব-ব্যাপক অমূর্ত্তকেই ধ্যান করিয়া থাকে।

পাঠক মহাশয়! দীর্ঘ ভূমিকা দেখিয়া ভাবিতেছেন আমরা ধান ভাঙ্গিতে শিবের গীতি আরম্ভ করিয়াছি। লিখিব চিদম্বরম্-তীর্থের ভ্রমণ-কথা কিন্তু তাহা না লিখিয়া অবান্তর কথা লিখিতেছি; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখুন, এ জগতে শিবের গীত ছাড়া আর কি আছে! গীত ব্যক্তিবিশেষের অথবা দেব-বিশেষের গুণ-কাহিনীর বর্ণনা করিয়া থাকে। এই অভিব্যক্ত জগৎ ত তাঁহারই বিভূতি ও ঐশ্বর্য্য। জগতের সকল শোভা সৌন্দর্য্য ও বৈচিত্র্য সেই অনন্তগুণ-ময়েরই মহিমা প্রকাশ করিতেছে। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার বিশেষণ। তাই "ঐতরেয় আরণ্যক ভাষ্যে" শঙ্করাচার্য্য স্পষ্টতর ভাষায় বলিয়াছেন যে "স্থাবর হইতে আরম্ভ করিয়া মনুষ্য পর্য্যন্ত পদার্থে, স্বয়ং পরমাত্মা ক্রমোন্নতভাবে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন এবং সর্ব্বাপেক্ষা মনুষ্যেই তাঁহার জ্ঞানাদির প্রকৃষ্ট অভিব্যক্তি হইয়াছে। তিনি বেদান্ত ভাষ্যেও বলিয়াছেন, স্তম্ভ হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত পদার্থে জ্ঞান এবং ঐশ্বর্য্যের অভিব্যক্তি ক্রমশঃ নিম্ন হইতে উর্দ্ধে ক্রমোন্নত ভাবে হইয়াছে" তথা মনুষ্যাদিষ্বের হিরণ্যগর্ভ পর্য্যন্তেষু জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদ্যভিব্যক্তি-রপি পরেণ পরেণ ভূয়সী ভবতি ইত্যাদি, বেদান্ত ভাষ্য।১।৩।৩০। (ক্রমশঃ)

শ্রীপান্নালাল সিং

মহামায়ার খেলা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অন্ধকার রাত্রি। ঘনঘটাচ্ছন্ন রজনীতে পরিস্ফুট নক্ষত্রালোক ব্যতীত আর কোনরূপ আলোক নাই। বিটপীরাজি দীর্ঘনিশ্বাসচ্ছলে মধ্যে মধ্যে এক এক বার হৃদয়ের হতাশ ভাব জ্ঞাপন করিতেছে। দূরাগত নিশাচরদিগের বিলাপ-সঙ্গীতের অস্পষ্ট-কলরব রহিয়া রহিয়া কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতেছে। অন্ধকার যেন মূর্ত্তিমান হইয়া মুখব্যাদান করতঃ জগৎকে গ্রাস করিতে যাইতেছে। চারিদিকে নৈরাশ্যের ছায়া অনুতাপের স্মৃতি আর আশু বিপদের অনুশোচনা যেন ক্রমে ফুটিয়া উঠিতেছে।

এই গভীর ঘনান্ধতম রজনীতে হেমলতা একাকী অঞ্চল পাতিয়া শুইয়া আছেন। নয়ন-পল্লবে দুই একটী পলক পড়িতেছে, বিষাদ-কালিমায় মুখকমল বিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে, স্মৃতি-সিন্ধু মথিত করিয়া হৃদয়ের হাহাকার এক একবার জাগিয়া উঠিতেছে। এমন সময়ে অদূরে কে যেন অন্ধকারে মিশিয়া গেল। হেমলতা চকিতোত্থিতের ন্যায় "কে" বলিয়া কোন উত্তর না পাইয়া নীরব হইলেন, মনে হইল ভ্রান্তি। তন্দ্রাঘোরে সহসা জাগ্রত হইয়াছি বলিয়া দৃষ্টির বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থাকিবে। ইতিমধ্যেই "জগুদিদি" আসিয়া উপস্থিত হইল। দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া উভয়ে শয়ন করিলেন। দীপশিখা মৃদু মৃদু কম্পিত হইতে হইতে নিবিয়া গেল।

নীরব রজনীতে দ্বারে আঘাত-শব্দ শুনিয়া তাঁহাদের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। ভয়ে চীৎকার করায় প্রতিবেশিবর্গ জাগ্রত হইল, তাহারা হেমলতার গৃহপ্রাঙ্গণে আসিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইল না, কিন্তু সে রাত্রি তাহাদের আর নিদ্রা আসিল না।

পাঠক বোধ হয় বুঝিয়া থাকিবেন ইহা সেই পিশাচ নবকুমারের কার্য্য। বিফল মনোরথ হইয়া পলায়ন করিয়াছে। হেমলতা রাত্রেই স্থির করিল যে, তাহার একাকী এখানে থাকা অপেক্ষা আপনা হইতে শ্বশুরালয়ে গমনই শ্রেয়ঃ। ভাগ্য-

ক্রমে সুযোগও উপস্থিত হইল। তাঁহার শ্বশুর কি যেন কেন তাঁহাকে তথায় যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। পত্রখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়া হেমলতা শ্বশুর ও স্বামীর নাম বাদ দিয়া সাশ্রুনয়নে ঠানদিদিকে শুনাইতে লাগিলেন।

পরম কল্যাণবরেষু—

মা! নির্ম্মলের মৃত্যুর পর হইতে তোমার কুশলাদি সংবাদ পাই নাই। আমরা বৃদ্ধ হইয়াছি, তাহাতে আবার একমাত্র পুত্র জন্মের মত হারাইয়া বুদ্ধির বৈকল্য জন্মিয়াছে সে জন্য এত দিন পর্য্যন্ত তোমার কোন সংবাদ লওয়া হয় নাই। নির্ম্মলের মৃত্যুতে আমাদের আশা, উৎসাহ, আনন্দ, কৌতুহল সব গিয়াছে। বড়ই দুঃখের বিষয়, তোমাদের উভয়কে লইয়া সংসার করিতে পাইলাম না। কি করিব, বিধাতা আমাকে সকল সুখ দিয়াও প্রাণে বড় আঘাত দিয়াছেন। অদৃষ্টের দোষে কৃতপস্তাব ফলে এরূপ ভীষণ শোকাবর্ত্ত সহ্য করিতে হইল।

এমন অমূল্য রত্ন হারাইয়া যে কিরূপ অবস্থায় আছি, তুমি সহজেই তাহা অনুমান করিতে পারিতেছ। যদি স্বহস্তে হৃদ্‌পিণ্ড ছিঁড়িয়া দিলেও নির্ম্মলকে দেখিতে পাই, তাহাও করিতে প্রস্তুত আছি। এতদিন বিষয় লইয়া মত্ত ছিলাম, পুত্রের অভাবে এত কষ্ট পাইতে হয়, অনুমানও করিতে পারিতাম না। সংসারে সুখের আধখানা চিত্র দেখিয়া উন্মত্ত ছিলাম, বাকী আধখানা দেখি নাই; এতদিনে বেশ বুঝিয়াছি যে, জগৎ কেবল উজ্জ্বলমুখ চিত্রের সমাবেশ নহে, উহার অন্তরালে বিষাদ-চিত্রও লুক্কায়িত আছে। অধিক কি লিখিব, আমরা মৃতপ্রায় হইয়াছি। তুমি আমাদের মা, সন্তানের এই দুরবস্থার সময় আসিয়া আমাদিগের কথঞ্চিৎ শান্তি বিধান কর। এতদিন তোমার খবর লই নাই, তজ্জন্য মনে অভিমান করিও না। আগামী বুধবার ত্রয়োদশীতে বেহারা ও ঝি পাঠাইব। তুমি আসিতে অন্যমত করিবে না। সাক্ষাতে সকল শুনিব ও বলিব। পত্রবাহক দ্বারা তোমার কুশল সংবাদ জানাইবে। তুমি আমাদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

হেমলতা মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিল যে আর সাত দিন বাকী আছে, সুতরাং জগুদিদিকে এ কয়দিন একটু সকাল সকাল আসিবার জন্য অনুরোধ করিল। জগুদিদি বলিল—সে কথা কি বলতে হয় মা। আমি আজ ঠিক সন্ধ্যের সময় আস্‌ব। ভয় করিস্ না মা!

বৃদ্ধা চলিয়াগেল। হেমলতাও সকাল সকাল গৃহস্থালী কার্য্যে নিযুক্ত হইল। বৃদ্ধার কিঞ্চিৎ বকা অভ্যাস। পথে বৃদ্ধাকে দেখিয়া নবকুমার ব্যস্ত হইয়া সংবাদ জানিবার জন্য বৃদ্ধার নিকটে একটু অগ্রসর হইয়া বলিল—দিদি। কাল নাকি হেমুদের বাটীতে চোর গিয়াছিল, সত্য নাকি?

বৃদ্ধা।—কি জানি ভাই, কোন্ আবাগীর বেটা চুরি কর্ত্তে গিয়েছিল। এক-বার যদি পেতেম ত ঝাঁটার বাড়ী বিষ ঝেড়ে দিতেম।

নবকুমার। তাও ভাগ্যি তুমি থাক, নইলে কি বিপদ হত! তা হেমুকে শ্বশুরবাড়ী রেখে এস না কেন?

বৃদ্ধা।—শ্বশুর বাড়ীই যাবে। আজ পত্তর এসেছে, এই তেরোদশীর দিন দিন হয়েছে। গেলে আমিও একটু নিশ্চিন্ত হই। আমরা ওদের খেয়েই মানুষ। জাত কৈবর্ত্ত, কিন্তু যার নুন এক দিন খেয়েছি তার কিছুতেই নিমখারামি কর্ত্তে পারিনে। যাই ভাই বেলা হল এখনও চৌকাটে জল দেওয়া হয় নি।

বৃদ্ধা চলিয়া গেল। নবকুমার ভাবিল—এখন উপায়? শ্বশুরবাড়ী গেলে আর কোন হাত থাকিবে না। এ আবার কি হইল? চিঠি লিখিলাম, গোপনে অনুসন্ধানে জানিলাম যে, তাহারা ইহার কোন খোঁজ-খবর লয় না। হঠাৎ লইতে আসিল কেন? যাহাই হোক, যে কোন উপায়ে ঐ দিনের পূর্ব্বে হেম-লতাকে আমার সম্পূর্ণ অধীনে আনিতে হইবে।

অপরাহ্নে সে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া তাহার মাতুলালয়ে চলিল। সে গ্রাম বনগ্রাম হইতে ১২ মাইল। গ্রামখানি ক্ষুদ্র, মোটে ৫০।৬০ ঘর লোকের বাস। অধিকাংশ লোকই গরীব। ইহার মামার অবস্থাই গ্রামের মধ্যে ভাল। নবকুমার তাহার নিকট গমন করিয়া গোপনে পরামর্শ করিতে লাগিল; শেষে ইহার ভ্রাতা বলিল—যে কল্যই আমি বেহারা ও ঝি তোমাকে দিব, তুমি

তাহাদিগকে শিখাইয়া লইয়া যাইও। গ্রামের প্রান্তভাগে আমার একটী বাগান-বাড়ী আছে, সেই থানে তাহাকে আনিয়া রাখো, কোন ভয় নাই।

নবকুমার আশ্বস্ত হইয়া সে রাত্রি তথায় অতিবাহিত করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বেলা প্রায় এক প্রহরের সময় বেহারারা হেমলতার বাটীতে উপস্থিত হইয়া জানাইল যে, ত্রয়োদশীর দিন আমাদের আসিবার কথা ছিল, কিন্তু কর্ত্তার হঠাৎ অসুখ হইয়াছে। তিনি বলিয়া দিলেন যে, কল্যই যেন রওনা হইয়া আসা হয়। আপনি সকাল সকাল প্রস্তুত হন, যত শীঘ্র হয় রওনা হওয়া যাক।

হেমলতা এই সংবাদ শুনিয়া জগুদিদিকে ডাকিতে পাঠাইলেন। অবশেষে পরামর্শমত সেইদিনই রওনা হইলেন। জগুদিদি কাঁদিতে কাঁদিতে অগত্যা বিদায় দিল ও কয়েকদিন পরে তাহাকে দেখিতে যাইবে বলিল। বাহকেরা ক্রমে গ্রাম পার হইয়া মাঠের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিল।

সন্ধ্যার পর বেহারারা পাল্কী নামাইল। হেমলতা পাল্কীর বাহিরে আসিয়া দেখিল চারিদিকে অন্ধকার। নিকটে একটী আলোক জ্বলিতেছে। একজন বাহক বলিল—মা ঠাকরুণ! আজ আর আমরা পারিতেছি না। এই গ্রামে আমাদের জানাশুনা লোক আছে। আজ এইখানে থাকুন।

হেমলতা—সেকি! আমি একাকী এখানে কিরূপে থাকিব। তোমরা চল, আমি বিশেষ পুরস্কার দিব।

বাহক—আজ আর আমরা কিছুতেই পার্ব্ব না, দেখুন কাঁধ ফুলিয়া গিয়াছে। এমন সময়ে একটী লোক তথায় উপস্থিত হইল। হেমলতা তাহাকে দেখিয়া লজ্জায় পাল্কীর ভিতরে প্রবেশ করিল।

লোকটী জিজ্ঞাসা করিল—কি হইয়াছে, তোমরা কোথায় যাইবে? বাহকেরা বলিল "আমরা রামপুর যাইব"।

"আজ আর যাইতে পার্ব্বে না। রাত্তিরে "আলবাস্তায়" যাইতে পারিবে না, এই গ্রামে থাক। এইটী আমার বাগান। ঐখানে একখানি আমার ঘরও আছে, যদি ইচ্ছা হয় ওখানে তোমরা থাকিতে পার। এখানে কোন ভয় নাই"। এই বলিয়া লোকটী চলিতে লাগিল। হেমলতা বাহকদিগের সহিত

পরামর্শ করিয়া সেই বাগানেই থাকা স্থির করিল। লোকটী ঘরের তালা খুলিয়া দিল ও বেহারাদিগকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিল যে, তোমরা এই বাহিরে থাক। আমি লোক দিয়া কিছু জলখাবার পাঠাইয়া দিতেছি। ঐখানে পুষ্করিণী আছে, জলও ভাল।

লোকটীর সদ্ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া অগত্যা সেইখানেই থাকিবার মনস্থ করিলেন। শয়ন করিলেন বটে, কিন্তু অপরিচিত স্থানে একাকী কিছুতেই নিদ্রা আসিল না। রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় দীপ নির্ব্বাপিতপ্রায়, সহসা একটী শব্দ শুনা গেল। হেমলতা শ্বাস বন্ধ করিয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত অনুমান করিলেন যে, ইহা মনুষ্যের পদশব্দ। তখন ত্রাস্তভাবে বাহকদিগকে ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন উত্তর পাইলেন না।

"কে তুমি" বলিয়া হেমলতা দীপ পুনঃপ্রজ্জ্বালিত করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, লোকটী তাঁহাদের গ্রামের "নবকুমার"।

তখন হেমলতার মনে এক অদ্ভুতভাব উদিত হইল, বিস্ময় ও ভীতি যুগপৎ তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। তিনি কি করিবেন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। মনের ভাব সংবরণ করিয়া বলিলেন—"নবদাদা, তুমি এখানে" ?

নবকুমার। আমিই তোমাকে এখানে আনিয়াছি।

হেমলতা বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন—"তুমি আমাকে আনিয়াছ কেন" ?

নবকুমার। "কেন আনিয়াছি তাহাকি এখনও বুঝিতে পারিতেছনা ?"

হেমলতা। "দেখ নবদাদা! আমি তোমার ভগ্নি, তুমি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তোমাকে করযোড়ে মিনতি করিয়া বলিতেছি,—আমায় বাড়ী পাঠাইয়া দাও।

নব। "আমি তোমায় ছাড়িয়া দিব না, তুমি আমায় ভ্রাতা সম্বোধন করিও না। তুমি আমার হৃদয়ের রাণী।"

হেম। ছি। নবদাদা! ওসবকথা মুখে আনিওনা।

নব। "দেখ হেমলতা! মনে পড়ে কি তোমার সহিত আমার বিবাহের কথা হইয়াছিল।"

হেম। "পড়ে, কিন্তু এখন আমি একজনের পরিণীতা পত্নী।"

নব। ওসব কথা ভুলিয়া যাও। আমায় তুমি বিবাহ কর, বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত।"

হেম। "ওসব কথা কাণে শুনিলেও পাপ। তোমার পায়ে ধরি আমায় বাড়ী পাঠাইয়া দাও।"

নবকুমার। "হেমলতা! আমি স্পষ্ট কথা বলি, আমি আজ উন্মত্ত; তুমি ভিন্ন আমার এ উন্মত্ততা দূর হইবে না। তোমার সুকুমার কণ্ঠে বরমাল্য দিব বলিয়া আজ তোমায় এখানে আনিয়াছি, দেখ কত বিপদের বোঝা মাথায় লইয়াছি। তুমি একবার আমার হৃদয়ের দিকে চাহিয়া দেখ, আমার এ হৃদয় শূন্য! একবার প্রীতির কটাক্ষে চাও, জীবন ধন্য হউক!

এতক্ষণ হেমলতা নিবাত-নিষ্কম্প অবস্থায় দণ্ডায়মানা ছিলেন। নবকুমারের একটী কথাও কর্ণে প্রবেশ করে নাই। সহসা "শুনিতে পাইলেন নবকুমার বলিতেছেন

"প্রীতির কটাক্ষে চাও"

তখন হেমলতা সাহসে বুক বাঁধিয়া গম্ভীরভাবে বলিয়া উঠিলেন—"নবকুমার! তুমি পিশাচ, তোমার সঙ্গে বি—বা—হ তোমায় পদাঘাত করিতেও ঘৃণা বোধ করি।"

নবকুমার। "পদাঘাত করিবে কর, তোমার পদাঘাত অঙ্গের ভূষণ করিব, চিরকাল তোমার পদারবিন্দ আরাধনা করিব। সুন্দরি! তোমায় দেখিতে দেখিতে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছি। তোমার চরণে একবার স্থান দাও।"

হেম। তবে রে পশু! "তোর মৃত্যু সন্নিকট। সতীর সম্মান মা দুর্গতিহারিণী রক্ষা করেন। এখনও বলিতেছি সাবধান হও" এই বলিয়া হেমলতা মনে মনে আকুল প্রাণে মা জগদম্বার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—মনে মনে বলিতে লাগিলেন—"মা দৈত্যদলনি। দৈত্যের আক্রমণ হইতে রক্ষা কর। মা কৃপাময়ি। এ বিপদে তুমিই ভরসা।"

নবকুমার আবার বলিতে লাগিল—"ললনে তোমার এত রূপরাশি দেখিতেছি হৃদয় এত কঠোর কেন? রূপের অন্তরালে সৌন্দর্য্যের পশ্চাতে এমন কঠিন শিলা, এমন কর্কশ কঙ্কাল কেন? সুন্দর আমায় চরণে স্থান দাও।

সহসা অপবিস্ফুট লাবণ্যময়ী কে যেন আগুল্‌ফবিলম্বিত বিশাল কেশকলাপ পৃষ্ঠদেশে দোলাইয়া শ্বেত বসনাঞ্চলে পীন পয়োধর আবৃত করিয়া রণরঙ্গিণীবেশে শাণিত ছুরিকাহস্তে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিয়া উঠিল "তবে এই দেখ"। সেই শব্দ-তরঙ্গাঘাতে বিশাল গগন যেন চমকিত হইয়া উঠিল গ্রহ-চন্দ্র-তারকা যেন

স্তব্ধ হইয়া রহিল, সমীরণ চকিত হইয়া শ্বাস-প্রশ্বাস নিবদ্ধ করিল, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন স্তম্ভিত হইল। নবকুমার ভাবিল—যে চণ্ডী যেন সত্যসত্যই যোদ্ধৃবেশে তাহাকে নিহত করিতে অবতীর্ণা। ভয়ে ও বিস্ময়ে নবকুমার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। হেমলতা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। নবকুমারের মূর্চ্ছাভঙ্গ হইলে দেখিল যে, সেই ব্রীড়ানম্রময়ী সুধাময়ী সেথানে নাই। প্রেমমন্দার কুসুমহার গাঁথিয়া যাহার কণ্ঠে দিবে বলিয়া আশা করিয়াছিল প্রণয়রশ্মি রাগ যাহার অঙ্গে মাখাইয়া প্রাণ ভরিয়া দেখিবে ভাবিয়াছিল, ব্রহ্মাণ্ডের সুধাসার ভাবিয়া যাহার চরণ-সরোজে আশ্রয় লইবে সংকল্প ছিল, সেই রূপসী যাদুমন্ত্রে তাহাকে মুগ্ধ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। এত যত্ন, এত পরিশ্রম, এত চেষ্টা সব ব্যর্থ হইয়াছে।

তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নবকুমার সেই রাত্রে একে একে অনেক স্থান অনুসন্ধান করিল, কোথাও তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না। সেই গভীর রাত্রে অস্ফুট নক্ষত্রালোকে নবকুমার বনে বনে নির্ভয়ে আত্মহারা হইয়া খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল।

রাত্রি প্রভাত হইতে চলিল। প্রভাতী তারা উঠিয়াছে। কাক, কোকিল প্রভৃতি বিহঙ্গমকুলের কলরবে গৃহস্থের নিদ্রা ভঙ্গ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অদূরে মন্দির মধ্য হইতে মঙ্গল আরতির শঙ্খধ্বনি শোনা গেল।

নবকুমারের তখনও সংজ্ঞা নাই, কি যেন খুঁজিতেছে। কেবল ভাবিতেছে, কিরূপে হেমলতাকে খুঁজিয়া পাই।   (ক্রমশঃ)

জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা।

রথযাত্রা মহোৎসব উৎকল খণ্ডের (স্কন্দপুরাণ) বিধানানুসারে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সেই পুরাণানুসারেই—

আষাঢ়স্য সিতে পক্ষে দ্বিতীয়া পুষ্যসংযুতা।
অরুণোদয়বেলায়াং তস্যাং দেবং প্রপূজয়েৎ॥

এ উৎসব একটী বিরাট্ ব্যাপার। ইহার গাম্ভীর্য্য ও বিরাট্ত্ব চক্ষে দর্শন না করিলে বুঝা যায় না। সেই দিন অসংখ্য জন-সমাবেশের ভিতর দিয়া যখন দীনার্ত্ত

পরিত্রাণ-সমুদ্ভূত শ্রীজগন্নাথ, সংকর্ষণ-মূর্ত্তি শ্রীবলদেব ও নিখিলকলুষনাশিনী কল্পলতিকা শ্রীসুভদ্রা দেবী রথারূঢ় হইয়া প্রশস্ত রাজপথ অতিক্রম করিয়া গুণ্ডিচামণ্ডপে গমন করেন সে দৃশ্য অতীব অপূর্ব্ব। সেই চিত্র বিচিত্রিত বহুসংখ্যক পতাকা ও বৈজয়ন্তীর শোভা এবং জনসংঘ হইতে অবিরত পুষ্পবৃষ্টি দর্শন করিলে হৃদয়ে ভক্তির উৎস আপনি যেন প্রবাহিত হইতে থাকে। দিঙ্‌মণ্ডল তখন কৃষ্ণাগুরু গন্ধে আমোদিত হয়, মৃদঙ্গ পণব ভেরী ঢক্কা প্রভৃতি বাদ্য ধ্বনি জগন্নাথের জয়োল্লাসের সহিত মিশ্রিত হইয়া আকাশ পথকে প্রতিধ্বনিত করে। ধনী দরিদ্র ব্রাহ্মণ শূদ্র উচ্চ নীচ সকলই তখন সেই মহাক্ষেত্রে একত্রে, জাতি ও বর্ণাশ্রম ভুলিয়া রথস্থ জগন্নাথকে দর্শন করেন। দ্বিজগণ শাকুন সূক্ত পাঠ করেন, কেহবা উচ্চৈঃস্বরে জয় জয় ধ্বনি, কেহবা সানন্দে ভগবানের পবিত্র নামোচ্চারণ ও স্তোত্রাদি পাঠকরিয়া তাঁহারই মহিমা প্রকাশ করেন। সেই চন্দ্রাতপ-শোভিত মাল্য চামর-বিরাজিত সুগন্ধ দ্রব্য সম্ভূত গন্ধে আমোদিত রথমধ্যে জগন্নাথ দেবকে লক্ষ্য করিয়াই প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছিলেন—

রথারূঢ়ো গচ্ছন্ পথিমিলিত ভূদেবপটলৈঃ
স্তুতং প্রাদুর্ভাবং প্রতিপদমুপাকর্ণ্য সদয়ঃ
দয়াসিন্ধুর্বন্ধু সকলজগতাং সিন্ধুসুদনো
জগন্নাথস্বামী নয়ন-পথগামী ভবতু মে॥

এই মূর্ত্তি সন্দর্শনার্থ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে অসংখ্য যাত্রী সমাবেশ হইয়া থাকে। এখনত যাতায়াতের সুবিধাই হইয়াছে, কিন্তু যখন রেলপথ বিস্তৃত হয় নাই সেই প্রাচীন কালে অসংখ্য হিংস্রজন্তু সমাকুল অরণ্যরাজি খরস্রোতা সেতুবিহীন বিশাল নদনদীকূল অতিক্রম করত কতলোক সংসারের মমতা বন্ধন ছিন্ন করিয়া পুত্র প্রিয়জন পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া কোন অজ্ঞাত পুণ্যময় আকর্ষণে এইখানে আগমন করিত।

পৌরাণিক তত্ত্ব আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক এই গুহ্য স্থান প্রকটিত হয়। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন পরম ভাগবত ছিলেন। পুরাণকার বলেন—

ইন্দ্রদ্যুম্ন মহানৃপঃ।
সূর্য্যবংশে সমুৎপন্নে স্রষ্টুঃ পঞ্চম পুরুষঃ॥

সত্যবাদী সদাচারো বদান্যঃ সাত্ত্বিকাগ্রণীঃ।
অধ্যাত্মবিজ্ঞ জ্ঞানশৌণ্ডঃ শূরসংগ্রামবর্দ্ধনঃ ॥

*　　　*　　　*

ইন্দ্রদ্যুম্ন পরম শ্রীমান্ মুমুক্ষু ধর্ম্মতৎপরঃ।

এই সত্যনিষ্ঠ মুমুক্ষু তত্ত্বদর্শী নৃপতি অজ্ঞানান্ধ জীবের নিকট দুরূহ ব্রহ্মতত্ত্ব এই তীর্থের ভিতর দিয়া প্রকট করিয়াছেন। তিনি দেখিয়াছিলেন যে, ভেদভাবের বিনাশ না হইলে সেই অখণ্ড চিদেকরস আনন্দঘন চৈতন্য বস্তু হৃদয়ে পরিস্ফুট হইবে না। জীবকুল ভেদাত্মক আমিত্বেই প্রতিষ্ঠিত, এই ভাবে অবস্থিত হইয়া সার্ব্বজনীন একত্ব বোধগম্য হইবে না, তাই তিনি এই মহাক্ষেত্রের অনুষ্ঠান ও আচার-পদ্ধতির ভিতর দিয়া একত্বমূলক সাধ্যসাধন-তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

স্কন্দ পুরাণ ব্যতীত, নারদপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, কূর্ম্মপুরাণ ও ভবিষ্যপুরাণেও এই মহাক্ষেত্রের উল্লেখ আছে। অনেকে এ সকল পুরাণের বাক্যে আস্থা স্থাপন করিতে চাহেন না। কেহ বা প্রক্ষিপ্তের ধূয়া ধরিয়া উড়াইতেও চাহেন। স্বনামখ্যাত একজন অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি জগন্নাথকে অনার্য্যের দেবতা বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। দিন দিন কতই আবিষ্কার হইবে আর হিন্দুগণ আপনাদের শাস্ত্র-চর্চ্চা ছাড়িয়া দিয়া ঐ সকল ভ্রান্ত মতের অনুসরণ করিবেন। আমাদের ইহা অপেক্ষা আর কি লজ্জার বিষয় হইতে পারে?

মহাভারতকে যাঁহারা প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করেন তাঁহারা দেখিবেন যে, বনপর্ব্বে পাণ্ডবদিগের এই ক্ষেত্রে গমন ও ব্রহ্মের উপাসনার উল্লেখ আছে। আর একটী কথা এই খানেই বলা ভাল। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন এই বচনটী উদ্ধৃত করিয়াছেন—

আদৌ যদ্দারু প্লবতে সিন্ধোঃ পারে অপুরুষং।
তদা লভস্ব দুর্দ্দনো তেন যাহিপরং স্থলং ॥

এই মন্ত্রটী সাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণের। উহার ভাষ্যে দেখা যায় "আদৌ বিপ্রকৃষ্টদেশে বর্ত্তমানং যৎ দারুময় পুরুষোত্তমাখ্য দেবতাশরীরং প্লবতে জলস্যোপরি বর্ত্ততে অপুরুষ নির্ম্মাতৃরহিতত্বেন অপুরুষং ত্বং আলভস্ব

...　　...　　... পরং স্থলং বৈষ্ণবং লোকং গচ্ছেত্যর্থঃ॥

পরিত্রাণ-সমুদ্ভূত শ্রীজগন্নাথ, সংকর্ষণ-মূর্ত্তি শ্রীবলদেব ও নিখিলকলুষনাশিনী কল্পলতিকা শ্রীসুভদ্রা দেবী রথারূঢ় হইয়া প্রশস্ত রাজপথ অতিক্রম করিয়া গুণ্ডিচামণ্ডপে গমন করেন সে দৃশ্য অতীব অপূর্ব্ব। সেই চিত্র বিচিত্রিত বহুসংখ্যক পতাকা ও বৈজয়ন্তীর শোভা এবং জনসংঘ হইতে অবিরত পুষ্পবৃষ্টি দর্শন করিলে হৃদয়ে ভক্তির উৎস আপনি যেন প্রবাহিত হইতে থাকে। দিঙ্‌মণ্ডল তখন কৃষ্ণাগুরু গন্ধে আমোদিত হয়, মৃদঙ্গ পণব ভেরী ঢক্কা প্রভৃতি বাদ্য ধ্বনি জগন্নাথের জয়োল্লাসের সহিত মিশ্রিত হইয়া আকাশ পথকে প্রতিধ্বনিত করে। ধনী দরিদ্র ব্রাহ্মণ শূদ্র উচ্চ নীচ সকলই তখন সেই মহাক্ষেত্রে একত্রে, জাতি ও বর্ণাশ্রম ভুলিয়া রথস্থ জগন্নাথকে দর্শন করেন। দ্বিজগণ শাকুন সূক্ত পাঠ করেন, কেহবা উচ্চৈঃস্বরে জয় জয় ধ্বনি, কেহবা সানন্দে ভগবানের পবিত্র নামোচ্চারণ ও স্তোত্রাদি পাঠকরিয়া তাঁহারই মহিমা প্রকাশ করেন। সেই চন্দ্রাতপ-শোভিত মাল্য চামর-বিরাজিত সুগন্ধ দ্রব্য সম্ভূত গন্ধে আমোদিত রথমধ্যে জগন্নাথ দেবকে লক্ষ্য করিয়াই প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছিলেন—

রথারূঢো গচ্ছন্ পথিমিলিত ভূদেবপটলৈঃ
স্তুতং প্রাদুর্ভাবং প্রতিপদমুপাকর্ণ্য সদয়ঃ
দয়াসিন্ধুর্বন্ধু সকলজগতাং সিন্ধুসুদনো
জগন্নাথস্বামী নয়ন-পথগামী ভবতু মে ॥

এই মূর্ত্তি সন্দর্শনার্থ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে অসংখ্য যাত্রী সমাবেশ হইয়া থাকে। এখনত যাতায়াতের সুবিধাই হইয়াছে, কিন্তু যখন রেলপথ বিস্তৃত হয় নাই সেই প্রাচীন কালে অসংখ্য হিংস্রজন্তু সমাকুল অরণ্যরাজি খরস্রোতা সেতুবিহীন বিশাল নদনদীকূল অতিক্রম করত কতলোক সংসারের মমতা বন্ধন ছিন্ন করিয়া পুত্র প্রিয়জন পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া কোন অজ্ঞাত পুণ্যময় আকর্ষণে এইখানে আগমন করিত।

পৌরাণিক তত্ত্ব আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক এই গুহ্য স্থান প্রকটিত হয়। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন পরম ভাগবত ছিলেন। পুরাণকার বলেন—

ইন্দ্রদ্যুম্ন মহানৃপঃ।
সূর্য্যবংশে সমুৎপন্নে স্রষ্টুঃ পঞ্চম পুরুষঃ॥

সত্যবাদী সদাচারো বদাতঃ সাত্ত্বিকাগ্রণীঃ।
অধ্যাত্মবিজ্ঞ জ্ঞানশৌণ্ডঃ শূরসংগ্রামবর্দ্ধনঃ॥

*　　　　*　　　　*

ইন্দ্রাজ পরম শ্রীমান্ মুমুক্ষু ধর্ম্মতৎপরঃ।

এই সত্যনিষ্ঠ মুমুক্ষু তত্ত্বদর্শী নৃপতি অজ্ঞানান্ধ জীবের নিকট দুরূহ ব্রহ্মতত্ত্ব এই তীর্থের ভিতর দিয়া প্রকট করিয়াছেন। তিনি দেখিয়াছিলেন যে, ভেদভাবের বিনাশ না হইলে সেই অখণ্ড চিদেকরস আনন্দঘন চৈতন্য বস্তু হৃদয়ে পরিস্ফুট হইবে না। জীবকুল ভেদাত্মক আমিত্বেই প্রতিষ্ঠিত, এই ভাবে অবস্থিত হইয়া সার্ব্বজনীন একত্ব বোধগম্য হইবে না, তাই তিনি এই মহাক্ষেত্রের অনুষ্ঠান ও আচার-পদ্ধতির ভিতর দিয়া একত্বমূলক সাধ্যসাধন-তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

স্কন্দ পুরাণ ব্যতীত, নারদপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, কূর্ম্মপুরাণ ও ভবিষ্যপুরাণেও এই মহাক্ষেত্রের উল্লেখ আছে। অনেকে এ সকল পুরাণের বাক্যে আস্থা স্থাপন করিতে চাহেন না। কেহ বা প্রক্ষিপ্তের ধুয়া ধরিয়া উড়াইতেও চাহেন। স্বনামখ্যাত একজন অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি জগন্নাথকে অনার্য্যের দেবতা বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। দিন দিন কতই আবিষ্কার হইবে আর হিন্দুগণ আপনাদের শাস্ত্র-চর্চ্চা ছাড়িয়া দিয়া ঐ সকল ভ্রান্ত মতের অনুসরণ করিবেন। আমাদের ইহা অপেক্ষা আর কি লজ্জার বিষয় হইতে পারে?

মহাভারতকে যাঁহারা প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করেন তাঁহারা দেখিবেন যে, বনপর্ব্বে পাণ্ডবদিগের এই ক্ষেত্রে গমন ও ব্রহ্মের উপাসনার উল্লেখ আছে। আর একটী কথা এই খানেই বলা ভাল। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন এই বচনটী উদ্ধৃত করিয়াছেন—

আদৌ যদ্দারু প্লবতে সিন্ধোঃ পারে অপুরুষং।
তদা লভস্ব দুর্দ্দনো তেন যাহি পরং স্থলং॥

এই মন্ত্রটী সাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণের। উহার ভাষ্যে দেখা যায় "আদৌ বিপ্র-কৃষ্টদেশে বর্ত্তমানং যৎ দারুময় পুরুষোত্তমাখ্য দেবতাশরীরং প্লবতে জলস্যোপরি বর্ত্ততে অপুরুষ নির্ম্মাতৃরহিতত্বেন অপুরুষং ত্বং আলভস্ব

...　　...　　... পরং স্থলং বৈষ্ণবং লোকং গাদৃত্যর্থঃ॥"

আমাদের "সর্ব্বত্র সমদর্শন" ভাব হৃদয়ে নাই, তাই আমাদের ন্যায় জীবের প্রতিমা বা তীর্থাদি ভ্রমণের আবশ্যকতা আছে। ভাগবতেও দেখা যায়—

অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েত্তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ।
যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেম্ববস্থিতং ॥ ৩। ২৯। ২০।

তন্ত্রেও—

তাবত্তপো ব্রতং তীর্থং জপহোমার্চ্চনাদিকং।
বেদশাস্ত্রাগমকথা যাবত্তত্ত্বং ন বিন্দতি ॥

হিন্দু এই তীর্থের ভিতর দিয়া যে কিরূপ উদার ও মহান্ ভাব শিক্ষা করে, তাহা শাস্ত্রের পদে পদে দেখা যায়। জগন্নাথ দেবের প্রণাম কালে হিন্দু বলিলেন—

যস্মাৎ সর্ব্বমিদং প্রপঞ্চরচিতং মায়াজ্যাৎ জায়তে
যস্মিংস্তিষ্ঠতি যাতি চান্ত সময়ে কল্পানুকল্প পুনঃ।
যং ধ্যাত্বা মুনয়ঃ প্রপঞ্চরহিতং বিন্দতি মোক্ষং ধ্রুবং
তং বন্দে পুরুষোত্তমাখ্য মমলং নিত্যং বিভুং নিশ্চলং ॥

এই পুরুষোত্তম দর্শন করিলে কি আর ভেদ থাকে, না বর্ণাশ্রমের আভিজাত্য প্রাণে জাগিতে পারে? এখন ত্রিগুণের অতীতাবস্থা। শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধ এখানে দাঁড়াইতে পারে না, তাই ব্রাহ্মণ চণ্ডালে একত্রে ভোজনেও দ্বিধা নাই, সঙ্কোচ নাই, উদ্বিগ্নতা নাই।

অন্যান্য উৎসব অপেক্ষা রথযাত্রায় এরূপ জনাধিক্য হওয়ার কারণ, সাধারণের দৃঢ় বিশ্বাস—

রথে তু বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।

এই বিশ্বাসে কত লোক জগৎ ভুলিয়া জগন্নাথ দর্শনে আপনাকে ধন্য মনে করিতেছে। কত লোক ইহা দর্শনে জীবনে কর্ম্মের গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিতেছে।

উপরোক্ত বাক্যটীর প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, বামন শব্দে ভগবানকে ইঙ্গিত করিতেছে। কঠোপনিষদে দেখা যায়—

মধ্যে বামনমাসীনাং বিশ্বে দেবা উপাসতে। ২। ৮৯।

সেই বামনকে কিনা ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর প্রেরক আত্মাকে ইন্দ্রিয়গণ উপাসনা করেন। ভাগবতেও বামনরূপে ত্রিলোক অতিক্রমন। ব্রহ্মপুরাণেও—

এতজ্জগত্রয়ং ক্রান্তং বামনেনেহ দৃশ্যতে।

সুতরাং বামন শব্দে পরমাত্মারই আভাষ পাওয়া যায়। রথ শব্দেও দেহকে বুঝায়। কঠোপনিষদে—

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু।

ভাগবতেও—

আহু শরীরং রথমিন্দ্রিয়াণি। ৭। ১৫। ৪১।

প্রাকৃতবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ এই রথকে আত্মা মনে করে, কেহবা ইন্দ্রিয়, বা মন, বা বুদ্ধিকেই আত্মা জ্ঞানে কার্য্য করে। প্রকৃত জীব বা প্রত্যগাত্মাকে বুঝিতে পারে না। কিন্তু যে এই দেহ-রথে আসীন আত্মাকে দর্শন করেন, দেহ মন, বুদ্ধি, এমন কি, অংকারের অতীত আত্মাকে অনুভব করেন, তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হইবে কেন? তিনি ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করেন। শ্রুতি বলেন—

স যোহবৈতৎ পরমং ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।

যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্মস্বরূপে পরিণত হন।

এই গভীর তত্ত্বোপদেশ প্রদানার্থই ঋষিগণ এই উৎসবের প্রচলন করিয়াছেন।

এবার শ্রীজগন্নাথদেবের নব কলেবর। ইহা ৩৬ বৎসর পর সাধিত হইতেছে। নব কলেবর অনুষ্ঠানের ভিতরও একটী গুহ্যতত্ত্ব উপদিষ্ট।

নব কলেবর অর্থাৎ নূতন দেহ ধারণ। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ একবাক্যে ঘোষণা করেন যে, আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, দেহ পরিবর্ত্তন মাত্র। গীতায় স্পষ্টতই দেখা যায়—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোহ পরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

এই তত্ত্বটী শিক্ষা দিবার জন্যই এই অনুষ্ঠান। জগন্নাথের বাহিরের রূপের

অন্তর্নিহিত আত্মাস্থানীয় একটী নাকি কি পদার্থ আছে, যাহা পুরাতন কলেবর হইতে নূতন দেহে নীত হয়। কেহ কেহ বলেন, সেটী কৃষ্ণের অস্থি, কাহারও মতে উহা বুদ্ধের পঞ্জরাস্থি। বস্তুতঃ সেটী কি, সে আলোচনায় আমাদের প্রয়োজন নাই।

আমরা শ্রীমৎচৈতন্যদেবের অনুসরণ করিয়া জগন্নাথদেবকে চিন্তা করি। তিনি জীবনের শেষ অষ্টাদশবৎসর এই নীলাচলে অবস্থান করিয়া সেই প্রতিমূর্ত্তির নিকটে দাঁড়াইয়া সতৃষ্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করিতেন। ঐ মূর্ত্তির ভিতর সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দনকে দেখিতে পাইতেন।—

"জগন্নাথ দেখে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।" চৈতন্য-চরিতামৃত শাস্ত্র যেরূপ বর্ণ সংযোজনায় অপ্রকট ভগবৎ-তত্ত্ব প্রকাশ করে, মহাত্মগণও তদ্রূপ তীর্থ ও অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া ভগবৎ-তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। চিত্র যেমন কতকগুলি রেখা ও বর্ণের সমাবেশ হইলেও, চিত্রকর উহার ভিতর দিয়া তাহার হৃদয়স্থ ভাবকে প্রকট করেন, দর্শকের চিত্তের গতি যদি সেই চিত্রের প্রতি থাকে তবে তাহার মনে চিত্রকরের ভাবটী আপনি ফুটিয়া উঠিবে। তাই জীবের হৃদয়ের প্রবণতা ভগবদ্দিকে প্রধাবিত হইলে তীর্থের ভিতরেও ভগবদ্ভাব আপনি প্রকাশিত হইবে। তাই চৈতন্যদেব ঐরূপভাবে শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিতেন। তুমি, আমি কাষ্ঠ-পুত্তলিকা দেখি, তিনি দেখিলেন যে, ইনি সেই কালিন্দী-তট-বিহারী ব্রহ্মাদিদেব-পূজিত গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ। তুমি আমি দেখি সুসজ্জিত জড়মূর্ত্তি, তিনি দেখিলেন কোমলহস্তে সুরতবর্দ্ধন শোকনাশন বেণু, শিরে শিখিপুচ্ছ, পরিধানে পীতবস্ত্র, জীবের আশ্রয়স্থান, বৃন্দাবনের লীলা-কারী কান্ত মূর্ত্তি; তাই তিনি তদুদ্দেশে জীবকুলের শিক্ষার নিমিত্ত বলিলেন—

নবৈ যাচে রাজ্যং নচ কনকমাণিক্যবিভবং
ন যাচেহং রম্যাং সকল জনকাম্যাং বরবধূং।
সদাকালে কামঃ প্রথমপঠিতেন গীতচরিতো
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥

হরত্বং সংসারং দ্রুততরমসারং সুরপতে
হরত্বং যোগীশং সততমপরং নীরজপতে।
অহো দীননাথ নিহিতমচলং নিশ্চিতপদং
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥

আমরাই তাঁহার সহিত বলি আর প্রার্থনা করি, যেন এই ক্ষেত্রের পুণ্যরেণুকা স্পর্শে হৃদয়ের মলিনতা দূর হয়, তীর্থের মহাভাব সমতারূপ জগন্নাথের আরাধনায় সর্ব্বদা লিপ্ত থাকি, যেন কাম ক্রোধাদির তীব্র কষাঘাত, লোভ মোহাদির অসহ্য তাড়না যেন হৃদয়কে আশ্রয় করিতে না পাবে। ওঁ

"সেবক"

শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ সকলেই একবাক্যে নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ ভাবের উল্লেখ করিয়াছেন—সুতরাং পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণ প্রকট হওয়া অসম্ভব নহে। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণভাবে প্রকটিত হইলেও ভাগবতে কোন কোন স্থলে অংশরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। নারদ যখন দ্বারাবতীতে সহস্র সহস্র মহিষীর পার্শ্বে শ্রীকৃষ্ণকেই দর্শন করিয়াছিলেন, সেই সময় নরসখনারায়ণ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

নারায়ণো নরসখো বিধিনোদিতেন। ১০।৬৯।১৬

আর একস্থলে অর্জ্জুন দ্বারকায় এক ব্রাহ্মণের মৃত পুত্র আনয়ন করিয়া দিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। কিন্তু সমর্থ না হইয়া আত্মহত্যা করিতে কৃতনিশ্চয় হন। শ্রীকৃষ্ণ সান্ত্বনা দিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া অনন্তশায়ী পুরুষোত্তমের নিকট লইয়া গেলে তিনি ইঁহাদিগকে "কলাবতী" বলিয়াছিলেন।

অন্যত্র উক্ত আছে—

তাবিমৌ বৈ ভগবতো হরেরংশাবিহাগতৌ।
ভারব্যায়ায় চ ভুবঃ কৃষ্ণযদুকুলোদ্বহৌ॥ ৪।২

শ্রীধর স্বামী টীকায় তন্ত্র হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন "অর্জ্জুনে তু নরাবেশঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।" ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ বৃন্দাবনবিহারী নন্দনন্দন চতুর্ব্বাহু পুরুষোত্তম এবং শ্বেতদ্বীপেশ নরনারায়ণের একত্ব দেখাইয়াছেন—

যো বৈকুণ্ঠে চতুর্ব্বাহু র্ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।
যএব শ্বেতদ্বীপেশেনবনারায়ণশ্চ যঃ।
সএব বৃন্দাবনভূবিহারী নন্দনন্দনঃ॥

এই শ্লোকেও অংশীর সহিত অংশের একত্ব বলা হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সর্ব্বজ্ঞত্বে এবং সর্ব্বেশ্বরতায় কোন ভেদ নাই, কেবল শক্তির অভিব্যক্তির তারতম্য। শ্রীকৃষ্ণের ভূভার-হরণাদি-কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহাকে অংশরূপে উল্লেখ করায় কোন দোষ হয় না। শ্রীকৃষ্ণে সকল অবতারের সকল শক্তি বিদ্যমান। তিনি মহাসমুদ্র অনন্ত ঊর্ম্মিমালা বিভিন্নভাবে প্রকাশিত থাকিলেও সমুদ্রাতিরিক্ত সত্ত্বা নাই।

অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি।
কেহো কোন মতে কহে যেমন যার মতি॥
কৃষ্ণকে কহয়ে কেহ নরনারায়ণ।
কেহ হয় কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ বামন॥
কেহ কহে কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী অবতার।
অসম্ভব নহে—সত্য বচন সবার॥

তাঁহাকে যে যে ভাবে দেখিয়াছে বা চিন্তা করিয়াছে, তিনি সেই রূপেই তাঁহার নিকট প্রকটিত হইয়াছেন। তাঁহারই বাণী—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং॥

কপিলদেব মাতাকে যে তত্ত্ব উপদেশ করেন, তাহাতে কথিত আছে যে, রূপ-রসাদি বহু গুণের আশ্রয় ক্ষীরাদি চক্ষুদ্বারা শুক্ল এবং জিহ্বা দ্বারা মধুর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ইন্দ্রিয়দ্বারা গৃহীত হয়, তদ্রূপ এক ভগবান্ মার্গভেদে বিভিন্নরূপ প্রতীত হন। তাই শ্রীকৃষ্ণ যে যে রূপে দেখিয়াছে সেই সেইরূপই মনে করিয়াছে—

যথেন্দ্রিয়ৈঃ পৃথক্ দ্বারৈরর্থো বহুগুণাশ্রয়ঃ।
একো নানেয়তে তদ্বদ্ভগবান্ শাস্ত্রবর্ত্মভিঃ॥ ৩। ৩২। ৩৩

সুতরাং তিনি যেরূপ ভাবেই কথিত হউন না কেন, তিনিই জীবের আশ্রয়,

তিনিই— প্রভবং প্রলয়স্থানং নিধানং বীজং অব্যং
তিনিই— গতির্ভর্ত্তা প্রভুসাক্ষী নিবাস শরণং সুহৃৎ।

তিনি যিনিই হউন, সর্ব্বস্বজ্ঞানে প্রণাম করি—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥

বৃন্দাবন লীলায় শ্রীকৃষ্ণ প্রেমময়, স্নেহময় এবং পূর্ণ মাধুর্য্যময়। দ্বারকা লীলায় সর্ব্ব শক্তির পূর্ণ প্রকটাবস্থা, মথুরা লীলায় ঐশ্বর্য্যে মাধুর্য্যে মেশামিশি। তাই তিনি পূর্ণ। তাই তিনি ভক্তের ভগবান্, যোগীর যোগেশ্বর, জ্ঞানীর জ্ঞান। ভক্ত ভাবেন তিনি ভক্তি দ্বারাই প্রাপ্য—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মিতত্ত্বতঃ।

জ্ঞানী ভাবেন তিনি জ্ঞান দ্বারাই লভ্য—

ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতেতদনন্তরং।

যোগী ভাবেন তিনি যোগ দ্বারা লভ্য—

তপস্বিভ্যোধিকোযোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি ততোধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন। ৬।৪৬

সকল ভাবেই শ্রীকৃষ্ণ উপদেষ্টা, তিনি ভিন্ন অন্য আদর্শের প্রয়োজন নাই, তাই তাঁহার অবতার-তত্ত্বের আলোচনা প্রয়োজনীয়। তিনিই বলিয়াছেন—

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যং এবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোর্জ্জুন॥

তত্ত্বতঃ জানিতে হইবে যে, তিনি কেবল লোকানুগ্রহবশতঃ স্বপ্রয়োজনাবেত্তা জন্মমরণাধীন জীবের ন্যায় আপনাকে প্রকটিত করেন। জানিতে হইবে যে, তিনি সর্ব্বভূতের আত্মা এবং আশ্রয় স্বরূপ হইয়াও লীলাবশে দেহীরূপে প্রতীত হন। জানিতে হইবে যে, কোন রূপ-প্রকাশেও তাঁহার অদ্বয় স্বরূপ (transcendent) ভাবের বৈলক্ষণ্য হয় না। জানিতে হইবে যে, তিনি স্বীয় যোগমায়াবলে বিশিষ্ট দেহধারীর ন্যায় অবতীর্ণ হইলেও তিনি নিত্যমুক্ত শুদ্ধ বুদ্ধস্বভাব। তিনিই বলিয়াছেন যে, মূঢ় ব্যক্তিগণ আমার সর্ব্বভূত মহেশ্বররূপ পরমার্থ-তত্ত্ব না জানিয়া মনুষ্যমূর্ত্তি বলিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীমতনুমাশ্রিতং।
পরং ভাবং অজানন্তো মমভূতমহেশ্বরং॥ ৯।১১

সেই নিত্য অব্যক্ত চিদানন্দঘন মূর্ত্তি দর্শনের বিষয় না হইলে ভক্তের প্রতি

অনুগ্রহ করিয়া দর্শন দিয়া থাকেন। সেই অপরূপ রূপেব কিঞ্চিৎ আভাষ পাইলেও ভেদাত্মক রূপেব মোহ কিংবা বৈভবের সুখ কিংবা মান অভিমান অতি তুচ্ছ, অতি অকিঞ্চিৎকব বোধ হইবে। এ ভেদেব জগতে অপ্রাকৃত মদনমোহনেব দর্শন হইবে না। আমাদেব এখনও কর্ম্মেব বিশিষ্ট আসক্তি যায় নাই, এখনও বিশিষ্ট সংকল্প, বিশিষ্ট উদ্দেশ্য, বিশিষ্ট ভাব লইয়া মত্ত, এখনও বিশিষ্ট কামনার উদ্দীপনাব বর্ত্তমান। এখনও জাতি, কুল, মান, সম্মান লইয়া ব্যস্ত, এই অবস্থায় সেই কালশশীর মুবলী নিঃস্বন আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিবে না। এই সকল ভাব ছাড়িয়া যেদিন আত্ম-নিবেদনের প্রেরণা দ্বারা সেই দিকে জীবনের গতি ফিবিবে, যেদিন তাঁহাকে বলিতে পারিব—

"জীবনে মবণে জনমে জনমে প্রাণনাথ হৈও তুমি"

সেইদিন "জনম ভরি সুখ" এব প্রথম আস্বাদ পাওয়া যাইবে। তাঁহাকে সর্ব্বভাবে আশ্রয় করিতে হইবে। তাই তিনি বলিয়াছেন—

তমেব শবণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভাবত। ১৮।৬২

প্রেমের এই সত্য চিত্র হৃদয়ে থাকিয়া তাঁহার চিন্ময় মূর্ত্তি ধ্যান করিতে কবিতে অকূল সমুদ্রে ঝাঁপ দিলে তিনি তাঁহার অবতবণীতে উঠাইয়া লইবেন। তাঁহার লীলা অনন্ত, ভাব অনন্ত, শক্তি অনন্ত, তাঁহার চবণে প্রণাম করি! যে যেভাবে তাঁহাকে উপাসনা করে, তিনি সেই ভাবেই তাঁহার নিকট প্রকট হন। দাসভাবে ডাকিলে তিনি প্রভু, স্ত্রীভাবে ডাকিলে তিনি স্বামী, পুত্রভাবে ডাকিলে তিনি পিতা, তাঁহাব লীলাব ইয়ত্তা নাই। ক্ষুধায় কাতর হইয়া ডাকিলে তিনি মা অন্নপূর্ণা, রাধিকাব মান রক্ষার্থ তিনি ভয়ঙ্করী শ্যামা, বাৎসল্যভাবে তিনিই বালগোপাল। তাঁহাকেই লোকে বিভিন্ন ভাবে উপাসনা করিয়া থাকে। অমস্তর তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—

যথাদ্রিপ্রভবা নদ্যঃ পর্জন্যাপুরিতাঃ প্রজাঃ।
বিশন্তি সর্ব্বতঃ সিন্ধুং তদ্বৎ ত্বাং গতযোহন্ততঃ॥

তাই তাঁহাকে "বহুমূর্ত্তৈ্যক মূর্ত্তিকম্" বলিয়া ভগবত নির্দ্দেশ কবিয়াছেন। জীবের মঙ্গলের জন্যই তাঁহাব অবতার গ্রহণ। কিন্তু আমরা এমনি অন্ধ, এমনি অজ্ঞ, এমনি মায়াজালে বদ্ধ যে, তাঁহার "জন্ম কর্ম্ম" না বুঝিয়া

ক্রমে অন্ধকারেই যাইতেছি, দেবতারা সত্যই তোমার সত্য-স্বরূপ বুঝিতে পারিয়া স্তব করিয়াছিল।

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং
সত্যস্য যোনিং নিহিতাত সত্যে।
সত্যস্য সত্যমৃত সত্যনেত্রং
সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ ॥ ১০। ২। ২৬

আপনি সত্যব্রত, সত্যই আপনার সংকল্প, সত্যই আপনার প্রাপ্তি সাধন, আপনি তিনকালে সত্য। আপনি সত্যের কারণ এবং সত্যে অবস্থিত। আপনি সত্যের সত্য। আপনি সত্যময়, এইরূপে সকল প্রকারেই আপনি সত্যাত্মক। আমরা সত্যরূপী আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম।

বিভর্ষি রূপাণ্যববোধ আত্মা
ক্ষেমায় লোকস্য চরাচরস্য।
সত্বোপপন্নানি সুখাবহানি।
সতামভদ্রাণি মুহুঃখলানাং ॥ ৯। ২। ২৯।

জ্ঞানস্বরূপ আপনি জীবের কল্যাণ হেতু সত্বগুণময় বিবিধ মূর্ত্তি ধারণ করেন। ঐ সকল রূপ ধার্ম্মিকদিগের সুখসাধন ও খলদিগের বিনাশকর।

সত্বং বিশুদ্ধং শ্রয়তে ভবান্ স্থিতৌ
শরীরিণাং শ্রেয় উপায়নং বপুঃ।
বেদক্রিয়া যোগতপঃ সমাধিভি
স্তবার্হনং যেন জনঃ সমীহতে ॥ ১০। ২। ৩৪

আপনি লোকপালনের নিমিত্ত কর্ম্মফলজনক সত্বমূর্ত্তি ধারণ করেন, লোকে ঐ মূর্ত্তিযোগে বেদ-ক্রিয়া যোগ-তপস্যা ও সমাধি দ্বারা আপনার পূজা করিতে সক্ষম হয়।

বসুদেবও যথার্থই বলিয়াছিলেন—

বিজিতোসি ভবান্ সাক্ষাৎ পুরুষোপরঃ।
কেবলানুভবানন্দস্বরূপ সর্ব্ববুদ্ধিধৃক্ ॥ ১০।৩।১৩

আপনাকে জানিতে পারিলাম আপনি সাক্ষাৎ ভগবান্, পুরুষের অতীত। আপনি নিরবচ্ছিন্ন অনুভব ও আনন্দস্বরূপ এবং সর্ব্ব বুদ্ধির সাক্ষী।

আমরা তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবান্ জানিয়া—

"সচ্চিদানন্দ রূপায় কৃষ্ণায় ক্লিষ্টকারিণে"

বলিয়া প্রণাম করি। ওঁ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস।

লক্ষ্মীর প্রীতি।*

অসুরে অমৃত ভাণ্ড করিলে হরণ
উঠেছিল হাহাকার অমর ভবন।
জরা, মৃত্যু, দুঃখ হতে পাইবারে ত্রাণ
বিষ্ণুর সকাশে সবে করিলা প্রস্থান
অনিবার্য্য জরা, মৃত্যু, সে অমৃত বিনা।
সদুপায় নির্দ্ধারিতে দিতে সুমন্ত্রণা
অক্ষম হইলা বিষ্ণু। হইলা চঞ্চল
নারায়ণ সহ যত অমরের দল।
চিন্তিলেন চিন্তামণি, অমৃতরূপিণী
লক্ষ্মী বিনা কে হইবে জীবন-দায়িনী।
তোমারি চরণে দেবি। লইলা শরণ
ত্রিদিব নিবাসী যত সহ দেবগণ;
তোমারি অভয় পেয়ে হরষিত মন
করেছিল সুরাসুরে সমুদ্র মন্থন।
আলোড়িত সমুদ্রের বক্ষ ভেদ করি,
অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময়ী সাগরকুমারী,
করেতে অমৃত ভাণ্ড সৌরভে পূরিয়া,
উঠিলে মা ধীরে ধীরে দিক্ উদ্ভাসিয়া।
চমকিল ত্রিভুবন সে রূপ হেরিয়া
প্রণমিল সুরাসুরে বন্দনা গাহিয়া।

---

* এই কবিতাটি দশম বর্ষীয়া বালিকা দ্বারা রচিত বলিয়া পন্থায় সন্নিবেশিত হইল। বালিকাটী স্বর্গীয় মনীষী আনন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের পৌত্রী।

হয়েছিলে অমরের জীবন-দায়িনী—
রক্ষা কর ভারতেরে আজি গো জননী।
বিনা তব কৃপাদৃষ্টি এ ভারতধাম
হইয়াছে স্বর্ণভূমি শ্মশান সমান।
আলস্য অধর্ম্ম আর সুখশান্তি হীন
রোগার্ত্ত জীবনমৃত অন্নবস্ত্র হীন
হতশ্রী ভারতবাসী দারিদ্র্য-পীড়িত
মূর্ত্তিমান দুঃখরূপে আজি বিরাজিত।
কৃষি ও বাণিজ্যে মাগো তোমার বসতি—
ভুলেছে ভারতবাসী, তাই এ দুর্গতি।
অমৃত-রূপিণী মাগো এসো একবার
বিলুপ্ত করিতে এই মহা দুখভার।
সুবৃষ্টি অমৃত ধারা করি বরিষণ
ফল শস্যে বসুধারে কর সুশোভন।
ধন ধান্যে বসুন্ধরা পরিপূর্ণ করি
দুর্ভিক্ষের হাহাকার ভীম মহামারী—
অকাল-মরণ হিংসা করি নিবারণ
ধরাতলে শান্তি মাগো করহ স্থাপন।
শ্রীরূপিণী চল মাগো তব শ্রীচরণে
প্রণমিনু ভগবতী ভক্তিযুক্ত মনে।

ঈশ্বরের স্বরূপ।

নির্গুণ ভাব।

আজকাল শিক্ষিত সমাজে অনেকেই ঈশ্বর উপাসনা করা আবশ্যক মনে করেন না। তাঁহাদের ঈশ্বর সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণাও যে আছে এরূপ বোধ হয় না। অনেকের এরূপ বিশ্বাস যে, একজন ঈশ্বর আছেন সত্য, কিন্তু তিনি খোসামোদপ্রিয় নহেন; অতএব তাঁহার উপাসনা করা অনাবশ্যক। তাঁহারা বলেন যে, এ সংসারে নৈতিক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিলেই হইল,

ধর্ম্ম ও ঈশ্বর উপাসনা লইয়া সময় ক্ষেপণ কবিবাব বিশেষ কোনও প্রয়োজন নাই। যাঁহাবা ইংবাজি শিক্ষিত নহেন, তাঁহাদেব মধ্যেও যুগধর্ম্মেব প্রভাবে অনেকে এই প্রকাব উপাসনা সম্বন্ধে উদাসীন। আর্য্যশাস্ত্রেব মত যে, ঈশ্বব-উপাসনা মানবেব অবশ্য কর্ত্তব্য এবং তাহা না কবিলে প্রত্যবায় ঘটিবে। উপাসনা সম্বন্ধে আলোচনা কবাব পূর্ব্বে আমবা যাঁহাব উপাসনা কবিব, তাঁহাব স্বরূপ কি, তাহা নির্ণয় কবা আবশ্যক। কাবণ যাঁহাব উপাসনা কবিব, তিনি কি বস্তু তাহা না জানিলে তাঁহাব ধ্যান ধাবণা কিছুই হইতে পাবে না। এজন্য ঈশ্বরেব স্বরূপ কি তাহা সর্ব্বাগ্রে আলোচনা কবা আবশ্যক।

আর্য্যশাস্ত্রেব সিদ্ধান্ত এই যে, ঈশ্বব সাকাব ও সগুণ। তাঁহাব আব একটী অবস্থা আছে যাহাকে শাস্ত্রে নিগুর্ণ, নিবালম্ব ও নিরুপাধিক বলিয়াছেন। যখন তিনি এই অবস্থায় থাকেন, তখন তাঁহাব কোন ধর্ম্ম কি ক্রিয়া নাই, কাজেই এ অবস্থা মানবেব মন বুদ্ধির অগোচব ও উপাস্য নহে। এই নিগুর্ণ অবস্থাব প্রতি [illegible] বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ”। তাঁহাকে [illegible] কবা যায না ; তিনি মন বুদ্ধিব অগোচব। তাঁহাব এই অবস্থাব প্রকৃত স্বরূপ মানুষেব ভাষা দ্বাবা নির্দ্দেশ কবা যায় না। শাস্ত্র বলিতেছেন যাঁহাবা নিগুর্ণভাব উপলব্ধি কবিয়াছেন, তাঁহাবা অনন্ত সুখ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন দ্বৈত-ভাব থাকে না, সাধক ও সাধ্য ভাব লোপ হয়। তখন কে কাহাব উপাসনা কবিবে. সাধক কেবল পবম আনন্দ-সাগবে ভাসিতে থাকেন।

তদা কেন কং পশ্যেৎ কেন কং বিজানীয়াৎ।

তখন সাধক সাধ্য এক হইয়া যান। কে কাহাকে দেখিবে কে কাহাকে জানিবে ?

বামকৃষ্ণ পবমহংস দেব এক দিন বলিয়াছিলেন—

“ব্রহ্ম কি তা মুখে বলা যায় না। যাব হয সে খবব দিতে পাবে না।” “ব্রহ্মজ্ঞান হ'যে সমাধি হ'লে আব “আমি” থাকে না।” “তখন কি অবস্থা হয় মুখে বলা যায় না ? যেমন নুনেব পুতুল সমুদ্র মাপতে গিছিলো। একটু নেমেই গলে গেল। ‘তদাকাবকাবিত’। তখন কে উপবে এসে সংবাদ দেবে, সমুদ্র কত গভীর।”

এই জন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন—"মূকাস্বাদনবৎ" বোবার রস আস্বাদন করার ন্যায়। বোবা যেমন রস আস্বাদন করিয়া তৃপ্ত হয়, কিন্তু ভাষা দ্বারা প্রকাশ করিতে পারে না; তদ্রূপ এই সকল জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণ যাঁহারা ঈশ্বরের ভাব উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা ভাষা দ্বারা এ অবস্থা প্রকাশ করিতে পারেন না।

শ্রুতি বলিতেছেন—

"ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি, ন বাক্ গচ্ছতি ন মনো ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাদন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি।" কেনোপনিষদ্

'সেখানে চক্ষু যাইতে পারে না, বাক্য যাইতে পারে না, মন যাইতে পারে না, বুদ্ধি যাইতে পারে না; তাঁহাকে আমরা জানি না; কিরূপে তাঁহার উপদেশ দেওয়া যাইবে? তবে এ পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, তিনি এ জগতে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত যত পদার্থ আছে, তৎসমুদয় হইতে ভিন্ন।'

তুমি যদি বল তিনি তেজোময়, তাহা হইলে হইল না; কারণ, তাঁহার কোন রূপ নাই, তিনি চক্ষুর বিষয় নহেন। যদি বল দয়াময় প্রেমময়, তাহা হইলেও হইল না, কারণ, তিনি সমস্ত প্রকার গুণ ও ধর্ম্মের অতীত, তাঁহার কোন গুণ কি ধর্ম্ম নাই।

শাস্ত্র জগদম্বার এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

"যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।"

(কেন)

যাঁহাকে মন দ্বারা ধারণা করা যায় না, কিন্তু মন যাহা হইতে নিজ শক্তি প্রাপ্ত হয় তিনিই ব্রহ্ম, তিনি উপাস্য নহেন।'

যদি উপাসনা করিতে চাও তাহা হইলে ইহা উপাসনার বস্তু নহে "নেদং যদিদমুপাসতে"। স্থানান্তরে বলিয়াছেন এ অবস্থা যে কি তাহা প্রকাশ করা যায় না। "স এষ নেতি নেতি আত্মা" এই প্রকার অভাব বাচক নেতি নেতি শব্দ দ্বারা শাস্ত্র কতকটা আভাষ দিয়াছেন মাত্র। তুমি মন ও বাক্যের দ্বারা যাহা কিছু ধারণা করিবে ও বলিবে, তাহা তিনি নহেন।

মহিম্নঃ স্তোত্রের দ্বিতীয় শ্লোকে আছে—

অতীতঃ পন্থানং তবচ মহিমা বাঙ্‌মনসয়ো,
য়তদ্ব্যাবৃত্ত্যা যং চকিত মভিধত্তে শ্রুতিবপি।

"হে দেব। তোমার মহিমা বাক্য ও মনেব অগোচর। বেদ ইহা নয়, উহা নয় এইরূপ অভাব বাচক শব্দ দ্বাবা কীর্ত্তন করিয়াছেন।" তাঁহাব নিগুর্ণ ভাবের প্রতি লক্ষ্য কবিয়া এইরূপ বলিয়াছেন।

তিনি যে কি তাহা মানবেব বুঝিবাব ধবিবাব উপায় নাই। তাঁহাকে যিনি বুঝিয়াছেন বলেন, তিনি তাঁহার এ অবস্থা ধরিতে ও বুঝিতে পারেন নাই। কাবণ, যতক্ষণ পর্য্যন্ত "আমি" থাকিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত ব্রহ্মকে জানিতে পাবা যায় না। আমিত্ব না গেলে তাঁহাকে জানা যায় না, আবার যখন তাঁহাকে জানিতে পারা যায় তখন "আমিত্ব" থাকে না। তখন আমি ও ব্রহ্ম এক হইয়া যাইব।

"যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ্মঃ।
অভিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাত মবিজানতাম্॥"

"যিনি ব্রহ্মকে জানেন না, তিনিই জানেন; যিনি জানেন, তিনি জানেন না। ব্রহ্ম যিনি জানেন, তাঁহার অজ্ঞাত, আব যিনি জানেন না, তাঁহারই জ্ঞাত।"

প্রথম দৃষ্টিতে কথাটা বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। যে পর্য্যন্ত জ্ঞাত জ্ঞেয় জ্ঞান পৃথক্ থাকে, ততক্ষণ ব্রহ্ম অজ্ঞাত থাকেন, আর যখন সেই ভেদ-বুদ্ধি রহিত হইয়া জ্ঞাত জ্ঞেয় জ্ঞান একাকাব বোধ হয়, তখন ব্রহ্ম জ্ঞাত হয়েন। যিনি ব্রহ্মকে জানিতে পারিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মেই পরিণত হন। "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।"

যেরূপ নদীসকল সমুদ্রে পতিত হইলে নিজ নিজ নাম লোপ পাইয়া সমুদ্রে পরিণত হয়, সেই প্রকাব যিনি তাঁহাকে জানিতে পাবিয়াছেন তিনি পৃথক্ অস্তিত্বহীন হইয়া সেই পবাৎপর পবম পুরুষেব স্বরূপে লীন হন। তথা বিদ্বান্ নাম রূপাদ্ বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।"

(মুণ্ডোপনিষৎ)

জগদম্বা যখন শুদ্ধ এই ব্রহ্ম বা পবমাত্মা ভাবে থাকেন তখন তিনি সৃষ্টি স্থিতি কিছুই কবেন না। তাঁহার এই ভাব অতি দুর্জ্ঞেয় এবং আমাদের

বুঝিবার শক্তি ও সামর্থ্য নাই। তাঁহার এই ভাব যখন শ্রুতিও প্রকাশ করিতে পারেন না, তখন আমাদের পক্ষে এই নিগুর্ণ ভাব উপলব্ধি করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র।

তিনি যতক্ষণ এই প্রকার নিগুর্ণ ভাবে থাকেন, ততক্ষণ তাঁহার কোন আকার ও রূপ থাকে না; তিনি তখন সম্পূর্ণ অনির্দ্দেশ্য, তিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন; তাঁহার শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, রূপ নাই, ক্ষয় নাই। তিনি তখন "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্"।

তিনি তখন অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র, অবর্ণ; তাঁহার চক্ষু নাই, কর্ণ নাই, হস্ত নাই, পদ নাই।

শঙ্করাচার্য্য তৈত্তিরীয় ভাষ্যে ব্রহ্মের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

" সর্ব্ব কার্য্য ধর্ম্ম বিলক্ষণে ব্রহ্মণি "

সমস্ত কার্য্য ও ধর্ম্ম হইতে বিপরীত। তাঁহার সম্বন্ধে এই মাত্র বলা যায় যে "অস্তি" তিনি আছেন। তাহার অতিরিক্ত আর কিছু বলাও যায় না, জানাও যায় না।

অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে।

"অস্তি"—এই মাত্র বলা যায়, তাহার অধিক উপলব্ধি হয় না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীচরণ সেন।

নাদ অনাহত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

২৮

যদি শিষ্য সাধ, থাকে হে তোমার,
প্রথম আলয় হইতে পার,—
মোহে মুগ্ধ হয়ে, মন যেন তব,
সংসারের লীলা না ভাবে সার;—

ইন্দ্রিয়ের ভোগ-লালসা অনল,
প্রবল হইয়া জ্বলিছে যথা,
প্রাণ-সূর্য্য জ্যোতিঃ ভাবিয়া তাহায়,
জাগে না যেন ভেদের কথা।

২৯

দ্বিতীয় পুরটি নিরাপদে যদি
পার হতে চায় তোমার প্রাণ,
শুন শুন শিষ্য রাখিও স্মরণে,
দাঁড়াও'না কভু ভুলিয়া সেখানে,
মধুময় মায়াপুষ্পের সৌরভে
আত্মহারা হয়ে করিতে ঘ্রাণ।
যদি শিষ্য তব কর্ম্মের শৃঙ্খল,
কাটিবারে সাধ থাকে হে প্রবল,
মায়া-পুর মাঝে যেন তব মন
নাহি করে কভু গুরু অন্বেষণ।

৩০

ইন্দ্রিয়ের এই
কেলির উদ্যানে,
জ্ঞানীরা কথন
প্রফুল্ল পরাণে,
আদরের ধন
অমূল্য সময়,
জানিও হে শিষ্য
করেনাক ব্যয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাধা

চিদম্বরম মন্দিরের গোপুরম
এবং হেম পুষ্করণী তীর্থ।
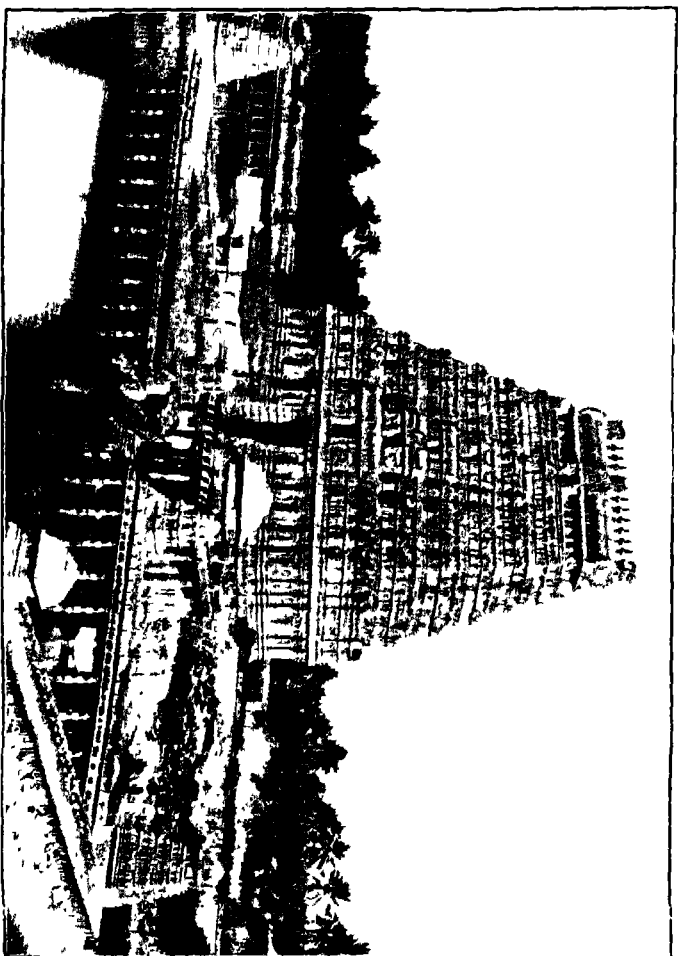
Printed by K. V Seyne & Bros.

(নবপর্য্যায়—ষোড়শ বর্ষ।)

মায়া—বিদ্যা ও অবিদ্যা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৪)

আমরা ভাগবতোদ্ধৃত আখ্যায়িকা হইতে বুঝিলাম মায়া ভগবানের চৈতন্ত-স্বরূপা। আমাদের চক্ষে ঐ চৈতন্যাংশে পূর্ব্বকল্পে বিশিষ্ট বহুত্বের এবং তৎ-সংস্থানের (Series or order) চিহ্ন বা আভাস আছে। প্রকৃত পক্ষে এক-রস ভগবানেব চৈতন্যে তাঁহার বিরুদ্ধ ভাব কিছু থাকিতে পারে না। তিনি সর্ব্ব, কিন্তু এই সর্ব্বতা বহুত্ববাচক নহে; উহা আনন্দঘন স্বরূপ প্রতীতি মাত্র রূপে অবস্থিত থাকে।

অসাবিহাসেক গুণোঽগুণোঽধ্বরঃ পৃথক্‌বিধ দ্রব্যগুণো ক্রিয়োক্তিভিঃ।

সম্পদ্যতেঽর্থাশয়লিঙ্গনামভি বিশুদ্ধ বিজ্ঞানঘনঃ স্বরূপতঃ॥ ভা ৪।২১।৩৪

সেই নির্গুণ ভগবান্ যদিও স্বরূপতঃ বিজ্ঞানঘন, অগুণ ও নির্ব্বিশেষণ, তথাপি পৃথক্ পৃথক্ গুণ, দ্রব্য, ক্রিয়া, মন্ত্র, অর্থ, আশয়, লিঙ্গ, নাম প্রভৃতি দ্বারা বিশিষ্ট হইয়া প্রকাশিত হন। তিনি মহদাদি স্থাবরান্ত অনন্তরূপে প্রকটিত হইয়া তাঁহার শাশ্বত একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্ব রূপ ত্যাগ করেন না। এই সর্ব্ব বা বহু-ভাবের দ্বারা তাঁহার বাধ হয় না বলিয়া তাঁহাকে শ্রুতি অবশেষ (অবশিষ্যত ইত্যবশেষম্ অধাধ্যম্) ও অমৃত বলিয়া ইঙ্গিত করেন। সর্ব্ব শব্দটি সর্ব্বনাম,

উহা অবিশেষ ভাবে সকল বস্তুতেই প্রযুক্ত হইতে পারে। বিশিষ্ট ভেদভাবে স্থিত জীব নিজ অবস্থানুসারে সর্ব্ব শব্দের একত্ব অর্থ বুঝিবার প্রয়াস পাইতেছে। একেবারে বিশ্লিষ্ট অহং জ্ঞানে জগৎকে পরস্পর বিশ্লিষ্ট বিরুদ্ধধর্ম্মী বস্তুসকলের সমন্বয় বলিয়া দেখে, কিন্তু সমষ্টি বা সমন্বয় ভাবটি একেবারে অন্তর্হিত হয় না, বিশিষ্ট বস্তুগুলিকে বিশেষরূপে দেখিতে গেলেও তাহার অবয়ব বা তাহার উপাদানভূত অণুগুলির একত্র সন্নিবেশ গুণ, অর্থাৎ বস্তুর সহিত অন্যান্য বস্তুর সম্বন্ধ প্রকার প্রভৃতি একত্ববাচক সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধির সাহায্য ভিন্ন উপলব্ধি হয় না। তাহার পর জাতি, জ্ঞান, ধর্ম্ম, স্বভাব, প্রভৃতি শব্দ বাচ্য একত্ব জ্ঞানের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্ব প্রকার পৃথক্ প্রতীতির আধার রূপে সর্ব্বাত্মিকা জ্ঞান বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার পর শক্তি ও অবিশেষ জ্ঞান (abstract idea) সাহায্যে উচ্চ ও উচ্চতর একত্বের উপলব্ধি হয়। ক্ষুদ্র বিশিষ্ট মানব চৈতন্যের এই প্রকার বহুত্বের অতীত উর্দ্ধগ অবিশেষ একত্ব-তত্ত্বের নিদর্শন হইতে আমরা কথঞ্চিৎ ভাবে ভগবৎ-চৈতন্যের সর্ব্বাত্মিকা ভাবটি অনুমান করিতে পারি। ঐ চৈতন্যে সর্ব্বময় ভাবটি আর বিশিষ্ট বিবিক্ত (Different idea) বহুত্ব নহে। উহা একরস ও বিজ্ঞানঘন। মধুতে যেরূপে বিভিন্ন পুষ্পের নিদর্শন পাওয়া যায় না, উহাও তদ্রূপ। এক অবিশেষ প্রিয় বোধ হইতে যেরূপে প্রিয় বস্তুর আকাঙ্ক্ষা মূলভূতা কামপ্রবৃত্তি নির্ভিন্ন হয় এবং ঐ আপেক্ষিক (Relative) একরস কাম হইতে রাগ-দ্বেষাদি ও কাম-ক্রোধাদি বিশিষ্ট প্রবৃত্তি (Function) সকল নিঃসৃত হয় এবং তাহা হইতে পরে নির্ভিন্ন শক্তি ও ইন্দ্রিয়াদির উৎপত্তি হয় এবং নিবৃত্তিমুখে চৈতন্যের উর্দ্ধগতি কালে বিভিন্ন শক্তি ও ইন্দ্রিয়ের কার্য্যসকল কামাদি রূপে ঘনতর অবিশেষ ভাবে এবং তাহার পর ঐ সকল হইতে স্পৃহারূপ একত্ব প্রকটিত হইয়া পুনরায় বোধে মিশিয়া যায়, ভগবানের সর্ব্বাত্মিকা ভাবও কতকটা সেইরূপ। অদ্বিতীয় স্বরূপ তাঁহাতে ভেদ নাই, শুধু একত্বই আছে। যেমন সর্ব্বাবস্থায় আমি প্রত্যয়টি এক অথচ বস্তু ভাবাদির অতীত বলিয়া অদ্বিতীয়, তদ্রূপ ভগবান্ এক ও অদ্বিতীয়, যেন ১ আপনাকে জানিতে ইচ্ছা করিয়া সকল সংখ্যার মূল রূপে প্রকাশিত হয়। ১+১, ১+১+১, ১+১+১+১ ইত্যাদি ব্যাপারের মধ্যে ১ই আপনাকে কাল বা সময় সাহায্যে ব্যাকৃত করে এবং এই ব্যাকরণের

(Differentiation) প্রত্যেক পদ (term or moment) সেই ১ই এবং তদ্ভিন্ন কিছুই নহে, তদ্রূপ কাল-শক্তির সাহায্যে একই বহু হন। কাল-শক্তির পরে মহত্তত্ত্ব আদি যোগিনী-শক্তির (Additive powers) সাহায্যে অন্বিত হইয়া সেই পরম একত্বই আমাদের প্রতীত বিশ্বরূপে প্রকট হইয়াছেন। তাঁহার চক্ষে সকলেই এক। সর্ব্বও এক। আমাদের চক্ষে ২, ৩, প্রভৃতি সংখ্যা এবং সংখ্যাগুলির পরস্পর সম্মিলন জন্য অন্যান্য ব্যক্ত বিশিষ্ট পদ সকল সত্য বলিয়া মনে হয়। ঐ যোগিনী-শক্তিকেই মায়া বলে।

যাহা আমরা সামান্যত জ্ঞান বলিয়া অভিহিত করি, তাহাও চৈতন্যের (Consciousness) এক অদ্ভুত প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করে। আমার সামনে ঘটটি বুঝিতে গেলে আমাকে প্রথমতঃ মৃত্তিকা, তৎপরে পরমাণু সকলের অবয়ব রূপে বিশিষ্ট সন্নিবেশ বা একীকরণ ভাব, ঘটের সহিত জলের সম্বন্ধ এবং তদুভয়ের সহিত আত্মার স্থূলাতীত ভাবের সম্বন্ধ না বুঝিলে ঘটের জ্ঞান হয় না। এক ঘটকে বুঝিতে গিয়া ক্রমে মৃত্তিকা ও তাহার ইষ্টক প্রস্তরাদি অবস্থা ভেদ এবং অন্যান্য অসংখ্য ভাবের অর্থ এক করিয়া বুঝিতে হইবে। বিজ্ঞান সাহায্যে মৃত্তিকা প্রভৃতি প্রত্যেকের সূক্ষ্মতর গুণ শক্ত্যাদি রূপ অনন্ত ভাব ঘটের জ্ঞানে প্রবিষ্ট হইয়া এক হইয়া যাইতেছে। তৎপরে ক্ষিতিতত্ত্বের আবার ভাব এবং তৎসঙ্গে অন্যান্য তত্ত্বের পরিজ্ঞান এই ঘট জ্ঞানের ভিতর দিয়া স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। যাহাকে এক সময় সামান্য পরিচ্ছিন্ন বলিয়া বুঝিয়াছিলাম, এখন দেখিলাম তাহার ভিতর দিয়া অনন্ত রূপে ব্যাপ্তির অনন্ত জগৎ বস্তুর সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের প্রবৃত্তি (tendency) রহিয়াছে। মসূরিকা (Small pox) রোগটিকে প্রথমতঃ আমির ভেদাত্মক ভাবে দেখিলাম, তৎপরে বুঝিলাম উহা কতকগুলি বিশিষ্ট জীবাণু (Specific micro-organism) এর শরীর ধর্ম্মে অনুকূল বা প্রতিকূল ভাবে অভিব্যক্তি মাত্র। ঐগুলি কোন স্থানে অনুকূল ভাবে কাছে কাছে, কোথাও বা প্রতিকূল ভাবে অবস্থিত হইয়া রোগ উৎপাদন করে। ক্রমে ঐ জীবাণুগুলিকে বুঝিতে গিয়া অন্যান্য প্রকার জীবাণুগুলিও আবিষ্কার হইল এবং পরস্পরের সম্বন্ধ নির্ণীত হইল। এই পর্য্যন্ত জড় বিজ্ঞান পূর্ব্বে পরিচ্ছিন্ন রূপে অনুভূত রোগটিকে অন্যান্য বস্তুর সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া জ্ঞানরূপে তাহার বিরুদ্ধ ভাব দূর করিলেন,

তার পর বর্ণ-বিজ্ঞান (Chromopathy) বলিল যে, লাল রংএর আলোক প্রদান করিলে রোগ শীঘ্র সারিয়া যায়। তখন হিন্দুধর্ম্ম বুঝাইয়া দিল যে, রোগটি জীবাণু ঘটিত নহে, উহা রক্তবর্ণা গর্দ্দভাভিরূঢ়া ঈশ্বর-শক্তি শীতলাদেবীর বিকাশ। ক্রমে বুঝা গেল যে, গর্দ্দভরূপ জন্তু মসূরিকা জীবাণু রক্তবর্ণ মানব-দেহ এবং দৈবী চৈতন্য কেন্দ্র শীতলাদেবীর সহিত কি একটা অদ্ভুত সম্বন্ধ আছে। বাহন-তত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখা গেল যে, গর্দ্দভ-দুগ্ধে ঐ রোগের উপশম হয়। এই রূপে একটি বিশিষ্ট বস্তুর জ্ঞান লাভ করিতে গিয়া বিশিষ্ট ভাব পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে ঐ বস্তুর ভিতরে অনন্ত জগৎ-বস্তুর শক্তি, ক্রিয়া ও ভাবের সম্বন্ধ দেখা যায় এবং ক্রমে ঐ জ্ঞান উচ্চতর স্তরগুলিকে সংক্রামিত করিল এবং তাহার মধ্যে এক দেবীভাব দেখাইয়া দিল। চৈতন্যই এই একীকরণ প্রয়াসের নামই মায়া চৈতন্য সর্ব্বদাই যে একত্বের প্রয়াস করিতেছে, তাহা বুঝা গেল। যখন এই একীকরণ সর্ব্বাঙ্গ ভাবে সিদ্ধ হয়, যখন অভিব্যক্ত জ্ঞানের ভিতর আমরা সর্ব্বকে দেখিতে পাই, তখনি উহা বিদ্যা নামে অভিহিত, কিন্তু যখন ঐ জ্ঞানে কেবল বিশিষ্ট আমি বস্তু বা শক্তি প্রকটিত হয়, তখন উহা অবিদ্যা, কারণ উহাতে একীকরণ প্রবৃত্তির হ্রাস হইতেছে, এবং তাহার ফলে মিথ্যা বিশেষ জ্ঞান উদ্ভূত হইতেছে। রামবাবু শনিবার দিন স্বাধীন ভাবে আমোদ আহ্লাদ করিয়া টলিতে টলিতে বাড়ী ফিরিলেন। মদের ঐকদেশিক আনন্দে রাস্তায় জ্ঞানটি লুপ্ত হইয়াছে, তাই হঠাৎ ল্যাম্প পোষ্টে মাথা ঠুকিয়া গেল। তিনি চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন "ব্যাটা মিউনিসিপালের কি অত্যাচার! ব্যাটা ল্যাম্প পোষ্ট ছুটিয়া আসিয়া আমার মাথায় আঘাত করিল।" বস্তুতঃই তাহার এইরূপ প্রতীতি হইল, ইহার নাম বিপর্য্যয়। ল্যাম্প পোষ্টের স্থাবরত্ব জ্ঞান মনে থাকিলে এরূপ হইত না। বাড়ী ফিরিলেন, ঘরে যাইয়া ছাতাটিকে কোণে রাখিয়া বিছানায় বিশ্রাম করিবার ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু ফলতঃ তাহা হইল না। যখন তাঁহার গৃহিণী তাঁহার ঘরে আসিলেন, তখন দেখিলেন যে ছাতাটি বিছানায় শায়িত এবং কোণে রামবাবু দণ্ডায়মান। তখন রামবাবু বুঝিলেন যে উল্টা হইয়াছে। ইহার নাম আরোপ বা ধর্ম্মের বিনিময়। সব ধর্ম্ম একেরই বলিয়া এই বিনিময় হইতে পারে। ঘড়িতে ১১টা বাজিল, রামবাবু শুনিলেন "টং এক" "টং এক" "টং এক" এবং রাগত হইয়া

যষ্টির আঘাতে ঘড়িটিকে পাতিত করিলেন এবং বলিলেন "নূতন ঘড়ি কিনিতে হবে, বেটা একেবারে ঠকাইয়াছে। কি না এগার বার একটা বাজলো" ব্যক্ত পরিচ্ছিন্ন শব্দগুলিকে জ্ঞানরূপ যোগিনী-শক্তির সাহায্যে এক রূপে পরিণত করিতে পারিলেন না বলিয়াই তাঁহার এই ভ্রান্তি হইল; ইহাই অবিদ্যা। রাম-বাবুর ভিতর একেবারে যোগিণী-শক্তি অন্তর্হিত হয় নাই বলিয়া তিনি ১১বার সংখ্যা গুণিলেন, কিন্তু ঐ গণনের মধ্যে বিশ্লিষ্ট শব্দগুলির ভাব প্রবল থাকাতে তদ্দ্বারায় ঐ বিশিষ্ট শব্দাতীত সময়ের একত্ব-জ্ঞান ফুটিল না। ২।৩।৪। প্রভৃতি সংখ্যাগুলি ১ একই অভিব্যক্তি, যেমন মানব, পশু, পক্ষী প্রভৃতি সকলি একেরই বিকাশ, কিন্তু ২। ৩ প্রভৃতি সংখ্যাগুলিকে আমরা পরস্পর বিশিষ্ট স্বতন্ত্র বলিয়া দেখি। এইরূপ সংখ্যা গণনের মধ্যে বিদ্যা বা যোগিনী-শক্তির উৎকর্ষ নাই এবং তাহার ভিতর পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের প্রাদুর্ভাব বশতঃ উহা ব্যবহারিক ভাবে সত্য হইলেও প্রকৃত পক্ষে মিথ্যা, এইরূপ সংখ্যা পরিজ্ঞানের ন্যায় জগদ্বস্তুকে মানব বিচ্ছিন্ন ভাবে বুঝিতে প্রয়াস পাইতেছে এবং তাহা হইতে অপর বিদ্যার ক্ষেত্রান্তর্গত গণিত, দর্শন, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রের উৎপত্তি। কিন্তু যখন ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ এই ভাবে গণনা করিতে শিখি তখন দেখি যে, বহুত্ব সংখ্যা জ্ঞানের মধ্যেও একতা জ্ঞান আরও পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। ৪র্থ বস্তুটিকে জানিতে গেলে আর তিনটি বস্তু অতিক্রম করিতে হয়, তাহা হইলেও উহা এক এবং উহার ভিতর ভেদ বিবক্ষা নাই। ঐ একের ভিতর আর তিনটির জ্ঞান অনির্ব্বচনীয় ভাবে মিলাইয়া গেল, যেমন বিশিষ্ট অঙ্কে (steps) বা কষিবার পর্য্যায়গুলি একই উত্তরে (answer) সমাহিত হইয়া গেল, ইহাও তদ্রূপ। ঐ উত্তরটিই অঙ্কের পরিসমাপ্তি, ঐ উত্তরের অভিমুখী হইয়া বিশিষ্ট অঙ্কটি (steps) বা পর্য্যায় রূপ ক্রমের মধ্য দিয়া ক্রমশঃ উত্তররূপী আপন স্বরূপে অভিব্যক্তি করিয়া চলিয়াছে, যতক্ষণ ঐ অভিব্যক্তি ক্রিয়া প্রবল রহিল ততক্ষণ আমরা যেন এক বিশিষ্ট পর্য্যায়ে উপনীত হইয়া অবিরত চলিতে লাগিলাম। গতির বিরাম নাই, সুতরাং অঙ্ক কষারও বিরাম নাই। ইহারই নাম সংসৃতি বা সংসার, কিন্তু যাই উত্তরে উপনীত হওয়া গেল, অমনি শান্তি, তৃপ্তি ও আশা প্রকটিত হইল। দেখিলাম ক+খ+গ+ঘ= অই দেখিলাম কত কষ্টে যে "ক"য়ের পরিজ্ঞান হইয়াছিল, যে জ্ঞানে মনে

হইয়াছিল কিছু বুঝিলাম, তাহা চঞ্চল। দেখিলাম ঐ জ্ঞান খ, গ, ঘ প্রভৃতি জ্ঞানের দ্বারা স্ফুটিত হইয়া তরঙ্গ মালার ন্যায় নাচিতে নাচিতে কোন এক দিকে যাইতেছে। গতির ভিতর দিকের জ্ঞান ফুটিবামাত্র একতা আরও স্ফুটিত হইয়াছিল, যেমন শ্যামবাজারে যাইবার সময় তুমি আর প্রতি পদবিক্ষেপ লক্ষ্য কর না, কেবল এক স্থির লক্ষ্য (object) প্রতি পাদবিক্ষেপে স্ফুটতর হইয়া উঠিতে লাগিল, তদ্রূপ প্রত্যেক স্তর পর্য্যায়গুলিকে গতির জ্ঞানের সংশ্লিষ্ট করিয়া দেখিলে অল্পে অল্পে তৃপ্তির প্রকাশ হইতে থাকে। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে বুঝা গেল যে, এই বিশিষ্ট শব্দ (terms) তাহাদের পরিণতি, গতি ও লক্ষ্য সেই অপর পাদস্থিত "অ"এরই জন্য তখন অঙ্ক কষায় বিশিষ্ট ক্লেশ জ্ঞান প্রভৃতি বিশিষ্ট ভাবগুলি এক অভিনব অতিগ (transcendent) একত্বে পর্য্যবসিত ও পরিসমাপ্ত। "অ"ই জ্ঞেয়, কারণ তখন বুঝিতে পারা যায় যে, অপর দিগের প্রকটিত বিশিষ্ট অনন্তরূপে পরিস্থাপিত প্রত্যেক শব্দের (terms) ভিতর সেই "অ"এরই ভাব নিহিত আছে এবং তাহা না হইলে বিশিষ্ট শব্দগুলিকে যোগ করিতে পারা যাইত না। 'অ'' ই প্রত্যেক সামান্য অধিকরণ বা আধার। গতির ভিতরও সেই "অ"এর স্বরূপ যোগিনী-শক্তি প্রকাশ হইতেছে, তাহার পর লক্ষ্য বা গতির অন্ত ভাবটি কোথা হইতে ফুটিয়া উঠিল, তাহার পর না জানি কি ওপারে হঠাৎ অপর পদস্থিত অক্ষর স্থির অপরিণামী 'অ''কে চিনিতে পারা গেল। দেখা গেল যে, ব্যক্ত পর্য্যায়ে কোন অবস্থাতেই 'অ''এর বাধ বা হ্রাস কখনও হয় নাই, ইহাই বিদ্যার পরিসমাপ্তি।

কত জন্ম ধরিয়া সংসৃতির মধ্য দিয়া প্রত্যেক জীব কি এক অপূর্ব্ব অভিনব একরস অথচ বিশ্বাতিগ "আমি" অঙ্ক কষিতেছে। দেব. মনুষ্য. স্থাবরান্ত যোনিগুলি তাহার পদচিহ্ন (পদ ও চিহ্ন) ইন্দ্রিয় প্রাণ প্রভৃতি এই অঙ্কের + যোগ চিহ্ন-তত্বগুলি এই অঙ্কের পর্য্যায় লোকসকল শব্দের অভিজ্ঞান-ক্ষেত্র। কিন্তু এ সমস্ত ভাব বর্ত্তমান থাকিলেও বিশিষ্ট পদগুলি মধ্যে ক্রমাভিব্যক্তি রূপ গতির পরিজ্ঞান হইলেও অঙ্ককষার নিবৃত্তি হয় না। উচ্চ ও উচ্চতর পদগুলিকে বিশিষ্ট জ্ঞানে গ্রহণ করিয়া অঙ্ক করিতে গেলে সামান্য অধিকরণে জ্ঞান হয় না, অথচ মানব মনে করে যে, এক লোক জয় করিয়া অপর লোকে যাইব এবং এইরূপে এই অনন্ত খেলার অন্ত দেখিব। ইহাই

শাস্ত্রকথিত দেবযান মার্গ এবং আধুনিক ব্রহ্মবাদিগণ এই পথের মোহে মোহিত হইয়া চলিতেছেন। আমি শুদ্ধ অনুভূতি পর্য্যন্ত বুঝিয়াছি এবং তাহার অঙ্ক কষিতে চেষ্টা করিব। ইহাই আমার উদ্ভিদ জন্ম বা সুষুপ্তি স্থান। অনুভূতির ভিতর সুখরূপ দেখিয়া অঙ্ক কষিতে গেলাম, আমার পশু জন্ম হইল। এই রূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবের বিকাশের ভিতর দিয়া দেবতাদি স্থাবরান্ত পদ সকলের সংস্থিতি স্থাপিত হইল, কিন্তু তখনো গতির বিরাম নাই, তখনো শান্তি নাই। তুমি আমি কি—কত চতুরানন মরি মরি যায়ত নাহি তুয়া আদি অবসানা—কিন্তু যে মুহূর্ত্তে শব্দ ব্রহ্ম রূপী বিশিষ্ট অনন্ত ভাবের প্রকাশের পারগামী এবং অপর পারস্থিত বিরজ, নিষ্কাম ভগবানে নিষ্ণাত আমাদের 'আমার" "আমি" অপেক্ষা প্রিয় গুরুর কৃপাতে সেই পরম একত্বের আভাষ হৃদয়ে ফুটিয়া উঠে, কেবল তখনই জীবের লক্ষ্য বা গতি স্থির হয়।

আমাদের একত্ব জ্ঞান ভেদভাব দ্বারা দূষিত এবং উহাতে প্রায়ই ব্যক্তির অতিগামী (Transcendent) বোধ নাই। পুরুষতত্ত্ব আলোচনে ইহা বিবৃত হইবে। মনে কর, একজাতি মানবের ভিতর এই ঊর্দ্ধ বা অতিগ একত্বের জ্ঞান নাই, তাহাকে কি তুমি চন্দ্র-সূর্য্যাদি দেখাইতে পার? চন্দ্রের জ্ঞান না থাকাতে আলোকেরও জ্ঞান নাই। তাহারা মনে করে বস্তুর রংগুলি বস্তুর পরমাণু সমবায়ের ফল। তাহাকে বুঝাইয়া দেও ঐ রংগুলি বিভিন্ন রূপ হইলেও তাহার মধ্য দিয়া প্রকাশ বা অভিব্যক্তি রূপ একত্ব আছে, যে বস্তু-গুলির ভিতর দিয়া কি এক পদার্থ ফুটিয়া উঠিতেছে। উহা আধার ভেদে লাল ও নীল রূপে বিভিন্ন হইলেও বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে, উহা প্রকাশ স্বরূপ। ঐ প্রকাশটি দেখিতে গেলে তাহার ভিতর চৈতন্যের অতিগামিত্ব (Transcendence) বা ব্যক্তিবিক্তত্ব ভাবের এক অপরূপ ভাষার পরিজ্ঞান হয়। যেমন মনস্তত্ত্বে অধিরূঢ় যোগীর ব্যক্ত শব্দ ইঙ্গিতাদির সাহায্য ভিন্ন কি এক অপরূপ ভাষার সাহায্যে এক অন্য জাতির সত্তা অনুভূত হয়। তাহার পর ঐ জাতীয় ব্যক্তিকে এক বৃক্ষের তলায় লইয়া যাও এবং মূল হইতে আরম্ভ করিয়া আপন অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া ক্রমে স্কন্ধাদি ঊর্দ্ধ ভাগে তাহার দৃষ্টিকে লইয়া যাও। তাহার পর যে শাখার যে স্থানের পার্শ্ব দিয়া চন্দ্র সমানুপাতে দেখা যায় সেই স্থানে সেই অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিবে অমনি শাখা দেখিতে গিয়া তাহার চন্দ্র দর্শন

ঘুটিবে, যে চন্দ্রের আলোকে বস্তু আদির পরিজ্ঞান হইয়াছিল, আজ তাহাকে দেখিতে পাইয়া অনুসন্ধানের তৃষ্ণা নিবৃত্ত হইল। দেখিবে যে, চন্দ্র বাস্তবিক জগৎ বস্তু হইতে অতীত, তাহাতে বস্তুর গুণ স্বভাব স্বরূপ শক্তি প্রভৃতির পরামর্শ নাই, উহা নিঃসহ এক ও অদ্বিতীয়। জ্ঞানরূপ একত্বের প্রকাশ উহাতেই পরিসমাপ্ত। (ক্রমশঃ)

সম্পাদকয়োঃ।

দাক্ষিণাত্যে-তীর্থদর্শন।

চিদম্বরম্।

ভূমিকা—সর্ব্বভূতে একত্ব দর্শন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

চিদম্বরম্ মান্দ্রাজের প্রসিদ্ধ শৈব-তীর্থ, সেই "শান্তম্ শিবম্ দ্বৈতম্" এখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। সুতরাং তাঁহার মহিমা ও পূজা-রহস্যের কিঞ্চিৎ আভাস অপ্রাসঙ্গিক নহে।

আমরা দেখিলাম শাস্ত্রের উপদেশ সর্ব্বভূতেই ব্রহ্ম দর্শন অভ্যাস করিতে হইবে। ইহা ভিন্ন মুক্তির অন্য পন্থা নাই, "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়," "সর্ব্বং শিবময়ঞ্চৈতৎ" এতৎ সমুদয়ই শিবময় এই ভাব যাহাতে মূর্ত্তি-পূজাকালে সাধক ভুলিয়া না যায় সেইজন্য পরমাত্মার অন্যতম মূর্ত্তি মহাদেবের অষ্টমূর্ত্তির পূজার ব্যবস্থা আছে। ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ এই পঞ্চভৌতিক মূর্ত্তি এবং সূর্য্য, চন্দ্র ও যজমান (জীব বা সাধক) এই অষ্টমূর্ত্তি শিবভক্তগণ যে কোন আধারে * পূজা করিয়া থাকেন। দ্রাবিড় প্রদেশে অর্থাৎ বর্ত্তমান মান্দ্রাজ অঞ্চলে পাঁচটি প্রসিদ্ধ তীর্থ মহাদেবের পঞ্চভূতাত্মক পাঁচটী লিঙ্গমূর্ত্তি বিদ্যমান আছেন, যথা (১) শিবকাঞ্চিতে একাম্রেশ্বর ক্ষিতিলিঙ্গ।

(২) ত্রিচিনোপল্লী জেলায় শ্রীরঙ্গম-তীর্থের সন্নিকট জম্বুকেশ্বর তীর্থে—জম্বুকেশ্বর আপলিঙ্গ।

---

* শিবলিঙ্গ, পুস্তক, মণ্ডল, অগ্নি, প্রতিমা, পট, ঘট, জল, যান, খড়্গ, শালগ্রাম, দর্পণ ও চন্দন দ্বারা মূলমন্ত্র লিখিত কবচে শিবের পূজা হয়। "হিন্দু সৎকর্ম্মমালা"।

(৩) দক্ষিণ আর্কট জেলার অরুণাচল তীর্থে তিরুবন্নমলর তেজো-লিঙ্গ।

(৪) উত্তর আর্কট জেলায় কালহস্তীশ্চর বায়ুলিঙ্গ।

(৫) চিদম্বরমে চিদম্বরমেশ্বর আকাশলিঙ্গ।

এই পঞ্চ স্থানই দাক্ষিণাত্যের অতি প্রাচীন ও পবিত্র তীর্থ। এই পবিত্র ক্ষেত্র সমূহেই শৈব আলোয়ার জ্ঞানী ও ভক্তগণের আবির্ভাব হয় এবং এই গুলিই তাঁহাদের অপূর্ব্ব লীলাক্ষেত্র। এই আলোয়ারগণের রচিত "নালায়িব প্রবন্ধম্" নামক তামিল গ্রন্থগুলিই "দ্রাবিড় বেদ" নামে প্রসিদ্ধ। তামিল বেদ দুইপ্রকার—শৈব ও বৈষ্ণব। আলোয়ারগণ দক্ষিণ দেশবাসিগণের নিকট অভ্রান্ত ব্রহ্মবিদ্ সিদ্ধপুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধ। শৈব আলোয়ারগণের মধ্যে ৬৩ জন এবং বৈষ্ণব আলোয়ারগণের মধ্যে দ্বাদশ জন প্রসিদ্ধ।

শ্রুতি বলেন "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" যিনি ব্রহ্মবিদ্ তিনি ব্রহ্ম-স্বরূপ; সুতরাং তাঁহার বাণী সংস্কৃতেই রচিত হউক অথবা ভাষায় রচিত হউক, তাহা অভ্রান্ত আপ্তবাক্য, সুতরাং বেদ স্বরূপ, তাই একজন সাধক বলিয়াছেন—"ব্রহ্মবিদ্ যো ব্রহ্ম সম তাকিবাণী বেদ। ভাষা অথবা সংস্কৃত করত ভেদ ভ্রম ছেদ" আলোয়ারগণ অধিকাংশই কলিযুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই সকল পবিত্র ক্ষেত্রে অনেক আলোয়ার সাধক ও ভক্তগণ আবির্ভূত হইয়া তৎসমুদায়কে এরূপ আধ্যাত্মিক শক্তিতে পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন যে, সাধক ভক্তের কথা দূরে থাক, সংসারপরায়ণ ব্যক্তিতে এই সকল তীর্থে গমন করিলে ক্ষণিকের জন্যও অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক শক্তি অনুভব করিয়া থাকেন। স্থানগুলির এমনই প্রভাব, পবিত্রতা ও গাম্ভীর্য্য যে, প্রথম আগমনেই আমাদের অশান্তচিত্ত পরম শান্তভাব ধারণ করিয়া কতকটা অন্তর্মুখীন হইয়া যায় এবং বিষয়-বৈরাগ্য ও ভগবৎ-ভক্তি হৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়া তোলে। অন্তরে পবিত্র ভাবের স্রোত ছুটিতে থাকে, যেন কোন অনির্দ্দেশ্য ঐশীশক্তি আমাদের মনকে কোন অজ্ঞাত ভাব-রাজ্যের উর্দ্ধলোকে উড়াইয়া লইয়া যায়। এই সকল তীর্থের বিশাল মন্দিরনিচয় অপূর্ব্ব কারুকার্য্য সমন্বিত সহস্র স্তম্ভমণ্ডল গগন-

স্পর্শী সুচিত্রিত গোপুরম্, উন্নত ও দুরারোহ প্রস্তর প্রাচীর এবং প্রাচীর পরিবেষ্টিত সুবৃহৎ প্রাঙ্গন এবং বিমল-সলিলা সুবিশাল সরসী, ভারতের স্থাপত্যশিল্পের এবং কারুকার্য্যের অতুলনীয় ও বিস্ময়জনক নিদর্শনস্থল, ভগ্নাবস্থায় পরিদর্শন করিয়া আজিও ইউরোপীয় পরিব্রাজকগণ এই মন্দিরাদিকে Works of Titan অর্থাৎ দানব নির্ম্মিত বলিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই মন্দিরগুলির বিশালত্ব স্বচক্ষে না দেখিলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় না। এই চিদম্বর তীর্থের মন্দিরাদির হাতা ৪০ একার অর্থাৎ ১২০ বিঘার কিঞ্চিৎ অধিক, মেরামত করিতে ১০।১২ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপান্নালাল সিংহ॥

দীক্ষা-মুখে।

প্রথম অধ্যায়।

সাধন-শৈল্য,—বহিঃপ্রাঙ্গণ।

(রূপক।)

(জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা ৬২ পৃষ্ঠার পর)

গুরু:—সেই যে মন্দিরের বহিঃস্থ প্রাঙ্গণের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে উঠিতে হইলে কেবল যে ঐ সম্মুখে দেদীপ্যমান পূর্ব্বোল্লিখিত ঘূর্ণায়মান পর্ব্বত বেষ্টনকারী পথ দিয়াই অগ্রসর হইতে হয়, তাহা নহে। ঐ সুদীর্ঘ পথের স্থানে স্থানে তুঙ্গ বা ঋজু আরোহণোপায় আছে। সেই দুর্গম পথ সাহায্যেও ঐ প্রাঙ্গণে অধিরোহণ করা যায়। যদি আরোহীর হৃদয়ে সাহস থাকে, মনে শক্তি থাকে, তাহা হইলে এই ঋজু পথের সাহায্যে, অল্পতর সময়ে ঐ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইতে সক্ষম হয়। তাহা হইলে তাহাকে আর অনন্তকাল ধরিয়া এই আবর্ত্তিত পথ সাহায্যে ধীরে ধীরে উঠিতে হয় না। যুগযুগান্তর ধরিয়া এই ঘূর্ণায়মান আবর্ত্ত-পথ ধরিয়া অতি ধীরে ধীরে, আরোহণ করিতে

করিতে, যখন মানব এই মহাযানের উদ্দেশ্য প্রথমে বুঝিতে পারে, যখন জ্যোতির্ম্ময়, শৃঙ্গ-শিখরস্থ, মন্দিরের অমল, ধবল, আত্মা-রশ্মি, প্রথমে চকিতের জন্য সে হৃদয়ে অনুভব করিতে সক্ষম হয়, তখনি সে সেই আবর্ত্ত-মার্গে স্তম্ভিত হইয়া দণ্ডায়মান হয় এবং বিস্ময়ে ও আনন্দে যুগপৎ উৎফুল্ল হইয়া, শীঘ্র আরোহণোপায় অবলম্বন করিতে উদ্যত হয়। তুমিইত এইমাত্র পরিচয় দিলে যে, এই বিমল শুভ্র মন্দির, চতুর্দ্দিকে অতি উজ্জ্বল আলোক-রশ্মি প্রসার করিতেছে। ক্রীড়াপরায়ণ পথিক, সম্মুখে বিরাজিত জগদ্বস্তুরূপ নানা বর্ণের পুষ্প, প্রস্তর-খণ্ড বা বিচিত্র মনোমোহকারী প্রজাপতি হইতে ক্ষণিকের জন্যও যখন তাহার দৃষ্টি সরাইয়া ঊর্দ্ধদিকে আত্মস্বরূপের দিকে নয়নবিক্ষেপ করে, তখন ঐ মন্দিরের জ্যোতির একটী রশ্মিরেখা আসিয়া তাহার নেত্রপথে পতিত হয়। সে তখন প্রথমে সেই রশ্মির সাহায্যে দেখিতে পায় যে, তাহার শিরোপরে, সুদূরে, কেমন নীলিমার মাঝে মহা শূন্যে, এক অপূর্ব্ব মন্দির বা ধাম বিরাজ করিতেছে। তাহার অতি স্নিগ্ধকর, অতি পবিত্র রূপের নিকট, এই সমস্ত প্রাকৃত ক্রীড়া-সামগ্রী অতি তুচ্ছ, তখন এই ক্ষণিকের অনুভূতিই তাহার জীবনে যুগান্তর আনিয়া দেয়। চকিতের এই অনুভূতিতে সে বুঝিতে পারে যে, তাহার জীবনের একটা মহৎ উদ্দেশ্য আছে,—এই যে তাহার অভিযান তাহা লক্ষ্যহীন জীবনীশক্তির কেবলমাত্র একটা অনর্থক বিকাশ নহে। অন্ততঃ ক্ষণিকের জন্যও তাহার আর পূর্ব্বক্রীড়া-দ্রব্য ভাল লাগে না; সে তখন সাধারণ পথ পরিত্যাগ করিয়া ঐ দুর্গম গিরি-আরোহণোপায় অবলম্বনদ্বারা উদ্দেশ্য স্থানে উঠিতে সঙ্কল্প করে। যাহারা এই পথ অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাদিগেরই কার্য্য লক্ষ্য করিয়া তুমি ইতিপূর্ব্বে স্তম্ভিত হইয়াছিলে। ঐ দেখ, কেমন তাহারা কণ্টকে ও শিলাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়াও লতা, রজ্জু বা অন্য কিছু উপায় অবলম্বন করিয়া পর্ব্বতশিখরে উঠিতেছে।

এই আলোক-রশ্মি বিবেক-জ্যোতির প্রথম আভাস। সে দেখিয়া আসিয়াছে যে, ঐ আবর্ত্তিত পথ, সহজগম্য হইলেও, তাহা অনন্ত, তাহার সীমা নাই; সে দেখিয়া আসিয়াছে যে, পুষ্প বা অপরাপর পার্থিব ক্রীড়াদ্রব্য আপাত-মনোলোভা ও মধুর বোধ হইলেও তাহারা চিরসুখের নিদান নহে। এখন সে মানব জীবনের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছে; দুর্গম হইলেও এই ঋজু পথ,

এখন তাহার হৃদয়পটে অবলম্বনীয় বলিয়া প্রতিফলিত হইয়াছে। এই পথ চিরবিদ্যমান থাকিলেও তাহার পরিচয় সে এতদিন পায় নাই। অদ্য প্রথম বুঝিয়াছে এই ঋজু পথ কি? তাহার নাম জীব-সেবা। অল্পকালে উদ্দেশ্য স্থানে লইয়া যাইবার একমাত্র অবলম্বনীয় পন্থাই "জীব-সেবা" ও নামে রুচি। সেই দুর্গম পথের প্রবেশ-দ্বারের উপর সুবর্ণ-বর্ণে লেখা রহিয়াছে "জীব-সেবা" ও নামে রুচি। অদ্য সে প্রথম বুঝিতে পারিয়াছে যে, ঐ মন্দির বহিঃস্থ প্রাঙ্গণে আরোহণ করিতে হইলে, পূর্ব্বেই এই সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে; সে অনুভব করিতে পারিয়াছে যে, তাহার জীবন-ধারণ তাহার স্বার্থ-সিদ্ধির নিমিত্ত নহে, তাহা ভগবদুদ্দেশে সর্ব্বজীবের সেবার জন্য। সে কেন দ্রুততর অগ্রসর হইতে বাসনা করিয়াছে? তাহা কি আপনি নির্ব্বাণানন্দ উপভোগ করিবে বলিয়া? না, তাহা নহে; তাহার মনে জীব-সেবা ও ভগবৎ-প্রেম জাগিয়া উঠিয়াছে। সে যে সাধারণ অপেক্ষা দ্রুততর আরোহণ-প্রয়াসী, তাহা তাহার আত্মসিদ্ধির জন্য নহে। তাহার এই উন্নতি-কামনা আপনার তৃপ্তির জন্য নহে। যাহারা আপনাদিগের সুখান্বেষণ চেষ্টায় বৃথা সময় অপচয় করিতেছে, সেই বালকদিগকে উন্নত করিবার জন্য তাহার এই সঙ্কল্প;—মন্দির মধ্যস্থিত মহাত্মাদিগের সেবক হইয়া ভগবদুদ্দেশে জগতের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিবে বলিয়া, তাহার স্থূলদেহের শক্তি, তাহার মনস্বিতা, এমন কি তাহার আধ্যাত্মিকতা, সমস্তই পরার্থে উৎসর্গ করিতে চলিয়াছে। তাহার অপেক্ষা যে মানবেরা অধিকতর দুর্ব্বল, অধিকতর শিশু স্বভাবসম্পন্ন, তাহাদিগের মধ্যে থাকিয়া, তাহাদিগের সঙ্গের সাথী হইয়া, আত্মীয়তা ও সখিতা আকর্ষণে বালক-প্রকৃতির চক্ষু ফুটাইবার জন্য তাহার আপন সাধনা। মন্দির মধ্যস্থিত মহাপুরুষদিগের জগৎ মঙ্গলার্থে যে মহা উৎসর্গ, সেই অতি পবিত্র করুণারূপী বিসর্জ্জনানন্দে স্নাত হইয়া, জগতের কল্যাণ কামনায় আপনার সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া সে এখন সেবানন্দ উপভোগ করিতে চলিয়াছে। মন্দিরের যে কমনীয়া ও শান্তিময়ী বিভার কথা বলিয়াছি, তাহা বহিঃপ্রাঙ্গণস্থিত ভক্ত সেবক সম্প্রদায়ের ভাব-সম্মিলনে যেন উজ্জ্বলতর হইয়া জগৎকে আলোকিত করে। যেরূপ প্রতিফলক সাহায্যে আলোক বর্দ্ধিত ও উজ্জ্বলতর হইয়া প্রকাশ পায়, ঠিক সেইরূপ প্রাঙ্গণস্থিত ভক্তদিগের সাহায্যে ভগবৎ-করুণা সংসারমাঝে বিকাশ

পায়। এইরূপে নিমিত্ত কারণ হইবার উদ্দেশ্যেই ভক্তদিগের বহিঃপ্রাঙ্গণে অবস্থিতি ; মন্দিরের ও গুরুদেবদিগের সান্নিধ্য উপভোগ করিবে বলিয়া নহে।

শিষ্য—গুরুদেব, বুঝিলাম ভগবানের মোহিনী-শক্তির আকর্ষণে ঐ সাধকবৃন্দ আত্মতৃপ্তি ও জগতের প্রিয়বস্তু ত্যাগ করিয়া এই দুর্গম শৈলপথ অতিক্রম করিতে এত সচেষ্ট। কিন্তু আমি দেখিতেছি তাহারা কিছুদূর মাত্র এইরূপে আরোহণ করিয়া আবার সাধারণ মানবের সহিত মিশিতেছে ; মিশিয়া আবার পূর্ব্বাভ্যস্ত ক্রীড়ায় আত্মবিস্মৃত হইয়া পূর্ব্বের মত ছুটাছুটি করিতেছে। এই স্নিগ্ধকরী আধ্যাত্মিক বিভা হৃদয়ে ধারণ করিয়া আবার কেন তাহারা মোহে আক্রান্ত হইতেছে? আমিত শুনিয়াছি, এই আধ্যাত্মিক জ্যোতিঃ "অমোঘ দর্শনা"। তবে কেন সেই মহাবাক্যের ব্যভিচার হইতেছে? অনুগ্রহ করিয়া আমার এই সন্দেহ দূর করুন।

গুরু—পুত্র, আমিত পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই জ্যোতির অনুভব কেবল ক্ষণিকের নিমিত্ত ; এই গিরিশৃঙ্গস্থিত শ্বেত-মন্দিরের শ্বেত বিমল-কিরণজাল, তাহার নয়ন সমীপে চপলাবালার চকিত-স্পন্দনমাত্র ;—তাহা ক্ষণিকের তরে আসিয়া আবার পুনরায় ঘোর অন্ধকারে কোথায় মিশিয়া যায়। বিক্ষিপ্ত চিত্তের নিমিত্ত একেত জ্যোতি ক্ষণস্থায়ী বলিয়া বোধ হয়, তাহার উপর এই ঘূর্ণায়মান পথের চারিধারে মানবের মনোলোভা চিত্তবিনোদন এত প্রকার প্রিয় পদার্থ বিকীর্ণ আছে যে, মানবের দৃষ্টি আবার তাহাদিগের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হয়, সুচিরাভ্যস্ত অর্ভক্রীড়া আবার তাহাকে সংসারের মাঝে টানিয়া আনে। কিন্তু সুখের বিষয়, আশাপ্রদ এইটুকু, যে সেই উজ্জ্বল জ্যোতিঃ একবারের নিমিত্তও যে মানবের নয়নমাঝে প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহার দৃষ্টি সহজেই আবার তাহার দিকে আকৃষ্ট হয়। মানবের চরমগতি ও অবস্থা, তাহার কর্ত্তব্য ও সেবাপরায়ণতা যে ক্ষণিকের জন্যও এমন কি কল্পনায়ও হৃদয়ে একবার অনুভব করিয়াছে, তাহার মনে সেই ঋজু পথ আবার জাগিয়া উঠে এবং তৎসাহায্যে পর্ব্বতশিখরদেশে উঠিবার আকাঙ্ক্ষা স্বতঃই ফুটিয়া উঠে।

প্রথম দর্শনের পর হইতে, মাঝে মাঝে, বার বার ঊর্দ্ধদৃষ্টির সহিত সেই মন্দিরের জ্যোতির্ম্ময়ী কমনীয়া বিভা তাহার হৃদয়াকাশে উদিত হইতে থাকে এবং সে ঘূর্ণায়মান সাধারণ পথ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক উদ্যমে

ঐ দুর্গম মার্গ সাহায্যে অধিরোহণে সচেষ্ট হয়। এইরূপে মানব-জীবনের উদ্দেশ্য ও সংসার-ক্রীড়ার পরিণাম যতই তাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইতে থাকে, সহজগম্য সাধারণ অয়নে বিক্ষিপ্ত ক্রীড়া-সামগ্রী ত্যাগ করিয়া সে ততই অবিচলিতভাবে সেই দুর্গম পথ অবলম্বনে স্থির থাকিতে সক্ষম হয়। যদিও এখনও তাহার সমস্ত মোহ অপসারিত হয় নাই, যদিও এখনও সংসারের মায়াময়ী ক্রীড়া সামগ্রী উপভোগেচ্ছা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয় নাই, যদিও এখনও অধিকতর সময় সর্ব্বসাধারণের অনুসৃত সেই সুগম পথ দেবযানরূপ আশ্রয় করিয়াই অবস্থান করে; তথাপি, তুমি যদি তাহার গতি ও লক্ষ্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিতে সক্ষম হও, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে, তাহার কার্য্যপ্রণালী অপরের হইতে পৃথক্। জাতীয় নীতিশাস্ত্রে যে সমস্ত ধর্ম্মের শাসন কীর্ত্তিত আছে, তাহা সাধনা করিতে সে চেষ্টা করিতেছে। সাধারণে যাহাকে ধর্ম্মনীতি বলে, সে তাহাদিগের সাধনায় আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিতে সযত্ন আছে। ঐ সমস্ত ধর্ম্মনীতি এই পর্ব্বত আরোহণের প্রধান সহায়। তাহাদিগের পরিপালনই এই দুর্গম পথকে সুগম করিয়া দেয়।

এইরূপে যাহারা পূর্ব্বোক্ত মন্দির-জ্যোতিঃ হৃদয়ে গ্রহণ করিতে পারিয়াছে, যাহারা মানব অভিব্যক্তির চরমচিত্র কল্পনা-চক্ষেও দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং যে মার্গ অবলম্বন করিলে পর্ব্বতশিখরস্থ ঐ পবিত্র বহিঃপ্রাঙ্গণে প্রবেশাধিকার হয়, সেই পন্থা অবলম্বনে উঠিতে যাহাদিগের প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে, তাহারা অপর সাধারণ লোক অপেক্ষা কি অধ্যবসায়, কি একাগ্রতায় যে প্রকর্ষতা লাভ করিয়াছে, তাহাতে অনুমাত্র সংশয় নাই। সেই মানব অভিযান তরঙ্গটির তাহারাই যেন শীর্ষস্থানীয়। মানব ক্রমোন্নতিরূপ তরুবরের তাহারাই প্রথম ফলস্বরূপ। তাহারা জনসাধারণ হইতে অধিকতর দ্রুতবেগে সেই পর্ব্বত-পথ অতিক্রম করিতে থাকে। কারণ, তাহারা বুঝিয়াছে যে, এতকাল ধরিয়া যে অতিদীর্ঘ পথ লঙ্ঘন করিতে তাহারা সময় অপচয় করিয়া আসিয়াছে, তাহার পরিণাম কি? তাহারা এখন পরিদৃশ্যমান শোভায় আকৃষ্ট হইয়া বিক্ষিপ্ত বালকের ন্যায় পথের এ পার্শ্বে ওপার্শ্বে ছুটাছুটী করিয়া বৃথা সময় অপব্যবহার করিতেছে না। সম্পূর্ণরূপেই না হউক, তাহারা অন্ততঃ আংশিকভাবে একটী উদ্দেশ্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া এখন ভ্রমণ করিতেছে। অতএব তাহাদিগকে মনোযোগের সহিত

লক্ষ্য করিলে তুমি দেখিতে পাইবে যে, মহৎ উদ্দেশ্যের ছায়া তাহাদিগের দৈনন্দিন জীবনের প্রতি ঘটনায় স্বপ্রকাশ রহিয়াছে। মানবজীবনের আবশ্যকতা ও উদ্দেশ্য যদিও তাহারা সম্যক্ভাবে উপলব্ধি করিতে পারে নাই, তথাপি তাহার আভাস মাঝে মাঝে তাহাদিগের মানসপটে জ্যোতিঃরূপে যাহা পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতেই তাহারা উদ্দেশ্যহীনের মত এখন আর মিছা ছুটাছুটী করিতে পারে না। যদিও এখনও তাহারা সর্ব্বসাধারণের মত সেই সাধারণ ঘূর্ণায়মান পর্ব্বত-পথ অবলম্বনেই উঠিতেছে, এখনও পূর্ব্বোক্ত দুর্গম ঋজু পথ সম্পূর্ণভাবে আশ্রয় করিতে সক্ষম হয় নাই; যদিও এখনও তাহারা সংসার-ক্রীড়ায় জনসাধারণের মত রত বলিয়া বোধ হয়, তথাপি তাহাদিগের কার্য্যপ্রণালী অপরের হইতে অনেক বিভিন্ন। কোনও বিজ্ঞান-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া একজন রসায়নবিদ্ পণ্ডিত ও একজন অজ্ঞ এই দুইটী লোকের কার্য্যপ্রণালী যগুপি তুমি অবলোকন কর, তাহা হইলে ঐ পূর্ব্বোক্ত বাক্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবে। দুইজনেই সমভাবে কার্য্য করিতেছে, নানা রাসায়নিক দ্রব্য পরস্পর সংমিশ্রণ করিতেছে, কখনও বা তাহাতে উত্তাপ দিতেছে, কখনও বা তুষার মধ্যে রাখিয়া শীতল করিতেছে; কিন্তু অবশেষে দেখা যাইতেছে যে, দুইজনের প্রক্রিয়ার ফল বিভিন্ন। একজন এই সামান্য প্রক্রিয়া হইতে এক অপূর্ব্ব রাসায়নিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিলেন, আর যে অনভিজ্ঞ, হয়ত তাহার মূর্খতার জন্য এমন একটী রাসায়নিক শক্তি উদ্ভূত হইল, যাহাতে তাহার প্রাণনাশের সম্ভব। এই মানব উন্নতি মার্গে ঠিক সেইরূপই হইয়া থাকে। মন্দিরের জ্যোতিঃ আসিয়া যাহাদিগের হৃদয়ে মাঝে মাঝে প্রতিফলিত হইতে থাকে, তাহাদিগের সম্পূর্ণরূপে আত্মবিস্মৃতি হয় না। একবার সেই জ্যোতিঃ কাহার হৃদয়ে প্রবেশলাভ করিলে, তাহার আভা তাহার সমস্ত কার্য্যকে রঞ্জিত করে। তাহারা অর্থোপার্জ্জন করিতেছে, পুত্র-পরিজনকে লালনপালন করিতেছে, এমন কি, তাহারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া আত্মপরিপুষ্টি করিতেছে, অথচ অপর সাধারণ হইতে তাহাদিগের কার্য্যে বেশ পার্থক্য লক্ষিত হয়। সবগুলিই যেন একটা কমনীয়, একটা মধুর আবরণে আবরিত; অপর সাধারণের মত ততদূর রুক্ষ, ততদূর কর্কশ, ততদূর অতৃপ্তিকর নহে। এইরূপে কখন ঘূর্ণায়মান পথ সাহায্যে, কখন বা দুর্গম ঋজুপথাবলম্বনে উঠিতে উঠিতে অবশেষে তাহারা

সাধারণ মানব অপেক্ষা, কি আধ্যাত্মিক উন্নতিতে, কি ধর্ম্ম অনুশীলনে, কি মানবের সেবাকার্য্যে, প্রকর্ষ লাভ করে। তাহারা বর্দ্ধমান গতিতে ঘুরিতে ঘুরিতে যেমন উর্দ্ধে আরোহণ করিতে থাকে, তাহাদিগের জীবন সঙ্গে সঙ্গে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে নিয়মিত হইয়া যায়।

শিষ্য।—গুরুদেব! আপনি এইমাত্র বলিয়া আসিলেন,—যে মার্গ অবলম্বন করিয়া সাধন-শৈলের তুঙ্গস্থানস্থিত বহিঃপ্রাঙ্গণে অল্পকাল মধ্যে উপনীত হইতে পারে, তাহার শিরোদেশে সুবর্ণবর্ণে "জীবসেবা" এ নামে রুচি লেখা আছে। আমি ইহাতে বুঝিয়াছিলাম, যে আপনাকে বিস্মৃত হইয়া আপনার উন্নতি বিস্মৃত হইয়া, পরার্থে চিন্তা ও পরার্থে আত্মবিসর্জ্জনই ঐ স্থানে তূণ আনয়নের কেবল একমাত্র উপায়। কিন্তু পিতঃ, আপনি এখন যাহা বলিলেন, তাহাতে আমার সন্দেহ উপস্থিত রহিয়াছে। আমার মনে হইতেছে, যেন মন্দিরের অমল ধবল আধ্যাত্মিক জ্যোতির আভাস হৃদয়ে ধারণ করিয়াও মানব কেবল আত্ম-সিদ্ধির জন্য ব্যগ্র থাকে। আত্মোন্নয়ন চিন্তায় পূর্ণ মানব-হৃদয়ে, জীবসেবার স্থান কোথায়, আমি দেখিতে পাইতেছি না। পিতঃ, অনুগ্রহ করিয়া আমার এই ঘোর সন্দেহ দূর করুন। আমার দ্বিতীয় সংশয় এই। স্বৈর-বৃত্ত নিয়মের আদেশাত্মক শাসনের ভিতর, আমি কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দেখিতে পাইতেছি না। শাস্ত্রের আদেশ তাহা ব্যতিরেকে আর কি? এই এই কার্য্য করিবে, এই কর্ম্ম কখন করিও না। এই গুলিকে পাপ বলে; এই সমস্ত পুণ্য কার্য্য। এইরূপ শাসনাত্মক উক্তি লইয়াই শাস্ত্র। শাস্ত্রের অর্থও ইহাই। এই সমস্ত সম্বন্ধহীন আদেশ পালনে মানবের যে কি প্রকারে, অভিব্যক্তি হইতে পারে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। অথচ দেখা যায় যে, ধর্ম্মের আদেশ পালনে মানব উত্তরোত্তর উন্নত হইতেছে। কিন্তু জগৎ পর্য্যালোচনা করিলে, দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রকৃতির নিয়ম অনুসরণ করিয়া সমস্ত জীবের ও পদার্থের অভিব্যক্তি হয়। তবে মানব সম্বন্ধে বৈপরীত্য কেন হয়?

(ক্রমশঃ)

শ্রীকিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

নির্গুণ ভক্তি ও বৃন্দাবনলীলা।

ভগবান্ কপিল দেব তাঁহার মাতা দেবহূতিকে ভক্তির চরম সিদ্ধান্ত শিক্ষা দিয়াছিলেন। বৃন্দাবনলীলা সেই সিদ্ধান্তের জাজ্বল্যমান উদাহরণ।

ভক্তি সগুণ ও নির্গুণ ভেদে দ্বিবিধ। স্বভাবের গুণে লোক তামসিক, রাজসিক বা সাত্ত্বিক। ভক্তিও বৃত্তি-ভেদে তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক।

হিংসা দম্ভ বা মাৎসর্য্য প্রণোদিত হইয়া লোক যে ভক্তি করে, তাহা তামসিক ভক্তি।

ভোগ, যশ বা ঐশ্বর্য্য লাভের জন্য লোক যে প্রতিমা পূজন বা অন্যরূপ পূজা করে, তাহাই রাজসিক ভক্তি।

কার্য্যক্ষয়ের জন্য, কিংবা ভগবানের প্রীতিলাভজন্য, কিংবা কেবল মাত্র ভগবানের বিধি পালন জন্য যে ভক্তি করা যায়, তাহা সাত্ত্বিক ভক্তি।

এই তিন প্রকার সগুণ ভক্তিতে ভিন্ন ভাব ও পৃথক্ ভাব আছে। হয়ত ঈশ্বরে আমরা ভিন্নভাব করি। মনে করি, শিব হইতে বিষ্ণু ভিন্ন। মনে করি, আমার ঠাকুর হইতে খ্রীষ্টানের ঠাকুর ভিন্ন। মনে করি, কোনও দেবতা কাহার ঠাকুর, অন্য দেবতা অন্যের ঠাকুর।

যদিচ এক ঈশ্বর অনুভব করিতে পারি, যদিচ ভক্তি জগতের এক ভগবান্‌কে লক্ষ্য করিতে পারি, তথাপি সগুণ ভক্তিতে ভক্ত ও ভগবান্ পৃথক্। চিরকালের জন্য ভক্ত ভগবান্‌কে দূর হইতে প্রণাম করিবে, সতত আপনার বিনয় জানাইবে এবং মনে মনে নানা ভাব উদ্দীপিত করিয়া ভগবান্‌কে সেই ভাবে রঞ্জিত করিবে। ভগবান্‌কে আপনা হইতে পৃথক্ রাখিয়াই ভক্তের আনন্দ। সগুণ ভক্তি সর্ব্বদা ভেদের অপেক্ষা রাখে, ভেদকে বিরাম করিতে পারে না। আমার ভগবান্ বলিয়া ভক্ত কত আব্দার করে, ভক্তের হৃদয়ে কত উচ্ছ্বাস হয়, কত আনন্দ-হিল্লোলে ভক্ত উন্মাদিত হয়।

নির্গুণ ভক্তির উদ্দেশ্য ভগবানে আত্মলয়, আপনাকে ভগবৎ-সমুদ্রে ঢালিয়া দেওয়া। ভক্ত এদিক্ দেখেনা, ওদিক দেখেনা, কাম জানেনা, ক্রোধ জানেনা, পিতা জানেনা, পুত্র জানেনা, পতি জানেনা, পত্নী জানেনা, বিষয়

জানেনা, যশ জানেনা, অনুরাগের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া সে একবারে ভগবৎ-সমুদ্রে গিয়া পড়ে।

মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতি রবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥

আমার গুণ শ্রবণ মাত্র যখন মনের গতি অবিচ্ছিন্ন হইয়া আমার প্রতি ধাবিত হয়, তখনই নির্গুণ ভক্তির উদয় হয়। ভুলিয়া মন বিষয়ের দিকে যায় না, মনোগতির বিচ্ছেদ হয় না।

মন অনন্ত পথে ভগবানের দিকে প্রবাহিত হইতেছে। দুই পার্শ্বে প্রলোভনময় বিষয়ের কূল। কোথাও লাবণ্যময়ী পূর্ণযৌবনা সুন্দরী "প্রাণনাথ কোথায় যাও" বলিয়া চীৎকার করিতেছে। কোথাও বিলাসময় আনন্দ-ভবন আপনার বিচিত্র বক্ষোদেশ দেখাইতেছে। কোথাও যশের পতাকা উড্ডীয়মান হইয়া আরও উর্দ্ধদেশ দিয়া লক্ষ্য করিতেছে। চতুর্দ্দিকে মায়ার বিচিত্রজাল বিস্তৃত রহিয়াছে। ভক্ত দেখিয়াও দেখিতেছে না, শুনিয়াও শুনিতেছে না। তাহার হৃদয় আবেগে পূর্ণ। ভগবানের যে অপ্রাকৃত গুণ শুনিয়াছে, সেই গুণে তাহার মন আকৃষ্ট। মন একমনে ভগবান্‌কে অবলম্বন করিয়াছে। আর কি পুতুলের খেলায় মন দেয়?

দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

মায়ার পুতুল ত তিনিই সাজিয়ে রেখেছেন। মায়াত তাঁহার সেবাদাসী মাত্র। আজ ভক্তের মন যে তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছে, মায়ার ভেল্‌কিতে ভুলিবে কেন? সেই অবিচ্ছিন্ন মনোগতি যেন পবিত্র গঙ্গার ধারা। কুলু কুলু রবে ভগবদ্গুণ গান করিতে করিতে সুরধুনী গঙ্গা অবিচ্ছিন্ন গতিতে সমুদ্রের অভিমুখেই ধাবিত হইতেছে।

এ ভক্তি অহৈতুকী। কোন প্রয়োজনের উদ্দেশ করিয়া, ভক্ত আপন হৃদয় অর্পণ করে না। ভগবানের কাছে তাহার কোন প্রার্থনা নাই। সে ধন চাহে না, পরিজন চাহে না, যশ চাহে না, ঐশ্বর্য্য চাহে না। তাহার পূজা নাই

তাহার অর্চ্চনা নাই, তাহার কর্ম্ম নাই। সে আপনাকেও চাহে না। সে চায় কেবল অবিচ্ছিন্ন ভগবদ্ভাবনা। ভগবান্‌কে ভাল লাগে তাই তাব সেরূপ ভাবনা।

এ ভক্তি অব্যবহিতা ভক্তি। শত ব্যবধান থাকিলেও ভক্ত সকল ব্যবধান অতিক্রম করিয়া ভগবৎ-সমুদ্রে প্রবেশ করে। বেগবতী স্রোতস্বতীর গতি কোন্ বৌল বোধ করিতে পারে? কোন্ নদীকে আজ এ পর্য্যন্ত কে সমুদ্র যাত্রায় বাধা দিতে পারিয়াছে? আজ দুরন্ত সংসার ভক্তের পদনত। আজ ত্রিগুণময়ী মায়া ভক্তের গতি রোধ করিতে পারেনা। নির্গুণ ভক্তিতে যখন ভক্তের হৃদয় দ্রব হয়, তখন ভগবানের সহিত তাহার ব্যবধান থাকা অসম্ভব। এ ভক্তি দৈবী গুণময়ী মায়ার অপর পারে। সেখানে মহামায়া যোগমায়া ভগবতী নিত্য ভক্তকে ভগবানের সহিত-মিলাইয়া দেন।

এই ভক্তির স্রোতে মুক্তিরূপ অপরূপ কুসুমনিচয় ভাসিয়া যায়। ভক্ত হাত বাড়াইলেই সেই সকল কুসুম পাইতে পারেন। কিন্তু ভক্ত এই সকল দুর্লভ বস্তু দেখিলেই চমকিয়া যান। ছি! ছি! আবার ঐশ্বর্য্য, আমি ভগবৎপ্রেমে আত্মহারা, আমার এই মুক্তিরূপ ব্যবধান কণ্টক স্বরূপ। আমি সকল ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি. শেষে কি আমি মুক্তির মায়ায় ভুলিয়া থাকিব।

সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্ব মপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

আমার ভক্ত মুক্তি চাহেনা। তাহাকে হাতে হাতে মুক্তি দিলেও সে ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়। সে চাহে কেবল আমাকে, সে চাহে কেবল আমার সেবা। সে আপন অঙ্গ আমার অঙ্গে ঢালিয়া দিয়া আমার সেবা করিতে চায়। সে আত্মহারা হইয়া, কেবল আমারই রূপ ধারণ করে, ও আমারই লীলার অনুকরণ করে। সে আমাকে কোন কাজ করিতে দেখিলে, অমনই অগ্রগামী হয়।

সংকর্ষণ যেমন বাসুদেবের সেবা করেন, ভক্ত কেবল সেই রূপ সেবা করিতে চাহেন।

"গমনের: কালেছত্র বসিতে আসন বস্ত্র
শয়নের কালে হয় শয্যা।
প্রলয়ে সে বট পত্র মহারণে দিব্য অস্ত্র
নানা রূপে করে পরিচর্য্যা॥"

স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতি ব্রহ্ম ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥

এই ভক্তি-যোগই আত্যন্তিক ভক্তি-যোগ। ইহাই ভক্তি-যোগের চরম। এই ভক্তি-যোগ দ্বারাই ভক্ত ত্রিগুণময়ী মায়া অতিক্রম করিতে পারে। নতুবা ত্রিগুণের মধ্যে থাকিয়া কিরূপে ত্রিগুণ অতিক্রম করিবে? ত্রিগুণ অতিক্রম করিলেই ভক্ত ভগবদ্ভাবে পূর্ণ হইতে পাবে।

কথাটি অতি সহজে বলা হইল। ত্রিগুণ অতিক্রম করা কি সহজ কথা? সকল বাধায় অতিক্রম কি সাধ্য। সকল বন্ধনেব ছেদ কি ভক্ত আপন বলে করিতে পারে? অসম্ভব হইলেও সম্ভব—সে কেবল ভগবানেব প্রতিজ্ঞার জন্য। ভক্ত যখন ভগবানে গা ঢালিয়া দেয়, ভগবান্ তখন তাহাকে হাতে তুলিয়া লন্।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পবিত্যজ্য মামেকং শবণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

ভগবানের এই প্রতিজ্ঞা বৃন্দাবনলীলায় সম্পূর্ণ সফল হইয়াছিল। এই নির্গুণ ভক্তির আলোচনা করিতে হইলে, বৃন্দাবনলীলার আলোচনা করিতে হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

মহামায়ার খেলা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পব)

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ত্রয়োদশীব দিন প্রাতে যথা সময়ে পাল্কী বেহাবা বামপুর হইতে বনগ্রাম আসিয়া দেখিলেন যে, ঘরে কেহ নাই। জগুদিদি এ সংবাদে আশ্চর্য্য হইয়া কাঁদিয়া গ্রামের লোক জড় করিল। সকলেই অবাক্

হইয়া ভাবিতে লাগিলেন ও পরিশেষে পুলিসে খবর দিয়া কর্ত্তব্যের শেষ করিলেন। পুলিসও ডায়রীতে লিখিয়া রাখিলেন।

বীরেন্দ্র বাবু এ সংবাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র অনুসন্ধান করিলেন। দিনের পর দিন সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলিয়া গেল—কোন সন্ধান হইল না। গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে লোক প্রেরিত হইল কোনই ফল হইল না। এমন কি বীরেন্দ্র বাবু সেই বৃন্দাকে সঙ্গে করিয়া, বহুদিন অনুসন্ধান করিলেন কিন্তু কোথাও হেমলতার সন্ধান পাওয়া গেল না। কিন্তু তিনি এ বিষয়ের চিন্তা হৃদয় হইতে দূর করিতে পারিলেন না।

একদিন তিনি এ বিষয়ের চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার প্রতিবেশী বৃদ্ধ জনার্দ্দন রায় তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "কি ভাবিতেছ?" বীরেশ্বর বাবু বলিলেন,—"কি আর ভাবিব! সংসারে আমাদের বাঁচিয়া থাকা বিড়ম্বনা। একে আমরা বয়ঃপ্রাপ্ত, তাহাতে শোকগ্রস্ত পুত্রবধূটী থাকিলেও এ অবস্থায় সেবা-শুশ্রূষা করিলেও কথঞ্চিৎ আরাম পাইতাম।"

"যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার জন্য অনুশোচনা বৃথা।"

বীরেশ্বরবাবু বলিলেন, "সেত বুঝি, কিন্তু তবুও এখনও মনের ভিতর হইতে কোনরূপ শান্তি পাই না।"

জনার্দ্দন। "আচ্ছা এই যে একটি নবীন সন্ন্যাসী আসিয়াছে, তাহার দ্বারা গণনা করাইলে হয় না? আহা; সন্ন্যাসিটী অতি অমায়িক। সর্ব্বাঙ্গে ভস্মলেপিত, ভস্মের ভিতর দিয়া যেন অপরূপ জ্যোতি নির্গত হইতেছে। আমি সেখানে গিয়াছিলাম—ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকল কথাই সে বলিয়া দেয়। ধর্ম্ম বিষয়ে মহা পণ্ডিতও বটেন। বহু লোক সেখানে যাতায়ত করিতেছে।

বীরেন্দ্র। আমি ভাই ওসব কথায় বিশ্বাস করি না। অনেক সন্ন্যাসী দেখিলাম, প্রায় সবই ভণ্ড; একজনা আসিয়া আমার বাটী হইতে অর্থ উঠাইয়া দিবে বলিয়া কিছু লইবার চেষ্টা করিয়াছিল, অবশেষে বেগতিক দেখিয়া 'বাঘের টাটকা পিত্ত জোগাড় করুন' বলিয়াই পলায়ন! আর এক জন আমার বৈঠক-খানায় আড্ডা নিল। সোনা তৈয়ার করিয়া দিবে বলিয়া, কয়েক দিন থাকিয়া কিছু লইয়াই প্রস্থান! আমি অনেক দেখিলাম প্রায়ই ভণ্ডের দল।

জনার্দ্দন। অবশ্য আমি এ কথা অস্বীকার করিনা, কিন্তু তাই বলিয়া

যে প্রকৃত সন্ন্যাসী নাই তাহা আমি বলিনা। যার নকল আছে, তাহার আসলও আছে।

বীরেন্দ্র। তা অবশ্যই আছেন, কিন্তু তাঁহারা প্রায়ই লোকালয়ে আসেন না। আসিলেও, আপনাকে এরূপভাবে জাহির করেন না।

জনার্দ্দন। জাহির হ'ল কিসে। লোকের হিতের জন্যই তাঁহাদের এ ব্রত গ্রহণ। নতুবা এই সকল মহা পুরুষদের আর কি আবশ্যক?

বীরেন্দ্র। দেখ ভাই, আমার অদৃষ্ট মন্দ, তাই ভাল সন্ন্যাসী চোখে পড়েনা। যত দেখিলাম সবই কপট। ঔষধ দিতে পারিলেই সন্ন্যাসী হয়না, ভেকি দেখাইয়া মানুষের চোখে ধূলা দিতে পারিলেই সাধু হয়না।

জনার্দ্দন। তা ভাই তুমি যাই বল, এ সন্ন্যাসীটী অতি উচ্চ দরের আর এঁর সরল ভাব বড়ই প্রীতিকর। তুমি একবার চল, তাঁহাকে দেখিলেই মুগ্ধ হইবে।

বীরেন্দ্র। তোমার যে অগাধ বিশ্বাস! চল যাই রাত তো বেশী হয়নি।

দুই জনে তথায় গমন করিলেন। তখনও লোকের ভিড় কিছুমাত্র কমে নাই। তাঁহাদিগকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে সকলেই পথ ছাড়িয়া দিলেন। উভয়ে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন। সন্ন্যাসী সহাস্য-বদনে জনার্দ্দন বাবুর কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন; তিনি বীরেন্দ্র বাবুর কথা তুলিয়া, তিনি এস্থানের জমিদার ও অমায়িক স্বভাব প্রভৃতি ভূমিকা দ্বারা তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিলেন।

সন্ন্যাসী মনোযোগ দিয়া শুনিয়া ধীর ভাবে বলিলেন যে, আপনার সাক্ষাতে পরিতোষ লাভ করিলাম। আপনারা সৌভাগ্যবান ও ভগবানের কৃপাপাত্র; আপনি বোধ হয় গীতা পড়িয়াছেন, ভগবান্ বলিয়াছেন—

"শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টো বাচয়তে"

আপনারা যোগভ্রষ্ট আপনাদের দর্শনে পুণ্যসঞ্চয় হয়। বীরেন্দ্র আত্ম-প্রশংসায় একটু সন্তুষ্ট হইয়া ও অল্পবয়সে গীতার শ্লোক শুনিয়া তাঁহাকে শাস্ত্রদর্শী বিবেচনা করিয়া প্রীত হইলেন। প্রকাশ্য বলিলেন—"ওরূপ বলিবেন না, আমরা সর্ব্বদাই বিষয় লইয়া মত্ত ও মহাপাপী। নতুবা

একমাত্র পুত্র অকালে হারাইব কেন? আপনাদেব নিজেব প্রয়োজন না থাকিলেও, কেবল আমাদেব ন্যায় মলিনচিত্ত ব্যক্তিব হিতার্থে লোকালয়ে আগমন করিয়া থাকেন। আপনাব দর্শনে দেহ পবিত্র হইল। দুই এক দিন অবস্থান করুন, আপনাব জ্ঞানগর্ভ উপদেশে মনেব মলিনতা দূব হউক।

সন্ন্যাসী। আপনাব বিনীত বচনে পবম সন্তুষ্ট হইলাম। সৎ পুরুষদিগেব স্বভাবই এইরূপ। আপনাব ন্যায় ব্যক্তিরা গৃহস্থাশ্রমেব মর্য্যাদা যথার্থ রক্ষা কবেন। এবাব থাকিবাব উপায় নাই, কল্য প্রত্যুষে এখান হইতে যাত্রা করিব। যদি আপনাদের সদিচ্ছায় ও ভগবানেব অনুগ্রহে উত্তবাখণ্ড পবিভ্রমণ কবিয়া ফিরিয়া আসি, আপনাব গৃহে অতিথি হইয়া অনুগৃহীত হইব।

এইরূপে সন্ন্যাসীব মিষ্টালাপে সন্তুষ্ট হইয়া বীবেন্দ্র বাবু পাথেয়-স্বরূপ কিছু প্রদান করিতে চাহিলেন। সন্ন্যাসী কিছুই গ্রহণ কবিলেন না, বলিলেন, "গুরুব আদেশ নাই। আমবা কেবল সামান্য আহাবীয় মাত্র গ্রহণ কবিয়া থাকি। সন্ন্যাসেব নিয়ম বড় কঠোব তবে আনন্দ আছে।"

বীবেন্দ্র। শুনিয়াছি যে আপনাব জ্যোতিষ ভালরূপ জানা আছে।

সন্ন্যাসী। ভাল জানা নাই, তবে দাক্ষিণাত্যে অবস্থান-কালে স্বামী অতুলানন্দেব নিকট কিঞ্চিৎ অধ্যয়ন কবিয়াছি, তবে অনেক সময় গণনায় ভুল হইয়া যায়। যদি আপনাব কোনও প্রশ্ন থাকে বলিলে আমি চেষ্টা কবিয়া দেখিতে পাবি। জ্যোতিষ শিক্ষা লোকহিতার্থ,—নতুবা আমাব কি আবশ্যতা আছে?

বীবেন্দ্র। আমাব প্রশ্নটী একটু গুরুতব—একটু গোপনে হইলেই ভাল হয়। এই কথা শুনিয়া তথায় যে কয়েক জন লোক উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাবা গাত্রোত্থান কবিয়া দূবে চলিয়া গেলেন।

সন্ন্যাসী বলিলেন "বলুন এইবাব।"

বীবেন্দ্র। সন্ন্যাসী নাবায়ণ, তাঁহাব নিকট কোন কথাই গোপন কবিতে নাই। আমাব পুত্রেব মৃত্যুব কথা আপনাকে বলিয়াছি। পুত্রবধূটী কিছু দিন হইল কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়াছে,—অনেক অনুসন্ধানেও কোন সন্ধান হইল না।

সন্ন্যাসী পুত্র ও পুত্রবধূর নাম জিজ্ঞাসা কবিবা অনেকক্ষণ স্থিবভাবে

চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে সন্ন্যাসী বলিলেন যে, কথা বড় গুরুতর। সে কোথায় আছে জানিয়া আবশ্যক নাই। তাহার চরিত্র সম্বন্ধে আমি সন্দিহান। আমার মতে তাঁহাকে আর গৃহে স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

বীরেন্দ্র। সে কথা কি বলিতে ঠাকুর? তাহার মুখ পর্য্যন্ত দর্শন করিব না। সে পাপিষ্ঠার আর নামও করিব না।

সন্ন্যাসী। দেখুন বীরেন্দ্রবাবু আপনার পুত্রের ত যোগী হওয়ার লক্ষণ দেখিতেছি।

বীরেন্দ্র। ঠিক বলিয়াছেন। পুত্রটী আমার যোগভ্রষ্ট। ওরূপ চরিত্রবান্ যুবক সংসারে বিরল। কুক্ষণে তাহাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইলাম সেখানে তাহার অপমৃত্যু ঘটিল।

সন্ন্যাসী। দুঃখ করিবেন না "জাতস্য হি ধ্রুবোমৃত্যুঃ" মৃত্যুর হাত কেহই এড়াইতে পারে না। আপনারা জ্ঞানী এ বিষয়ে আর শোক করিবেন না।

এইরূপে নানা কথা-বার্ত্তার পর বীরেন্দ্রবাবু ও জনার্দ্দন রায় সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন। সন্ন্যাসীকে প্রাতঃকালে আর দেখা গেল না। কিছুদিনের মধ্যে বীরেন্দ্রবাবু বিষয়ের সুবন্দোবস্ত করিয়া, সপরিবারে কাশী যাত্রা করিলেন। উদ্দেশ্য,—জীবনের অবশিষ্ট সময় শোকতাপ ভুলিয়া তথায় অতিবাহিত করিবেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

যখন হেমলতা সেই নরপিশাচের হস্ত হইতে উদ্ধার হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করেন, তখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান প্রায় একরূপ লোপ পাইয়াছিল। কঙ্করময় কণ্টককুল প্রান্তরের মধ্য দিয়া কতদূর চলিলেন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

কিঞ্চিৎ আত্মজ্ঞান হৃদয়ে জাগ্রত হইলে, একবার ভাবিলেন, চীৎকার করি, কিন্তু আবার ভাবিলেন চীৎকার করিয়াই বা লাভ কি? এতরাত্রে এই গভীর অরণ্যে কে আমার জন্য বসিয়া আছে? আবার ভাবিলেন, পাষণ্ড নবকুমার চীৎকার শুনিয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে পারে।

এইরূপ নানাবিধ চিন্তা 'করিতে করিতে' হেমলতা একটি জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন। জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিয়া পথ নিরূপণ করিতে পারিলেন না। একস্থানে কিছুক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং অল্পক্ষণ পরেই রাত্রি প্রভাত হইলে ইতস্ততঃ ঘুরিতে ফিরিতে একটি সংকীর্ণ পথের রেখা দেখিতে পাইলেন। সেই পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। বন ক্রমে নিবিড় বৃক্ষশ্রেণীদ্বারা পরিবেষ্টিত বোধ হইতে লাগিল, সেই গভীর বনমধ্যে যাইতে যাইতে এক একবার হেমলতার মনে ভীতির সঞ্চার হইতে লাগিল। ভাবিলেন, এ বনে ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি হিংস্রজন্তু থাকা সম্ভব। কিন্তু আবার ভাবিলেন হিংস্রজন্তুর দ্বারা বিনষ্ট হওয়া বরং শ্রেয়ঃ তথাপি পিশাচের হস্ত হইতে ত রক্ষা পাইব। এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিতে করিতে ক্রমে অগ্রসর হওয়াতে বৃক্ষশ্রেণী ক্রমশঃ এত ঘনসন্নিবিষ্ট দেখা যাইতে লাগিল যে, হেমলতা অতি কষ্টে সেই অস্পষ্ট পথ-রেখা অনুসরণ করিতে লাগিলেন। সেই নিবিড় জন-সমাগম-শূন্য হিংস্র ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি সমাকুল অরণ্যে একাকী গমন করা সহজ নহে। হেমলতা অগত্যা নির্ভীক হৃদয়ে সাহসে বুক বাঁধিয়া প্রায় অর্দ্ধক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া, ক্ষত-বিক্ষত শরীরে একটি অপ্রশস্ত প্রাঙ্গণ-সদৃশ উন্মুক্ত প্রান্তরে উপনীত হইলেন। তথায় স্বচ্ছ-সলিল-পূর্ণ একটি সরোবর দৃষ্ট হইল। তীরগুলি পাথরে বাঁধান। কিন্তু কালের পরাক্রমে স্থানে স্থানে পাথরগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পাথর-বাঁধান ঘাটটী ভগ্নপ্রায়। চারিদিকে ঘনসন্নিবিষ্ট বিটপীরাজি ও ঘনবিন্যস্ত লতাশ্রেণী। সরোবরটী আকাশের নীলিমায় রঞ্জিত ও প্রকটিত কমল-কুমুদ-সৌন্দর্য্যে সুশোভিত। সূর্য্যের প্রাতঃ রশ্মি বৃক্ষশিরে, লতাপল্লবে ও পার্শ্বস্থিত মন্দিরের সমুন্নত শিখরে যেন হাসিতেছিল। স্থানটি এমনি মনোরম যে, হেমলতা তথায় উপস্থিত হইবামাত্র সংসারের সকল দুঃখ, সকল যন্ত্রণা ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার তাপদগ্ধ হৃদয় কে যেন অমৃত-প্রলেপে স্নিগ্ধ করিল। আত্মগ্লানির তীব্র কষাঘাত এবং দুশ্চিন্তার অসহ্য তাড়না এবং ভবিতব্যের নৈরাশ্যচিত্র ক্ষণকালের জন্য যেন তাঁহার তমসাচ্ছন্ন হৃদয় হইতে অপসারিত হইল। একে প্রকৃতি অপূর্ব্ব ধৈর্য্যময়ী-বিলাসমূর্ত্তি তদুপরি যেন দৈবীশক্তির পুণ্যময়

আকর্ষণ। হেমলতা সেইস্থানে উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহার মৃতকল্প প্রাণ যেন কি এক অপূর্ব্ব ভাবে উদ্বেলিত হইল।

মন্দিরের দ্বারে গিয়া হেমলতা দেখিলেন—

সম্মুখে—

মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাং॥
ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীং।
শবরূপমহাদেবহৃদয়োপরি সংস্থিতাং॥

প্রতিমার সম্মুখে পঞ্চদশ বর্ষীয়া অপরূপ লাবণ্যময়ী ভৈরবী গভীর ধ্যানে মগ্না। তাঁহার শরীরস্থ তেজে যেন চতুর্দ্দিক আলোকিত। নবযৌবন-সম্পন্না গৈরিক-বসন-পরিহিতা ভস্ম-রুদ্রাক্ষ-বিভূষিতা, জটাজুট-বিলম্বিনী জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া হেমলতা একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন।

ভৈরবীর ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি সাষ্টাঙ্গে পাষাণময়ী মূর্ত্তির উদ্দেশ্যে বলিতে লাগিলেনঃ—

নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে
নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে।
নমস্তে জগদ্বন্দ্য পদারবিন্দে
নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহিদুর্গে॥

* * *

অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য,
ভয়ার্ত্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তো।
ত্বমেকা গতির্দ্দেবী নিস্তারদাত্রী
নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে॥

ওঁ সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমোস্তুতে॥

ভৈরবী প্রণামান্তে গাত্রোত্থান করিয়া সম্মুখে দেখিলেন একটি সুন্দরী যুবতী দণ্ডায়মানা। বিধবা বলিয়াই তিনি অনুমান করিলেন। তখন হেমলতা

কেবল মনে মনে ভাবিতেছিলেন "ভয়ার্ত্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তো" সহসা বিজন প্রান্তরে একটি অল্পবয়স্কা রমণী মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া ভৈরবী বলিলেনঃ—"মা তুমি কে? ভয়সঙ্কুল অরণ্যে কে তোমায় লইয়া আসিল?" হেমলতা বিনিত বদনে বলিলেন—মা আমি বড়ই দুঃখিনী হতভাগিনী। আমার পিতা নাই, মাতা নাই, আমার সহায়-সম্পদ কেহই নাই। ভগবানের কৃপায় অনন্ত সৌন্দর্য্যময় পরম-দেবতা-ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য স্বামীর অনন্ত ভালবাসা অতলস্পর্শ প্রেমের অধিকারিণী হইয়াও কপাল ক্রমে ও কর্ম্মদোষে তাঁহাকে হারাইয়াছি। অবশেষে বলিতে লজ্জা কি এক নরপিশাচের কবলে পতিত হইয়া স্ত্রীলোকের সর্ব্বস্ব সতীত্ব রত্নও বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছিলাম। জানিনা কাহার করুণায় তথা হইতে কোনরূপে পলায়ন করিয়া এই বিজন অরণ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। মা আমাকে আশ্রয় দিন, আমি বড়ই বিপদগ্রস্ত।

ভৈরবী—"মা এখানে কোন ভয় নাই। ইহা দেবতার স্থান। এখানে নিরাপদে থাকিতে পার। তোমার সমস্ত বৃত্তান্ত পরে শ্রবণ করিব। ঐ সরোবর হইতে পদ প্রক্ষালন করিয়া আইস তোমার মুখ শুষ্ক বোধ হইতেছে। একটু ফলমূল আহার করিয়া একটু জল খাও। তুমি যখন ধর্ম্মপথ হইতে স্খলিত হও নাই, তখন তোমার কোন চিন্তা নাই! মা তোমার মঙ্গল করিবেন। যাও মা হাত পা ধুইয়া আইস।"

হেমলতার বাস্তবিকই বড়ই পিপাসা পাইয়াছিল। স্বচ্ছ সরোবরের নির্ম্মল সলিলে অবগাহন করিয়া প্রাণে যেন কত শান্তি পাইলেন।

স্নান করিয়া আসিলে, ভৈরবী এক খানি গৈরিকবসন পরিধান করিতে দিলেন। হেমলতা বস্ত্র পরিধান করিয়া কিঞ্চিৎ প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। ভৈরবী বলিলেন—"মা তুমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর। মায়ের ভোগ হওয়ার পর প্রসাদ পাইবে। সমস্ত রাত্রি নিদ্রা নাই। একটু বিশ্রাম করগে।"

হেমলতা একটী বৃক্ষের ছায়ায় নিজ অঁাচল পাতিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

(ক্রমশঃ)

ঈশ্বরের স্বরূপ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতেব পব)

শাস্ত্রের মত এই যে শাস্ত্র-কথিত নির্ধর্ম্ম নিগুর্ণ ব্রহ্মের উপাসনা হয় না। তবে শাস্ত্রে অধ্যাত্মযোগাধিগম্য বলিয়া এই ব্রহ্ম অবস্থাকে নির্দ্দেশ কবিয়াছেন। কিন্তু সেই অধ্যাত্মযোগ বিষয়টা কি, তাহা বুঝিতে পাবিলেই ইহা সুন্দবরূপে প্রতীয়মান হইবে যে, আমাদেব ন্যায় বিষয়াসক্ত মানবেব পক্ষে ঐ অধ্যাত্ম যোগ কথাটা পাগলেব প্রলাপবৎ। প্রাচীন ঋষি সমাজেও এই অধ্যাত্ম-যোগাবলম্বী যোগীব সংখ্যা খুব বেশী ছিল বলিয়া বোধ হয় না। শ্রুতি এই অধ্যাত্মযোগেব প্রতি লক্ষ্য কবিয়া বলিয়াছেন—

ক্ষুবস্য ধাবা নিশিতা দুবত্যযা
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।

যেমন ক্ষুবেব নিশিত ধাব দিয়া গমন কবা দুঃসাধ্য মুনিগণ বলেন এই অধ্যাত্ম-যোগেব পথও সেইরূপ দুর্গম। শঙ্কবাচার্য্য তাঁহাব ভাষ্যে অধ্যাত্ম-যোগ এই প্রকাবে ব্যাখ্যা কবিয়াছেন—

"বিষয়েভ্যঃ প্রতি সংহৃত্য চেতসঃ আত্মনি সমাধানম্।"

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি বাহ্যজগৎ হইতে প্রতিনিবৃত্ত কবিয়া আত্মায় লীন কবার নাম সমাধি-যোগ অথবা অধ্যাত্ম-যোগ। সেই পবম আত্মাকে পাইতে হইলে ইন্দ্রিয় শক্তিকে বিষয় হইতে সংহৃত কবিয়া মনে; মনকে বিষয় হইতে সংহৃত কবিয়া বুদ্ধিতে, বুদ্ধিকে মহত্তত্বে ও মহত্তত্বকে প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতিকে আত্মা বা ব্রহ্মে লীন কবিতে হইবে। ইহা আমাদেব ন্যায় কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত মানবেব অবলম্বনীয় নহে। যাহাবা দিবাবাত্র কেবল বিষয় লইয়া ক্রীড়া কবিতেছেন, তাহাদেব মুখে শাস্ত্রীয় নিবাকাব নিগুর্ণ উপাসনা অথবা অধ্যাত্ম যোগের কথা প্রলাপ বৈ আব কি?

বামকৃষ্ণ পবমহংসদেব বলিয়াছিলেন—"তাকে ইন্দ্রিয় দ্বাবা বা এই মনের দ্বাবা জানা যায় না। যে মনে বিষয় বাসনা নেই—সেই শুদ্ধ মনেব দ্বাবা তাঁহাকে জানা যায়।" অধ্যাত্ম-যোগ এরূপ কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী মহা-পুরুষের পক্ষেই সম্ভব।

শাস্ত্রে যেখানে নির্গুণ উপাসনার কথা বলিয়াছেন, সেখানেই এই শাস্ত্রীয় অধ্যাত্ম-যোগের কথা বলিয়াছেন। সগুণ ঈশ্বরের উপাসনা ও এই অধ্যাত্ম-যোগ বা ব্রহ্মজ্ঞান আকাশ পাতাল প্রভেদ। এই অধ্যাত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্র বলিয়াছেন—"অয়ন্তু পরমো ধর্ম্ম যদ্ যোগে নাত্মদর্শনম্।" "নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।" "জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে।" সমাধি-যোগের দ্বারা অর্থাৎ জীব যখন এই বহির্বাজ্য সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া এবং বাসনা প্রভৃতি লয় পূর্ব্বক প্রকৃতির পর স্তরে আরোহণ করিতে সক্ষম হন, তখন আত্মদর্শন হয়। আমাদের আত্মা যখন বাসনা প্রভৃতি শূন্য হয়েন, তখন তিনি ব্রহ্ম।

মানব আত্মা ও পরমাত্মা একই পদার্থ। "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" (মাণ্ডুক্য উপনিষদ্) এই জীব আত্মা ব্রহ্ম। এখানে "নহি জ্ঞানেন সদৃশং" পদে যে জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে তাহা এই আত্মদর্শন বা ব্রহ্মজ্ঞান। যখন এই জ্ঞান উপস্থিত হয় তখন আমি ও ব্রহ্ম যে পৃথক্ পদার্থ এরূপ দ্বৈত ভাব থাকে না, জীব শিব হয় এবং জন্ম মৃত্যুর হাত এড়াইয়া পুরুষ জীবন্মুক্ত হন। কাজেই শাস্ত্রীয় নির্গুণ উপাসনা বা অধ্যাত্ম-যোগ আমাদের ন্যায় বিষয়াসক্ত বহির্বাজ্য বিচরণশীল মানবের অবলম্বনীয় নহে। এ পথের অধিকারী একালে কেহ আছেন কি না সন্দেহ, থাকিলেও তাঁহাদের সংখ্যা অতি কম।

এই অধ্যাত্ম-যোগের অধিকারী নির্ব্বাচন করিতে গিয়া বেদান্তসার বলিতেছেন—অধিকারী তু বিধিবদধীত বেদবেদাঙ্গত্বেনাপাততোঽপি গতাখিল বেদার্থোঽস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা কাম্য নিষিদ্ধ বর্জ্জন পুরঃসরং নিত্য নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্তোপাসনানুষ্ঠানেন নির্গত নিখিল কল্মষতয়া নিতান্ত নির্ম্মল স্বান্তঃ সাধন চতুষ্টয় সম্পন্নঃ প্রমাতা।

"যিনি বিধিপূর্ব্বক (আজ কালকার ধরণে নহে) বেদ বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়া আপাততঃ অখিল বেদার্থ অবগত হইয়াছেন, যিনি ইহ জন্মে কিম্বা পূর্ব্ব জন্মে কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম বর্জ্জন পূর্ব্বক, সন্ধ্যা বন্দনাদি নিত্য কর্ম্ম, যাগ যজ্ঞাদি নৈমিত্তিক কর্ম্ম, পাপ ক্ষালন জন্য প্রায়শ্চিত্ত-উপাসনাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা সর্ব্ব প্রকারে পাপ হইতে বিমুক্ত ও নিতান্ত নির্ম্মল চিত্ত হইয়াছেন যিনি সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন ব্যক্তি তিনি অধ্যাত্ম যোগের অধিকারী।

যিনি ব্রহ্ম নিত্য বস্তু ও অন্য সকল অনিত্য পদার্থ ইহা অসংসন্নিতরূপে বুঝিয়াছেন, যিনি ইহ কি পরকালে বিষয় ভোগে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ হইয়াছেন, যিনি শম দম ইত্যাদি গুণ সম্পন্ন এবং যাহার বিষয়ানুরাগ সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হইয়া মোক্ষ লাভের জন্য একান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে, তিনিই সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন ব্যক্তি। নিত্যানিত্য বস্তু বিবেকেহামুত্র ফলভোগ বিরাগ শমদমাদি সম্পন্মুমুক্ষত্বম্ (বেদান্ত সার)।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীচরণ সেন।

নাদ অনাহত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

৩১

মহা জ্ঞানে জ্ঞানী
মহাত্মা যাঁহারা,
শুনিয়া মায়ার
মোহকরী ধ্বনি,
বিমোহিত কভু
না হন তাঁহারা,—
জানেন মায়ার
কি লীলা মোহিনী।

৩২

যিনি দেন দ্বিতীয় জনম,
খুঁজ তারে কবি পাতি পাতি,
বিজ্ঞানের মন্দির মাঝারে,
যথা জ্বলে পূর্ণ সত্য-বাতি।

সত্যরূপী সেই আলোকের
বৃদ্ধি নাই, কভু নাই হ্রাস,
ছায়ারূপী মায়া মূর্ত্তি যত
তার কাছে না হয় প্রকাশ।

৩৩

যাঁর সৃষ্টি হয় নাই,　　শুন শিষ্য কহে যাই,
অজ নাম জানিও তাঁহার,
বিজ্ঞান মন্দিরে আর,　　হৃদয় মন্দিরে তাঁর
বিরাজিত মোহন আকার।
শুন প্রিয় কহি আমি,　　যদি পুত্র চাহ তুমি
বিজ্ঞানের, হৃদয়ের অজের মিলন,
অবিদ্যা করিয়া নাশ,　　ফেলো সেই কৃষ্ণবাস,
যাহা শিষ্য আছ তুমি করিয়া ধারণ।
কৃষ্ণবাস তেয়াগিলে,　　দেহ-ধ্বনিঃ শুদ্ধ হ'লে,
ইন্দ্রিয়ের সৃষ্ট মূর্ত্তি আসি,
এরূপ হইলে পরে　　যেন শিষ্য চিরতরে
রাধা লয়ে এক হয়ে সদা,
সে অনন্ত শ্রীনিবাস　　করিবেন মহারাস
অতি দূরে পলাইবে বাধা।
বিজ্ঞান মন্দির হতে,　　অজ্ঞানতা বুঝে লয়ে
দূরে যেও পলাইয়া ধীরি ধীরি, পায় পায়;
অতি মনোরম সেই　　মন্দির-সৌন্দর্য্য হেরি,
থাকিও না মুগ্ধ হয়ে পরমাত্মা পরিহরি;
কর' শিষ্য দৃঢ় মন,　　হেথাকার প্রলোভন,
এনে ফেলে বিপদের রাশি;
যাদুকরী মায়া-বালা　　গাঁথি কুসুমের মালা,
গাহে লয়ে মোহকরী বাঁশী।

কহি শিষ্য পুনর্ব্বার ইহাই জ্ঞানের দ্বার,
সাধনার পথ মাঝে শিখিবার স্থান ;
কিন্তু শিষ্য মনে রেখ এক দণ্ড নাহি থেক
সাবধান সাবধান করি সাবধান ;—
সে পুরের মনোরম শোভা হেরি অনুপম,
বিমোহিত হয়ে যেন জীবাত্মা তোমার
আত্মা'ভুলি নাহি করে তথা অবস্থান।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাধা।

কুয়াসা।

নিশি-শেষে অতি ভোরে আসি' নদী-কূলে
চেয়ে দেখি—অখণ্ডিত ধূম্র কোয়াসায়
সর্ব্বত্র ভরিয়া গেছে ; যাদু-দণ্ড তুলে'
কে যেন মুছিয়া দেছে নিখিল ধরায় ;
নভ নগ নদী তরু এপার ওপার
মিশিয়া রয়েছে যেন হ'য়ে একাকার !

সহসা তপন আসি' দীপ্ত কোটি করে
খুলি' দিল প্রকৃতির সে অবগুণ্ঠন,
সমগ্র চারুতা তার প্রতি অঙ্গ'পরে
ফুটিয়া উঠিল মরি নয়ন-রঞ্জন !

আমারো জীবনে আজি মায়া-কুজ্ঝটিকা
ঢাকিয়া রেখেছে হৃদে মহা ভাবগুলি ;
তুমি কি সহসা আসি' জ্বালি' দিব্য শিখা
দিবে নাথ ! তাহাদের আবরণ খুলি' ?

শ্রীভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী।

মায়ুর।

রাধারাণী শ্যাম রসরাজ।
বৃন্দাদেবী রচিত রাজ আসন,
রঙ্গ হিন্দোলক মাঝ॥
বাজত কিঙ্কিনী, নূপুর সুমধুর,
লটকত হার মণিমাল।
মধুকর নিকর, রাগ জনু গায়ত,
গুণ, গুণ, শবদ রসাল॥
নাঝারি করব, হেরই পরস্পর,
দুহুঁ জন হসিত বয়ান।
দোলা লম্বিত, কুসুম পত্র যুত,
শাখী বিজনক ভান॥
দুহুঁ মন বীঝে, ভিজি রস বাদর
আদর কো করু ওর।
উদ্ধব দাস, আশ করি হেরইতে
সখী সহ যুগল কিশোর॥

(পদ কল্পতরু)

১ম খণ্ড] ভাদ্র, ১৩১৯ [৫ম সংখ্যা

(নবপর্য্যায়—ষোড়শ বর্ষ ।

মায়া—বিদ্যা ও অবিদ্যা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা মায়া সম্বন্ধীয় কয়েকটী বিষয় বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি যে (১) মায়া শ্রীভগবানের চৈতন্যে সর্ব্বাত্মিকা প্রবৃত্তি। ঐ সর্ব্ব ভাবে তখন ব্যাকৃত অনন্ততা বা বহুত্ববাচক সংখ্যার ভাব নাই :—উহা একতা বাচক প্রজ্ঞা মাত্র।

(২) মায়ারূপ সর্ব্বাত্মিকা প্রবৃত্তিতে "বহুর" অস্তিত্ব না থাকিলেও উহাতে পূর্ব্বানুভূত বহুত্বের ভস্মরূপ চিহ্নমাত্র অবস্থিত থাকে। ঐ চিহ্নগুলিতে ভগবানের বিরুদ্ধ বা প্রতিদ্বন্দ্বী ভাব নাই। উহা কেবল একতা ভাবের ব্যঞ্জনা বা ভগবানের মহিমা প্রকট করিবার জন্য আছে।

বিশ্বতোমুখ বিস্তারের প্রবৃত্তি বশে তাঁহার মায়াশক্তি বিশিষ্ট জগৎভাব তাঁহাকে প্রকট করিয়া পুনরায় তাঁহাতেই লয় করে। এই সংসৃতিটীকে আমরা ক+খ+গ+ঘ=অই। এখানে "অ" ভগবানের স্বরূপ শুদ্ধ চৈতন্য "সচ্চিদেকম্ ব্রহ্ম"। "ই"টী তাঁহার শক্তিমাত্রা বা সর্ব্বাত্মিকা প্রবৃত্তির ভাব। তিনি নিষ্ক্রিয় শান্ত ও নিরবদ্য; বাস্তবিক কর্তৃত্ব ও কর্ম্ম, প্রকাশ ও লয় তাঁহাতে নাই। নিত্য পূর্ণ পদার্থের কোন অভীষ্ট থাকিতে পারে না, সুতরাং কর্তৃত্বও থাকিতে পারে না। তাঁহার সর্ব্বাত্মিকা মহাভাব আপনা আপনি তাঁহার নিজ লীলারস প্রকট করিবার জন্য তাঁহাতে এই মিথ্যাভূত বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া পুনরায় লয় করিতেছে।

স বাচ্যবাচকতয়া ভগবান্ ব্রহ্মরূপধৃক্
নামরূপক্রিয়া ধত্তে সকর্ম্মাকর্ম্মকঃপরঃ ॥

ভাঃ। ২। ১০। ৩৬

সেই ভগবান ব্রহ্মভাবে অবস্থিত হইয়া (সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম) আপনার সর্ব্বরূপ আনন্দঘন ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাচক বা নামশক্তি এবং বাচ্য বা রূপ-শক্তি গ্রহণ করেন। এবং ঐ মায়ার দ্বারা স্বকর্ম্মকরূপে লক্ষিত হয়েন; কিন্তু তিনি বাস্তবিক অকর্ম্মক, তাঁহাতে ব্যক্তভাবের লেশ নাই।

স এবেদং জগদ্ধাতা ভগবান্ ধর্ম্মরূপধৃক্।
পুষ্ণাতি স্থাপয়ন্ বিশ্বং তির্য্যঙ্ নরসুরাদিভিঃ ॥
ততঃ কালাগ্নিরুদ্রাত্মা যৎ সৃষ্টমিদমাত্মনঃ।
সংনিযচ্ছতি তৎকালে ঘনানীকমিবানিলঃ ॥
ইত্থং ভাবেন কথিতো ভগবান্ ভগবত্তমঃ।
নেত্থং ভাবেন হি পরং দ্রষ্টুমর্হন্তি সূরয়ঃ ॥
নাস্য কর্ম্মাণি জন্মাদৌ পরস্যানুবিধীয়তে।
কর্ত্তৃত্বপ্রতিষেধার্থং মায়য়ারোপিতং হি তৎ ॥

ভাঃ। ২। ১০। ৪২—৪৬।

"সেই ভগবানই আবার মনুষ্য, দেবতা, পশু, পক্ষী, প্রভৃতি নানারূপে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মরূপে বিষয় সকল ভোগ ও এই বিশ্ব পালন করিতেছেন। আবার সময় উপস্থিত হইলে তিনিই কালাগ্নি-রুদ্ররূপে, বায়ু যেরূপ মেঘ শ্রেণীকে সংহার করে, তদ্রূপ আপনার এই সমুদায় সৃষ্ট বস্তুই সংহার করিবেন। কিন্তু তাঁহাকে এই ভাবেই দর্শন করা পণ্ডিত ব্যক্তিদিগের উচিত নহে; কেননা, এই বিশ্বের সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যে পরমেশ্বরের কর্ত্তৃত্ব প্রতিপাদন শ্রুতিরও তাৎপর্য্য নহে। কেবল কর্ত্তৃত্ব প্রতিষেধের নিমিত্তই তিনি ঐরূপ বর্ণিত হইয়া থাকেন।" শাস্ত্রের কি আশ্চর্য্য কৌশল, জীবের কর্ত্তৃত্ব ভাণ ও শ্রীভগবানে কর্ত্তৃত্বের আরোপ এই মিথ্যা জ্ঞান নাশ করিবার জন্য প্রকাশ ও লয় ক্রিয়ার হেতুভূতা মায়া প্রকৃতির উপদেশ হইল। ব্রহ্মার কর্ত্তৃত্বের অভিমান যেরূপে ভগবন্মায়া দর্শনে নিবৃত্ত হইল, তাহা বুঝিতে পারিলে জীবেরও মায়াকল্পিত কর্ত্তৃত্বাভিমান নাশ হইবে।

জীব যখন সংস্থতির অঙ্ক কষিতে গিয়া পূর্ব্বোক্ত সংস্থা (series) মধ্যে "ক"কে ভগবন্মূর্ত্তি বা ভগবদ্‌ভাবের প্রকাশের স্থান বলিয়া বুঝিতে পারিবে, যখন এইরূপে ক+খ+গ+ঘ প্রভৃতি ব্যক্ত ভাবগুলিকে এক বিশাল অনির্দ্দেশ্য সর্ব্বাত্মিকা ভাবের চিহ্ন বলিয়া দেখিতে পাইবে ; যখন তৎপরে ঐ সকলকে ভগবানের পদ-চিহ্নরূপে জানিতে পারিবে, তখন পরতত্ত্বের একতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আপন কর্ত্তৃত্বের মোহ অতিক্রম করিয়া স্থির হইবে। যে কোন বিশিষ্ট বস্তু লও না কেন, জড় বিজ্ঞান তাহার ভিতর দিয়া তাহার সহিত সমস্ত জগদ্-ভাবের সম্পর্ক বুঝাইয়া দিতেছে। মসূরিকা (small pox) রোগের জীবাণুটীর সহিত অন্যান্য জগদ্‌বস্তুর সম্বন্ধরূপ একতা জ্ঞান স্ফুরণ করিবার জন্য বিজ্ঞান চেষ্টা করিতেছে। ঐ জীবাণুটীকে 'প্রকট সর্ব্ব' হইতে বিশ্লিষ্ট করিয়া না দেখিয়া তাহার ভিতর অবস্থিত সর্ব্বাত্মিকা প্রবৃত্তির পরিজ্ঞানই বিজ্ঞানের ভাষা। তারপর উহার ভিতর দিয়া প্রকটিত শীতলাদেবীর পরিজ্ঞান হইলে জড় ও চৈতন্যের বিরোধ ভাবটী আরও উচ্চতর সর্ব্বাত্মিকা ভাবে ডুবিয়া গেল। তাহার পর ঐ শক্তিকে ভগবানের শক্তি বলিয়া চিনিতে পারিলে আরও উচ্চস্তরের একতার প্রকাশ হইল। এইরূপে প্রত্যেক বস্তুর ভিতর যখন ভগবানের স্বরূপ এবং সর্ব্বাত্মিকা এই উভয় প্রকৃতির প্রয়াস দেখিতে পাইবে, যখন প্রত্যেক ব্যক্তভাবের মধ্যে অনুস্যূত মহা একীকরণরূপ প্রয়াসের চিহ্ন সকল দেখিতে পাইবে, তখন এখনকার মত 'সর্ব্ব' শব্দে আর বহুত্ব সূচিত হইবে না। তখন দেখিবে যে বহুত্ব ভাবটীও আমাদের ভেদবুদ্ধিতে স্তর, ক্রম বা পর্য্যায়রূপে বিশেষকে অনুসন্ধান করিয়া এক পরম একত্বের ব্যঞ্জনাই করিতেছে। এইরূপে প্রকটিত বিশ্ব এক রসেই পরিণত হয়। বস্তুগুলি ভেদভাবাপন্ন বিশেষ নহে, উহারা অদ্বয় একত্বের পরিস্থাপন জন্য অঙ্কের (steps) পর্য্যায় বা ক্রমমাত্র।

তারপর দেখিবে যে, বস্তুগুলির মধ্যে প্রকটিত গুণ, ধর্ম্ম ও স্বভাবরূপ সর্ব্বাত্মিকা ভাবের শক্তিগুলি বস্তুর "স্বরূপ প্রকৃতি"ভাবের মধ্য দিয়া বস্তুর প্রকাশ ক্ষেত্রের উপর দিকে এক অভিনব অদ্বিতীয় ভাবে মিশিয়া যাইতেছে। আম্রের আকার জাতি, রস, মিষ্টাদি গুণ আছে, উহার দ্বারা আম্র একে একে যেন সমস্ত জগদ্-বস্তুর সহিত আপনাকে সম্পর্কিত করিবার প্রয়াস পাইতেছে। উৎ-পত্তি স্থানে আম্রে বৃক্ষজাতীয় সকল বস্তুর ভাব নিহিত আছে। রূপে সমস্ত

প্রকটরূপের সহিত সম্পর্ক স্থাপিত হইতেছে। স্নিগ্ধ পিত্তনাশক আদি গুণে মানব শরীরের সহিত তাহার সম্পর্ক সিদ্ধ হইতেছে। দেবতার পূজায় প্রদত্ত হইয়া দেবতাভাবের সহিত আম্র ভাবটী মিশিয়া যাইতেছে। এইরূপে মানবের জ্ঞানের প্রসারের সহিত বিশিষ্ট আম্রটী সমস্ত প্রকটিত বস্তুর সহিত একীকৃত হইয়া গেল। অথচ সে এক অদ্বিতীয় পদার্থ। তাহাতে কি এমন সম্পর্ক ও গুণাতীত পদার্থ আছে যাহাতে অন্যান্য বস্তু হইতে তাহাকে পৃথক্ করিয়া বুঝা যায়।

এই অদ্বিতীয় ঊর্দ্ধগামী প্রবৃত্তিটীকে শাস্ত্র পুরুষনামে ইঙ্গিত করেন। গুণ-প্রভৃতির সমবায়ে আম্রের এই অদ্বিতীয় বস্তুভাব নিঃশেষিত হয় না। ইরাণ দেশীয় জনৈক রাজা আম্র ফলের কথা শুনিয়া তাঁহার উজীরকে ভারতবর্ষে পাঠান। তিনি দেখিলেন যে, হাঁটা পথে আম্র ইরাণ দেশে লইয়া যাওয়া অসম্ভব। এই জন্য আম্রের গুণ ধর্ম্মাদি ভাল করিয়া বুঝিয়া চলিয়া গেলেন। তাহার মনে হইল যে ঈষৎ অম্লের সহিত মধুর রসের মিশ্রণ করিলে বিশেষ আম্ররস উৎপন্ন হইবে। তিনি রাজাকে আম্রতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য একটী সরাবে একটু তেঁতুলের সহিত গুড় মিশাইয়া তাহাতে নিজের শ্মশ্রুর অগ্রভাগ ডুবাইয়া রাজাকে তাহা চুষিতে বলিলেন। ইহা দ্বারা বুঝা গেল যে, বিশিষ্ট বস্তুর ভিতর দিয়া গুণ, ধর্ম্ম স্বভাবাদির অতিরিক্ত এক অদ্বিতীয় অভিনব ভাব আছে; সেই ভাবটীকে না বুঝিলে বস্তুর স্বরূপের পরিজ্ঞান হয় না। ঐ ভাবের দিকে লক্ষ্য করিয়া গুণ প্রভৃতি সামান্য ধর্ম্মগুলি মিশিবার চেষ্টা করিতেছে। এই ঊর্দ্ধগতি প্রবৃত্তিকে পুরুষ বলে। কি ভগবানে কি সামান্য বস্তুতে ধর্ম্মাদি সর্ব্বাত্মিকা প্রবৃত্তি এই পুরুষ ভাবে সংযত বা সম্পূর্ণরূপে মিলিত বা পরিসমাপ্ত। পূর্ব্বোক্ত উদাহরণের ক+খ+গ+ঘ প্রভৃতি শব্দ (Terms) গুলির সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। বস্তুর নূতন নূতন অভিনব গুণ ও ধর্ম্ম আবিষ্কৃত হইতেছে। এই ক্রম অভিব্যক্তির বিরাম নাই। এই গতির শেষ নাই। ইহা বুঝিতে পারিয়া মানব সাধারণ (Universal) বুদ্ধির সাহায্যে প্রকট বিশিষ্ট গুণ গুলিকে যোগ করিবার চেষ্টা করিতেছে ;—ইহাই বিজ্ঞান। প্রাচ্য বিজ্ঞান প্রত্যেক বস্তুর ভিতর প্রখ্যা বা বোধ, প্রবৃত্তি বা ক্রিয়া, শীলতা এবং স্থিতিশীলতা এই তিনটী সর্ব্বাত্মিকা ভাবের সাহায্যে বস্তুর ব্যাকৃত গুণধর্ম্মাদি

পুনর্বায় মিলাইয়া দিতেছেন। এই তিনটী সংযোগিনীশক্তিকে গুণ বলে এবং ঐ গুণের সাহায্যে ব্যক্ত এবং অনন্ত ভাবগুলি সর্ব্বাত্মিকা প্রকৃতি ভাবের একত্বে উপনীত হইতেছে। এইরূপ ভাবে ক+খ+গ+ঘ প্রভৃতিকে যোগ কর, দেখিবে সেই যোগফলেও স্থৈর্য্য বা শান্তি নাই। তবে শান্তি কোথায়, এই সর্ব্বাত্মিকা ভাবের পরিসমাপ্তি কোথায়?

আর একটী দৃষ্টান্ত লইয়া দেখা যাউক, রামকে আমি ব্রাহ্মণ, সুপুরুষ, কামুক অথচ দয়াশীল এবং বুদ্ধিমান বলিয়া জানি। রাম=ব্রাহ্মণত্ব+সুপুরুষত্ব,+কামুকত্ব,+বুদ্ধিমত্তা+মানবত্ব+দয়াশীলতা। এক্ষণে দেখুন প্রত্যেক ধর্ম্ম বা গুণগুলি সর্ব্বাত্মিকা ভাবে অবস্থিত অবিশেষ জ্ঞান। তাহারা বিধা প্রকার বা রকম বা জাতিবোধক সামান্য অবিশেষ জ্ঞান। সুতরাং তাহাদের দ্বারা বিশিষ্ট রামের পরিমাণ হইতে পারে না। রাম খঞ্জ হইল, কামভোগ ত্যাগ করিয়া যোগের দিকে মন দিল, অথচ রাম—রামই রহিল। রাম মৃত হইয়া টম্যাস রূপ ধারণ করিয়া অন্য গুণ অবলম্বন করিল, অথচ ব্যক্তিত্ব ব্যক্তিত্বই রহিল। গুণ বা ধর্ম্মভাবগুলি ঐ এক অভিনব অদ্বিতীয়তার দিকে যাইতেছে; কিন্তু বিশিষ্ট নামে কখনই পরিসমাপ্ত হইতে পারে না। রাম, টম্যাস প্রভৃতি অনন্ত ব্যক্ত নামের দ্বারা উহার মান করা যায় না। এই জন্যই পুনর্জন্ম। অনন্ত সম্পর্করূপ সম্বন্ধরূপ সর্ব্বাত্মিকাভাবের বিশিষ্ট প্রকাশের দ্বারা তাহার মান করা যায় না, এই জন্য কর্ম্মের দ্বারা প্রকৃত অনন্তভাব যোগ করিতে গিয়া হয়ত হঠাৎ একদিন তাহাকে সর্ব্বভাবে চিনিতে পারিবে; এই জন্যই কর্ম্ম। এইরূপে 'ধর্ম্মাদন্যত্র অধর্ম্মাদন্যত্র' সর্ব্বগত ভাব সিদ্ধ হয়; ইহাই মায়ার উপদেশ। কিন্তু তাহাতেও হইল না, আমরা দেখিলাম যে রাম, টম্যাস প্রভৃতি বিস্তৃত, ব্যাকৃত অনন্তভাবের পরিসমাপ্তিতে কি এক উর্দ্ধগতি আছে, কি এক অদ্বিতীয়তার প্রবণতা আছে; ঐ প্রবণতার সাহায্যে, ঐ নামশক্তি বা জীবশক্তির সাহায্যে, মায়া বা প্রকৃতির সর্ব্বাত্মিকা ভাব হইতে এক অদ্বিতীয় ভাবের ব্যঞ্জনা বা ইঙ্গিত দেখা যাইতেছে। দেখিলাম, যে ঐ প্রবৃত্তির বশে রাম, দেবতা জীব ও ব্রহ্মা ভাবে আপনার অদ্বিতীয়তা সিদ্ধ করিয়াও ক্ষান্ত নহেন। দেখিলাম হঠাৎ একদিন সে আমাকে প্রকাশিত ও সর্ব্বভাবের অতীত নিষ্কল, গতি ও ক্রমোন্নতি ভাবের অতীত, অনিরুদ্ধ শান্ত,

নিরবদ্য, নিরঞ্জন বলিয়া আপনাকে চিনিতে পারিল। পুরুষই সর্ব্বাত্মিকা ভাবের পরিসমাপ্তি, পুরুষ এক ও অদ্বিতীয়; তিনিই পুরুষোত্তম। ব্যক্ত পুরুষ বা জীবভাব বস্তুতঃ পদার্থ নহে। উহা সমস্ত বিশ্বের মধ্যে অনুস্যূত বিশ্বাত্তিগ গতিমাত্র। "স কাষ্ঠা স পরাগতিঃ"।

উর্দ্ধমূল অধঃশাখা সর্ব্বাত্মিকা প্রবৃত্তির প্রসূত সৃষ্টি-বৃক্ষের মধ্যে এই পুরুষোত্তমাভি-মুখী গতি দৃষ্ট হইলে, ঐ বৃক্ষের শাখার মধ্য দিয়া নিষ্কল চন্দ্রবৎ শুদ্ধ ঈশ্বর পদার্থের ইঙ্গিতের জন্য বিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলে, বহুত্বের ভাণ ঘুচিয়া যায়। মায়ার উদ্দেশ্যও সাধিত হয়।

মায়ার বিশ্বাত্মিকা ভাব কিরূপে ক্ষুদ্রজীব গ্রহণ করিতে পারে, কিরূপ ভাবে দেখিলে মায়া লক্ষ্যভূত পরমাদ্বৈত শিব ও শান্ত ভগবৎতত্ত্বের ব্যঞ্জনা করিয়া কর্ত্তৃতাদি জীবভাব নিরাশ করে তাহার বিশদ আলোচনার প্রবৃত্তি রহিল।

(ক্রমশঃ)

সম্পাদকয়োঃ।

বৈষ্ণব-দর্শন।

অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষীয় বৈষ্ণবগণ যে প্রণালীতে উপাসনা করিতেন, তাহার ধারাবাহিক কোন বিবরণ আমরা অনুসন্ধানেও প্রাপ্ত হই নাই, তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, বেদ সংহিতাকারে নিবদ্ধ হওয়ার বহু পূর্ব্বে ভারতবর্ষে বিষ্ণুর উপাসনা প্রচলিত ছিল, ঋগ্বেদের বহু স্থানে বিষ্ণুর নাম উল্লেখ আছে। যাঁহারা বিষ্ণুকে প্রধানতম দেবতা বলিয়া উপাসনা করিতেন, আমরা তাঁহাদিগকেই বৈদিক যুগের বৈষ্ণব বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। যজুর্ব্বেদে বিষ্ণু ও রুদ্র উভয়ই প্রধানতম দেবতা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। যদিও শতরুদ্রীয় স্তোত্রে রুদ্র দেবতার প্রাধান্য বহুল রূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে, তথাপি এই যজুর্ব্বেদে বিষ্ণুকেই প্রধানতম দেবতা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় ঋগ্বেদের ও যজুর্ব্বেদের মন্ত্রে ভারতের প্রাচীন ঋষিগণ বিষ্ণুর উপাসনা করিতেন। তাঁহারা যে যজ্ঞ করিতেন বিষ্ণুই সেই যজ্ঞের যজ্ঞেশ্বর বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইতেন। "বিষ্ণুর্দেবতা অস্য, ইতি বৈষ্ণবঃ"

অর্থাৎ বিষ্ণুই ইহার দেবতা এইরূপ শব্দ ব্যুৎপাদনক্রমে "বৈষ্ণব" পদ সিদ্ধ হইয়াছে।

বৈদিক সময়ে উপাসনার বহুবিধ প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়, সম্ভবতঃ সর্ব্ব প্রথমে যজ্ঞীয় ক্রিয়াকাণ্ড প্রচলিত ছিল না। কেবল স্তোত্রাকারে ঋষিগণ বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিতেন,এইরূপ পাঠের সময়ে তাঁহাদের হৃদয় ভক্তির মন্দাকিনী ধারায় পরিপুষ্ট হইত। তাঁহারা ভক্তিরসে পরিষিক্ত হইয়া উপাস্য দেবতার নাম করিয়া তাঁহার নিকট প্রাণের কথা ও মনের ব্যথা খুলিয়া বলিতেন। বৈদিকখণ্ডের মুখ্যার্থ বিচারে দেখা যায়, ঋষিরা সকামভাবে বিষ্ণু দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেন, তাঁহারা সিদ্ধি, ঋদ্ধি, সুখ-সৌন্দর্য্য ও শত্রুনাশের কামনা করিয়া বিষ্ণুর আহ্বান করিতেন, সেই প্রার্থনা সরলতা মাখা ভাষায় অভিব্যক্ত হইত। তাঁহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহাদের নেত্রসমক্ষে বিষ্ণুশক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াই যেন কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতেন। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডল হইতে পরবর্ত্তী মণ্ডল সমূহে অনেক স্থলে বিষ্ণু বিষয়ক স্তোত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইন্দ্র বহুবার বিষ্ণুর সমীপে সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছেন, বিষ্ণু তাঁহার পক্ষসমর্থন করিতে তাহার শত্রুদিগের বিনাশসাধন করিয়াছেন, যেুল ঋকমন্ত্রে ইন্দ্রকে অতি প্রধান দেবতা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, সেই ইন্দ্রও যখন বিষ্ণুর শরণার্থী তখন বৈদিক যুগে বিষ্ণু যে শ্রেষ্ঠতম দেবতা বলিয়া পূজিত হইতেন তাহার আর সন্দেহ নাই।

এখন একটা কথা জ্ঞাতব্য, বৈদিক যুগে যে বিষ্ণু পূজিত হইতেন, তাঁহার স্বরূপ কি? কার্য্য কি? জীবের সহিত ও জগতের সহিত তাহার সম্বন্ধ কি? এবং পরিণামতঃ কোন ফলপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যেই বা ঋষিরা তাঁহার উপাসনা করিতেন। এই সকল বিষয় দার্শনিক সূক্ষ্মালোকসম্পাতে প্রকাশিত করিতে পারিলে বৈদিক যুগের বৈষ্ণব ধর্ম্মের দার্শনিক তত্ত্বের কিছু কিছু তথ্য পাঠকগণের নিকট উপস্থাপিত করা যাইতে পারে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমরা বৈদিক বিষ্ণুতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব জগৎতত্ত্ব (cosmology) উপাসনা-তত্ত্ব ও মুক্তি-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তৎপরে বৈষ্ণব বেদান্ত দর্শনের পর্য্যালোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

আমরা সর্ব্ব প্রথমে ঋগ্‌বেদ সংহিতা হইতে এই সকল তত্ত্বের সার ভাগ

মন্ত্রে ও ভাষ্য সহকারে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত করিতে চেষ্টা করিব। বৈষ্ণব দর্শনের মূল সারভাগ এইরূপে সংস্থাপিত করিতে পারিলে, আমরা ঐতিহাসিক আলোকে বৈষ্ণব দর্শনের তথ্য স্পষ্টরূপে পর্য্যালোচনা করিতে সমর্থ হইব।

অতঃপর বৈষ্ণব বেদান্ত দর্শনসম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করা কঠোরতর বলিয়া প্রতিভাত হইবে না। বহু প্রাচীনকাল হইতে বৈষ্ণবগণ বেদান্ত দর্শনের ব্যাখ্যা সুদৃঢ় যুক্তি এবং সর্ব্ব সম্মত শ্রৌতি-প্রমাণের উপর স্থাপিত করিয়া বৈষ্ণব বেদান্তের উজ্জ্বল মূর্ত্তি বিদ্বৎসমাজে প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন। এমন কি, রাজা উপরিচর বসু, "সাত্বত সংহিতা" প্রচার দ্বারা বৈষ্ণব ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝাইতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। মহাভারতের মুখ্যধর্ম্ম প্রসঙ্গে নারায়ণীয় অধ্যায়ে প্রাচীন বৈষ্ণব সমাজের রীতি নীতি কিয়ৎ পরিমাণে অভিব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায় দেবর্ষি নারদ "সাত্বত সংহিতা" বীজাকারে প্রকাশ করেন। ফলতঃ এই সকল সাত্বত সংহিতায় বৈষ্ণব দর্শনের ভগবতত্ত্ব, ধামতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব ও জীবব্রহ্মের সম্বন্ধ তত্ত্বাদি বিকীর্ণভাবে বিবৃত হইয়াছে।

মহর্ষি বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করেন, গৌড়ীয় শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ এই ব্রহ্মসূত্রেরই ভাষ্য। পরবর্ত্তী পুরাণ সমূহেও শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্রেষ্ঠত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

"ভাষ্যোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং বেদার্থ পরিবৃংহিতঃ" একথা শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে পুরাণবিশেষে বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের অন্তিমস্কন্ধে লিখিত হইয়াছে "সর্ব্ব বেদান্ত সারং হি শ্রীভাগবতমেষ্যতে" সুতরাং শ্রীভাগবত বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য বলিয়াই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অদ্বিতীয় বিশ্বাস। এতদ্ব্যতীত বোধায়ন, দ্রমিড়, টঙ্ক, প্রমিলাচার্য্য প্রভৃতি বহুল ভাষ্যকারগণ মহামতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের বহু পূর্ব্বে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যবৃত্তি প্রভৃতি করিয়া রাখিয়াছেন। নাথমুনি, যমুনাচার্য্য প্রভৃতি পূর্ব্বাচার্য্যগণ বৈষ্ণববেদান্তের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, ভগবৎ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য সেই সকল আলোকরেখা বিশিষ্ট কেন্দ্রে সমাসক্ত করিয়া ধারাবাহিক রূপে ব্রহ্মসূত্রের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ব্যাখ্যা প্রচার করিয়াছেন। ইহারই ভাষ্যের নাম শ্রীভাষ্য বলিয়া খ্যাত। শ্রীভাষ্যে গঙ্গাধর মায়াবাদের

বিরুদ্ধে বহুল তর্ক ও শ্রৌত প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্বৈতবাদী মধ্বাচার্য্য যে বৈষ্ণব বেদান্ত ব্যাখ্যা প্রণয়ন করিয়াগিয়াছেন তাহাব মধ্য শ্রীমধ্বভাষ্য বা পূর্ণ প্রজ্ঞাদর্শন নামে খ্যাত। মধ্বাচার্য্যের শিষ্য জয়তীর্থ প্রভৃতি সুপণ্ডিতগণের বিচাবপ্রণালী বিদ্বৎসমাজের বিস্ময়জনক। এই সম্প্রদায়ে বহুল নৈয়ায়িক পণ্ডিতেব আবির্ভাব হইয়াছিল। বল্লভাচার্য্য বিশুদ্ধাদ্বৈত মতবাদ স্থাপন করিয়া বেদান্তসূত্রেব ব্যাখ্যা কবেন। নিম্বার্কেব ভেদাভেদ বাদময় ভাষ্যও বৈষ্ণব বেদান্ত ভাষ্যেব গৌবব স্থল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ অচিন্ত্য ভেদাভেদ ভাব স্বীকার কবেন। প্রকৃত কথা বলিতে কি অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদী গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ যেরূপ সূক্ষ্ম যুক্তি তর্ক ও শ্রুতি প্রমাণেব উপব নির্ভব কবিয়া অচিন্ত্য ভেদাভেদ বাদ স্থাপনা কবিয়াছেন, তাহা এক দিকে যেমন অতি উচ্চাঙ্গেব দার্শনিক তথ্যময়, অপব দিকে ভগবদুপাসনাবও তেমনই বসময় প্রণালী ক্রমে উহা নিবদ্ধ। আবার আধুনিক পদার্থ যে পবিমাণে সূক্ষ্ম শক্তিতত্ত্বেব দিকে অগ্রসর হইবে, এই শক্তি বাদময় অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্বে বৈজ্ঞানিকগণ প্রচুরতম সত্যেব আলোক সেই পরিমাণে দেখিতে পাইবেন।

আমবা শ্রীভগবানেব কৃপায় ক্রমশঃ এই সকল তথ্য পবিস্ফুট কবিতে চেষ্টা কবিব। এই প্রবন্ধ কেবল উপক্রমণিকা স্বরূপ বলিয়া মনে কবিতে হইবে।

শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ।

দাক্ষিণাত্যে তীর্থদর্শন।

চিদম্বরম্।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পব)

দেবাদিদেব মহাদেবেব প্রকট মূর্ত্তিব মধ্যে চিদম্বরমে অনাদি আকাশ লিঙ্গ বিরাজমান। চিৎ=জ্ঞান, অম্বর=আকাশ, চিদম্ববেব অর্থ চিদাকাশ বা 'জ্ঞানাকাশ। আকাশরূপী মহাদেবেব মন্দিবে কোন বিশিষ্ট মূর্ত্তি নাই। মন্দিরাভ্যন্তরস্থ দবজায় একটী হরিৎ বর্ণের রেসমী পর্দ্দা ঝুলান আছে।* যাত্রিগণ উপস্থিত হইয়া দুই আনা দক্ষিণা দিলেই অর্চ্চকগণ পর্দ্দা অপসাবণ করিলে, আকাশের ন্যায় নীলবর্ণপ্রস্তরমণ্ডিত ভিত্তিসমন্বিত মন্দিবাভ্যন্তরে কোন বিশিষ্ট রূপ মূর্ত্তি

দৃষ্টি গোচর হয় না। অর্চ্চকগণ ঐ অমূর্ত্ত স্থানে কর্পূরালোকে আলোকিত করেন। ভিত্তিগাত্রে দোদুল্যমান সুবৃহৎ একটী পদ্মমালা পরিদৃষ্ট হয়। এই পদ্মমালার মূল্য লক্ষ মুদ্রা; ইহা মহীশূর রাজ টীপু সুলতানের ভক্ত্যুপহার। টীপু সুলতান হিন্দুবিদ্বেষী গোঁড়া মুসলমান ছিলেন ও তিনি অনেক হিন্দু-মন্দির ভগ্ন করেন;—কিন্তু চিদম্বরমে মূর্ত্তি ভগ্ন করিতে আসিয়া দেখেন, তথায় নিরাকারের উপাসনা হয় এবং ভগবানের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে ঐ মালা উপহার দিয়া যান। এই আকাশরূপী লিঙ্গ "চিদম্বর রহস্য" নামে কথিত হইয়া থাকেন।

আকাশলিঙ্গের বাহিরের মন্দিরে তাণ্ডব নৃত্যকারী নটরাজ মহাদেবের রত্নালঙ্কার-ভূষিত নয়ন-মনোরম মূর্ত্তি। নটরাজ মহাদেব শিঙ্গা হস্তে এক পা তুলিয়া নৃত্য করিতেছেন।

দ্বে বাব ব্রহ্মণোরূপে মূর্ত্তঞ্চৈবামূর্ত্তঞ্চ মর্ত্ত্যঞ্চামৃতঞ্চ স্থিতঞ্চ॥

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

ব্রহ্মের দুইটী বিভাব (aspect) মূর্ত্ত, অমূর্ত্ত পরিবর্ত্তনশীল, অপরিবর্ত্তনীয়:—অর্থাৎ ব্রহ্মের দুই রূপ, সগুণ ও নির্গুণ। শ্রুতি যে ব্রহ্মের নির্গুণ এবং সগুণ এই দুইটী ভাব উল্লেখ করিয়াছেন, কোন স্মরণাতীত কালে কোন ভাগবত মহাত্মা যাহাতে ভেদভাবাপন্ন জীবের হৃদয়ে এই মহাভাব প্রকটিত হয় এবং প্রকটিত হইয়া যাহাতে তাহার দুর্ভেদ্য ভেদাত্মক গণ্ডী ক্রমে অপসারিত করিয়া তাহাকে সেই পরম সদসদতীত নির্গুণ সত্তায় অবস্থিতি করিতে পারে, তদুদ্দেশ্যে নটরাজরূপে মূর্ত্ত ও আকাশরূপে অমূর্ত্তভাবে মন্দিরের অধিষ্ঠাতা দেবকে লক্ষিত করিয়াছেন। ভগবান যখন স্বরূপভাবে অবস্থিত, যে ভাবে সৃষ্টির বিক্ষেপ নাই, যেন বীচি-বিক্ষোভ-বিহীন মহাসমুদ্র, যে ভাবে জগৎ নাই, আমি নাই, তুমি নাই, সেই পরম অব্যক্ত সত্তাই ভগবানের নির্গুণ অবস্থা। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন, 'ন সন্নচাসচ্ছিব এব কেবলঃ।' শ্বেতাশ্বেতর। ৪।১৮

আর যখন সেই পরম অব্যক্ত ভাব আপনাকে মায়ার যবনিকা বা তিরস্করিণী দ্বারা আবৃত রাখিয়া সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদিরূপ মায়াকার্য্যে যেন লিপ্ত হন, তখন তাঁহার সগুণ অবস্থা। ইহাই শ্রুতি প্রোক্ত—"মায়িনন্তু মহেশ্বরম্" মায়া-শক্তি অবলম্বনে শ্রীভগবানের সৃষ্ট্যাত্মকভাবই নটরাজ রূপে প্রকটিত।

অব্যক্ত মূল প্রকৃতির ভগবৎ শক্তি কর্তৃক স্পন্দনই (মহাদেবের নৃত্য। শব্দ তত্ত্ব হইতে জগৎ সৃষ্টি, তাই মহাদেব হস্তে শিঙ্গা বাজাইতে বাজাইতে নাচিতেছেন। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার নৃত্যতালে স্পন্দিত হইতেছে। তিনিই প্রাণরূপে চেতনারূপে বুদ্ধিরূপে, শক্তিরূপে ও আনন্দরূপে, অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন। সূত্রে মণিগণের ন্যায় ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাতে বিধৃত হইয়া আছে। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ে তাঁহারই নৃত্য লীলা পরিদৃশ্যমান। যে দিন তাঁহার নৃত্যলীলার অবসান হইবে, সেইদিন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড আবার প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া অব্যক্তরূপ ধারণ করিবে।

শিবোঽপি দ্বিবিধঃ প্রোক্তঃ নিষ্কলঃ সকলস্তথা।
নিষ্কলঃ স্যান্নিরাকারং লিঙ্গং তস্য সুসঙ্গতং॥

শিব ব্রহ্মেরই নামান্তর, তিনি সকল ও নিষ্কল ভেদে দুই প্রকার উক্ত হয়েন। নিষ্কল অর্থে নিরাকার। নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার আধার লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্ন, যেরূপে নিরাকার ব্রহ্মের মুখ হস্তপদাদি বিশিষ্ট অবয়বাদি নাই, সেইরূপ তাঁহার চিহ্ন। শিবলিঙ্গেরও কোন প্রকার অবয়ব নাই। সাকার ব্রহ্মের উপাসনায় প্রতিমা, আবশ্যকীয়। শিব নিরাকার ও সাকার উভয়াত্মক। সুতরাং লিঙ্গ এবং প্রতিমা উভয় রূপেই পূজিত হন। শিবলিঙ্গ আর এক অর্থে কল্যাণবাচক চিহ্ন। বস্তুতঃ শিবলিঙ্গ নিষ্কল বা নির্গুণ ব্রহ্মের ইঙ্গিত করে, (Indicative)। শিব-পুরাণের প্রথম অধ্যায়ে আছে, ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুর সম্মুখে একদা বিশাল তেজোময় অগ্নিরূপী লিঙ্গ আবির্ভূত হইলেন। এই লিঙ্গের শেষ কোথায় তাহা নির্ণয় করিবার জন্য ব্রহ্মা হংস রূপ ধারণ করিয়া, আকাশে উড়িতে উড়িতে বহু ঊর্দ্ধে উঠিয়াও লিঙ্গের অন্ত পাইলেন না। বিষ্ণু বরাহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভূগর্ভে খনন করিতে করিতে চলিয়া গেলেন, কিন্তু লিঙ্গের শেষ পাইলেন না তাৎপর্য্য এই যে নির্গুণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের শেষ অন্ত বা সীমা নাই। তখন তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কে ? লিঙ্গরূপী নির্গুণ ব্রহ্ম বলিলেন, আমি

অলিঙ্গং লিঙ্গতাং যাতঃ ধ্যান মার্গেপি অগোচরং। *শিবপুরাণ জ্ঞান সংহিতা।

ধ্যান মার্গেও অগোচর, অলিঙ্গ বা নামরূপ বিবর্জ্জিত আমি লিঙ্গরূপ ধারণ করিয়াছি। লিঙ্গরূপী নির্গুণ ব্রহ্মের নিম্নলিখিত ধ্যান আলোচনা করিলেও বুঝা যায় যে নির্গুণ ব্রহ্মেরই পূজার আধার লিঙ্গ।

---

(১) শ্রীশ্রীশৈলজানন্দ ওঝা সংকলিত বৈদ্যনাথ মাহাত্ম্য।

হৃদয়কমলেমধ্যে নির্ব্বিশেষং নিবীহং।
হবিহববিধিবন্দ্যং যোগিভির্ধ্যানগম্যং
জননমরণভীতিভ্রংশি সম্বিৎস্বরূপং
সকলভুবনবীজং ব্রহ্মচৈতন্যমীড়ে॥
হৃৎপুণ্ডবীকান্তবসন্নিবিষ্টং স্বতেজসাব্যাপ্তনভোঽবকাশং।
অতীন্দ্রিয়ং সূক্ষ্মমনন্তমাদ্যং ধ্যায়েৎ পবানন্দময়ং মহেশং॥

লিঙ্গে পাছে সাকাব বা সগুণেব ভ্রম হয় এই জন্য চিদম্ববমেব মন্দিবে কোন মূর্ত্তি নাই, নিবাকাব আকাশেবই পূজা হয়। লিঙ্গ শব্দেবও এক অর্থ সর্ব্বব্যাপী আকাশ। "আকাশং লিঙ্গমিত্যাহুঃ পৃথিবীতস্য পীঠিকা।"

চিদম্ববেব মূল মন্দিবে এই আকাশরূপী লিঙ্গেব পূজা হয়, আর নটরাজের পূজা সগুণ ব্রহ্মেব পূজা।

লিঙ্গরূপী তিনি ব্রহ্মা হইতে স্তম্ভ পর্য্যন্ত প্রত্যেক বস্তুতে অবস্থিত আছেন, তাই তিনি বলিয়াছেন—

আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্তং লিঙ্গরূপীহ্যহং প্রিয়ে॥

নটরাজ মহাদেবেব মন্দিবেব ঠিক সম্মুখে দক্ষিণ দিকে একটী মন্দিরে স্বর্ণ বস্ত্রাভরণভূষিত কৌস্তুভ-মণিমাল-অলঙ্কৃত শেষশয্যাশায়ী গোবিন্দবাজ ভগবানের বিশাল শ্যামল মূর্ত্তি বিবাজমান। মূর্ত্তি শ্রীরঙ্গমেব শ্রীবঙ্গনাথ সদৃশ। মহালক্ষ্মী ভগবানেব পাদ সেবন কবিতেছেন এবং ব্রহ্মাদি দেবগণ করযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া স্তব কবিতেছেন, এই বিষ্ণু মূর্ত্তিও অতি প্রাচীন এবং ইহাব অধিষ্ঠানে চিদম্বরম বৈষ্ণবগণেব ও একটী "দিব্যদেশ" অর্থাৎ পরমতীর্থ। তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থে ইহার নাম দক্ষিণ চিত্রকুট।

শ্রীচিত্রকুট নগবে দেবং গোবিন্দ নামকম্।
শেষে শয়ানং সেবেঽহং শিবতাণ্ডবসাক্ষিণম্॥ (১)

"চিদম্ববম্ বা শ্রীদক্ষিণ চিত্রকুট নগবে তাণ্ডব নৃত্য পবায়ণ নটবাজ মহাদেবেব সম্মুখে শেষ-শায়ী গোবিন্দবাজ ভগবানকে সেবা করি।" নটবাজ মহাদেবের ও গোবিন্দরাজের মন্দির এরূপ ভাবে গঠিত যে ভক্তগণ এক প্রাঙ্গণে দাড়াইয়া

---

(১) অর্চ্চাবতার স্থল বৈভবদর্পণম্ নামক রামানুজ সম্প্রদায়িক গ্রন্থ।

ভিন্ন ভিন্ন মন্দিরে হরিহরের মূর্ত্তি দর্শন করিতে পারেন। চিদম্বরম অপূর্ব্ব তীর্থ এখানে ভিন্ন ভিন্ন মন্দিরে জগৎকারণ কারণ নির্গুণ পরমব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ডপতি শিব, শেষশায়ী নারায়ণ, জগৎকারণ ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণী যোগমায়া পার্ব্বতী, বিঘ্নেশ্বর গজানন, মহাকালী, ময়ূরবাহন সুব্রহ্মণ (কার্ত্তিকেয়) শিবলিঙ্গ, শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার দেবমূর্ত্তি এবং দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ শৈব আলোয়ারগণ পূজিত হইয়া থাকেন। হিন্দুর সকল সম্প্রদায়ের সাধক এখানে নিজ নিজ ইষ্ট দেবতার দর্শন পাইবেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীপান্নালাল সিংহ।

সমুদ্র-গর্জ্জন।

সমুদ্র যে দিনরাত গর্জ্জন করে কেন তা জান? বৈজ্ঞানিক মহাশয়েরা একটা উত্তর দিবেন তা জানি। কিন্তু সমুদ্রের প্রাণের ভিতরকার কথাটা বলা বড়ই শক্ত। দিনরাত তার প্রাণে যে কি ব্যাকুলতা উচ্ছ্বসিত হচ্ছে, তা তার চঞ্চলতা দেখলেই বুঝা যায়। তা হ'ক সে জড়;—আমরাও কি এক হিসাবে জড় নহি। আরো তার ভিতরেও সেই চেতনা আছেই আছে, যা সমস্ত বিশ্বের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। তবে তার ব্যাকুলতা থাকবে না কেন? সে কথা বলিতে পারে না;—তাই? তার ভাষায় হয়তো সে বলে; আমরা বুঝতে পারি না। অনেক জন্তু কীট পতঙ্গেরও ভাষা আছে, আমরা সবই কি ছাই বুঝি। বুঝবার চেষ্টাকরলে হয়তো বুঝা যেত। অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত পশু, পক্ষী, কীটের ভাষা বুঝতে চেষ্টা করেছেন, কৃতকার্য্য যে একেবারেই হন নি—একথা বলা যায় না। আমাদের দেশেও তপস্বীরা ঋষিরা ইতর জীবের ভাষা বুঝতে পারতেন—এ রকম জন-প্রবাদ এখনও বর্ত্তমান রয়েছে। যে ভাষায় আমরা কথা বলি, তা আর কটা লোকে বুঝে? এক দেশের লোক আর এক দেশের কথা বুঝতে পারে না। কিন্তু আর এক রকম ভাষায় কথা কওয়া আছে, যেখানে সব লোকেরই সব জীবেরই একই ভাষা। ইহাকেই "পশ্যন্তীবাক" বলে। ঋষিরা চিত্তকে সংযত করিয়া একটি অবস্থা লাভ করিতেন, যেখানকার ভাষায় বাহ্যিক শব্দ নাই, অথচ কথা কহা, কথা বলা, সবই সেখান থেকে

বেশ চলতে পারে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অবশ্য এই ভাবে পশু পক্ষীদের কথা বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই :—তাঁহাদের প্রণালী অন্যরূপ। তাঁহারা বাহিরের শব্দ সাহায্যে তাহাদের মনের ভাব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এ প্রণালী অসম্পূর্ণ। এমনই, যাহারা কথা বলিতে পারে, তাহারাও ভাষায় সমগ্র মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারে না। ভাষার সে পূর্ণতা এখনও হয় নাই ; কখনও হইবে কি না, তাহাও জানি না।

যাই হ'ক মানুষ বড় অহঙ্কারী জীব, তাই অন্য সমস্ত জগতের যে জ্ঞান, বুদ্ধি, ভাব, ভাষা আছে, তাহা সে স্বীকার করিতে চায় না। কিন্তু এসমস্ত গায়ের জোর বই, আর কিছুই নয়। ব্যাঘ্র মহাশয়ও একটা মানুষের ঘাড়ে লাফাইয়া তার রক্ত পান করিতে করিতে ভাবিতে পারে যে "মনুষ্যেরা অজ্ঞ জীব, আমরাই জ্ঞানী, এই দেখনা তার ঘাব মটকে রক্ত পান করচি"। মোটের উপর কথা এই, ভাব যখন আছে, ভাষাও তখন আছে। মোটামুটি একথাটা আমরা স্বীকার করতে পারি। এখন সমুদ্রের প্রাণের কথাটা বুঝতে চেষ্টা করা যাক্।

আমি একদিন সমুদ্রের কূলে বসে তার তরঙ্গের রঙ্গভঙ্গ দেখচি, আর তার গর্জ্জন শুনচি। বহুদূর পর্য্যন্ত তার সেই সুনীল জলরাশি শুভ্র ফেন-বিমণ্ডিত তরঙ্গরাশির উত্থান ও পতন, কেমন যেন প্রাণে একটা ভাব তুলে দিচ্ছে। তার সেই সীমাহীন জলের মধ্যে আমার সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়শক্তিগুলো যেন তলিয়ে যাচ্ছে। একজন আমার কাছে বসেছিলেন, তিনি বলছেন "বাবা যে শোঁ শোঁ গোঁ গোঁ অনবরত শব্দ, এখানে কি মন স্থির করা যায়"? কথাটা আমার কাণে গেল ;—মনে করিলাম বাহিরের দিক দিয়ে দেখলে ঐ কথা মনে হওয়া সম্ভব বটে। কিন্তু আমি অনেকবার পরীক্ষা করে দেখেছি প্রথমে গর্জ্জন শুনে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয় বটে, কিন্তু খানিক ক্ষণ চুপ করে শুনতে শুনতে মনের কার্য্য বন্ধ হয়ে আসে—তখন আর কোন শব্দের দিকে মন যেতে চায় না। ক্রমশঃ আরও সূক্ষ্ম একটি ঐক্য-তান কাণে আসিয়া লাগে, তখন আর বাহিরের শব্দের দিকে মন একেবারেই যেতে চায় না। ক্রমশঃ দেখি কি, এই সূক্ষ্ম ঐক্যতান আমার প্রাণের মধ্যে আর সমুদ্রের মধ্যে জমাট হয়ে উঠে। তখন আমার বীণার তারে আর সমুদ্রের বীণার তারে ঐক্যতান বাদিত হইয়া

উঠে—শুধু একটি মাত্র ধ্বনি ধ্বনিত হইতে থাকে। তখন কোনটা কার সুর আর ভেদ করিতে পারা যায় না।

ক্রমে তাও নীরব হয়ে আসে, সব শব্দ যেন এক মহাশূন্যে মিশিয়ে যায়। সমুদ্রের মধ্যে ডুব দিলেও তার আর এই উপরের শব্দ কাণে পৌঁছায় না। সেখানে এক গভীর নীরবতার মধ্যে সমস্ত চাঞ্চল্য যেন এক অসীম শমতা লাভ করে। সেইখানে সব সুর মিলে গিয়ে এক অব্যক্ত ভাবের মাঝে সমস্ত ভাষার ও শব্দের সমাপ্তি ঘটে। সকলের 'সর্ব্বের' সঙ্গে এই সুর মেলাতে পারিলেই আর কোন গোল থাকে না। জীবের সঙ্গে জীবের যেখানে সুরের মিল আছে, সেই জায়গাটিতে ঘা দিতে পারলেই একই রকম সুর সবার ভিতর হতে বাহির হইতে থাকে। তখনি বুঝা যায় আমরা সকলের সহিত অভিন্নভাবে এক হইয়া এক জায়গাতেই রহিয়াছি। ভগবানের সঙ্গেও আমাদের এইরূপ সুর মেলানই হল তাঁর সাধনা। তাঁর সুরের সঙ্গে যেখানে আমাদের সুরের মিলন হয়, তা বুঝতে হলে আমাদের এই শব্দ-মুখরিত, বাসনা-বিক্ষোভিত মন-সমুদ্রের অতল তলে ডুব দিতে হবে। ডুব দিতে দিতে, ডুব দিতে দিতে আমরা ক্রমশঃই একটি অব্যক্ত অবস্থার কথা বুঝতে পারবো। এ জগতের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ— সব একাকারে মিলিয়ে যাবে, একটি গম্ভীর ঐক্যতানের মধ্যে মনের সমস্ত বিক্ষেপ, সমস্ত চাঞ্চল্য মূর্চ্ছিত হয়ে পড়বে। তখন আমাদের হৃদয়ের সঙ্গে, এই বিশ্বের হৃদয়ের সঙ্গে, এবং ভগবানের সঙ্গে একটি অখণ্ড সংযোগ উপলব্ধি হয়। তখন নির্বাতস্থানে দীপশিখার মত, মন একাগ্র অচঞ্চল ও স্তব্ধ হইয়া যায়। ইহাকেই যোগীরা দ্বন্দ্বাতীত অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করেন। এখানেই যথার্থ জ্ঞানী ও ভক্ত "মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধা"। তখন অন্তঃকরণে যে একটি ঐক্যতান গীত হইতে থাকে, তাহা শুনিলেই বাঁধনগুলি খসিয়া পড়ে। কেমন মিঠে প্রাণ জুড়ানো শব্দ!!! উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরে বিশ্বের ঐক্যতান, মানব হৃদয়ের ঐক্যতান এবং ভগবানের অনাদি মহিমান্বিত ঐক্যতান—সব সুর একসঙ্গে বেজে উঠে, তখন আমরা শুনি অ-অ উ-ওম্—অ-উ-উ ওম্—ওঁ-ওঁ॥

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল।

মসী-বিন্দু

১। জীবাত্মা জাগ্রতাবস্থায় ইন্দ্রিয়ে, নিদ্রাবস্থায় মনে এবং সুষুপ্তি অবস্থায় হৃদয়ে অবস্থান করে।

২। কাষ্ঠ যেমন স্বীয় অবয়ব হইতে উৎপন্ন অগ্নি দ্বারা বিনষ্ট হয়, অবিবেকী মনুষ্যও তেমনি সহজাত লোভ কর্তৃক বিনষ্ট হয়।

৩। ধর্ম্মের নিমিত্ত অর্থ সঞ্চয় করিতে গিয়া অনেক সময় সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি জন্মে এবং উহাতে অনর্থ ঘটিতে পারে। গাত্র-লগ্ন পঙ্ক প্রক্ষালন করা অপেক্ষা পঙ্ক স্পর্শ না করাই ভাল।

৪। জীব-দেহে ত্রিবিধ অগ্নি বর্ত্তমান। উদরে কোষ্ঠাগ্নি—আহারীয় দ্রব্য পরিপাক করে; নেত্রে দর্শনাগ্নি,—রূপাদি গ্রহণ করে; এবং হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি,—নিত্যানিত্য বিচার করে।

৫। জীবনের পশ্চাতে মৃত্যুর কৃষ্ণ ছায়া,—যেমন প্রদীপ্ত চন্দ্রার্দ্ধের পার্শ্বে চন্দ্রমার তমসাবৃত অপরার্দ্ধ; কখনো একাংশ আলোকিত, কখনো বা অপরাংশ ভাস্বর। মুক্তি—পূর্ণচন্দ্রবৎ সর্ব্বত্র সুন্দর, জীবন ও মরণের পরিপূর্ণ প্রকাশ।

৬। প্রবৃত্তির পঙ্কে কাম মূলা প্রেম-পঙ্কজিনীর জন্ম। কিন্তু যখন সেই প্রেম-পদ্ম প্রবৃত্তির মালিন্য হইতে মুক্ত হইয়া নিবৃত্তির দুগ্ধ-শুভ্র মৃণালের উপরে ফুটিয়া উঠে, তখন তাহার স্বর্গীয় সৌগন্ধে সারা বিশ্ব আমোদিত হইতে থাকে।

৭। আত্মোৎসর্গ এক মুহূর্ত্ত, ইন্দ্রিয়-সংগ্রামে চিত্ত-জয়ের নিমেষ-মাত্র, সারা জীবনব্যাপী যপতপ অপেক্ষা মূল্যবান্।

৮। পাপ—মুক্তির সোপানমাত্র। পাপ-মুক্ত জীব লক্ষ্য স্থলে উপস্থিত হইলে দিব্য চক্ষে দেখিতে পায়—যে সোপান-শ্রেণী উত্তীর্ণ হইয়া আজ সে মুক্তি-মণ্ডপে দণ্ডায়মান, সেগুলি অপর পাপিগণের শ্রমাশ্রুজলে এক্ষণে সিক্ত হইতেছে। তাই সে আর অপরের আচরিত পাপ ঘৃণার চক্ষে দর্শন করে না, পাপীকে উর্দ্ধে উত্তোলন করিবার জন্য করুণার হস্ত প্রসারিত করে।

৯। পথ দুইটী,—শ্রেয় ও প্রেয়। শ্রেয় পথ কণ্টকাকীর্ণ, কিন্তু লইয়া যায় অমৃত হ্রদে। প্রেয় পথ আপাততঃ সুখ-গমন, কিন্তু লইয়া যায় মৃত্যুর গহ্বরে।

১০। জীবনের উদ্দেশ্য—আমাদিগের প্রত্যেকের ভিতরে যে একটি "ভিতরকার মানুষ" আছে, তাহাকে জাগ্রত করা। সে জাগিলে, যন্ত্রণার অবসান, বাসনার নির্ব্বাণ, এবং কর্ম্ম-চক্রের অবিরাম-গতির চির-বিশ্রাম।

১১। "আমার পুত্র; আমার কলত্র, আমার ধন"—ইত্যাদি জ্ঞানকে "মমকার" কহে। মমকার—মৃত্যু-স্বরূপ, এবং নির্ম্মমতা শাশ্বত ব্রহ্ম-স্বরূপ।

১২। কফ, পিত্ত ও বায়ু যেমন দেহের গুণ, তেমনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ মনের গুণ। দৈহিক গুণত্রয় সমভাবাপন্ন থাকিলে দেহ সুস্থ থাকে; মানসিক গুণত্রয় সমাবস্থ থাকিলে মন সুস্থ থাকে। এক গুণের আধিক্য ঘটিলে জীবের অসুস্থতা ঘটে; এবং তজ্জনিত বিকার অপর গুণের ক্রিয়ার দ্বারা দমন করিতে হয়।

১৩। ক্ষয় স্তূপের অন্ত, পতন উন্নতির অন্ত, বিয়োগ সংযোগের অন্ত, এবং মরণ জীবনের অন্ত। সকল পদার্থেরই পরিণামে এই ধ্বংস আছে।

১৪। মনুষ্যের জন্ম হইবা মাত্রই সুখ ও দুঃখ তাহার আত্মাকে আশ্রয় করে। যেমন কোনও রূপ রস, গন্ধ, রূপ স্বভাবেই জন্মিয়া থাকে, সুখদুঃখও সেইরূপ স্বভাবতঃই জীবনের অনুসরণ করে।

১৫। সমুদ্রে যেমন কাষ্ঠে কাষ্ঠে সংযোগ ও বিয়োগ ঘটে, তদ্রূপ এই ভূমণ্ডলে প্রাণী সমুদয় একবার সংযুক্ত ও পুনরায় বিয়োজিত হইতেছে। এমন কি স্বীয় শরীরের সহিতও কাহারও চিরকাল সম্বন্ধ থাকে না। স্বপ্ন-লব্ধ অর্থের ন্যায় মৃত ব্যক্তির বিলোপ ঘটিয়া থাকে।

১৬। ইন্দ্রিয় সকল মন-পাখীর পদ-স্বরূপ; শ্বাস নিঃশ্বাস তাহার দুই পক্ষ। মায়া-রূপ ইন্দ্রজাল তাহাকে আবদ্ধ করিয়াছে। ভগবৎকৃপাই এই মায়া-তন্তু ছিন্ন করিবার একমাত্র অস্ত্র।

১৭। পুষ্প মধ্য হইতে যেরূপ পুষ্প-নাশন ফলের উৎপত্তি হয়, ভোগের মধ্য হইতে সেইরূপ ভোগান্তক বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়া থাকে।

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী—

মহামায়ার খেলা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

নবম পরিচ্ছেদ।

এই আখ্যায়িকা যে সময়ে ঘটে তখন বীরভূমে এইরূপ ঘন-সন্নিবিষ্ট দুর্গম বনের সংখ্যা বেশী ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। বীরভূমের ঐতিহাসিক বিবরণ সঠিক না থাকিলেও জনশ্রুতি দ্বারাও ইহার তৎকালিক অবস্থা কিঞ্চিৎ পরিমাণে অবগত হওয়া যাইতে পারে।

বীরভূমি তখন আয়তনে বহুদূর বিস্তৃত ছিল। মধ্যে মধ্যে অনুন্নত শৈলসমূহ শ্রেণীবদ্ধভাবে বিরাজিত থাকিয়া ইহার শোভা কথঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিয়া ছিল অজয় দামোদর ও পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর তখন অপূর্ব্ব শোভা। এখন ভাগীরথীর সে স্রোত নাই "ক্বচিৎ ছিন্না ক্বচিৎ ভিন্না" হইয়া কলির প্রকোপ জানাইয়া তন্ত্রের সত্যতা জানাইতেছেন। দামোদরে এখন বালুকা ধুধু করিতেছে। অজয় এখন সকল নদীর নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছে।

বীরভূম নামকরণ সম্বন্ধেও অনেক মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন এই স্থানে বহুতর অদ্ভুত বীরপণার কীর্ত্তি ছিল বলিয়া, কাহারও মতে বীরসিংহ রাজার নাম অনুসারে, কাহারও মতে বীর * অর্থাৎ জঙ্গলময় ভূমি এই অর্থে বীরভূমি নামের উৎপত্তি হইয়াছে। †(১) যে কারণেই হউক বীরভূমি যে পূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে নিবিড় অরণ্যরাজিতে পরিপূর্ণ ছিল এবং সেই সকল অরণ্যের ভিতরে যে নানাবিধ দেবদেবীমূর্ত্তির পূজার্চ্চনা হইত, বর্ত্তমান সময়েও ইহার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়।

বীরভূমি পৌরাণিক বহুচিত্রের স্মৃতি অদ্যাপি রক্ষা করিতেছে। বক্রেশ্বর (২) অষ্টাবক্র ঋষির সিদ্ধ স্থান। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে বর্ণিত সুরথ রাজার

---

* সাঁওতালি ভাষায় বীর শব্দের অর্থ জঙ্গল।

†(১) Imperial Gazetteer of India Vol. III

(২) দুবরাজপুর (ই, আই, আর অণ্ডাল সঁথিয়া) ষ্টেসন হইতে ৫ মাইল। এখানে কয়েকটা উষ্ণ প্রস্রবণ কুণ্ড ও পাপহরা নদী আছে। শিবরাত্রিতে মেলা হয়।

প্রতিষ্ঠিতশিব সুরথেশ্বর নামে পূজিত হইতেছেন। (৩) প্রবাদ যে দুর্ব্বাসা ঋষি পূজিত পাষাণময়ী দেবী এখানে বর্ত্তমান (৪) তারাপুর (৫) অনেকের নিকট পরিচিতা মহাত্মা বশিষ্ঠ কামরূপ হইতে তারাদেবীকে আনায়ন করিয়া এইখানে সিদ্ধিলাভ করেন। পাণ্ডবেরা বনবাস কালে নিত্যানন্দের জন্ম-স্থান একচক্রার সন্নিকটস্থ অরণ্যে আশ্রয় করিয়াছিলেন বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। (৬)

এতদ্ব্যতীত অট্টহাস (১) নলাটিশ্বরী (২) উচানী (৩) বহুলা (৪) প্রভৃতি পীঠ স্থান বীরভূমের অন্তর্গত। শৈব ও শাক্তগণেরই তীর্থস্থানই বীরভূমের কঙ্কর ভূমিকে পবিত্র করিয়াছে এমন নয়, বীরভূমি বৈষ্ণবদিগেরও অতি আদরের স্থান। মহাপ্রভুর অভিন্ন তত্ত্ব শ্রীসংকর্ষণের অবতার শ্রীমৎ নিত্যানন্দ প্রভু এই জেলাতেই জন্মগ্রহণ করেন। জ্ঞানদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবির এই দেশেই জন্মস্থান। এতদ্ব্যতীত শ্রীজয়দেব কবি (৫) যাঁহার সুললিত সুমধুর লেখনী নিঃসৃত প্রেমের অপূর্ব্বভাব বঙ্গবাসীর নিকট সুপরিচিত, স্বয়ং শ্রীভগবান ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বহস্তে "দেহি পদপল্লবমুদারং" লিখিয়া যাঁহার মান বাড়াইয়াছিলেন, যাঁহার প্রত্যেক অক্ষরে অক্ষরে অপূর্ব্ব সুধামাখান, যাঁহার গীতিসমূহ আধ্যাত্মিক প্রেম সাধনার চরম অবস্থা জ্ঞাপন করে, সেই

---

(৩) বোলপুর (ই, আই, আর লুপ) ষ্টেসন হইতে ১ মাইল।

(৪) লাভপুরের অন্তর্গত গোপালপুরের নিকট। আমোদপুর ষ্টেসন হইতে যাইতে হয়।

(৫) রামপুরহাট ষ্টেসন হইতে ৫।৬ মাইল।

(৬) পাণ্ডবেশ্বর নামে একটী শিবলিঙ্গ আছে ও চতুঃপার্শ্বের গ্রামের নাম ভীমগড়া, যুধিষ্ঠিরপুর, অর্জ্জুনপুর ইত্যাদি।

(১) দেবীর অধঃ ওষ্ঠ পতিত হয়। দেবীর নাম ফুল্লরা। আমোদপুর ষ্টেশন হইতে মাইল; প্রকাণ্ড শিলামূর্ত্তি এখানে শিবাভোগ হয়।

(২) নলাহাটী হইতে ১মাইল। দেবীর নলী পতিত হইয়াছিল।

(৩) এখানে দেবীর কনুই পতিত হয়। গুস্‌করা ষ্টেশন হইতে ৬ মাইল। উজানির বর্ত্তমান নাম কোগ্রাম।

(৪) দেবীর বামবাহু পতিত হয়। দেবী বহুলা। বর্ত্তমান নাম কাটোয়ার অন্তর্গত কেতুগ্রাম।

(৫) কেন্দুবিল্ব। বোলপুর হইতে ১২ মাইল, পৌষ সংক্রান্তিতে মেলা হয়।

মহাত্মাও এইখানে অবস্থিতি করিতেন। যাঁহার পদাবলী প্রত্যেক বৈষ্ণব কণ্ঠে ধ্বনিত হয়, যাঁহার কামগন্ধহীন অপূর্ব্ব প্রেমবৈচিত্র সাধনরাজ্যের গুহ্যতমতত্ত্ব প্রকাশ করে, যাঁহার পদাবলী লইয়া শ্রীচৈতন্যদেব গোপনে দুই একজন ভক্তের সহিত আলাপ করিতেন সেই প্রেমের চণ্ডীদাস (৬) এইখানে বাস করিতেন।

এই সকল জ্ঞাত স্থান ব্যতীতও কত স্থান এখনও অপ্রকট ভাবে বিদ্যমান আছে আমরা তাহা অনুমান করিতে পারি না। শান্তি বিরাজিত পবিত্র স্থানে মনোরম ভক্তি উদ্দীপক দেবমূর্ত্তি এবং জ্যোতির্ম্ময়ী ভৈরবীকে দেখিয়া হেমলতার হৃদয় রোমাঞ্চিত হইল; প্রেমাশ্রুসিক্ত নেত্রযুগল মায়ের পানে স্থির হইয়া রহিল। হেমলতা ক্ষণকালের জন্য জগৎ সংসার ভুলিয়া গেলেন, এমন সময় ভৈরবী-কণ্ঠ-"মা তুমি কে" শব্দ তাঁহার কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইল।

তৎপরে যাহা ঘটিয়াছে পাঠকগণ অবগত আছেন। ভোগ সমাপনান্তে ভৈরবী ও হেমলতা প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। অপরাহ্ণে উভয়ে মন্দিরের বাহিরে বসিয়া পরস্পর নানারূপ কথায় কালাতিপাত করিতেলাগিলেন। হেমলতা তাহার আনুপূর্ব্বিক সকল বৃত্তান্ত বলিতে বলিতে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

সন্ধ্যার পর আরতি সম্পাদন করিয়া সন্ন্যাসিনী ও হেমলতা নানাবিধ কথায় কাল যাপন করিতেছেন, এমন সময় মধুর কণ্ঠ নিঃসৃত গীতধ্বনি দূরাগত বংশী-ধ্বনির ন্যায় তাঁহাদিগের কর্ণে প্রবেশ করিল। উভয়েই নিস্তব্ধ হইয়া সেই গীত শুনিতে চেষ্টা করিলেন। শব্দ ক্রমে নিকটে আসিতে লাগিল। সেই গীত শ্রবণে হেমলতার দেহ যেন সজীব হইয়া উঠিল। সেই গীত বিশ্বযন্ত্রের সহিত মিলাইয়া ভক্তের হৃদয়ে শতবীণার ঝঙ্কার তুলিয়া কি এক অভিনব ছন্দে উচ্ছ্বসিত হইল। শুনিলেন—

আমি কি দুখেরে ডরাই।
ভবে দেও দুখ মা আর কত তাই।

গান শুনিয়া হেমলতা বলিলেন "মা! এই নিবিড় অরণ্যে গীতধ্বনি কার?" ভৈরবী বেশী কথা না বলিয়া সংক্ষেপে বলিলেন "এখনি দেখিতে পাইবে।"

(৬) নান্নুর বোলপুর হইতে ১২ মাইল। এখনও বিশালাক্ষী দেবী আছেন।

ক্রমে গীত স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর শুনা যাইতে লাগিল, নীরব নিস্তব্ধ ধীর ও গম্ভীর অরণ্য যেন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। গীতের প্রতি বর্ণমালা যেন ফুটিয়া উঠিল; ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে গমকে গমকে উর্ম্মিমালার ন্যায় ভাবনিবহ ছুটিতে লাগিল। গায়ক গায়িতেছেন—

আগে পাছে দুখ চলে মা
যদি কোন খানেতে যাই।
(তখন) দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে
দুখ দিয়ে মা বাজার মিলাই ॥

গান শুনিয়া হেমলতা মনে মনে নিজের অবস্থার তুলনা করিতে লাগিলেন, দেখিলেন তিনিও যেখানে যাইতেছেন দুঃখও তাঁহার অনুসরণ করিতেছে। তাই তাঁহার অতীত স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। পিতার অকাল মৃত্যু মাতার পর-লোক গমন, অবশেষে স্বামীর সমাধি মনে পড়িল। মনে পড়িল নবকুমারের অদ্ভুত সাহস ও পৈশাচিক ব্যবহার; আর অগাধ অন্ধকারে কঙ্করময় পথে একাকিনী ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন। আবার সেই গীত ধ্বনিত হইল।

বিষের কৃমি বিষে থাকি মা।
বিষ দিযে প্রাণ রাখি সদাই ॥
আমি এমন বিষের কৃমি মাগো
বিষের বোঝা নিয়ে বেড়াই।
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী বোঝা নাবাও খানিক জিরাই
দেখ সুখ পেয়ে লোক গর্ব্ব করে আমি করি দুখের বড়াই ॥

গান শুনিয়া হেমলতার হৃদয়ে একটী নূতন ভাবের সঞ্চার হইল। সাধকের উক্তির ভিতর হেমলতা এক অপূর্ব্ব ভগবৎ নির্ভরতা দেখিতে পাইলেন।

বাস্তবিক গানটীতে কি এক অপূর্ব্ব ভাব বিজড়িত। সাধক দুঃখের ভয় করেন না। শোক দুঃখ দেখিয়া সাধক পিছাইয়া যান না। ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া সুখদুঃখ দুইএর অতীত অবস্থায় যাইতে সাধক প্রয়াস পান। দুঃখ দ্বারা আমার বন্ধন বা ভেদভাব দূর হয়। আমি আমার যে ভাবটীর উপর দাঁড়াইয়া আমাকে জগৎ হইতে পৃথক্ ভাবিয়া কার্য্য করি; দুঃখ সেই বিশিষ্ট অহংকারকে ভাঙ্গিয়া ফেলে ও সেই দুঃখের ভিতর দিয়া অবিশেষ একত্ব ভাবটী

ফুটিয়া উঠে। তাই ভক্ত বা সাধক দুঃখকে না ভাবিয়া ভগবানের দয়া বলিয়া মনে করেন। আমাদের সে বিশ্বাস নাই, সে আত্মনির্ভরতা নাই; কাজেই দুঃখ দেখিলেই তাহার বিভীষিকা ভাবটী সহজে প্রতিবিম্বিত হয়। তাহার ভিতব দিয়া ভগবান যে অপূর্ব্ব শিক্ষা দিতেছেন আমাদের হৃদয় তাহা গ্রহণ করিতে পারে না। যাঁহারা এই সকল দুঃখ কষ্টের মধ্যে অচলভাবে দণ্ডায়মান থাকেন, সুখ দুঃখের দ্বারা অনুমাত্রও উদ্বেলিত হন না, তাঁহাবা আমাদের প্রণম্য। সাধক রামপ্রসাদ কত আবদার করিয়া ব্রহ্মময়ীকে বলিতেছেন— "বোঝা নামাও খানিক জিরাই।"

ক্রমে গীত নিকটবর্ত্তী হইলে একটী নবীন সন্ন্যাসী সম্মুখে উপস্থিত হইল। আগন্তুক আসিয়া ভৈববীকে দূর হইতে অভিবন্দন করিল। ভৈরবী বলিলেন— আজ ত আসিবার কথা ছিল না"।

আগন্তুক বলিলেন—আজ কথা ছিল না বটে, কিন্তু একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় সংবাদ লইয়া আসিয়াছি। পিতা বলিলেন যে একটী অসহায়া স্ত্রীলোক এখানে আসিলে তাহাকে সযত্নে রক্ষা করিও। তাঁহাব জন্য এই দুইখানি বস্ত্র ও আহারীয় দ্রব্য পাঠাইয়া দিয়াছেন।" এতক্ষণ অন্ধকাবে আগন্তুক হেমলতাকে দেখিতে পান নাই। তাহাকে দেখিয়াই আগন্তুক বলিলেন—"এটি কে

ভৈরবী। উটিও অসহায়া; বোধ হয় পিতা উহাবই কথা বলিয়াথাকিবেন?

আগন্তুক। (হেমলতার প্রতি) মা। তোমাকে দেখিয়া সম্ভ্রান্ত বংশীয়া বোধ হইতেছে আপনি একাকী এরূপ ভাবে আসিলেন কিরূপে? তবে এস্থানে ভয় নাই। এ মায়েব স্থান।

হেমলতা। আমার বিপদের কথা সমস্তই আপনাদিগকে বলিব। আমাব দুঃখের অবধি নাই।

আগন্তুক। মা! পিতা কল্য আসিবেন, আপনি তাঁহাকে সমস্ত বলিবেন। আপনার নামই কি হেমলতা?

হেমলতা। আজ্ঞে হাঁ। আপনি কি আমাকে চিনেন?

আগন্তুক। আপনাকে আমি চিনি না; পিতা বলিয়াছেন আপনার বাটী বোধ হয় বামপুর। আপনি বোধ হয় নির্ম্মলকুমারের [illegible]।

হেমলতা কাঁদিয়া ফেলিলেন। প্রভু আপনি কে কৃপা করিয়া বলুন। আপনি

নিশ্চয়ই কোন মহাপুরুষ নতুবা কিরূপে আমাকে এই বিজন অরণ্যে আশ্রয় দিবার জন্য আসিয়াছেন। কিরূপে আপনি জানিলেন যে আমি আজ এই বিজন অরণ্যে অসহায় অবস্থায় আসিব।

আগন্তুক হাসিয়া বলিলেন আপনি আমাকে মহাপুরুষ বলিবেন না, আমি মহাপুরুষের দাসানুদাস হইবারও উপযুক্ত নহি। কেবল গুরুদেবের ভৃত্য মাত্র; তাঁহার সামান্য সেবক মাত্র। তাঁহার আদেশ লইয়া বলিতে আসিয়াছি; পিতা কাল আসিবেন তাঁহার নিকট সকল সংবাদ জানিতে পারিবেন। তবে আমি শুনিয়াছি যে আপনি দুঃখিনী হইলেও ভাগ্যহীনা নহেন।

হেমলতা। আমার দুঃখের অন্তনাই। আমার দেশে ফিরিবার ও উপায় নাই, সকল কুলই গিয়াছে এখন কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিনা।

আগন্তুক। আপনি চিন্তিত হইবেন না। এ সংসার মায়ের। মা আমার অন্নপূর্ণা! সকলকেই অন্ন বিতরণ করিতেছেন। আপনার এত চিন্তা কেন? যিনি জীবন দিয়াছেন তিনিই তাহার উপায় করিবেন। মায়ের করুণার সীমা নাই। আপনি এই স্থান পরিত্যাগ করিবেন না। পিতা যখন আপনার জন্য ভাবিয়াছেন, তখন তিনি আপনাকে গ্রহণ করিয়াছেন। আপনি বিশ্রাম করুন, আমি পূজাদি সমাপন করিয়া আসি। এখনই আমাকে যাইতে হইবে।"

হেমলতা মনে মনে ভাবিল। ইঁহাদের আশ্রয় পরিত্যাগ করা হইবে না।

(ক্রমশঃ)

মুক্তি।

যে দিন জাগিবে বিশ্বে
সর্ব্ব আবরণ খুলি,
স্পর্শময় মহাপ্রাণ
অন্তঃহীন স্রোতে মেলি;
যে দিন নিখিলপ্লাবী
উদার কল্যাণ গেহে

অনির্ব্বাণ প্রেম আঁখি

রবে স্থির ছায়া ছেয়ে,

যেদিন অজস্র ঊষা

নিশার আঁধার হ'তে

নির্ভয়ে বহিবে জেগে

বিশ্বভাঙ্গা খরস্রোতে,

যেদিন জীবনময়

অবারিত তনু সেজে

তোমার দানের লিপি

রবে বিশ্ব দেশ মাঝে ॥

যেদিন সাগর গাথা

অণু পরমাণুগণ

বিরাট স্পন্দন মাঝে

রবে স্থির অনুক্ষণ

কল্লোলিত পরাণের

অরুণ লেখায়

রচিবে আসন তব

বিনা প্রতীক্ষায় ;

যেদিন উলঙ্গ প্রাণে

প্রতি বালুকণা

তোমার অক্ষয় রশ্মি

করিবে ঘোষণা—

সে দিন দেখিব বিশ্বে

মুক্তিময় দ্বার,

তোমার আদেশ মাথা—

লুণ্ঠ-মান হার ॥

শ্রীনরেশভূষণ দত্ত।

শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা।

জয় শ্যাম সুন্দর শ্যামল কলেবর—
সজল জলদ জিনি সুন্দর কাঁতি
কুম্‌কুম রঞ্জিত সন্ধ্যাকিরণ জিনি
লম্বিত বনমালা চপলাক ভাতি।
খণ্ডিত-শশিকলা-মণ্ডিত-দল-জাল
কোকনদ কোরক করধৃত বেণু
নধরাধর চারু সুহাস বিলাসিত
অলকা সুরঞ্জিত মলয়জ রেণু।
চূড়া শিখি পুচ্ছক গুচ্ছ সুনির্ম্মিত—
কুসুম কলিকা মালা মণ্ডিত, ধীরে
শ্রুতিমূল মণ্ডিত লম্বিত কুন্তল
কম্পিত মনোলোভা সুধীর সমীরে।
ভুরুযুগ ভঙ্গিমা অসিত ভুজঙ্গম
শঙ্কিত আঁখি যুগ চকিত চকোর
নীলোৎপল দল লাঞ্ছিত চঞ্চল
আকুল ব্রজ গোপীজন মনোচোর।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা ত্রিভুবনজনমনো-
মোহন, সুপীত বসন পরিধানে
মনোজ্ঞ সুগঠিত মহামরকত মাণ
শোভিত নিরমল হেম অনুমানে।
ফুল্ল কমলযুগ রাতুল শ্রীপদযুগ—
মত্ত মধুপ পতি মকরন্দ লোভে
গুন্ গুন্ গুঞ্জন সুগীত চরণ গুণ
অপরূপ। খণ্ডিত শশিকলা শোভে।

কনক নূপুরক রুনু রুনু গুঞ্জন
ভক্ত বিনোদন হৃদয় বিলাস
দাস কুমার দীন সংসার বিষানলে
তাপিত সতত শ্রীপদ যুগ আস।

শ্রীপ্রসন্নকুমার দাস।

ঈশ্বরের স্বরূপ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

২। সগুণ ভাব।

শাস্ত্রে জগৎপিতা বা জগন্মাতার আর একটি ভাবের কথা বর্ণিত আছে, তাহা ঈশ্বর ভাব। যখন মহাপ্রলয়ের অবসানে তাঁহার স্বরূপগত নিত্যশক্তি প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া সগুণ হন, তখন তিনি ঈশ্বর পদবাচ্য হয়েন এবং সাকারের মত ভাব ধারণ করেন। আর্য্য শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে ঈশ্বর সাকার ও সগুণ। যতক্ষণ তিনি নির্গুণ ভাবে থাকেন ততক্ষণ তিনি ঈশ্বর পদবাচ্য নহেন। যখনই তিনি ঈশ্বর তখনই তিনি সাকার; এই সাকার (সগুণ) ভাব পরিগ্রহ করিয়াই তিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন।

ঈশ্বর ঐশ্বর্য্যশালী; তিনি নির্গুণ হইতে পারেন না, এবং সগুণ হইলেই তিনি আকারবান্ হইবেন।*

পাতঞ্জল দর্শনে সমাধিপাদে ঈশ্বর কাহাকে বলে তাহা বলিতে গিয়া এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যথা :—

ক্লেশ কর্ম্ম বিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষ-বিশেষ ঈশ্বরঃ। পা ১। ২৪ সূত্র

অবিদ্যা প্রভৃতি পঞ্চবিধ ক্লেশ, ধর্ম্মাধর্ম্ম, জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ এবং সংস্কার এই সমস্ত যাঁহাতে নাই, এরূপ বিশেষ পুরুষ ঈশ্বর। মহর্ষি পাতঞ্জল তদীয় দর্শনের সমাধি পাদের ২২ সূত্র পর্য্যন্ত ঈশ্বর চিন্তা ভিন্ন, কি প্রকারে চিত্ত-বৃত্তি নিরোধ করিয়া সমাধি লাভ করিতে পারা যায়, তাহা দেখাইয়াছেন। তৎ-

* "যতোবা" শ্রুতি হইতে জানা যায় যে প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টির মূলেও এক নির্গুণ চৈতন্যের আবশ্যকতা আছে। লেখক মহাশয় এটী বিবেচনা করিবেন। পংসং

পর ২৩ সূত্রে বলিয়াছেন "ঈশ্বর প্রণিধানাদ্ বা" অর্থাৎ ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে ঈশ্বরের উপাসনা করিলেও সমাধি লাভ করা যায়। পরমাত্মার অতি-রিক্ত কি আছে যাঁহাকে ঈশ্বর বলা যাইতে পারে এরূপ আশঙ্কায় ২৪ সূত্রে ঈশ্বর কাহাকে বলে তাহা বলিয়াছেন।

শাস্ত্রে যেখানে ঈশ্বরের কথা, সেখানেই আকারবানের কথা।* শাস্ত্রকারগণ কুত্রাপি নিরাকার ঈশ্বরের কথা বলেন না। যেখানে তাঁহাকে নিরাকার বলিয়া-ছেন সেখানেই তাঁহাকে অজ্ঞেয়, মনোবুদ্ধির অগোচর, নির্গুণ পরমাত্মা বা ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এই পরমাত্মা বা ব্রহ্ম চারি প্রকার কারণে রূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকেন।

(১) স্বভাবের অনুরোধে।

অনন্ত শক্তি সম্পন্ন ভগবানের যখন সৃষ্ট্যাদি সময়ে এক এক শক্তির পরি-স্ফুরিত অবস্থা হয়, তখন আপনা হইতেই (অবশ্য তাঁহার ইচ্ছা ক্রমে) এক এক প্রকার স্ত্রী বা পুরুষাকৃতি ব্যাকৃত হইয়া পড়ে। মহাপ্রলয়ে তিনি একমাত্র অদ্বিতীয় সৎ পদার্থ বিদ্যমান ছিলেন। তখন তাঁহার নাম রূপ কিছুই ছিল না, তিনি নির্গুণ ব্রহ্ম ভাবে অবস্থিত ছিলেন। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতিতে (ব্রহ্মশক্তিতে) বিলীন ছিল এবং প্রকৃতি ব্রহ্মে লীনা ছিলেন। সেই সময়ের বর্ণনা করিতে গিয়া শাস্ত্র বলিয়াছেন—

নাহো ন রাত্রির্নভো ন ভূমিঃ।
নাসীত্তমো জ্যোতিরভূন্ন চান্যৎ॥

তখন দিবা, রাত্রি, আকাশ, ভূমি, অন্ধকার, জ্যোতিঃ কিছুই ছিল না। সেই সময়ের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা শাস্ত্র বর্ণনা করিতে অক্ষম হইয়া "অন্ধকার ও আলোক কিছুই ছিল না" এ পর্য্যন্ত বলিয়াছেন। আলোক ও অন্ধকারের অতিরিক্ত কোন পদার্থ আমরা জানি না, কাজেই আমাদের সে অবস্থা ধারণা করা সাধ্যায়ত্ত নহে। স্থানান্তরে "প্রসুপ্ত মিব সর্ব্বতঃ" যেন সকল জগত নিদ্রিতাবস্থায় ছিল, এরূপ বলিয়াছেন।†

---

* লেখক মহাশয় 'আকার' ও 'গুণ' এই দুই শব্দ স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিলে ভাল হয়। পং সং।

† বৈষ্ণবশাস্ত্রে পরব্যোমের পরপারেও শ্রীমূর্ত্তি আছে বলা হয়। পং সং

মহাপ্রলয়ের অবসানে "সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি" তাঁহার যখন "আমি বহু হইব" এরূপ ইচ্ছা হইল, তখন প্রকৃতিতে ক্ষোভ অর্থাৎ চাঞ্চল্য জন্মিল। এই ব্রহ্মশক্তি প্রকৃতি মহাপ্রলয় অবসান পর্য্যন্ত সাম্যাবস্থায় অর্থাৎ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ব্রহ্মে লীন ছিল। যখন প্রকৃতিতে ক্ষোভ জন্মিল, তখন সেই সৎ ব্রহ্ম-পদার্থ নিজ শক্তি প্রকৃতিতে (গুণ বা মায়াতে) সংযুক্ত হইয়া ঈশ্বর বা ঈশ্বরী পদবাচ্য হন এবং নানা প্রকার আকার ধারণ করেন।

মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরম্। শ্বেত ১। ১০।

এই মায়াই প্রকৃতি—আর মায়া উপহিত অর্থাৎ মায়া উপাধিযুক্ত * পরব্রহ্ম মহেশ্বর নামে অভিহিত হন। ব্রহ্ম মায়োপাধি গ্রহণ করিয়া ঈশ্বর হয়েন, ইহাই আর্য্য শাস্ত্রের মর্ম্ম। এই মায়াই ব্রহ্মের ইচ্ছা শক্তি, বেদান্ত শাস্ত্রে ইহাকে ঈক্ষণ শক্তি বলা হইয়াছে। এই ঈক্ষণ শক্তি ব্রহ্মের নিত্য শক্তি; ইহা ব্রহ্মে কখনও অভাব ছিল না। তবে এই শক্তি কখন প্রকট (প্রকাশ) কখন অপ্রকট (অপ্রকাশ) ভাবে থাকে। ব্রহ্মের এই ইচ্ছা শক্তি দ্বারা জগদাদি আবির্ভূত হইয়াছে; তিনি যতক্ষণ এই শক্তিযুক্ত (শক্তির প্রকাশাবস্থাপন্ন) ততক্ষণ তিনি প্রকট ও জ্ঞেয়। শক্তি তন্মধ্যে বিলীনা হইলে তিনি অজ্ঞেয় ভাব ধারণ করেন—তখন তিনি নির্গুণ। এই প্রকারে সৃষ্টির পর প্রলয়, প্রলয়ের পর সৃষ্টি এবং তৎসহ ব্রহ্মের প্রকট ও অপ্রকট অবস্থা অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। শক্তির স্ফুরণ হইলে, রূপেরও স্ফুরণ হইয়া থাকে।

ভগবতী বলিয়াছেন—

সৃষ্ট্যর্থ মাত্মনো রূপং ময়ৈব স্বেচ্ছয়া পিতঃ।
কৃতং দ্বিধা নগশ্রেষ্ঠ স্ত্রী পুমানিতি ভেদতঃ॥

পিতঃ পর্ব্বতরাজ! আমি সৃষ্টির জন্য নিজ রূপকে স্বেচ্ছাক্রমেই স্ত্রী ও পুরুষ এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি।

সৃজামি ব্রহ্ম রূপেণ জগদেতচ্চরাচরম্।
সংহারামি মহারুদ্র রূপেনান্তে নিজেচ্ছয়া॥

ভগবতী গীতা ৪র্থ অঃ ১৫ শ্লোক

---

* না, মায়ার অধীশ্বর? পং সং

আমি ব্রহ্মরূপে এই চরাচর জগৎ সৃজন করি; আবার অন্তকালে স্বেচ্ছা-ক্রমেই মহারুদ্র রূপে সমস্ত জগৎ সংহার করি।

নির্গুণং সগুণঞ্চেতি দ্বিধা মদ্রূপ মুচ্যতে।
নির্গুণং মায়য়া হীনং সগুণং মায়য়া যুতম্॥

তিনি মায়া অর্থাৎ গুণযুক্তা হইয়া আকারবান্ হন; এই মায়া ও গুণ তাঁহারই বটে। মানুষের যেমন দুই অংশ—দেহাংশ ও আত্মাংশ—জগদম্বারও সেইরূপ। তাঁহার আত্মাংশ নিষ্ক্রিয় ও নির্গুণ; ইহা উপাস্য নহে, ইহাই শাস্ত্রীয় ব্রহ্ম।

দেহাংশ ও আত্মাংশ লইয়া ঈশ্বর। ইনি সৃষ্টি স্থিতি, প্রলয় করেন এবং আকারবান্ ও গুণ সম্পন্ন। এই ঈশ্বরই আমাদের উপাস্য। তিনি প্রকৃতি আর পুরুষ বা শক্তি আর চৈতন্য, এই উভয়ের স্বরূপ। এই উভয় মিলিয়াই ঈশ্বর; তন্মধ্যে প্রকৃতি তাহার দেহ এবং পুরুষ তাহার আত্মা। ইনি প্রলয়াবসানে সৃষ্টি কার্য্যের জন্য নানা প্রকার রূপ পরিগ্রহ করেন;—যথা ব্রহ্মা বিষ্ণু, রুদ্র, ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী রুদ্রাণী ইত্যাদি। ইঁহারা সেই প্রকৃত্যাত্মক পরম পুরুষের ইচ্ছাময় অবতার। সৃষ্টির অবসানে মহাপ্রলয়ে এই সকল রূপের অভাব হইয়া থাকে; কিন্তু নষ্ট হয় না। কারণ এই সব আকারগুলি নিত্য সিদ্ধ, কেবল মহাপ্রলয়ে প্রকাশের অভাবে এই সব রূপ ব্রহ্ম সত্তায় লীন থাকে। তিনি দেহধারী হইলেও তাঁহাতে জীবভাবের কিছু মাত্র সংস্রব নাই। তাঁহার দেহের সহিত ভূত ভৌতিক পদার্থের কিছু মাত্র সম্পর্ক নাই, অস্থি, মজ্জা, রক্ত প্রভৃতি কিছুই নাই, অথচ মনুষ্যাদির ন্যায় হস্ত পদ বিশিষ্ট। তাঁহার এই সকল দেহ শক্তিময় ও ইচ্ছাময়; প্রয়োজন শেষ হইলে তাহাদের তিরোধান হয়। ইহাদিগকে নিয়ত আবির্ভাব বলে; কারণ ইহাদের আবির্ভাব ও তিরোধানের সময় নির্দ্দিষ্ট আছে। প্রত্যেক মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত এই সকল ইচ্ছাময় দেহ প্রকট অবস্থায় থাকে।

(২) জগতে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য, মহিষাসুর, শুম্ভ, নিশুম্ভাদি দৈত্য দানব বিনাশ পূর্ব্বক জগতের শান্তি স্থাপন করিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য সময় সময় তাঁহার ইচ্ছাময় রূপের আবির্ভাব হয়। ইহাদিগকে অনিয়ত

আবির্ভাব বলে। কারণ ইহাদের আবির্ভাবের সময় নির্দ্দিষ্ট নাই, প্রয়োজন হইলেই আবির্ভূত হয় এবং কার্য্য শেষ হইলে তিরোহিত হয়।

চণ্ডীতে বলিয়াছেন ঃ—

নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্।
তথাপি তৎ সমুৎপত্তি র্বহুধা শ্রূয়তাং মম॥
দেবানাং কার্য্য সিদ্ধ্যর্থ মাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে॥

মেধস ঋষি বলিতেছেন, "তিনি নিত্যা অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার স্বরূপ। তাঁহার দ্বারা এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্ব সৃষ্টি হইয়াছে। যদিও তাঁহার আমাদের ন্যায় উৎপত্ত্যাদি কিছুই নাই, তথাপি লোকে তাঁহার এক প্রকার উৎপত্ত্যাদি কীর্ত্তন করে, তাহা তুমি আমার নিকট বহু প্রকারে শ্রবণ কর। তোমার স্মরণার্থে পুনরপি বলিতেছি, তিনি নিত্য বস্তু, কিন্তু দেবগণের কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত যখন আবির্ভূতা হন, তখনই লোকে তাঁহাকে "উৎপন্না" বলিয়া থাকে।"

গীতাতেও শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

"যে সময়ে ধর্ম্মের ক্ষয় এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়া আইসে, তখনই আমি মায়াকে আশ্রয় করিয়া জন্ম গ্রহণ করি।" তিনি জগতের সামঞ্জস্য রক্ষার নিমিত্ত যে সকল রূপ পরিগ্রহ করেন, তাহারা সমস্তেই অনিয়ত আবির্ভাবের অন্তর্গত; তবে কতকগুলি রূপের বাল্য কৌমারাদি অবস্থা আছে এবং কতকগুলি রূপের বাল্য কৌমারাদি অবস্থা নাই। প্রথমোক্ত অনিয়ত আবির্ভাবের মধ্যে সতী, বামন, রাম, কৃষ্ণ—ইত্যাদি। শেষোক্ত প্রকারের মধ্যে কালী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, তারা, নৃসিংহ, ত্রিপুরারি ইত্যাদি; ইহারা ব্রহ্মাণ্ডের উপকার সাধনের নিমিত্ত এই সকল মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হন।

(৩) উপাসকগণের উপাসনার নিমিত্ত। শাস্ত্র বলিতেছেন—

চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা॥

চিন্ময় অদ্বিতীয় (যাঁহার দ্বিতীয় নাই) নিষ্কল অশরীর ব্রহ্ম উপাসকগণের উপাসনা কার্য্যের জন্য শরীর পরিগ্রহ করেন।

ভগবতী গীতায় আছে :—

অনভিধ্যায় রূপন্তু স্থূলং পর্ব্বত পুঙ্গব।
অগম্যংসূক্ষ্মরূপং মে যদ্দৃষ্টা মোক্ষভাগ্ ভবেৎ॥
তস্মাৎ স্থূলং হি মে রূপং মুমুক্ষুঃ পূর্ব্ব মাশ্রয়েৎ॥

আমার স্থূল রূপের সম্যক্ ধ্যান না করিয়া, কেহ আমার সেই সূক্ষ্ম রূপে প্রবেশ করিতে পারে না, যে সূক্ষ্মরূপ দর্শন করিলে জীব সংসার বন্ধন বিমুক্ত হইয়া নির্ব্বান লাভ করে। সেই হেতু মুক্তি অভিলাষী সাধক অবশ্য আমার স্থূল রূপ প্রথমে আশ্রয় করিবে।

স্থূল সূক্ষ্ম উভয় রূপই তাঁহার। ব্রহ্ম বা পরমাত্মাকে সূক্ষ্ম রূপ দ্বারা লক্ষ্য করিয়াছেন; একরূপ মানবের মনোবুদ্ধির অগম্য, এজন্য তাঁহার স্থূল রূপ অর্থাৎ ঈশ্বর রূপের আশ্রয় গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। এই সকল রূপ যে তাঁহার নিজের, মানুষের কল্পিত নহে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ শাস্ত্রে আছে। "ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা" অর্থে মানুষের মিথ্যা কল্পনা অর্থে মানুষের মিথ্যা কল্পনা নহে এখানে ব্রহ্মণঃ পদে কর্ত্তায় ষষ্ঠী হইয়াছে, কল্পনা অর্থে সৃজনঃ; এই সৃজন তাহার নিজের, তিনি নিজে নিজের রূপ সৃজন করিয়াছেন। অন্যত্রও এই অর্থে কল্পনা শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন "ধাতা যথা পূর্ব্ব সকল্পষৎ" বিধাতা পূর্ব্বে যেরূপ ছিল সেই রূপ সৃষ্টি করিলেন।

(৪) তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ ব্যঞ্জনার নিমিত্ত। তাঁহার স্বরূপ নিজে ব্যক্ত না করিলে মানুষের কি সাধ্য আছে তাহার উপলব্ধি করে। তাঁহার এক একটি রূপের দ্বারা অতি দুর্জ্ঞেয় অবস্থা এক একটীর চিত্র প্রকাশ করিয়াছেন। সেই আকৃতি দেখিলেই তাঁহার সেই দুর্জ্ঞেয় অবস্থাটিরও এক একটী সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। প্রত্যেক মূর্ত্তি দ্বারা নানা প্রকার ভাব ও শক্তি প্রকাশ করিতেছেন। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সত্ত্ব রজঃ তমো গুণ বা শক্তি দ্বারা তিনি ব্রহ্মাণ্ডে নানা প্রকার লীলাখেলা করিতেছেন। কোন মূর্ত্তিতে একটী কোন মূর্ত্তিতে দুইটী ও কোন মূর্ত্তিতে তিনটী গুণের প্রকাশ পাইতেছে, অথচ প্রত্যেক মূর্ত্তিতে ত্রিগুণেরই সমাবেশ আছে। এই সকল

গুণ অবলম্বনে তিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত লীলা কবিতেছেন এবং প্রকৃতি সম্ভূত পিতৃ মাতৃ শক্তির সনাতন লীলাব দ্বাবা ব্রহ্মাণ্ডেব সৃষ্টি স্থিত্যাদি যাবৎ কার্য্য সংসাধিত কবিতেছেন। জগদম্বা একাই নিজশক্তি প্রকৃতিকে অবলম্বন কবিয়া স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব শক্তিরূপে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। এই সকল বহস্য কোন মূর্ত্তিতে একাধাবে অর্দ্ধ নাবীশ্বর হবগৌবী ইত্যাদি রূপে এবং কোন মূর্ত্তিতে পৃথকভাবে লক্ষ্মী, বিষ্ণু, শিব, কালী ইত্যাদি রূপে দেখাইতেছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীচবণ সেন।

মহী।*

সিন্ধু-কণ্ঠে নিশিদিন তুলি আর্ত্তনাদ,
ত্রস্ত পদে চক্রপথে ঘুবি নিবন্তব,
দগ্ধ পদতলে দলি' শত উল্কাপাত,
মহাশূন্যে ধায় মহী আকুল অন্তব,—
উন্মাদিনী যেন। নীবদ-কুন্তল-জাল
উড়ি পড়ে পৃষ্ঠ' পবে, ম্লান মুখ-শশী ;
বক্ষের পঞ্জব হ'তে তীব্র বিকবাল
অগ্নি-মাখা উষ্ণ শ্বাস উঠিছে উচ্ছ্বসি'
থাকি' থাকি' ; যন্ত্রণায় উঠে শিহবিয়া !
ক্ষণে ক্ষণে ; স্রস্ত-বাস অদ্রি-পয়োধব
ঘন দুলে ; মর্ম্ম-তাপে ফাটে বুঝি হিয়া !
গুমবি' গুমবি' কাঁদে, কাঁপে কলেবব।
যতদিন বক্ষে তাবে না ধরিবে ববি,
এমনি ছুটিছে বালা নিরাশার ছবি।

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

* মহী ও সূর্য্য, জীবাত্মা ও পরমাত্মার সহিত কি তুলিত হইয়াছে ?—পং সং।—

আশ্বিন] ১৩১৯ । [কার্ত্তিক

পূজার

সম্পাদক —

শ্রীরাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্,

ও

শ্রীবারাণসীবাসী মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ ।

প্রকাশক —

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ ।

প্রিণ্টার — শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

মেট্‌কাফ্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,

৩৪ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা ।

১৩১৯

৺পূজার পদ্ম।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

K. V Seyne & Bros.

১ম খণ্ড]   আশ্বিন ও কার্ত্তিক ১৩১৯   [৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা

(নবপর্য্যায়—ষোড়শ বর্ষ ।)

জগৎজনন্যৈ জগদেকপিত্রে ।

(১)

হব ভোলা দিগম্বব !   শঙ্কব শ্মশানচব !
(আমাব) শ্মশান-হৃদয়ে এসে   নৃত্য কব নিবন্তব ।
হু হু প্রজ্জ্বলিত চিতা   জ্বলে সেথা অনিবার,
(আমার প্রাণ পোড়া ছাই মাখি   সাজিবে তুমি সুন্দব ।
কত শত বিহরিছে   কালকূট বিষধব,
তাদেব) ধবে ধবে পবে নিজ   অঙ্গেব ভূষণ কর ।
উঠে তীব্র হলাহল   অহবহ অবিবল,
(তুমি , প্রাণ ভবি, কণ্ঠ ভবি   যত পাব পান কব ।
মর্ম্ম-ভেদী মুক্তশ্বাসে   বাজাও শৃঙ্গা উচ্চৈঃস্বব,
(আব) মাতাও বম ববম্ নাদে   ব্যোম বিশ্ব চরাচর ।
ভূত প্রেত বাস ভাল   আছে সেথা বহুতর
(তাবা) যোগাবে যা চা'বে যবে   সতত হ'য়ে তৎপর ।
একা না থাকিতে হবে   পাবে প্রাণের দোসর,
(সেথা) শ্মশান-বাসিনী করে   বসতি নিশি বাসর :—
পাগ্‌লী সনে পাগল প্রাণে   থাকবে ভাল প্রাণেশ্বর,
(আমি) যুগল মাধুবী হেরি   প্রেমে হব গর গর ।

(২)

পরমা সুন্দরী শ্যামা ! কে তোমারে বলে কাল,
(তুমি) অন্তরালে থেকে কর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আলো।
তরুণ তপনে তুমি কিরণ অরুণোজ্জ্বল,
(আবার) শশীর সুষমা রাশি সুধাময় সুশীতল।
প্রকাশে তোমারি দিব্য জ্যোতি প্রজ্বলিতানল,
(মাগো) বিজলী বিকাশে তুমি হাস্য কর খল খল।
শিশুর অমিয় কান্তি মুখে হাসি নিরমল,
(মাগো) মমতা মূরতি তুমি জননী স্নেহ বৎসল।
সতীর যৌবন ভাতি হৃদে প্রীতি ঢল ঢল,
(মাগো) প্রেমিক নয়নে তুমি প্রেম অশ্রু অবিরল।
বিমল সরসী জলে বিকসিত শতদল,
(মাগো) ফলে সুমধুর রস, পুষ্পে তুমি পরিমল।
তরুলতা শিরে নব কিশলয় সুকোমল,
(আবার) কোকিল কাকলী তুমি, মরালের মদকল।
সুনীল জলধি জলে জ্বলন্ত বাড়বানল,
(মাগো) সমীরের সুধাস্পর্শ তারিণি ! তুমি সকল।
এ হেন মোহন রূপ হেরে হয়েছি পাগল,
(আমার) আঁধার প্রাণের মাণিক তুমি বিরাজ মা সমুজ্জ্বল।

গোবিন্দলাল

মহাপূজা।

১। পূর্ব্বাভাস।

পরিদৃশ্যমান নামরূপাত্মক বহুত্ববাচক বিশ্বের অন্তরালে তাহার আলয় ও নিধান স্বরূপ সত্যজ্ঞান ও অনন্ত আনন্দ-মাত্রা একরসমূর্ত্তি অগাধবোধ ব্রহ্ম বা ভগবান তত্ত্ব আছেন। "ব্রহ্মাদ্বয়ম্ পরমনন্তমগাধবোধম্" [ভাগবত পুরাণ ১০।১৩।১৬] এই পরম সত্ত্বার অপর নাম তত্ত্ব। (১) বিশ্ব এই চৈতন্যের এক অংশ মাত্রে আছে। "একাংশেন স্থিতঃ জগৎ।" এই অক্ষর পদার্থকে তৎসৎ শব্দে ইঙ্গিত করিয়া সমস্ত শাস্ত্র তাঁহারই উপর পর্য্যবসিত। ইনি **সত্য** বা সর্ব্বভাবে, সর্ব্বাবস্থায় সম বা **একরূপে** অবস্থিত,—**এক** অর্থাৎ বহুত্বের **প্রভব** ও **প্রলয়** স্থান ও বিশ্বাতিগ (transcendent) পুরুষোত্তম, ও ব্যক্তের আদি বলিয়া **পুরাণ**। তিনি জন্মাদি বিকার এবং স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদশূন্য বলিয়া **নিত্য**, সর্ব্বদা পরিপূর্ণ বলিয়া **অক্ষর** ও **অজস্র আনন্দ-স্বরূপ**। প্রকাশ ও লয় তাঁহাকে স্পর্শ করেনা বলিয়া, তিনি **অনন্ত**, এবং সর্ব্ব বা জগৎভাব দ্বারা অস্পৃষ্ট বলিয়া তিনি নিষ্কল ও জ্ঞানানন্দঘন, সদা **সিদ্ধ** অর্থাৎ প্রকাশাদি ক্রিয়া দ্বারা তাঁহার বাধ হয়না, এবং ভেদবুদ্ধি দ্বারা অলব্ধ বলিয়া **স্বপ্রকাশ** স্বয়ংজ্যোতি ও অমৃতস্বরূপ। তাঁহাতে মায়ার লেশ নাই, উপাধির সম্পর্ক নাই, সুতরাং তিনি অবশেষ অমৃতস্বরূপ ও **নিরঞ্জন**।

একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ
সত্যঃ স্বয়ংজ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ।
নিত্যোঽক্ষরোঽজস্রসুখো নিরঞ্জনঃ
পূর্ণাদ্বয়ো মুক্ত উপাধিতোঽমৃতঃ॥ ভাগবত ১০।১৪।২৩

'সত্যের সত্য' এই পরমতত্ত্ব তিন বিভাবে তত্ত্বদর্শিগণের নিকট দৃষ্ট হয়েন। স্বরূপ-ভাবে নিষ্কলরূপে তাঁহাতে জীব ও জগৎ প্রভৃতি ভাবের লেশ নাই। প্রকাশের সময় তিনি "অহং কেন্দ্র" বা জীবরূপে, এবং সর্ব্বাত্মিকা ভাবে বা জগৎ-

(১) ভাগবত। ১।২।১১

রূপে ব্যাকৃত (expanded) হয়েন। জীব তাঁহার ব্যঞ্জক বলিয়া, জীবশক্তি তটস্থা শক্তি। সর্ব্বাত্মিকা ভাবের আশ্রয় মায়াশক্তি দ্বারা তিনি প্রকৃতি বা প্রধান ভাবে,ব্যক্ত বিশিষ্ট ও অব্যক্ত অবিশেষ এই উভয় রূপে প্রকট হন।

শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দঘন চৈতন্যকে শাস্ত্র দেবীরূপে বর্ণনা করেন। "দেবী মায়া বৈশারদী মতিঃ" ইতি ভাগবত। আমার চৈতন্য যেমন সদা আমাকেই প্রকাশ করে, যেমন জগৎবস্তু সকলকে প্রতিভাত করিয়াও সর্ব্বদা সেই সকল বস্তুকে পুনরায় ক্রিয়া, ইচ্ছা ও জ্ঞানরূপে আমার 'আমির' সহিত সম্পর্কিত করিয়া আমার 'আমির' সর্ব্বব্যাপী ভাবের ইঙ্গিত করে, তদ্রূপ ঈশ্বর-চৈতন্যময়ী দেবী মায়ারূপে আপাততঃ পরিদৃশ্যমান সর্ব্বরূপ অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড শ্রীভগবানে প্রকাশ করিয়া, পুনরায় তাঁহাতেই লয় করিয়া 'সর্ব্বং খল্বিদম্ ব্রহ্ম' এই ভাবের সংস্থাপনা করেন। আবার জীবশক্তি রূপে ব্যক্ত অনন্ত ভাবের মধ্যে 'অহং' ও 'মম' রূপে একীকরণ প্রবৃত্তি প্রকট করিয়া অহং পদার্থ যে প্রকৃত বিশ্বাতিগ (transcendent) 'সোহং' তাহা প্রমাণ করিতেছেন। এই জন্য এই প্রবৃত্তিকে "পরা" বা বিশ্বাতিগা প্রকৃতি বলিয়াই অভিহিত করা হয়।

এই দুই প্রবৃত্তি বা প্রবণতা (tendency) দ্বারা স্বরূপ চৈতন্যের মান করা যায়না। ভোজনাদি প্রবৃত্তি উদিত হইলে তাহা হইতে হস্তাদি পরিচালন রূপ বিশেষ বিশেষ, এবং আপততঃ বিশ্লিষ্ট, চৈতন্য ব্যাপার প্রকট হয়। কিন্তু তদ্দ্বারা আমাদের 'আমি' জ্ঞানটীকে নিঃশেষিত করা যায়না। পরন্তু ঐ 'আমি' ভাবটীর বিকাশগুলি বিশিষ্ট কার্য্যের দ্বারা নিয়মিত ও পরিচ্ছিন্নপ্রায় হইলেও, উহা সর্ব্বদা ঐ সকল ব্যক্তভাবের অতীত। কারণ বিভিন্ন লোকে ভোজন ক্রিয়াদি ব্যাপারের মধ্যে আপন আপন "আমির" লব্ধ ধর্ম্মাদি ভাব সকল প্রকাশ করিয়া ভোজনাদি ব্যাপারের দ্বারা অহং ভাবের সংসিদ্ধিলাভ করেন। এমন কি সামান্য ভোজনের ভিতরও জনার্দ্দন রূপ ঐশ্বরিক ভাব ক্ষেত্র-বিশেষে প্রকট হয়। তদ্রূপ মায়া বা বিশ্বাভিমুখী সর্ব্বাত্মিকা প্রবৃত্তি, এবং জীব বা কেন্দ্ররূপী অহংভাবের বিকাশ হইলেও তদ্দারা ব্রহ্মস্বরূপ এবং ব্রহ্মের সর্ব্বাত্মিকা চৈতন্যের নিঃশেষীকরণ, পরিণতি বা অপলাপ হয়না।

চৈতন্যের বা ব্রহ্মময়ী দেবীর এই আশ্চর্য্য প্রবৃত্তি সর্ব্বদাই প্রকাশিত রহিয়াছে। অর্থের লোভে আমি আকৃষ্ট হইয়া কার্য্য করিতেছি ; বিশিষ্টভাবে,

বিশিষ্ট বস্তুর দিকে আমার লক্ষ্য ও গতি। কিন্তু 'আমিটী' যদি বিশিষ্ট হইত, ও বস্তুটী যদি মদতিরিক্ত হইত, এমন কি শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি যদি বাহিরের বস্তু হইত, তাহা হইলে চৈতন্যের সাহায্যে 'আমির' সহিত শরীরের সংযোগ হইত না। চৈতন্যের সাহায্যে জড়ের ক্রিয়া হইত না। জড় বস্তু লাভ করিয়া সুখ ও জ্ঞান-রূপ সত্ত্বভাব প্রকাশ হইত না, এবং ভোগের দ্বারা আমার 'আমিকে' চিনিতে পারিতাম না। এই সামান্য ব্যাপারের মধ্যেও "আমি যে সর্ব্ব," এই জ্ঞানটী লুক্কাইত আছে। পরবস্তু যখন ভোগে আনন্দিত ও জ্ঞানরূপে তৃপ্ত হই, তখনই 'বস্তু' 'চেষ্টা' প্রভৃতি ভাবগুলি ডুবিয়া আমাতে মিশিয়া যায়। চিত্তে দ্বন্দ্ব বা বিরোধভাব থাকিলে আনন্দ বা জ্ঞান প্রকাশ হইতে পারে না। এইরূপে সকল প্রকার ব্যক্ত প্রকাশের মধ্যে এক অদ্বিতীয়, সমস্ত জগৎ বস্তুর অতীত বা উর্দ্ধগামী, প্রলয়স্থান রূপ অহং তত্ত্ব ও সর্ব্বাত্মিকা প্রবৃত্তিরূপ অহংতত্ত্বের প্রকাশ ভাব ইঙ্গিত করাহইতেছে। সেইজন্য চৈতন্যময়ী দেবী সর্ব্বাবস্থাতেই পরম পুরুষে সঙ্গতা এবং সর্ব্বদাই সেই পুরুষোত্তমের একতা, বা সর্ব্বাত্মিকতা এবং অদ্বিতীয়তার ব্যঞ্জনা করিতেছেন। চৈতন্য বা বোধশক্তি গোত্র, আকৃতি প্রভৃতি রূপের ভাব লইয়া খেলা করিতে পারে; কিন্তু এ খেলার মধ্যেও, দেখ কোথা হইতে, রূপাদি বাহিরের ভাব অতিক্রম করিয়া জ্ঞান বা বোধরূপে, ব্যক্ত প্রপঞ্চের অতীত বিশ্বাতিগ ভাবে—চৈতন্য কোথায় মিশিয়া গেল। বস্তু পড়িয়া গেল, বাহ্যভাব অন্তর্হিত হইল, ও এমনকি বিশিষ্ট আমিত্ব জ্ঞানটী সেই বোধে ডুবিয়া গেল। চৈতন্য বহুত্বরূপী জগৎবস্তু লইয়া খেলা করিতে করিতে, ঐ দেখ কোথা হইতে ব্যক্ত বহুত্বের দ্রষ্টা, সাক্ষী বা তদতিগ অহং জ্ঞানে বাহ্য বহুকে মিশাইয়া দিয়া শান্ত হইল। বিশিষ্ট লক্ষ্যের দিকে—ধন, মান, পুত্রাদির দিকে, চৈতন্যকে প্রযুক্ত করিলে, অনন্ত বস্তু প্রকট করিয়া, ঐ দেখ, চৈতন্য-ময়ী জগন্মাতা দুঃখ, অতৃপ্তি ও বৈরাগ্যের ভিতর দিয়া লক্ষ্য বস্তুর উপরে স্থিত এক বিশাল ভাব ফুটাইয়া দিলেন। এবং সম্বন্ধ বা সম্পর্ক জ্ঞানের (relativity of consciousness) মধ্য দিয়া জগদ্বস্তু সকলের মিলনস্থান বা আধাররূপ এক পরমতত্ত্বের ইঙ্গিত করিলেন। সাধারণ বা সামান্য (universal) ভাবে "প্রকৃতি" "স্বভাব" "ধর্ম্ম" প্রভৃতি লক্ষণাদ্বারা, কোথা হইতে, অসাধারণ অদ্বিতীয়তা ও অসম্বন্ধতা ভাব ফুটিয়া উঠে, বলিযাই মানব যে যে বিষয়ে চৈতন্যের এই সামান্য গতি (universal trend) দেখিতে পান, তিনি সেই সেই বিষয়ে

অনুরূপ বিজ্ঞানের সাহায্যে, "অহংতত্ত্ব যে ব্যক্ত বহুত্বের পরিচালক ও অধ্যক্ষ", ইহা সিদ্ধ করিয়া সেই অহংতত্ত্বের নিঃসঙ্গতা প্রতিপাদন করিতেছেন ঐ দেখ গঙ্গার স্রোত কেবল সাগরাভিমুখী—অন্য কোনদিকে যায় না, কিন্তু রামের শ্বশুর-বাটী হুগলী, তিনি ভাবেন স্রোতটী বুঝি সেই দিকেই যাইতেছে। হরি বৈদ্যবাটীর ঘাটে আলু বিক্রয় করে, এবং মনে করে যে স্রোতটী তাহাকে বৈদ্যবাটীতে লইয়া যাইবার জন্য খেলিতেছে। ধীরেন ব্রহ্মবিদ্যা প্রচার করেন, তিনি ভাবেন যে 'নূতন ধর্ম্ম বা জাতি' ও তাঁহার 'সত্য লোকাদিপ্রাপ্তির' জন্যই বুঝি তাঁহার ভিতর দিয়া চৈতন্যরূপিণী খেলিতেছেন।

গরগর বাজে বাঁশী নন্দের ভবনে।
যার মনে যা হৈছে সে তৈছে শুনে॥

প্রবৃত্তি ও ব্যক্তভাবের মোহে জীব স্বকল্পিত লক্ষ্যের দিকে চৈতন্যের প্রেরণা করিলেও, বাস্তবিক পক্ষে গঙ্গার স্রোতের ন্যায় চৈতন্যময়ী সর্ব্বদাই সেই পরতত্ত্ব ভগবান্ বা পরব্রহ্মের দিকে যাইতেছেন, এবং সর্ব্বদাই বিশ্বাতিগ পর অহংরূপে এবং সর্ব্বাত্মিকা একত্বরূপে এই, উভয় ভাবে, পরব্রহ্মে পরিসমাপ্তা বা সংসিদ্ধা হইতেছেন। যিনি আপন চৈতন্যের মধ্যে সর্ব্বদাই এই পরা প্রবৃত্তি দেখিতে পান, তিনিই প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্যার উপাসক। শাস্ত্র চৈতন্যময়ী মহামায়া দেবীকে এইজন্য মহাকালীরূপে কল্পনা করিয়া তাঁহাকে পরব্রহ্মভাবের প্রতিপাদিতা বা ব্রহ্মরূপে সিদ্ধা বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন।

অগোত্রাকৃতিত্বাদনৈকান্তিকত্বাৎ,
অলক্ষ্যাগতিত্বাদশেষাকরত্বাৎ।
প্রপঞ্চালু সত্বাদনারম্ভকত্বাৎ,
ত্বমেকা পরব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা॥
অসাধারণত্বাদসম্বন্ধকত্বাৎ,
অভিন্নাশ্রয়ত্বাদনাকারণত্বাৎ।
অনাদ্যন্তকত্বাদনাদীনকত্বাৎ,
ত্বমেকা পরব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা॥ তন্ত্রোক্ত মহাকালী স্তব।

মা আনন্দময়ি! তুমি আছ বলিযাই, গোত্র, বর্ণ ও তৎসম্ভূত ধর্ম্ম বা উপাসনা সাহায্যেই হিন্দু অগোত্র, নিরাকার শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ ভগবানে উপনীত হন। তোমার

ব্রহ্মময়ীভাব কখনও সুপ্ত হয না বলিযাই, বাসনাক্ষেত্রে খেলিতে খেলিতে জীব হঠাৎ একদিন লালাবাবুর ন্যায় বাসনা ত্যাগ করিয়া মুক্ত হইতে পারেন। তোমার ঐ পর প্রবৃত্তির সাহায্যেই গণিকাতে প্রেম ঢালিয়া অবশেষে অতৃপ্ত হৃদয় বিল্বমঙ্গলকে অন্তরতম আনন্দময় শ্রীভগবান্ স্বপ্রকাশ হইযা কাম হইতে প্রেমে আনয়ন করিয়াছিলেন। মা সর্ব্বময়ি। তুমি পরাভাবে খেল বলিয়াই, বিশিষ্ট শারীরিক আসনাদি ক্রিযা ও বিশিষ্ট জপ ধ্যানাদির মধ্যদিযা, বিশিষ্ট বস্তুবিকাশের ভিতর দিয়া, জীব শ্রীভগবানের চরণকমলে উপনীত হইতে পারে। নচেৎ কোথায় ব্যক্ত, বিশিষ্ট, পরিচ্ছিন্ন মনের প্রযত্ন, আর কোথায় সেই ভূমা পরমব্রহ্ম। বিশিষ্ট লবণ খণ্ড বিশিষ্ট জলে দ্রব হইল,—কিন্তু গুরু বলিলেন 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো,' এবং শান্ত শিষ্যের হৃদযে পরমতত্ত্ব ফুটিযা উঠিল। চৈতন্যময়ী সকল চৈতন্য ব্যাপারের মধ্যদিয়া অবিশেষ বিশ্বাতীত "শান্তম্ শিবমদ্বৈতং" পরম তত্ত্বের ভাব প্রকাশ করেন বলিয়াই, সাধনা যোগাদি মানবের উপকারী হয়। তবে সাবধান। যেন ভেদ দৃষ্টি-বশে আমরা সেই ব্রহ্মময়ী চৈতন্যকে জোর করিয়া বিশিষ্ট মত, ব্যক্তি ও ভাবের স্থাপনার জন্য প্রয়োগ না করি। মোহ প্রযুক্ত আমরা সর্ব্বদাই মহামায়ার এই বাণী অগ্রাহ্য করিযা তাঁহাকে আত্মেন্দ্রিয-প্রীতির জন্য নিযোজিত করি। কিন্তু দয়াময়ী তাহা সত্ত্বেও আনন্দরূপে, ক্ষণমাত্রের জন্যও সুখরূপ বোধে, বাহ্যজ্ঞান স্তিমিত করিযা, আমাদের ভেদ বুদ্ধি দূর করেন, বস্তুর ধর্ম্মাদিভাব প্রকাশ করিয়া তাহাতে বিশেষ ভাবের লয় করিযা দেন। আবার তাহার মধ্যে পরাৎপর শান্ত 'আমিকে' দেখাইযা দিযা, আমাদের চঞ্চল ক্ষুদ্র বিশেষ 'আমি' জ্ঞানের পরি-সমাপ্তি করিয়া দিতেছেন। চৈতন্যময়ী সর্ব্বদা একত্বের ব্যঞ্জিকা বলিযাই জ্ঞান সম্ভব। তিনি সদা 'পর' ভাবে স্থিত বলিযাই, সাধক বিশ্ব অতিক্রম করিয়া পরম তত্ত্বে উপনীত হইতে পারেন। ক্রিযা, প্রবৃত্তি ও জ্ঞানরূপের মধ্যে—বিশিষ্ট বৃত্তির পশ্চাতে, যে সর্ব্বাত্মিকা বিশ্বাতিগা প্রবণতা আছে, তাহার স্রোতে আপনাকে ভাসাইযা দিলেই তৎক্ষণাৎ এক পরমাদ্ভুত চৈতন্য সত্বার প্রকাশ হয় ও হৃদয়া-বদ্ধ মন বিলীন হইলেই হৃদযে আনন্দময়ী প্রকট হন, এবং জীবকে ব্রহ্মবন্ধু ভেদ করিয়া লইয়া যাইয়া পরম পদে স্থাপিত করেন।

তত উন্মাদনস্ত তব ধাম শিবঃ পরমং।

পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে॥ ভাগবত।১০।৮৭।১৮

ঐ স্রোতে যে জীব আপনাকে ছাড়িতে পারেন, তিনি জন্মমৃত্যু প্রভৃতি মর ভাব তৎক্ষণাৎ অতিক্রম করিয়া শাশ্বত অমৃতত্ব লাভ করেন। যিনি ইহাতে সক্ষম নহেন, তিনিও বিফলমনোরথ হয়েন না। কারণ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ চারিটী ভাবই সেই ব্রহ্মাত্মিকা ব্রহ্মযোনি চৈতন্যময়ীর বিকাশ। সাধক একটী না একটী ফললাভ করিয়া কৃতার্থ হয়েন। তাই, বঙ্গদেশ আজ উদ্‌গ্রীব হইয়া মহামায়ার প্রতীক্ষা করিতেছে। এস ভাই পন্থার গ্রাহক ও পাঠকগণ, এস পন্থার লেখক ও কর্ম্মকর্ত্তৃগণ, এস মহামায়ার আবাহন জন্য যথাসাধ্য তাঁহার লীলামাহাত্ম্য বুঝিতে চেষ্টা করি। কারণ ঐ চেষ্টার হৃদয়ের কাম দূর হইবে, এবং হয়ত তাঁহার পূজায় আমাদের ক্ষুদ্র প্রাণ মন ব্যবহৃত হইবে।

২। প্রথম চরিত্র।

যে উদার হৃদয়ে বা বুদ্ধিতে ব্রহ্মযোনি মহামায়ার সর্ব্বাত্মিকা পরাভাব প্রকাশ হয় তাঁহাকে ঋষি বলে। ঋষয়ঃ মন্ত্রদ্রষ্টারঃ। মন্ত্রে যে অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্বাত্মিকা ব্রহ্মভাব প্রকাশ হয়, তাহাকে শাস্ত্র মন্ত্রের দেবতা নামে লক্ষিত করেন। ব্যক্ত, বিশিষ্ট, জগৎ ভাবের মধ্যে ঐ ব্রহ্মাত্মিকা ভাবের যে ক্রিয়া হয়, তাহার কারণ শক্তি। দেবতা দ্বারা পরাভাব-রূপ একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্ব স্থাপিত হয়। ক্রিয়ার মধ্যে ঐ ভাবের পরিস্থাপনা শক্তির সাহায্যে হয়। যে সুর বা মাত্রার সাহায্যে প্রকাশমান ঐ পরাভাব নিম্ন স্তরের বিশিষ্ট বস্তু আদির মধ্যে প্রকট হয়, তাহার নাম ছন্দ। নিম্ন স্তরের যে আধারে এই পরাভাবের ক্রিয়া বা ব্যঞ্জনা হয়, তাহার নাম বীজ। পরমতত্ত্বের জ্ঞানরূপ অভিব্যক্তির নাম বেদ। অভিব্যক্তির যে ক্ষেত্রে অবিশেষ বা বিশেষ জ্ঞান, ক্রিয়া ও স্থিতিশীলতা প্রকট হয়, তাহার নাম তত্ত্ব।

মানবচৈতন্যের অভ্যন্তরে চৈতন্যময়ীর এই দুই বিভাবই বর্ত্তমান আছে। স্বরূপভাবে মানব 'সোঽহম্' বা ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত। এই ভাব অবলম্বন না করিলে প্রকৃত ধ্যান,ও এমন কি বাহ্যপূজাও হয় না। তাই সাধক, আমি মানব নহি, 'ভগবানের দাস', অথবা 'সচ্চিদানন্দরূপোঽহং শিবোঽহং শিবোঽহং' ভাবে অবস্থিত না হইলে কোন কর্ম্মই সম্পন্ন হয় না। মানবের সর্ব্ব বা জগৎরূপ আর একটি ভাব আছে। এই ভাব লইয়াই মহা গণ্ডগোল। জগৎ অর্থে পরিচ্ছিন্ন

বিশিষ্ট বস্তু বুঝিলেই মোহ বা অবিদ্যার খেলা। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে যাহার হৃদয়ে এই পরিচ্ছিন্ন বিশিষ্ট ভাব ক্ষীণ হইয়া তৎপরিবর্ত্তে ভ্রাতৃভাব, বিশ্বজনীন ভাব বা কোন প্রকার সর্ব্বাত্মিকা প্রবৃত্তির প্রকাশ হয়, তিনিই আত্মজ্ঞানে পরিপুষ্ট হইয়া 'বিদ্যাতত্ত্ব' লাভ করিয়া "শিব" বা 'পরতত্ত্ব' লাভে সক্ষম হন। কিন্তু এই পরাজ্ঞান লাভের পথে কতকগুলি প্রতিবন্ধক আছে। তাহার মধ্যে ত্রিতয় বা ত্রিপুটি অন্যতম প্রতিবন্ধক। ইড়া দ্বারা রূপ ভাবে চৈতন্য পরিণত হয়। পিঙ্গলা দ্বারা বিশেষ অহং বুদ্ধি প্রকট হয়। সুষুম্নার সাহায্যে সর্ব্বাত্মিকা ভাবের সংসিদ্ধির সহিত শুদ্ধ অহংকারতত্ত্বের তিনটি গ্রন্থি ভেদ করিয়া জীব নির্গ্রন্থ হইয়া ভগবৎচরণে উপনীত হয়।—

তুরীয়ং ত্রিতয়ং লিঙ্গং তদাহং মুক্তিদায়কঃ
ধ্যানমাত্রেণ যোগীন্দ্রো মৎসমো ভবতি ধ্রুবম্। শিব সংহিতা ১৩৷৪
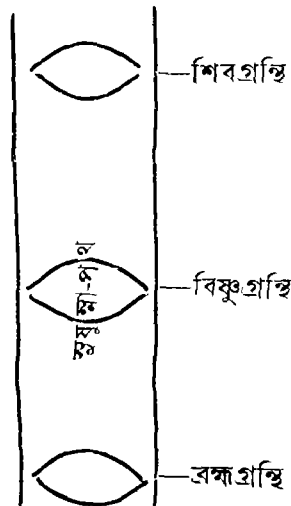
এই লিঙ্গ ত্রিতয়কে জড়শক্তি সম্ভূত বলিয়া মনে করিয়া, আধুনিক অল্পদৃষ্টি সাধকগণ permanent atom নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থিগুলি ছিন্ন হইলে, চৈতন্যের জীব ও জগৎরূপে পরিণতি বন্ধ হইয়া যায়। এইজন্য মুক্ত ভাগবতগণকে 'নির্গ্রন্থ'শব্দে অভিহিত করা হয়। (ভাগবত ১৷১০) এই গ্রন্থিগুলি "দুর্গ"নামেও অভিহিত হয়। "মৎচিত্ত সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।"

২—প্রথম চরিত্র।

প্রলয়কাল। জগদাত্মক বিশিষ্ট 'সর্ব্ব' (manifested universe), অব্যাকৃত অবিশেষ গর্ভোদক সলিলে লীন হইয়া 'প্রধান'রূপে অবস্থিত। ব্যক্ত বিশিষ্ট ভাবের লয়স্থান এবং ধাতু সকলের বিস্তার ক্ষেত্ররূপ অবিশেষ জ্ঞানই, পুরাণে 'জল' ও'তনু' নামে অভিহিত হইয়াছে। 'রূপ' নাই, বস্তু নাই, জীব নাইঃ—সকলেই সারভূত অব্যাকৃত (abstract) 'তনু'তে মিশিয়া আছে। নরের আলয় বলিয়া এ জল 'নার' নামে লক্ষিত। "ধাতুং স্তনোতি বিস্তারে তেনাস্ত স্তনবঃ স্মৃতঃ" (ব্র,পু।) ইহাই ব্রহ্মার ক্ষেত্র। 'ততস্মিন্ কার্য্যকরণং সংসিদ্ধং ব্রহ্মণস্তদা, (ব্র, পু ১।৫।৭২)

বিশিষ্ট জগৎ দুই ভাবে চৈতন্যে লীন হয। 'জ্ঞান' ও 'স্মৃতি' এই দুই ভাবে বহুত্ব একত্বেরদিকে মিশিতে যায। জ্ঞান পুরুষাভিমুখী অবিশেষপ্রধান ভাব। স্মৃতি রূপাভিমুখী প্রথ্যাদি প্রবৃত্তিশীল বিশ্বাত্মক ভাব। ব্রহ্মার অপর নাম 'স্মৃতি।' "স্মরতে সর্ব্বকার্য্যাণি (phenomena) তেনাসৌ স্মৃতিরুচ্যতে।" (ব্র, পু) তিনি ব্রহ্মের মনস্তত্ত্ব। "মনুতে সর্ব্বভূতানাং যস্মাৎ চেষ্টাফলং বিভুঃ" (ব্র, পু)। বিশ্বের মন জাগিযাছে, কিন্তু বুদ্ধি এখনও সুপ্ত। বিশেষপ্রবৃত্তিপ্রধান মনে সর্ব্ব-বস্তুর 'ভাব' খেলিতেছে। তাঁহাতে অনুরূপে—বিশিষ্ট 'সর্ব্বের' প্রবণতা আছে, কিন্তু বিশেষ নাই।

অপরিচিত স্থানে, গভীর নিদ্রার পর, অনেক সময় আমাদের স্মৃতি জাগ্রত হইয়াও আমরা "আমি কোথায় ও কেন" এই প্রশ্ন সমাধান করিতে পারি না। অবিশেষ বা সামান্য স্মৃতি জাগ্রত না হইলে, অহং বুদ্ধি স্থির না হইলে, সেই অবস্থায় বিশিষ্ট বস্তুর স্থান ও মর্য্যাদা (place and value) স্মৃতিতে প্রকট হইতে পারে না। তদ্রূপ ব্রহ্মা জাগ্রত হইলেন বটে, কিন্তু সর্ব্বাত্মিকা মতি তাঁহাতে ফুটিল না, এবং তজ্জন্য তিনি 'আমি কে এবং কেন আছি' তাহা বুঝিতে পারিলেন না। যেরূপ বিশেষ বস্তু বুদ্ধি ও কর্ম্মাদি, বাসনা, বৃত্তি প্রভৃতি উত্তরোত্তর অবিশেষ (abstract) ও সর্ব্বাত্মিকাভাবে পরিণত হয়, তদ্রূপ সংহরণ কালে নামরূপাত্মক বিশ্বের বিশেষ ভাবগুলি কালশক্তিবশে সংকলিত হইয়া জগৎ 'ব্রহ্মতন্মাত্র' রূপে পরম তত্ত্বে লীন রহিয়াছে। কার্য্যে বিশিষ্ট স্মৃতি ও জ্ঞান ফুটিতেছে না। নিদ্রালুব্যক্তির চিত্তে অন্তর্মুখী প্রবৃত্তির প্রাবল্য

বশতঃ যেরূপ বাহ্যবস্তুর উপরাগ (attraction) থাকে না, ও বাহ্যবস্তু প্রকাশ হইতে পারেনা,—তদ্রূপ মহাকালীদেবীর সংহননরূপ প্রবৃত্তি বহির্মুখী না হইলে 'বিশ্বের মনে' বিশিষ্ট বস্তুর বিশিষ্ট স্মৃতি জাগিতেছে না।

"আসীদিদং তমোভূতং অপ্রজ্ঞাতং অলক্ষণং।" ইদং শব্দবাচ্য বিশেষ জগৎ লক্ষণাদির অতীত ভাবে স্বরূপচৈতন্যে একরস হইয়া রহিয়াছে। অবিশেষ ভাবে প্রত্যাহৃত মন সে ভাব বুঝিতে পারিত। কিন্তু ব্রহ্মার সে দৃষ্টি নাই; তিনি বাহিরে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সেই জন্য তাঁহাকে তপস্যাদ্বারা, প্রত্যাহারদ্বারা, বুদ্ধি ও আত্মভাবে লীন জগতকে জানিতে বলা হইল। কারণ জগৎ এখন মহাবিদ্যা (wisdom) বা মহামায়া (potentiality) ও মহাস্মৃতিরূপে আছে।

তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে।
মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ॥ চণ্ডী ১।৭

ঐ স্মৃতিতে বিশেষ নাই :—আছে কেবল কালশক্তি দ্বারা একীকৃত, নিষ্পেষিত বিশিষ্ট ভাবগুলির লিঙ্গ বা চিহ্ন। দগ্ধবস্ত্রাবভাষের ন্যায়, ভস্মের ন্যায়, বিভূতির ন্যায় অবস্থিত, প্রকট "সর্ব্ব" ভাবগুলি মহাকালী দেবীরদন্তে রক্তচিহ্নরূপে, অতীত ব্রহ্মাণ্ডের পূর্ব্ব সত্তামাত্র ইঙ্গিত করিতেছে। যেরূপ মানবের চরিত্র অপরিজ্ঞাত ভাবরূপে তাহার মুখে নিহিত থাকে, তদ্রূপ বিশিষ্ট জগৎভাব 'চিহ্ন' বা 'বীজে' লীন আছে। বিশিষ্টাভিলাষী বহির্মুখী মন উহা গ্রহণে অক্ষম। 'রক্তদন্তিকা' বীজের রহস্য গ্রহণ করিতে অক্ষম হইয়া, ব্রহ্মা ব্যতিব্যস্ত হইলেন।

সে যাহা হউক, ঐ পরা একরস জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্মৃতি বা জ্ঞান কিরূপে প্রবর্ত্তিত হইবে? বিশেষ ভাবে মগ্ন স্মৃতিরূপ গ্রন্থির, বহির্মুখী প্রবণতারূপ গ্রন্থির, ছেদ না হইলে—শুদ্ধজ্ঞান কিরূপে প্রকাশ হইতে পারে? এখন গুণত্রয় নাই, জীব নাই। তবে কোন্ বিশেষ ভাবের সাহায্যে আবার নামরূপ ফুটিতে পারে? "রক্ত-দন্তিকা" বীজের ভিতর নিহিত সর্ব্বাত্মিকা প্রজ্ঞানের ভাষা বহির্মুখী মনে কিরূপে প্রকটিত হইবে? এই প্রথম সমস্যা। অবিশেষ আনন্দভাবে সমাধিস্থিত যোগী, ধ্যানচ্যুত হইয়া ব্যক্ত জগতে সেই আনন্দকণা দেখিতে না পাইয়া যেমন সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মনের সাহায্যে ব্যক্ত জগৎ বস্তুর ভিতরে সেই ঐক্যভাব হারাইয়া ফেলেন,—আজ ব্রহ্মাও তদ্রূপ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। বিশিষ্টভাবে লগ্নচিত্ত হওয়াতে, অবিশেষ পূর্ব্বানুভূত জ্ঞানানন্দঘন একরস

জ্ঞান ও স্মৃতি তাঁহার বিরুদ্ধভাবে প্রতিস্থাপিত (polarised) হইল। যেরূপ 'সম'ভাবে সংসিদ্ধ ধ্যানলব্ধ আনন্দ-জ্ঞানই, যোগীকে জাগ্রৎ অবস্থায় বিশেষাত্মক অশেষ জগৎ ভাবকে গ্রহণ করিতে দেয় না, যেরূপ ধ্যানবেদ্য একরস ভাবকে সহজে বিশিষ্ট ভাবে, বাহ্যবস্তুতে নামাইয়া আনা যায় না,—তদ্রূপ ব্রহ্মাও পূর্ব্বানুভূত একরস জ্ঞানানন্দ ও আপাততঃ বিভিন্নরূপে, চৈতন্যের প্রতিদ্বন্দী রূপে,প্রকট বহু ভাবের স্মৃতির মধ্যে কোন সম্বন্ধ দেখিতে না পাইয়া কাতর হইয়া পড়িলেন। বিশিষ্টভাবে অবিশেষকে পরিণত করা যায় না। আবার বিশেষকে অবলম্বন না করিলেও সৃষ্টি হইতে পারে না। সামান্য অবিশেষ জ্ঞান না ফুটিলে, এবং তাহাতে অবস্থিত বিশিষ্ট চিহ্ন গুলিকে জ্ঞানরূপে না চিনিলে,বিশিষ্ট বস্তুগুলির স্থান, মর্য্যাদা ও ক্রম জানিতে পারা যায় না। এই পর্য্যায় বা ক্রম জ্ঞানের বিপরীত ভাবকে বিপর্য্যয় কহে। পর্য্যায (order) প্রভৃতি জ্ঞানগুলি প্রজ্ঞারূপে মিশিয়া আছে। একরস প্রজ্ঞাতে ভেদ নাই, অথচ বিশিষ্টের ভস্মরূপ চিহ্ন মাত্র আছে। এই চিহ্নগুলি কেবল সঙ্কেত মাত্র। ঐ সঙ্কেতগুলিকে সঙ্কেত বলিয়া না বুঝিলে,—তাহাদিগকে একরস প্রজ্ঞার সঙ্গে মিশাইয়া না দেখিলে—তদ্দ্বারা জ্ঞান প্রকট হইতে পারে না। ব্যক্ত বিশেষের প্রতি আকর্ষণ প্রবল হইলে প্রজ্ঞা প্রকট হয় না, এবং ব্যক্ত ভাবগুলির স্থিতিও সিদ্ধি হয় না। বিশিষ্টের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া আমরা আমাদের জীবনের মূলভাব ও ঐ ভাবের অভিব্যক্তি বুঝিতে পারি না, এবং ব্যক্ত ঘটনাগুলির প্রকৃত মর্ম্ম হারাইয়া ফেলি। ব্রহ্মারও তাহাই হইল।

শুধু তাহাই নহে, বিশিষ্ট যোগী ধ্যানে শ্রীভগবানের চরণ-মকরন্দপানে বিভোর আছেন :—এক্ষণে যদি ভিতর হইতে বিশিষ্ট বাহ্যভাবে কার্য্য করিতে আদেশ হয়, তাহা হইলে যোগীর চিত্তে দুইটী প্রধান প্রতিবন্ধক জাগিয়া উঠে। যে আনন্দ-রসে তিনি আপ্লুত ছিলেন, তাহা যে সর্ব্বগত ইহা তিনি জানেন না। তিনি ইহাকে কেবল ধ্যানগম্য বলিয়াই জানেন। সুতরাং ঐ আনন্দজ্ঞানই তাঁহাকে ধ্যান ছাড়িয়া বাহে আসিতে বাধা দেয়। এই জ্ঞান বোধস্বরূপ,এবং ঐ 'মধু-রসকে'জগৎ হইতে বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখি বলিয়াই ধ্যান ছাড়িয়া আসিতে এত কষ্ট। তাহা হইতে মোহ উৎপন্ন হয়। তৎপর বিশেষ জ্ঞান হইতে, ঐ প্রকার বিশিষ্ট আনন্দ বোধ হইতে, ঐ ভাবের সংরক্ষণজন্য স্পৃহা বা প্রবৃত্তি জন্মে। এই ফলাকাঙ্ক্ষাকে

শাস্ত্রে 'কৈতব' বলে। আনন্দঘন ভগবান্ জগদ্‌রূপে খেলিতেছেন, তত্রাচ যোগী তাঁহাকে জগদ্‌রূপে দেখিতে বড় কষ্ট বোধ করেন। ভগবান্ স্থূল জগতে আছেন, তত্রাচ যোগী বলপূর্ব্বক সংসারভাব বোধ করিয়া পুনরায় ধ্যানে অব্যক্তভাবে যাইবার প্রয়াস করেন। তাঁহার মনে হয় যে, ভগবান্ বুঝি শুধু অহং ভাবেই অবস্থিত, ভগবান্ যে সর্ব্বভাবে থাকেন, "সর্ব্ববিষ্ণুময়ং জগৎ", যোগী ইহা বিশিষ্ট অহঙ্কারের মোহে বুঝিতে পারেন না। ব্রহ্মার চিত্তে বিশিষ্ট জগৎ ভাবের স্মৃতি ফুটিতেছে ঃ—কিন্তু বিশেষ ভাবে অবস্থিত বলিয়া তাঁহার চিত্তে "মধু" নামক রস-বিজ্ঞান ও 'কৈটব' বা কৈতবরূপ ফলাকাঙ্ক্ষা তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে জাগ্রত হইয়া উঠিল। আকাশতত্ত্ব পর্য্যন্ত বিশেষ। আকাশতত্ত্বে ভগবানের সর্ব্বাত্মিকা একত্ব না দেখাতে, জগতের বীজ, আকাশতত্ত্বের মলরূপে, বিষ্ণুর কর্ম্মমলরূপে (Unrealised residue), উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মার বিশিষ্ট অহং জ্ঞানকে গ্রাস করিতে ছুটিল। সাধকের হৃদয়ে এই দুই দৈত্য 'যোগ' ও 'ক্ষেম' রূপে সর্ব্বদাই প্রকাশ হইতেছে। তাহারা বিশিষ্টজ্ঞানের ফল মাত্র।

এই বিষম সঙ্কটে ব্রহ্মানন্দ তমোরূপে খেলিতে লাগিল। ব্রহ্মার বিশিষ্ট-জ্ঞানশক্তির সাধ্য নাই যে, এই তমঃ অতিক্রম করে। কারণ তাঁহারই বিশেষ স্পৃহার ফলেই, ব্রহ্মানন্দ ভেদ বুদ্ধির প্রতিদ্বন্দ্বী তমোরূপে প্রত্যুপস্থাপিত হইয়াছে। গুণসাম্য অবস্থা হইতে গুণের ব্যতিকর বা গুণের প্রকাশ হইতে গেলে, গুণ-সাম্যের তমঃ বা স্থিতিভাব (inertia) নাশ করিতে হইবে। এই জন্যই শ্রীভগ-বানের কাল শক্তি বা পরাশক্তির প্রকাশ না হইলে, ভগবানের ঈক্ষণ না হইলে, প্রকৃতির গুণ সাম্য অবস্থা হইতে প্রকাশ অবস্থা আসিতে পারে না। সেই জন্য কালশক্তিকে 'কালঃ গুণব্যতিকরঃ' নামে বর্ণিত করা হয়। কালে বহুত্ব আছে, ভেদ নাই। পরম একত্ব কালেরই সাহায্যে দুই বার আপনাকে ব্যক্ত করিয়া প্রত্যেক বারে "এক"ই এইরূপে অবস্থিত হইল। ইহাতে 'দুই' ভাব প্রকট হইল ; ১ + ১ = ২। তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ রূপে সেই "একই" আপনাকে অভিব্যক্ত করিলেন। এইরূপে দশমহাবিদ্যা প্রকটিত হইলেন। সংখ্যাতীত অব্যক্ত একত্ব (Unity) হইতে নামরূপ-গন্ধহীন অথচ প্রকাশের সহায়ভূত দশটী সংখ্যা (number) প্রকটিত হইল। সেইজন্যই প্রথম চরিত্রের দেবতা **মহাকালী**। কারণ কালরূপ স্বরূপশক্তি বা বিদ্যার দ্বারাই

'এক' হইতে 'বিশ্ব' প্রকট হইতে পাবে। উহাব বীজ রক্তদন্তিকা এবং আনন্দরূপ প্রকাশ ভাবেব বিকাশ বলিয়া নন্দাশক্তি। ভেদে আনন্দ নাই, অথচ প্রকাশ না হইলে আনন্দ হয় না। তাই কালরূপে একত্বকে ব্যক্ত কবেন বলিযা—মহাকালীব কৃপা ভিন্ন জগৎ প্রকট হয় না।

ইহাই শ্রীশ্রীজগন্মাতাব সপ্তম্যান্তকল্পপূজা। মহাকালীরূপ দ্যোতনশীলা মহামায়াব সাহায্যে জীব ব্রহ্মগ্রন্থিরূপ বিশেষেব মোহ অতিক্রম কবিতে পাবে। এই ব্রহ্মগ্রন্থিকে বায়ুপুবাণে ব্রহ্মাব মনোময চক্রেব নেমিরূপে উক্ত কবা হইয়াছে।

ইদং মনোমযং চক্রং মযা সৃষ্টং বিসৃজ্যতে।
যত্রাস্য শীর্য্যতে নেমি স দেশস্তপসঃ শুভ॥

সেই ভাবরূপী দেশেব নাম নৈমিষারণ্য। সেখানে ঋষিবা সর্ব্বদাই মহান্ একত্ব ও আনন্দরূপ ভগবদ্ভাব বক্ষা কবিবাব জন্য যজ্ঞ কবিতেছেন।

ওঁনৈমিশেঽনিমিষক্ষেত্রে ঋষযঃ শৌনকাদযঃ।
সত্রংস্বর্গায় লোকায় সহস্রসমমাসত॥ ভাগবত ১।৪

এই নেমিকেই ভাববসিকা পূজনীযা শ্রীমতী ব্লাভাটস্‌কি "Ring-pass-not" নামে অভিহিত কবিযাছেন। এইজন্য মহাকালীরূপিণী মহামাযা সর্ব্বদাই পূজ্যা। এইজন্যই সাধকেবা তাঁহাব ধ্যানে অন্তর্বিক্ষেপশূন্য হন। ইহাই চৈতন্যেব প্রথম দুর্গ।

৩।—দ্বিতীয চরিত্র।

ব্রহ্মাব সৃষ্ট দেবতা তত্ত্বাদি প্রকট হইল, কিন্তু তাহাতেও বিশ্বেব সৃষ্টি হইল না। পবস্পব বিশ্লিষ্ট ও বিরুদ্ধ ভাব ও ধর্ম্মাক্রান্ত তত্ত্ব ও বিশ্বসৃগ্‌গণ (Cosmo-crators) বিশ্বসৃষ্টি কবিতে অক্ষম হইযা পুনবায় শ্রীভগবানেব নিকট প্রার্থনা করিল। ঃ—

তে তৎবয়ং লোকসিসৃক্ষযাদ্য ত্বয়ানুসৃষ্টা স্ত্রিভিবাত্মভিঃ স্ম।
সর্ব্বে বিযুক্তা স্ববিহাবতন্ত্রং ন শক্নুমস্তৎ প্রতিহর্ত্তবে তে॥

ভাগবত ৩।৫।৪৮

"হে আদ্য! আমবা তোমাবই, কাবণ তুমি লোকসৃষ্টি-অভিলাষে আমাদেব সত্ত্বাদি তিন ভাবে সৃজন কবিয়াছ। কিন্তু আমবা বিযুক্ত বা পবস্পর

ভেদদ্বারা বিশ্লিষ্ট; সুতরাং তোমার বিহারের উপযোগী একত্ব বাচক ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ করিতে অক্ষম"।

বিশ্লিষ্ট বহুত্বের অভিমুখী, ব্রহ্মাকৃত প্রকট প্রকৃতি এবং তৎকার্য্যভূত তত্ত্বাদির ভিতর মহান সাম্যভাব অনুস্যূত না করিলে কে তাহাদিগকে মিশাইবে? কে তাহাদের ভিতর অনুরূপে প্রবেশ করিবে, এবং তাহাদের অনুগত পৃথক্ প্রবৃত্তিগুলিকে সমন্বিত করিয়া দিবে? কে তাহাদের সমন্বয় সাধন করিয়া, তাহাদিগকে সমানুপাতী করিয়া, ভগবানের অংশভূত জীবের সহিত একসূত্রে গাঁথিবে? দেহ বা অবয়ব নির্ম্মাণ করিতে গেলে বহুত্বের আবশ্যক। কারণ 'সর্ব্ব'ভাবে না গঠিলে, দেহের দ্বারা বাহ্যজ্ঞান এবং ভিতরের চৈতন্যের অভিব্যক্তি সম্ভবে না। জগতে যে ব্যাকৃত বহুত্ব আছে, তাহার সহিত সমানুপাতী না করিলে, দেহ বাহ্যস্পন্দনাদি 'সর্ব্ব'ভাব গ্রহণ করিতে অক্ষম। সুতরাং তদ্দ্বারা দেহের 'অহং' 'সর্ব্ব'ভাবে সিদ্ধ হইতে পারে না। কিন্তু অপর পক্ষে সমষ্টিভূত তত্ত্বাদিগণের পৃথক্ প্রবৃত্তিগুলিকে একসূত্রে অন্বিত করা আবশ্যক। তাহাদের ভিতর জীবাভিমুখী, এক এবং সমানুপাতী প্রবৃত্তি না আনিলে, দেহলব্ধ জ্ঞানাদি জীবের নিকট পৌঁছিবে না। অবয়ব নির্ম্মাণ করিতে গেলে, অবয়বকে বাহিরের 'সর্ব্ব'ভাবে এবং ভিতরের 'জীব'ভাবে যুগপৎ নিয়মিত করা আবশ্যক। বিশিষ্ট জীব একদিকে, অপরদিকে বিশিষ্ট তত্ত্বাদি। সুতরাং 'সর্ব্ব' বা 'বহু' ভাবাপন্ন তত্ত্বগুলিকে জীবরূপ অদ্বিতীয়তার ভাবে সমানু-পাতী করা আবশ্যক। 'অহং' ও 'সর্ব্ব' এই দুই ভাবকে মিশাইতে গেলে, এতদুভয়ের অতিরিক্ত বৃহত্তর প্রজ্ঞানের আবশ্যকতা আছে। জীবের পৃথক্ 'অহং' ভাব দ্বারা কোষাণু বা তত্ত্বগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিলে, দেহের পৃথক্ সত্তার নাশ হয়, এবং জীবকে প্রত্যেক কার্য্যে, প্রত্যেক দৈহিক ব্যাপারে, সদা ব্যাপৃত থাকিতে হয়। উপরন্তু ঐরূপ দেহদ্বারা জীব-ভাবের অতীত পরম একত্ব জ্ঞান লাভ হইতে পারে না। জীবের 'অহং' ভাবের ক্রমোন্নতি হইতে পারে না, জীবের প্রকৃত ভগবৎ স্বরূপ সিদ্ধ হইতে পারে না। সেইজন্য ক্ষুদ্র দেহনির্ম্মাণকার্য্যেও বিশিষ্ট তত্ত্ব ও জীব-ভাবের অতীত সর্ব্বানুগত বিশ্বব্যাপী ভগবৎশক্তির আবশ্যকতা আছে। তাই—

পরেন বিশতা স্বস্মিন্ মাত্রয়া বিশ্বসৃগ্‌গণঃ।
চুক্ষোভান্যোন্যমাসাদ্য যস্মিন্ লোকাশ্চরাচরঃ॥　ভাঃ পু ৩।৫।৫

পব (Transcendent) ভগবানেব অংশ দ্বাবা পব ভাবে উজ্জীবিত হইযা বিশ্বস্থগ্‌গণ ক্ষুব্ধ হইল,এবং পবস্পব অন্যোন্য ভাবে সংযমিত হইল। তাহাবা 'পব' বা বিশ্বাতীগ ভগবদ্ভাবে সমানুপাতী হইযা পবস্পব মিলিতে সক্ষম হইল। শ্রীভগবান্ 'বাচ্য' ও 'বাচক' ভাবে নামরূপ ধাবণ কবেন ঃ—

স বাচ্যবাচকতযা ভগবান ব্রহ্মরূপধৃক্
নামরূপক্রিযা ধত্তে । ভাঃ পু ২।১০।৬৬

অঙ্কশাস্ত্রে বাচ্যকে বা 'নাম'কে Numerator এবং বাচককে বা 'রূপকে' Denominator বলে। নাম বা 'বাচ্য' দ্বাবা, ব্যক্ত অংশ ভাবেব বা ভগ্নাংশেব (fractional life) মর্য্যাদা সিদ্ধ হয, এবং 'বাচক' দ্বাবা তাহাব সর্ব্বাত্মিক 'কর্ম্ম' ও'ধর্ম্ম'লক্ষিত হয। মানব অবয়বে বিভিন্ন অংশগুলিকে শাস্ত্র পৃথক দেবতাদিগেব অংশ বা কলারূপে বর্ণিত বলেন। মনে কব চক্ষুতে আদিত্য, ও মনে চন্দ্র অধিষ্ঠিত। চক্ষুতে 'বাচ্য' আদিত্য, এবং মনেব দ্বাবা চন্দ্রদেবেব সত্তাব প্রকাশ হইবে। আবাব চক্ষু 'রূপ' নামক পবম ভাবেব 'বাচক' এবং মন বিশ্বেব সংযোগিনী শক্তিব বাচক। এক্ষণে মানবদেহে চক্ষু ও মন আপন আপন ভাবে কার্য্য কবিলে, পবস্পব মিলন হইবে না, এবং তদ্দ্বাবা জীবেব কোন কর্ম্মই সাধিত হইতে পাবে না। তাহাব পব, এরূপ দেহে জীব আপনাকে প্রকাশ কবিতে এবং তদ্দ্বাবা বাহ্যজ্ঞান লাভ কবিতে পাবিবে না। চক্ষুব লব্ধ জ্ঞান আদিত্যেব 'অহং' বা,'নামে' মিশিবে, জীবে পৌছিবে না। জীবও চক্ষুব দ্বাবা তাহাব অহংকে দেখিবে না। তাহাব এরূপ দেহে কস্মিনকালে ভগবৎভাব ফুটিতে পাবিবে না। সেইজন্য বিষ্ণুশক্তিব দ্বাবা 'পব' বা বিশ্বাতিগ ভাবে তত্ত্বাদিব সংহনন আবশ্যক।

একটী দৃষ্টান্ত দ্বাবা এই সংহনন ক্রিযা বহস্য বুঝিতে চেষ্টা কবিব। তত্ত্ব ও দেবতাগুলিতে ভগ্নাংশ রূপে কল্পিত কবিযা দেখিলে, তাহাদিগকে আমবা $\frac{\text{ক}}{২}, \frac{\text{খ}}{৩}, \frac{\text{গ}}{৪}, \frac{\text{ঘ}}{৫}, \frac{\text{ঙ}}{৬}$ রূপে বর্ণিত কবিতে পাবি। ক, খ, গ প্রভৃতি বিশিষ্ট নাম বা দেবতাভাব। এই গুলিকে অন্বয় কবিতে গেলে কোন অবিশেষে সামান্য মাত্রাব সাহায্যে তাহাদেব 'বাচ্য' ও 'বাচক' (Numerator & Denominator) উভয ভাবকে পবিণত কবিতে হইবে।

এইরূপে $\frac{ক}{২}$,কে $\frac{৩০ক}{৬০}$, $\frac{খ}{৩}$কে $\frac{২০খ}{৬০}$, $\frac{গ}{৪}$কে $\frac{১৫গ}{৬০}$, $\frac{ঘ}{৫}$কে $\frac{১২ঘ}{৬০}$ এবং $\frac{ঙ}{৬}$কে $\frac{১০ঙ}{৬০}$ রূপে পরিণত করিয়া, তবে যোগ করিতে হইবে। তাহার সঙ্গে

ক, খ, গ, ঘ, ঙ প্রভৃতি দেবভাবের ভিতর ভগবানের মাত্রা ফুটিয়া উঠিলে, ভগ্নাংশ-গুলির 'বাচ্য'-ভাব মধ্যে জীবের স্বরূপভূত ভগবৎ-ভাব সংযোজিত করিয়া দিলে, তদ্দ্বারা শ্রীভগবানের বিশুদ্ধ বিগ্রহতত্ত্ব লীলাক্ষেত্রভূত দেহ নির্ম্মাণ হইবে। 'অবয়বের' কোষাণু ও তত্ত্বগুলিকে, এবং 'অবয়বীকে' সামান্য ভগবন্মাত্রা দ্বারা নিয়মিত না করিলে, দেহ নির্ম্মাণ হইতে পারে না। জীব 'অবয়বের' তত্ত্বাদি-স্রষ্টাগণকে আপন পৃথক্‌ভাবে কর্ষণ করিয়া তাহাদের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করিলে, জীবে ও দেহে সমতা হয় বটে,—কিন্তু ঐ দেহ দ্বারা জীবের বাহ্যজ্ঞান লাভাদি কার্য্য সাধিত হইতে পারে না। অপিচ, তদ্দ্বারা জীবের পারমার্থিক ভাবও সিদ্ধ হইতে পারে না। অথচ দেহ জীবের অনুগত না হইলেও চলে না। দেহাভিমানে, দেহের বশ্যতা—এবং জীবাভিমানে, দেহের অভিকর্ষণ, এই দুই মোহই দেহধারণের গ্রন্থি। এই মোহদ্বয় অতিক্রম করিতে গেলে, দেহ ও জীব, উভয়কে ভগবৎভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া সংযোগ করিতে হইবে।

এই দুই মোহ, বিষ্ণুগ্রন্থি-রূপে বর্ণিত হয়। এই মোহ নাশ না হইলে, দেহে থাকিয়া পরিপূর্ণ ভগবৎভাব গ্রহণ করা যায় না, এবং ভগবানের সৃষ্টি-কার্য্যের চক্র পরিবর্ত্তন করা হয় না।

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥ গীতা ৩।১৬।

পূর্ব্বে মহিষাসুর নামে এক দৈত্য ছিল। দেবী-ভাগবতমতে, ঐ দৈত্য রক্তবীজের পুত্র। মহিষাসুর পৃথিবীতে ব্রাহ্মণগণকে বশীভূত করিয়া, দেবতা-দের যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতে লাগিলেন, এবং এমন কি দেবতাদিগকে স্ব স্ব অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া নিজেই তৎতৎকার্য্য করিতে লাগিলেন।

সূর্য্যেন্দ্রাগ্ন্যনিলেন্দূনাং যমস্য বরুণস্য চ।
অন্যেষাঞ্চাধিকারান্ স স্বয়মেবাধিতিষ্ঠতি॥ চণ্ডী ২।৬

কারণ, অসুরেরা ভেদভাবে অবস্থিত, এবং অহঙ্কারবশে—

ঈশ্বরোঽহং অহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী।

"আমি ঈশ্বব, আমি ভোগী, আমি সিদ্ধ, বলবান্, সুখী" ইত্যাদি অভিমানে বিমোহিত হইয়া, অবয়বেব নিদানভূত দেবতাগণেব স্বাতন্ত্র্য সহ্য কবিতে পাবে না। দেবতাদেব সহিত সমানুপাতী না হইয়া, ভগবান্‌ই যে অবয়বী, তাহা না বুঝিয়া, তাহাবা স্বদেহে ও পবদেহে শ্রীভগবানেব 'সর্ব্বভূতান্তবস্থা' ভাবেব দ্বেষ কবে।

মমাত্মা পবদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ। গীতা।

তাহাবা দম্ভ ও অহঙ্কাবযুক্ত হইযা, তত্ত্বজ্ঞানশূন্য হইয়া, শবীরস্থ ভূতগ্রাম এবং শবীরের ভিতব অন্তর্যামী-রূপে অবস্থিত ভগবৎশক্তিকে কর্ষণ কবতঃ আপনাদেব ভেদভাবের, অহঙ্কাবেব—সংসিদ্ধি কবিতে চেষ্টা কবে।

কর্ষয়ন্তঃ শবীবস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশবীবস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুবনিশ্চয়ান্॥ গীতা ১৭।৬

দেবতাগণ ও ঋষিগণ বিনীত হইয়া শ্রীভগবানেব নিকট ঐ সকল ব্যাপাব জ্ঞাপন কবিলেন। শ্রীভগবান্ দেবতাদিগকে স্ব স্ব তেজ ও অস্ত্রাদি দান কবিয়া শ্রীমহালক্ষ্মীরূপা মহামায়াব প্রকাশ-ক্ষেত্র নির্ম্মাণ কবিতে বলিলেন। মহামাযা সর্ব্বদেবময়ী। তাঁহা হইতেই দেবতা সকল উৎপন্ন হইয়াছেন। কিন্তু ব্যক্ত ভাবে বিভিন্ন, বিশিষ্ট, দেবতাগণ কিরূপে তাঁহাকে অভিব্যক্ত কবিবেন? কে, ব্যক্ত, বিশিষ্ট ভাবেব দ্বাবা কিরূপে সেই বিশ্বাত্মিকা মহামাযাকে প্রকাশ করিতে পাবিবে?

ভগবানেব আদেশমত দেবতাগণ আপন আপন তেজ ত্যাগ কবিলেন। তেজ অর্থে, বিশিষ্টভাবেব অতিগ দ্যোতনশীল স্বয়ং-জ্যোতিঃ চৈতন্যেব ভাব। তান্ত্রিক পূজাপদ্ধতি ব্যাপাবেব মধ্যে এই তত্ত্ব কথঞ্চিৎ উদ্ভাসিত হইয়াছে। প্রতিমাপূজাব্যাপাবে সাধককে স্বশবীবস্থ দেবতাগণেব তেজ দ্বাবা ইষ্টদেবেব প্রাণ প্রতিষ্ঠা কবিতে হয়। সাধক "ব্রহ্মাস্মি" এইভাবে সমাধিস্থ হইয়া, ভেদবুদ্ধি ত্যাগ কবতঃ, ইন্দ্রিয়গণেব বিশিষ্টভাব অতিক্রম কবিযা, "সর্ব্বেন্দ্রিযগুণাভাসং"—সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণেব ভিতব দিয়া আভাসরূপে প্রকাশিত ভগবত্তত্ত্বে পবিণত কবেন। এইরূপে তাঁহাব "অহং" এবং "সর্ব্বভাব" শ্রীভগবানে অর্পণপূর্ব্বক ভগবদ্ভাবে পুটিত হইযা নামিয়া আসিয়া, উক্তপ্রকাবে পবিশুদ্ধ আপন ইন্দ্রিয়শক্তিগুলিকে দেবতাব শবীবে প্রযুক্ত কবিয়া, সমন্বয়কাবিণী আত্মশক্তিব সাহায্যে, দেবতাব প্রাণ-

প্রতিষ্ঠা সাধন করেন। বিশিষ্ট অহংবোধ ও বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়জ্ঞান থাকিলে, ভূতশুদ্ধি ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইতে পারেনা। সম বা একরূপে অবস্থিত, অবয়বী (organic life) শ্রীভগবানকে "বাচ্য"ও"বাচক"রূপে দেখিতে না পাইলে, বিভিন্ন শক্তিগুলি সমানুপাতীভাবে মিলিতে পারেনা ; এবং তৎসাহায্যে সাধক নামরূপাতীত মহা-বিদ্যাকে নামাইয়া আনিতে পারেন না। বিভিন্ন ছিদ্রের মধ্যদিয়া গৃহপ্রবিষ্ট সূর্য্য-রশ্মিগুলিকে প্রাকৃত জনেরা ভিন্ন করিয়া দেখিলেও, যেমন উহারা একভাবে মিশিয়া যাইতে পারে ; তদ্রূপ ব্যক্ত শক্ত্যাদি ভাবগুলি মহাবিদ্যাভাবে সমন্বিত হইয়া মহাবিদ্যার প্রকাশোপযোগী অবয়ব নির্ম্মাণ করে। শক্তিগুলির বিশিষ্ট মাত্রা দ্বারা বাহিরের বিশিষ্ট বিশিষ্ট কার্য্য হয়। কিন্তু তাহাদের 'গতি' বা 'অন্তগুলি' এক হইয়া যাওয়াতে, পরমাদ্বৈতা মহামায়া তাহার ভিতর দিয়া প্রকাশ হইতে পারেন। এইরূপে ব্রহ্মার রক্তবর্ণ তেজে দেবীর অলক্তকনিন্দিত চরণযুগল নির্ম্মিত হইল। বিষ্ণুর তেজে অষ্টাদশ বাহু, ও হরের তেজে মুখমণ্ডল নির্ম্মিত হইল। দেবী অষ্টাদশভুজা হইয়া সিংহবাহিনীরূপে আবির্ভূতা হইলেন, এবং বিষ্ণু-গ্রন্থিসম্ভূত দেহাত্মবুদ্ধিরূপ অসুরকে বিনাশ করিলেন।

সর্ব্বকর্ম্ম, সর্ব্ব ইন্দ্রিয়, ও দেহাত্মবুদ্ধি শ্রীভগবানে অর্পিত হইলে দেবী মহা-লক্ষ্মীরূপে পুনরায় বিরাজিত হন। সেইজন্য অষ্টম্যন্তকল্প পূজার, ঋষি বিষ্ণু, সর্ব্বজীবের মর্য্যাদারক্ষিণী শাকম্ভরী শক্তি। ইন্দ্রিয়াদি সংহননকারী বায়ু তত্ত্ব, দেহাত্মজ্ঞানরূপ মহাদুর্গ হইতে রক্ষা করেন বলিয়া দুর্গা বীজ, ও মহালক্ষ্মী দেবতা। এস, সমষ্টি ও ব্যষ্টিভাবে শ্রীভগবানের বিহারক্ষেত্র সর্ব্বদেবময় অবয়ব ও পরম অবয়বী এক ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষোত্তমের প্রকাশের হেতুভূতা দেবীকে নমস্কার করিয়া বলি :—

যা মুক্তিহেতুরবিচিন্ত্যমহাব্রতা চ, অভ্যস্যসে সুনিয়তেন্দ্রিয়তত্ত্বসারৈঃ।
মোক্ষার্থিভির্ম্মুনিভিরস্ত সমস্ত দোষৈ, র্বিদ্যাসি সা ভগবতী পরমা হি দেবী॥
শব্দাত্মিকা সুবিমলর্গ্-যজুষাং নিধান, মুদ্গীতরম্যপদপাঠবতাঞ্চ সাম্নাম্।
দেবী ত্রয়ী ভগবতী ভবভাবনায়, বার্ত্তা চ সর্ব্বজগতাং পরমার্ত্তিহন্ত্রী॥
মেধাসি দেবি বিদিতাখিলশাস্ত্রসারা, দুর্গাসি দুর্গভবসাগরনৌরসঙ্গা।
শ্রীঃ কৈটভারিহৃদয়ৈককৃতাধিবাসা, গৌরী ত্বমেব শশিমৌলিকৃতপ্রতিষ্ঠা॥

চণ্ডী ৪র্থ অঃ ৯-১১

মা ! সর্ব্বদেবময়ি ! প্রণতজনের প্রতি কৃপাপূর্ব্বক,—সংসারে বিমুগ্ধ, ত্যাগ ধর্ম্মে পরাঙ্মুখ সাধকদিগেরও দৈত্যভাবাপন্ন ভেদবুদ্ধি মানবগণের কল্যাণার্থ তোমার সেই অপরূপ সর্ব্বদেবময়ী সর্ব্বায়ুধসমন্বিতা মহাবিদ্যাভাবে প্রকট হও। ধর্ম্ম-রূপী পুরুষোত্তমের প্রতি আবার জীবের মতি হউক। সংসারে উপদ্রুত মানবগণের চিত্তে তোমার চৈতন্যের ধর্ম্মার্থকামমোক্ষদ, শুদ্ধ স্বপ্রকাশ, স্বয়ং-জ্যোতিঃ-রূপ মহাভাবের বীজ বপন কর। আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিরূপ মহিষাসুরের হস্ত হইতে মানবকে, এবং ঐশ্বর্য্যালোলুপ তোমার ভক্তগণকে উদ্ধার কর। তুমি না খেলিলে, যোগশাস্ত্রাদির অনুশীলনসম্ভূত ভেদাত্মক অহংবুদ্ধির নাশ হইবে না। তুমি না আসিলে, মানব 'সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ' ভাব গ্রহণ করিতে পারিবে না। তোমাকে নমস্কার। আর বাহিরে খেলিও না,—একটু আমাদের চৈতন্যে প্রবেশ কর। তোমার বাহিরের খেলার মুগ্ধ হইয়া, আমরা তোমাকে ভুলিয়া যাইতেছি। তোমার সর্ব্বাত্মিকাভাব হারাইয়া, অহংকারের গর্ত্তে নিপতিত হইতেছি। এস, মা, ক্ষুদ্র দাসগণের—মুগ্ধসন্তানগণের, পূজার সার্থকতা কর। নামে রুচি, জীবে দয়া ও ঈশ্বরভক্তির বীজ বপন কর।

সম্পাদকয়োঃ।

চৈতন্যময়ী।

ওঁ। তন্নোধীয়ো প্রচোদয়াৎ। ওঁ

'অখণ্ডমণ্ডলাকার' রূপে ব্যক্ত চরাচর,
অনুপমা চিতি শক্তি যাঁর।
সেই তত্ত্ব প্রকাশিতে, ভেদবুদ্ধি নিবারিতে,
"গুরু" রূপে প্রকটি আকার॥
সেই রূপে হৃদি পশি, অবিদ্যা-তিমির নাশি,
চৈতন্যময়ীকে জাগাইয়া।
কি কৌশলে! ভ্রান্ত জীবে, পরব্রহ্ম সদাশিবে
অভেদেতে দিলে মিশাইয়া॥

"চৈতন্যময়ীর গান" তোমারি চরণে দান
কবিবারে চায় প্রাণ মম ।
যেন, দেবী পরা শিবে ! তোলে তান সর্ব্বজীবে,
একতার ভাব অনুপম ॥

একি রূপ দেখি, শিবে । (একি) জ্যোতি চারিধার । (১)
মন বুদ্ধি পরাভূত হয়ে যায় মা আমার ।
কি রূপে বর্ণিব, বিশ্বে ! নিত্যা শুদ্ধা । তুমি ত্রয়ী, (২)
জীবেতে চেতনা হয়ে খেল মা আনন্দময়ী ।
বাহিরের ভাবগুলি লভি চিত্তে পরিণতি,
হৃদয়ে দেখিবে যবে "দেবী বৈশারদী মতি" ॥ (৩)
সার্থক জীবন তবে, মহাবিদ্যা !! মহামায়া !! (৪)
অমৃতত্ব পাবে জীব লভি তব পদচ্ছায়া ॥

চিন্তার অগ্রাহ্য তুমি বুদ্ধির অতীত ।
অথচ "সাকার শক্তি"-রূপে (৫) প্রতিভাত ॥
'অনন্ত পর্য্যায়' রূপে (৬) নিজ অধিষ্ঠানে,
শান্ত, শুদ্ধ, পরাৎপর, বোধমাত্র, জ্ঞানে,—(৭)
অভিব্যক্ত কর সদা, অক্ষর নিষ্কলে,—
কলা-শক্তি, বিন্দু-নাদে, (৮) আশ্চর্য্য কৌশলে ।।
গুণের অতীত শুদ্ধ চৈতন্যরূপিণি ।
বোধমাত্র, একরস, (৯) দ্বন্দ্ববিনাশিনি !

---

(১) জ্যোতিষাং অপি তজ্জ্যোতিঃ—গীতা ১৩।১। (২) বেদত্রয় ।

(৩) শ্রীমদ্ভাগবৎ 'দেবীমায়া বৈশারদী মতিঃ' । (৪) চণ্ডী ১।৭৭

(৫) জগদাত্মশক্তি—চণ্ডী ২।৪।৩ (৬) নামরূপাত্মক পর্য্যায় or Series

(৭) যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্ । ভা পু ১।২।

(৮) কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনী । চণ্ডী ৩।১১।৭

(৯) চিতিরূপেণ যা কৃৎস্ন । চণ্ডী—২।৩।৮

ভেদবুদ্ধি ছিন্নজ্ঞানে করিছ নিবাস।
পরব্রহ্মে নিত্যসিদ্ধ তোমারি প্রয়াস ॥

'নামরূপ' 'গোত্রাকৃতি' ভাবেতে খেলিয়া,
তব অনুগ্রহে জাগে অমৃতত্ব জ্ঞান।
অভিনব গতি তব ॥ দাও ডুবাইয়া
জীবে, নামরূপ ভাবে। কিন্তু মা কেমন,
অনির্দ্দেশ্যভাবে—পুন বহুত্বের মাঝে,
শান্ত চিত্তে হয় যবে বৃত্ত-পরিণতি, (২)
চিত্ত হয় স্থির, তব, বাহ্যবস্তু সাজে।
কিন্তু, কোথা হতে। জাগে একত্বের গতি,—
অতৃপ্তির ভাষা,—জাগে 'ঐকান্তিক মতি';
'অনেক' সমাপ্ত যাহে,—"বহু" "সর্ব্বে" মিশি,
'ছিন্নজ্ঞান' হতে উঠে 'সর্ব্বাত্মিকা' রতি।
দারা-পুত্র লয়ে খেলি, পুনঃপুনঃ আসি
'বস্তুবোধ' ত্যজি, জীব "সুখরূপ" জ্ঞানে
বস্তুর সমাপ্তি দেখে :—সুখ ত্যজি পরে,
'বিজ্ঞান' ত্যজিয়া, পুন উঠি 'আত্মজ্ঞানে',
'আত্মজ্ঞান' ত্যজি ধায়, 'বিশ্বের' উপরে।
কিরূপে মা ছিন্নজ্ঞানে, জীবে কর রত?
কিরূপে কর, মা, পুন ব্রহ্মে অনুগত?

'বিশিষ্ট লক্ষের' দিকে, অজ্ঞান মানব
পুনঃপুনঃ ভেদতৃষ্ণা প্রয়োজিত করি,
তব আকর্ষণে ধায় ধরিবারে 'সব'—
ব্যক্ত অনন্তেরে :—অতৃপ্তহৃদয়ে ফিরি

---

(২) যা দেবি সর্ব্বভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা—চণ্ডী

আসে পুন। 'দুঃখ', 'মৃত্যু,'—প্রবৃত্তি তোমার,
দেয় ব্যক্ত বিনাশিয়া ;—তোলে তবে তায়
অব্যক্ত শাশ্বত পানে,—যথা একাকার
'বহু' জ্ঞান ; অবশেষে 'শাখা চন্দ্র'-ন্যায়—
মানব হঠাৎ দেখে, 'ব্যক্ত' অতিক্রমি
অভিনব উর্দ্ধস্রোত—শুদ্ধা গতি পরা
বিশ্বাতীত প্রবণতা,—লক্ষ তার 'আমি' :—
কলাতীত ভাবে, দেখে তুমি পরাৎপরা,
বিশ্বাতিগ, এক, নিত্য, শুদ্ধ, শান্ত বোধে
রয়েছ সমাপ্ত। দেখে বহুত্বের ভাষা—
'বিজ্ঞান' 'বৈরাগ্য' 'জ্ঞান'-রূপেতে—'অনেক'
ধায় 'শুদ্ধ' 'এক' পানে। 'অশেষের' আশে
বিশিষ্টতা মোহে, যবে ব্যক্ত 'বহু' পানে
লয়ে যাও জীবে ,—তবে অতৃপ্ত কামনা
জাগে অন্তহীন , যেন স্থৈর্য্য নাহি মানে।
কিন্তু কোথা হতে, সেই 'অশেষ বাসনা'
দেয় জীবে বুঝাইয়া 'পশ্যন্তীর' বাণী ;—(১)
লাল, নীল, পীত, আদি যথা বর্ণজ্ঞান
করিছে লক্ষিত যেন শুদ্ধ দিনমণি,—(২)
অশেষ বর্ণের খনি, রূপের নিদান,
আলয়, নিধন-স্থান। প্রপঞ্চ রূপেতে
একি মা প্রবৃত্তি তব,—চিদানন্দঘনে
ভগবান পরব্রহ্মে সদা প্রকটিতে ?
'জড' 'শক্তি' 'মুক্তি' ভাব লয় করি 'জ্ঞানে'
বিশ্বমাঝে প্রকাশিছ "অনারন্ত" ভাবে ;—

---

(১) অন্তঃ পশ্যতি নতু অবধারতি"—শ্রীধর।
(২) স্যোযথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষু র্ন লিপ্যতে—কঠ। ২।২।১০

'কারণকে কার্য্যে' রাখি, 'কার্য্যকে কারণে,
নিষ্ক্রিয়তা-রূপ ব্রহ্মে,—'ভাবের অভাবে।'
'স্থিতি' হতে 'ক্রিয়া', পুন সমতা স্মরণে –
'অস্তি' 'ভাতি' ভাবে, দেবি। 'জগত' তেমনি। (১)
কি বিরুদ্ধ গতি, দুর্গে। কিবা ক্রীড়া তব,
দেবময়ি। জ্ঞানময়ি। অনন্তরূপিণি।
পরব্রহ্মরূপে সিদ্ধ তব চেষ্টা সব।

তবে কি 'সামান্য' রূপ প্রয়াস তোমার,--
'সম'রূপে, সামান্যতা জ্ঞানে মিশাইয়ে,
'সম্বন্ধ' জ্ঞানেতে গাথি 'বিশ্লিষ্টতা' হার,
ব্যক্ত জীবে মহাসাম্য ভাষা বুঝাইযে ?
কিন্তু সেই 'অবিশেষ সমে' দেখি পুন
ঐ যে ফুটিয়া উঠে 'অসামান্য' গতি,—
অদ্বিতীয় নিঃসঙ্গতা ভাব ,—যাহে গুণ,
গুণের-প্রকাশ বিশ্ব,—লভি নিবিরতি,
পরিপূর্ণ হয়ে থাকে যাঁর এক পাদে,
এক অংশে,—শান্তভাবে সমগ্র এ ভব ,—
—সেই শুদ্ধ 'আমি', যাঁর আর তিন পাদে (২)
নাই 'বিশেষের' লেশ, নাই আর 'সব'—
একরস, নিত্যমুক্ত, নিরঞ্জন, পর,
সদাস্থির, কলাতীত, শুদ্ধ, অপ্রকট,—
বিভক্তের প্রায় পুন, মরেতে অমর ,
যাঁতে দগ্ধবস্ত্ররূপে থাকে 'বিশ্ব'ভাব।

একি পুন দেখি, ভেদের আশ্রয় তুমি।
বিশ্ব প্রকাশিয়া, জ্ঞানপ্রেমসুখরূপে পুন

(১) "তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্ব্বং"—কঠ।
(২) ত্রিপাদ অমৃতং ভুবি--পুরুষসূক্ত।

প্রকট আশ্রয়তত্ত্ব—শুদ্ধ সে যে 'আমি'—
রূপহীন, নামহীন, অশব্দ, নির্গুণ।
অনাদি অনন্তরূপে প্রকটি প্রবৃত্তি, (১)
সান্ত, ক্ষুদ্র ভাবগুলি পুন মিশাইয়া—
'যোগিনী' 'পরমাবিদ্যা' পরমানিবৃত্তি!
'পরা' ভাবে আছ স্থির, ব্রহ্ম সংস্থাপিয়া॥

বুঝেছি তোমার খেলা, চৈতন্য-রূপিণি!
মোহ দিয়া ব্রহ্মক্ষেত্রে 'জীবে' প্রকটিয়া—
'সর্ব্ব' জ্ঞানে সেই-তত্ত্বে, মায়াকুহকিনি।
তন্তুরূপে ওতপ্রোতে বিশ্ব নিরমিয়া,—
"আমি," "সব," মিথ্যা ভাবে সংযোগিয়া পুন,—
মিশাইয়া 'জীবে' সর্ব্বাত্মিকাবুদ্ধি জ্ঞান—
"অদ্বিতীয়ে" ফুটাইছ 'একতার' গুণ—
'প্রকৃতির' মাঝে তুলে দ্বৈতহীন তান।
কিন্তু মা! লাগিছে মনে ইহ বাহ্যভাব,
খেলাওনা এ খেলায়, মুগ্ধশিশু তব।
বুঝাইয়া দাও, দেবি! সেই পরাভাব
বদ্ধে মুক্তে একতত্ত্ব,— জীবরূপী শিব—(২)

প্রকাশ-নিবোধাতীত, নিষ্কল, অমল।
'কলাতীত' সেই ভাবে মিশিছে 'সকল'॥
সেই জ্ঞান দাও সবে, জ্যোতি-স্বরূপিণি!
'জীবে' 'শিবে' মিশাইয়া, সংসৃতিনাশিনি।
কাল ভয় নাশ কর, শ্মশানবাসিনি।
সপ্নে দৃষ্ট ভীতি নাশ, কলুষনাশিনি।

(১) স ঐক্ষত একোহহং বহুস্যাম প্রজায়েয। শ্রুতি।

(২) অবিদ্যা-কাম-কর্ম্ম-বিশিষ্ট কার্য্যকরণোপাধি আত্মা সংসারী জীব উচ্যতে, নিত্য নিরতিশয়-জ্ঞানশক্ত্যুপাধিরন্তর্য্যামীশ্বর উচ্যতে, স এব নিরুপাধিঃ কেবলঃ শুদ্ধঃ। ভাষ্য বৃ ২০।৮।৬।১১

'সপ্নে-দৃষ্ট'-ব্যাঘ্র-ভীত অধম সন্তানে।
কেন মা প্রবৃত্তি 'ব্যাঘ্র-তত্ত্ব' নির্দ্ধারণে ?—
'কে প্রকৃতি' 'কিবা-গুণ,' 'ক্রিযা কিবা তার' ?
'তত্ত্ব পরিজ্ঞান কিবা' ? 'জীব ধর্ম্ম আর' ?
বিদ্বান্ ভাবুক তব যে সন্তান আছে।
এই সব বড প্রশ্ন, দিও তার কাছে ॥
সপ্ন দেখে বড ভয হযেছে জননি।
বুদ্ধি নাই ব্যাঘ্রতত্ত্ব কিবা অনুমানি ॥
সুকোমল স্পর্শে, কিম্বা প্রবল আঘাতে।
ঘুমঘোর ভেঙ্গে দাও, কি ফল তাহাতে ?
তাহাতেই দূরে যাবে যত 'গোলমাল',
মিছা কেন 'বিদ্যা' ভাবে, বাধাও জঞ্জাল ॥
পরে, যদি সন্তানেরে ভুলে লও কোলে,
জাগরণ-কষ্ট তাহে সব যাব ভুলে ॥
'অবিদ্যার' ভাব, মাগো, 'বিদ্যা' ভাবে ক্ষয,—
'বিদ্যা' ভাব! সেও খেলা।—সব মাযামযি।
এক দ্রষ্টা,—নাহি দৃশ্য, বহুত্বের ভাব,—
'দ্রষ্টাতে আরোপ দৃশ্য,' ইহাই 'স্বভাব' ॥
মিথ্যা দৃশ্য,—সেই তত্ত্ব কি হবে মা জানি—
নানা তত্ত্ব—স্বপ্ন-দৃশ্য, কেন অনুমানি।
আকাশে জলের বর্ণ—দেখে অজ্ঞজনে (১)
'একে,' 'বহু তত্ত্ব'-জ্ঞান, মিথ্যা, মা তেমনে ॥
স্বপ্ন দেখে বড ভীত সন্তান তোমার।
জাগাইযা দাও মাগো, ঘুচুক আঁধার ॥

স্বপ্নভীতস্য

---

(১) যথা নভসি মেঘৌঘা রেণুর্বা পার্থিবোঽনিলে।
এবং দ্রষ্টরি দৃশ্যত্বমারোপিতমবুদ্ধিভিঃ। ভাগবৎ ১।৩।৩০।

অগতির গতি।

(১)

"মা বিমলা—ইনিই সেই যোগিপুরুষ। এঁরই নাম সদানন্দ দেব। এঁকে প্রণাম কর" এই বলিয়া মাতা ও কন্যা সাষ্টাঙ্গে সেই ধ্যানমগ্ন যোগীর চরণে প্রণাম করিলেন। যোগী ঈষৎ নয়ন উন্মীলন করিয়া, "স্বস্তি" শব্দ উচ্চারণ করিলেন।

মাতা ও কন্যা উভয়েই নীরব, উভয়ের মুখে চিন্তার কালিমা ফুটিয়া উঠিয়াছে। যোগীর চরণে তাহাদের কোন প্রার্থনা আছে, তা' তাহারা জানাইতে সাহস পাই-তেছে না। অবশেষে মাতা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া, যোগীর মুখের দিকে চাহিয়া, বলিলেন "বাবা! আমরা মরিতে বসিয়াছি,—আপনি দয়া না করিলে আর আমাদের উদ্ধার নাই।"

যোগী তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন, এবং অতি প্রশান্তভাবে ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন। মাতা শিহরিয়া উঠিলেন, বুঝিলেন 'ভগবান্ ভিন্ন কেহ কাহাকেও রক্ষা করিতে পারেন না, তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করাই জীবের একান্ত কর্ত্তব্য ও ভরসা।'

তথাপি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না, কাতর নয়নে যোগীর প্রশান্ত মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মুখের একটী কথায়, সহসা এতটা নির্ভর শ্রীভগবানের প্রতি হয় কই? সংসারী জীবের প্রাণে এত শক্তি কোথায়, এবং করুণাময়, দয়ারসাগর ভগবানের প্রতি অচলা ভক্তির স্রোত ক্ষুদ্র জীব ছুটাইয়া দিতে পারে কৈ? তাহারা হাসিতে জানে, কাঁদিতে জানে,—আনন্দে উন্মত্ত হইয়া আপনার অস্তিত্ব হারাইতে জানে, শ্রীভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিতে তাহারা ত জানে না। বিমলার মাতাও একটী সংসারের জীব, তিনিও চিত্তস্থির করিতে পারিলেন না; বাসনা বিজড়িত মনকে করুণাময়ের চরণে সমর্পণ করিতে পারিলেন না। কাঁদিতে কাঁদিতে যোগীর চরণদ্বয় জড়াইয়া ধরিলেন, কিন্তু কিছুই বলিতে পারিলেন না। তাঁহার বিশ্বাস যে, সদানন্দ দেব ইচ্ছা করিলে অসাধ্যও সাধন করিতে পারেন।

সদানন্দ দেব বুঝিলেন, ধীরস্বরে কহিলেন "মা! যদি শ্রীভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিতে না পার, তবে এই মরণ-ধর্ম্মশীল সংসারে, আর কাহার মুখ চাহিয়া দিন

কাটাইতেছ ? বস্তু মাত্রই কোনও কারণে নিজ ধর্ম্ম ত্যাগ করে না, যাহার যা স্বভাব সে কখনই তাহা ভুলিতে পারে না। শরীরের ধর্ম্মই নাশ, ভগবদ্ ইচ্ছা ব্যতিরেকে কে তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে। যাও মা, গৃহে ফিরিয়া যাও; ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে অবশ্যই তোমার ইষ্ট-বিয়োগ ঘটিবে না।" পরে কিঞ্চিৎ অস্ফুটস্বরে সদানন্দ দেব—

"মূকং করোতি বাচালং, পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥"

এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে নয়নদ্বয় ধ্যানে মুদ্রিত করিলেন।

এইখানে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব পরিচয় দিই। বিমলার মাতা মঙ্গলা দেবী বিধবা রমণী। তাঁহার সংসারের অবলম্বন তাহার কন্যা বিমলা ও জামাতা বিজয় কুমার। একমাত্র পুত্র অভয়চরণ। তিনি সংসারের সুখ দুঃখ বুঝিতেন না। অভাবের তাড়নায় মাতা তাহাকে একদিন দু'টা কড়া কথা বলিয়াছিলেন; সেইদিন হইতে তিনি নিরুদ্দেশ। মাতা অনেক কাঁদিলেন, কাটিলেন, কিন্তু তাহার জীবিতকালে আর পুত্রের মুখ দেখিতে পাইলেন না। বিজয়কুমার আজ কঠিন রোগে আক্রান্ত,—তাই আজ মাতা ও কন্যা উভয়ে সদানন্দদেবের শরণাপন্ন হইয়াছেন।

বিমলার মাতা ও বিমলা ধ্যানস্থ যোগীর চরণে প্রণাম করিয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

(২)

বিমলার অবস্থা অতি শোচনীয়। সে আজ নিজের মনের অবস্থা নিজেই বুঝিতে পারিতেছে না। যে মোহ নিদ্রায় সে এত আচ্ছন্ন ছিল, এতদিনে বুঝি সে নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়। সে আজ জাগিয়া জাগিয়াই যেন দুঃখময় স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতেছে। জাগ্রত-স্বপ্নের অভিনয় মানব নিত্যই করিতেছে, অস্বপ্ন জাগরণ কয়টি মানবের অদৃষ্টে ঘটিয়া থাকে। খুঁজিলেও একটি মিলিবে কিনা সন্দেহ। বিমলার চিত্ত মানবচিত্তের উপাদানে গঠিত। সংসারের ভাবে বিজড়িত-চিত্ত, সে চিন্তা হইতে অব্যাহতি পাইবে কিরূপে ? বিমলাও ভাবিতে লাগিল, বিমলা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না সে পথে চলিতেছে না বসিয়া আছে,—সে নিদ্রিত না জাগ্রত, মৃত না জীবিত। তাহার হৃদয়ে আজ প্রবল তরঙ্গ দুকূল ভাসাইয়া ছুটিয়া

চলিয়াছে। বিমলা এখনই বুঝিয়াছে তাহাব সংসাবেব সকল সাধ, সকল সুখ ইহ জীবনেব মত ফুবাইযাছে। বিধাতাব সৃষ্ট এমন আলোকময় বিশ্বরাজ্যও তাহাব চক্ষে এখন নিবিড় অন্ধকাবে আবৃত। বিধাতার যে মধুময়ী সৃষ্টি প্রতিনয়নে স্ববগেব সৌন্দর্য্য ঢালিয়া দিতেছে, সেই মহীয়সী সৃষ্টি বিমলাব প্রাণে আজ নৈরাশ্য-বিজড়িত কি এক তীব্র দুঃখ-কাহিনীব অবতাবণা কবিতেছে মাত্র। বালিকা মধুময়ী মাযেব কোলে বসিয়া, চাঁদেব আলোয় সোণাব স্বপনে ডুবিয়া, কতদিন কত সুখেব খেলা খেলিযাছে,—কি মধুব হাসি হাসিয়া জগতেব চক্ষে সুধা সৃষ্টি কবিয়াছে। তাহাব সে সৌন্দর্য্য, সে হাসি, আজ কোথায়? যে প্রাণে সুখেব কি দুঃখেব, কোন ছায়াই পড়িত না, সে প্রাণই বা কোথায়? যৌবনে পতি সঙ্গে আত্মহাবা হইয়া কযটা দিন সে স্বপ্নেব মত কাটাইয়া দিয়াছে,—আলো কি আঁধাব, সুখ কি দুঃখ, প্রণয় কি উন্মত্ততা, চৈতন্য কি জড়তা, পুণ্য কি পাপ, তরল আলোক-রশ্মি কি হৃদয-ব্যাপিনী মলিনতা, কিছুই জানিতে পাবে নাই।

মৃদু-সমীবণে হেলিতে, দুলিতে যে প্রাণেব একটানা স্রোতে সে ভাসিয়া যাইতেছিল, সে গতি ফিবিল কেন? বিমলা ভাবিতেছে,—সেই ত জগৎ—সেই ত ফল-ফুল, সেই মৃদুমন্দ-মধুব কোকিল-কূজন, সেই মধুব মলয় সমীবণ, সেই সব; কিন্তু তাহাব এমনটা হইল কেন? সে কি কবিয়াছে,—না বুঝিতে পাবিয়া জীবনে কি এমন একটা ভুল কবিযা ফেলিযাছে,—যে প্রেমেব আশাটী অকালে ববিব তাপে ফুলটীব মত ঝবিয়া পড়িল, সে ভাবিতেছে, "আমাব চোখের আলোটী সবাইয়া লইযা বিধাতাব কি সুখ হইল? তাঁহার কি মহান্ উদ্দেশ্য সংশাধিত হইল?" অনভিজ্ঞা বিমলা কিছুই বুঝিতে পাবিল না।

এ কি! কাহাব এ বোদন বোল, হৃদয-পঞ্জব ভাঙ্গিয়া মুখবিত হইল? বিমলা এতক্ষণ জানিতে পাবে নাই যে, সে তাহাব গৃহে উপস্থিত;—চিবজীবনেব মত প্রাণেশ্ববকে বিদায় দিতে প্রস্তুত,—মুমূর্ষু পতিব পাদদেশে দণ্ডায়মানা। ইহপবকালেব গুরু, সকল সাধ, সকল বাসনা, পতির চবণ বক্ষে ধাবণ কবিয়া, বিমলা নেত্র-বিগলিত অশ্রুধাবায় চবণদ্বয় ভাসাইয়া দিল। স্বামীর বদন প্রতি দৃষ্টি নিহিত কবিল, কিন্তু চ'খের জলে ভাল দেখিতে পাইল না। অন্তিম-শয্যায় শয়িত বিজয়কুমাবেব অমৃতময় শেষ কথা কয়টি বিমলার

কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। বিজয়কুমার বলিলেন—"বিমলা! আমার সময় হইয়াছে, আমি চলিলাম। জগদম্বা, তোমার দুঃখ দূর করিবেন।"

তৎপরে নারায়ণের মধুমাখা নাম উচ্চারণ করিতে করিতে বিজয়কুমার সাধের সংসার পশ্চাতে ফেলিয়া সেই সুদূর অজ্ঞাত দেশের অভিমুখে প্রয়াণ করিলেন।

নিদারুণ যাতনা হৃদয়ে বহিয়া, বিমলা গত প্রাণপতির চরণতলে লুটিয়া পড়িল। ইহজীবনের মত বিমলার সংসার খেলা ভঙ্গ হইল, জীবনের আলো চিরদিনের মত নিভিয়া গেল, বিমলা চারিদিক্ অন্ধকার দেখিল। অভাগিনীর মনের ভিতর যে কিরূপ করিতেছে, কে বলিয়া বুঝাইবে।

বিমলা তিন দিন কিছুই খাইল না, কেবল মাটিতে পড়িয়া দিবারাত্র কাঁদিতে লাগিল।

(৩)

এইরূপে ছয়মাস অতীত হইল, বিমলা এখন বুঝিয়াছে এতবড় সংসারে তার আর কেহই নাই। স্নেহময় হাত বুলাইয়া তাহার মর্ম্ম বেদনা মুছাইয়া দেয় এ জগতে তেমনটী আর কেহই নাই। যাহাকে একবার ভাবিলে, যাঁহার মধুর নাম একবার উচ্চারণ করিলে প্রাণের আগুন নিভিয়া যায়,—সকল দুঃখ, সকল যাতনা দূরে যায়, দারুণ মর্ম্ম আঘাত যাঁর শান্তি-বিলেপনে সারিয়া যায়, প্রাণ অমৃত-রসে গলিয়া যায়, প্রেমের উচ্ছ্বাসে হৃদয়তট প্লাবিত হইয়া যায়,—বিমলা ত সে মধুর নাম জানে না। প্রাণভ'রে আত্মহারা হ'যে সে ত ভগবানকে ভালবাসিতে শিখে নাই। বিমলা জানিত স্বামীই তাহার একমাত্র উপাস্য দেবতা। সে তাঁহাকেই ভাল বাসিত, তাঁহাকেই ভাবিত,—তাঁহারই ধ্যান, তাঁহারই চিন্তা বিমলার সমগ্র জীবনের সুখ ও শান্তি। এখন মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রাণের সকল যাতনার অবসান হয় কিসে? সে মধুর মধু, প্রেমময় প্রতিমা, প্রাণের দেবতা, সুখের উৎস, দরিদ্রের নিধি কে? বিমলাকে কে বুঝাইয়া দিবে? যাঁ'র মধুর ভাবে প্রাণের ভিতর প্রেমের নদী উজান বহিয়া যায়, যাঁর অমৃতময়ী বাণী সংসারে মলিন মানবচিত্তে, বিমল শান্তির সুষমারাশি ঢালিয়া দিয়া সবলে গরিমা-মণ্ডিত আনন্দময় বিরজধামের প্রতি টানিয়া লইয়া যায়, ভগবানের সেই অমৃতময়ী জগপ্লাবিনী বাণী বিমলা কি কখনও শুনিয়াছে? শুনিলে কি, মনে বিষাদের

ছায়া পড়িত ? সেই প্রেমময়ের ভাষা বুঝিলে কি, এই দারুণ মর্ম্মান্তক যাতনায় কাতর হইয়া সে মাটিতে পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিত !

ছিদ্র পাইলেই বিপদ্‌ সহস্রমুখী হইয়া দেখা দেয়। অভাগিনী বিমলার একমাত্র আশ্রয় তাহার শোকাতুরা জননী। সেই স্নেহের আশ্রয়টিও কালের স্রোতে ভাসিয়া গেল। হরিনাম করিতে করিতে, বিমলার মাতাও সংসারের বাধন ছিঁড়িয়া মহাপথে যাত্রা করিলেন।

বিমলা চারিদিক্‌ শূন্য দেখিল, সংসারের সকল আশা ফুরাইল, জীর্ণ আশ্রয়-টুকুও ভাঙ্গিয়া গেল বিমলা একবার গলা ছাড়িয়া কাঁদিল, খুব কাঁদিল, প্রাণ ভরিয়া কাঁদিল। তার পর, উন্মাদিনী বিমলা উঠিয়া বসিল, একবার মায়াময় সংসারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, সাধের সাজান ঘরখানি জনমের মত দেখিয়া লইল। আবার চোখের কোণে এক ফোটা জল আসিল, কতকালের সুখস্মৃতিগুলি মনের কোণে, একটী একটী করিয়া জাগিয়া উঠিল, প্রাণের ভিতর প্রলয়ের ঝড় ছুটিল,—তখনি ঝড় থামিল,—একটুকু আগুন আনিয়া ঘরখানি জ্বালাইয়া দিল।

(৪)

আজ বিমলা পথের ভিখারিণী। কাহার উদ্দেশে, কোথায় চলিয়াছে, সেও তা' জানে না। কোটী কোটী নরনারী পূর্ণ এই জগতের মধ্যে, সে একা চলিয়াছে। যায় তবু একবার পেছু ফিরে চায়,—কি যেন, কি মহারত্ন সে এইখানে ফেলিয়া আসিয়াছে, তাই দেখিবার জন্য তা'র আকুল নয়ন দুটী ফিরাইয়া দেখে। দেখিতে দেখিতে বিমলা অনেক দূর চলিয়া আসিয়াছে, আবার ফিরিয়া চাহিল। সব শূন্য,—সুদূর বিস্তৃত অনন্ত আকাশ শ্যামাঞ্চলা ধরণীর অঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। সম্মুখের দিকে চাহিল সেই অনন্তব্যাপী শূন্য, উভয় পার্শ্বেও তাই। নিম্নে দৃষ্টিপাত করিল, অনন্ত পৃথিবী পড়িয়া রহিয়াছে। উৰ্দ্ধে চাহিল, তরল অনন্ত নীলিমারাশি। ওইখানে, ঐ নীলিমার মধ্যে কি তা'র হারাণ ধন লুক্কায়িত আছে! বিমলা ভাবিল 'সেখানে জ্বালা নাই, যন্ত্রণা নাই, কামনা নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, সুখ শান্তি স্নেহ, সুধা সবই ঐখানে,—আমি ঐখানেই যাব।' বিমলার প্রাণ আকুল হইল, সপ্তস্বরে প্রাণের ভিতর মহাসঙ্গীত বাজিয়া উঠিল। বিমলা নীরব; শান্ত, ঢলঢল নয়ন দুটী ঐ অনন্ত নীলিমায় সংলগ্ন, সে দৃষ্টি আর ফিরিল না। আত্মহারা হইয়া ধরণীর স্নেহময় অঞ্চলে, তাহার সংজ্ঞাহীন মূৰ্চ্ছিত দেহ খানি লুটিয়া পড়িল।

পশ্চাতে কে যেন বলিল "মা উঠিয়া দাঁড়াও। ঐ মন শ্রীভগবানের চরণে সমর্পণ কর। তাঁহার আনন্দঘন মঙ্গলময় জ্যোতি তোমার হৃদয়ের সকল যাতনা দূর করিয়া দিবে।"

বিমলা উঠিল, উঠিয়া দাঁড়াইল, চকিতে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিল; কৈ! কাহাকেও ত দেখিতে পাইল না। ভাবিল, কে আমার কর্ণে মধু বর্ষণ করিল, শীতল বারিবিন্দু সিঞ্চনে পোড়া হৃদয়ের জ্বলন্ত অগ্নি নির্ব্বাপিত করিল। কে এ মহাপুরুষ! কহিল "চিনিয়াছি, স্বর-সংযোগে চিনিয়াছি, ইনিই সেই মহাভাগ সদানন্দ দেব। প্রভু! প্রভু! কোথায় গেলে, ফিরে যেওনা! এস, আমি একাকিনী আঁধারে পড়ে আছি। আমায় শান্তির পথ দেখাও, আমার হাত ধ'রে নিয়ে যাও। আমি যে পথ জানি না!!"

কি জানি, বাহিরে কি ভিতরে, আবার মধুর ধ্বনি হইল—"ঐ প্রবল অনুরাগই তোমাকে তোমার গন্তব্য স্থানে লইয়া যাইবে। মানবের সাহায্য নিষ্প্রয়োজন।"

বিমলা চমকিত হইল; সে ভাবিল "ভগবান্ কেমন আমি যে তা' জানি না, আমি যে কখন তাঁ'রে ভাবি নাই,—কখনও তাঁ'কে ভালবাসিতে শিখি নাই। আমায় কি চরণে তিনি স্থান দিবেন? আমি যে মহাপাতকী। তাঁহার চিন্তা যে ক্ষণেকের জন্যও আমার বিক্ষিপ্ত মনে স্থান পায় নাই। আমার হৃদয় বড় মলিন, তাঁ'র স্বচ্ছ আলো কেমন ক'রে সেখানে প্রতিভাত হইবে। তবে কি তাঁ'কে পাইব না, তা' হইলে আমার কি হবে, কেমন ক'রে আমি এই শূন্য জীবন বহন করিব? আমার এই কাতর রোদন তিনি কি শুন্বেন না? তিনি যে সব শুনেন, সব দেখেন,—তিনি যে অন্তর্য্যামী, শুন্বেন বৈ কি! ভগবান্! তুমি যে করুণাময়, তুমি যে জগতের পিতা। আমি অভাগিনী তনয়া, আমার প্রতি তোমার দয়া হইবে বৈ কি। আমার মত দয়ার পাত্র আর কে আছে? দীননাথ! দয়াময়! ভগবান! আমায় কোলে তুলে লও, আমায় পথ দেখাইয়া দাও। আমি তোমার কাছে যাব। আর এ ছেলেখেলার সংসার চাহি না। যাক্ এই বসুন্ধরা পায়ের তলে গড়িয়ে যাক্, আমি কিছুই চাই না, আমি তোমায় চাই। তোমার একটানা প্রেমের স্রোতে ভাসিয়া যাইতে চাই। আমার হাতে ধ'রে তুলে নাও। এঁ্যা – এঁ্যা—ঐ যে আলো—ঐ করুণার প্রস্রবণ, ঐ যে কেমন স্নিগ্ধ সুষমারাশি-মণ্ডিত অমৃত তনু!—ঐ যে, আমার হরি! দীননাথ!!"

বিমলা স্পন্দহীনা জড়পুত্তলিকার মত নিশ্চল। তাহার মুখে আর বাক্য নাই। দেখ, দেখ, তা'র মনের বৃত্তিগুলি অন্তরাত্মায় বিলীন হইয়াছে। সে আপনার অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়াছে। প্রেমময় আনন্দঘন বিশ্ববিধাতার মধুর মূর্ত্তি, তাহার হৃদয-মন্দিরে হঠাৎ কি করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইল? আহা! দয়াময়ের কি অপার করুণা। একবার প্রাণ ভরিয়া ডাকিবা মাত্র বিমলার তত জ্বালা, তত যন্ত্রণা কোথায় গেল,—স্রোতের মুখে তৃণের মত কোথায় ভাসিয়া গেল? বিমলা আপনাকে ভুলিয়া গেল, জগৎকে—সর্ব্বকে, ভুলিয়া গেল। বিমলার মনে আজ যে পরাশান্তি, যে প্রসাদ, তাহা মানবজীবনে মহাভাগ্যফলে ঘটিয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় বিমলার পশ্চাদ্দেশে আসিয়া কে দাঁড়াইল। এযে অভয়চরণ। সংসারবিতাড়িত, দৈন্যের প্রতিমূর্ত্তি, অভয়চরণ। আজ একি! নয়ন-কোণে শত চন্দ্রমার জোছনারাশি গলিয়া পড়িয়াছে। তাহার সমস্ত অবয়ব এক অদ্ভুত স্বর্গীয় কান্তিতে উদ্ভাসিত। ভিতর হইতে, কি এক শান্ত জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে, দেখিলে প্রাণে যুগপৎ ভক্তি ও প্রীতির আবির্ভাব হয়। অভয়চরণ সন্ন্যাসী, সংসারের সব ভাবগুলিকে পদতলে দলিয়া চলিয়াছে,—প্রাণের ভিতর আদৌ সংসারের মলিনছায়া পড়ে নাই, আর পড়িবেও না। অন্তর্যামী স্বয়ং তাহাকে পূত করিয়া, তাহার হৃদয়ে কৃত-অধিবাস। অভয়চরণ মুক্ত। তিনি অতি ধীরস্বরে ডাকিলেন, বিমল! বিমলার উত্তর নাই, বাহিরের ডাকে বিমলার কর্ণ আজ বধির। অভয়চরণ বিমলার অবস্থা বুঝিলেন, বুঝিয়াই আর ডাকিলেন না, ধ্যানস্থ হইয়া নিজ 'হৃদয়াবস্থিত ভগবানের ভাষায়' ডাকিলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে বিমলার ধ্যান ছুটিয়া গেল। বিমলা ফিরিয়া চাহিল। "একি! দাদা! দাদা" বলিতেই, বিমলার চোখের কোণে আবার জলবিন্দু দেখা দিল। কিন্তু অভয়চরণের সেই শান্তি-মণ্ডিত মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবা মাত্র, চোখের জল চোখের কোণেই মিলাইয়া গেল; দেহ-বুদ্ধি ডুবিয়া গেল। অভয়চরণ বলিল "বিমল! একদিন অর্থের জন্য এই সংসার হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলাম। আজ তোমাদের জন্য এক মহারত্ন আনিয়াছি। এই জ্বালাময় সংসারের ঊর্দ্ধে উঠ, হৃদয়ের মোহ আবরণ ভেদ করিয়া ফেল, প্রত্যাহৃত মনের অঞ্চলে এই মহারত্ন ধারণ কর, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, কি উজ্জ্বলতম রত্ন কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভাসিত করিয়া রহিয়াছে,—দেখিতে পাইবে, ভাস্বন্ সূর্য্য চন্দ্রও সে রত্নের জ্যোতির নিকট অতি

মলিন। বিমল! চাহিয়া দেখ, সেই আলোক অনন্ত ব্যাপিয়া, চারিদিকে 'সব' সমাচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। দেখ, সমস্ত জগৎ-পদার্থই সেই সুষমা রাশিতে ওতপ্রোতভাবে ভাসিতেছে। দেখ, সুখ দুঃখ, জন্ম মৃত্যু, পাপ পুণ্য, সব দ্বন্দ্বের ভিতর সর্ব্বজীব, সর্ব্বকর্ম্ম, সর্ব্বকামনার ভিতর দিয়া,—সেই এক অমৃত জ্যোতি বা ভর্গ সমভাবে প্রবাহিত হইতেছে। দেখ, দেখ! সেই জ্যোতিস্রোত ঘনীভূত হইয়া আত্মারাম প্রাণেশ্বরের অপ্রাকৃত মদনমোহনরূপ প্রকট করিতেছে। "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বম্ তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" দেখ দেখ, চেয়ে দেখ, ঐ সুদূর অন্তরীক্ষ উদ্ভাসিত করিয়া সেই মহা-জ্যোতি, জীবের হৃদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, জীবকে প্রেমোন্মাদে মোহিত করিয়া, আপন অমল ধবল ভাবে পরিণত করিবার জন্য সদা তরঙ্গায়িত হইয়া ছুটিতেছে। এস বিমল, এস, মলিন সংসার পশ্চাতে ফেলিয়া ঐ ভর্গে মিশিয়া যাই;—আনন্দময়ের আনন্দময়ী চৈতন্যতে আপনাকে হারাইয়া ফেলি।"

উভয়ে নতজানু হইয়া প্রাণ ভরিয়া, মুক্তকণ্ঠে গাহিলেন—

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিবাসম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম, ত্বয়া ততম্ বিশ্বমনন্তরূপং॥ "রসময়"

নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে,
নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে।
নমস্তে জগদ্বন্দ্যপদারবিন্দে,
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥
নমস্তে জগচ্চিন্ত্যমানস্বরূপে
নমস্তে মহাযোগিনি জ্ঞানরূপে
নমস্তে চিদানন্দনন্দস্বরূপে,
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥
অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য,
ভয়ার্ত্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তোঃ।
ত্বমেকাগতি র্দেবি নিস্তারদাত্রি
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥

শ্রীশ্রীমৎ-চৈতন্যদেবের উপদেশ।

(১)

ভারতের উপাসনাতত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি, এই তিনটী মোক্ষের বা ভগবৎ-প্রাপ্তির পথ বা সেতু। পরম পুরুষার্থ বা পরম-পুরুষকে অর্থ বা লক্ষ করিয়া তাঁহাকে লাভের, বহুবিধ পন্থা নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও, এই তিনটীর প্রাধান্য বেদ, পুরাণ, সংহিতা, তন্ত্র প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেই ভূয়োভূয়ঃ উল্লিখিত হইয়াছে। এই সকল বিভিন্ন-পন্থাবলম্বীরা অনেক সময়ে নিজ নিজ মতের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পান বটে; কিন্তু সেই পরমপ্রিয় পুরুষো-ত্তমের উপলব্ধিতে যে সকল পথই পর্য্যবসিত বা পরিসমাপ্ত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাই একজন কবি গাহিয়াছেন—

ভিন্ন ভিন্ন পথ, ভিন্ন ভিন্ন মত,
কিন্তু এক গম্যস্থান।
যে যেমন পারে, ট্রেণে ষ্টিমারে,
হোক সেথা আগুয়ান।

জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি—পুণ্যসলিলা বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা-গঙ্গা, শ্রীকৃষ্ণের বংশী-নিস্বনে অনুপ্রাণিত যমুনার সহিত, স্বচ্ছ ও অন্তঃসলিলা সরস্বতীর ন্যায় পরস্পর মিলিত হইয়া জগতের উদ্ধারের জন্য নিত্যই প্রবাহিত হইতেছে। প্রত্যেক চক্রে চৈতন্যের এই তিনটী প্রবৃত্তি এক এক বার মিলিত হয়। সাধনার প্রথমাবস্থায় এইরূপ পথের পার্থক্য দৃষ্ট হইলেও, পরিশেষে তিনে এক হইয়া যায়। অক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে সেই কথাই বলিয়াছিলেন,—

যথাদ্রিপ্রভবা নদ্যঃ পর্জন্যাপূরিতাঃ প্রভো।
বিশন্তি সর্ব্বতঃ সিন্ধুং তদ্বৎ ত্বাং গতয়োঽন্ততঃ॥ ভা ১০।৪০।১০

'হে প্রভো! যেমন পর্ব্বতজাত নদীকুল বর্ষাগমে জলপূর্ণ হইয়া সর্ব্বদিক্ হইতে সমুদ্রেই পতিত হয়, তেমনি সমুদায় গতি, অন্তে এক তোমাতেই পরিসমাপ্ত আছে।' শ্রীধরস্বামী টীকায় তাই সুস্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, "সর্ব্বে মার্গাস্ত্বয্যেব পর্য্যব-সন্তি।" সকল মার্গই শ্রীভগবানেই পরিসমাপ্ত হইয়া পরিপূর্ণতা লাভ করে।

ত্রয়ী সাঙ্খ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি,
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥ মহিম্ন-স্তব

বেদত্রয়ে যজ্ঞ, সাঙ্খ্যে জ্ঞান, পতঞ্জলি প্রণীত যোগশাস্ত্রে যম নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগ, তন্ত্রে পঞ্চ মকারাদি সাধন, নারদাদি পঞ্চরাত্রে বিষ্ণু উপাসনা, মুক্তির হেতু বলিয়া বর্ণিত আছে। ভিন্ন ভিন্ন মার্গে, সেই সেই পথই শ্রেষ্ঠ এবং হিতকর,— ইহাই বলা আছে। রুচির (Character of the individuality) পার্থক্যই ইহার কারণ। জল যেমন সরল বা কুটিল পথে গমন করিলেও সমুদ্রই তাহার গম্যস্থান, তদ্রূপ মানব যে ভাবে উপাসনা করুক না কেন, তদ্দ্বারা শ্রীভগবানেরই উপাসনা করিয়া থাকে। "মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।"

শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে উপদেশ কালে বলিয়াছেন যে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই তিনটী সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে বা পরোক্ষভাবে মুক্তিপ্রদ। কর্ম্মদ্বারা বা জ্ঞানদ্বারা মুক্তি হয় না বলিলে, ভগবদ্বাক্যের সহিত বিরোধ হয়—

যোগ স্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃনাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ॥ ভা, ১১।২০।৬

শ্রীশ্রীচৈতন্য দেবও সনাতনকে এই কথার ইঙ্গিত দিয়াছেন—

সেই কৃষ্ণ প্রাপ্তিহেতু ত্রিবিধ সাধন।
জ্ঞান, যোগ, ভক্তি—তিনের পৃথক্ লক্ষণ।
তিন্ সাধনে ভগবান তিন্ স্বরূপে ভাসে।
ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবত্তে প্রকাশে॥ চৈতন্যচরিতামৃত

ভারতে এক এক সময়ে, এক এক মহাপুরুষ বা অবতারাদি অবতীর্ণ হইয়া এই সকল বিভিন্ন পন্থার সংস্কার করিয়া তাহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া বৌদ্ধবিপ্লবে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম হারাইয়া গেলে, শঙ্করের অবতারস্বরূপ শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য অবতীর্ণ হইয়া পুনরায় জ্ঞানের পন্থা খুলিয়া দিলেন, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" উপনিষদের এই মহাভাব পুনঃ হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত প্রচার করিলেন। ভারত জ্ঞানের আলোকে আবার উদ্ভাসিত হইল, এবং তৎসঙ্গে তাহার আধারভূত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম আবার অনুষ্ঠিত হইল।

তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কত শত সাধক পরম অদ্বয় জ্ঞানের পথে চলিতে লাগিল, ও চৈতন্য-ক্ষেত্রে অভিব্যক্ত বহুত্বের মধ্যে একত্ব সিদ্ধ হইল।

কালচক্রে আবার ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইল, অধর্ম্মের অভ্যুদয় হইল, হিংসাদ্বেষ ও অহংকারে ভারত পরিপূর্ণ হইতে চলিল, কলির ঘোর কালিমায় জ্ঞানের শুভ্রজ্যোতি মলিন হইল। ধর্ম্মপ্রাণ সাধক এবং ধর্ম্মযাজকগণ লোকচক্ষুতে অতীব হেয়, অপদার্থ ও বিকৃতমস্তিষ্ক বলিয়া পরিগণিত হইল। এমন সময়ে প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আবির্ভূত হইলেন। প্রেমের বন্যায় বঙ্গদেশ ভাসিয়া গেল; সেই প্রেমের স্রোত জগতে নূতন আলোক বিকীর্ণ করিল, জীবের সাধনা সুলভ হইল; যুগধর্ম্ম প্রচারিত হইল, নাম-সঙ্কীর্ত্তনে বঙ্গদেশ মাতিয়া উঠিল। "কলি-কালে যুগধর্ম্ম—নামের প্রচার" এই উক্তি সার্থক হইল। ভাগবত সে কথা পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছেন—

নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ ভা ১১।৫।৩১।৩২

কলিকালে যিনি সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান নাম-যজ্ঞ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন, তিনি সুমেধা। শ্রীগৌরাঙ্গদেব নাম-সঙ্কীর্ত্তন বা ভগবানের মহিমা-ব্যঞ্জনরূপ যুগধর্ম্ম প্রচার করিলেন, প্রেমভক্তির প্রচারে যেন নবযুগের সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া, যে এই ভক্তিমার্গ একেবারে অপরিজ্ঞাত ছিল, এ কথা বলা যায় না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাবের পর, ধারাবাহিকক্রমে ভক্তের ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যে শ্রীরামানুজাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া ভক্তিমার্গ প্রচারিত করেন। তৎপূর্ব্বেও অনেক ভক্তের কথা শুনা যায়। দাক্ষিণাত্যে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী হইতে ক্রমে বাহ্যভাবে এই স্রোত বঙ্গে প্রবাহিত হইয়াছে।

জয় শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী কৃষ্ণপ্রেমপূর।
ভক্তিকল্পতরুর তেঁহো প্রথম অঙ্কুর॥
শ্রীঈশ্বরপুরী রূপে অঙ্কুর পুষ্ট হইল।
আপনি চৈতন্য মালী স্কন্ধ উপজিল॥ চৈতন্যচরিতামৃত

তবে প্রকৃত ভক্তের সংখ্যা চিরদিনই বিরল। গীতাতেও ভগবান্ বলিয়াছেন,—

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে।
যততাং অপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥

ভাগবতের 'শ্রুতিস্তোত্রে' দেখা যায় —

> ন পবিলষন্তি কেচিদপবর্গমপীশ্বর তে
>
> চবণসবোজহংসকুলসঙ্গ বিসৃষ্টগৃহাঃ ॥ ১০।৮৭।২১

ভগবানেব চবণ-কমলে হংসায়মান ভক্তাগ্রগণ্যদিগেব সঙ্গপ্রাপ্ত হইয়া যাঁহাবা গৃহত্যাগ কবিয়াছেন, তাঁহাবা মুক্তি কামনাও কবেন না। এই শ্লোকে "কেচিৎ" শব্দেব টীকায়, পূজ্যপাদ শ্রীধবস্বামী বলেন "অপবর্গমপি কেচিৎ ন পবিলষন্তি ইচ্ছন্তি কুতোঽন্যদিন্দ্রপদাদি। কেচিদিতি এবম্ভূতা ভক্তিবসিকা বিবলা ইতি দর্শয়ন্তি" এক্ষণে এই ভক্তিব স্বরূপ কি? মহাপ্রভু "আপনি আচবি জীবে শিখাইতে" সাধারণ জীবেব ন্যায় প্রাণেব ব্যাকুলতায়, এই অহৈতুকী স্বার্থশূন্য ভক্তি প্রার্থনা কবিয়াছিলেন—

> ন ধনং ন জনং ন সুন্দবীং, কবিতাং বা জগদীশ কামযে।
>
> মম জন্মনি জন্মনীশ্ববে, ভবতদ্ভক্তিবহৈতুকী ত্বয়ি ॥

হে জগদীশ। আমি ধন, জন, সুন্দবী বমণী বা কবিত্বশক্তিব কামনা কবি না; কেবল জন্মে জন্মে তোমাতে অহৈতুকী ভক্তি প্রার্থনা কবি।

এই ভক্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রেব অভিমত কি দেখা যাউক। ভক্তি শব্দেব ধাতুগত অর্থ বিবেচনা কবিলে ভক্তিব লক্ষণ বা স্বরূপ কিযৎ পবিমাণে উপলব্ধি হইতে পাবে। ভক্তিশব্দ 'ভজ'ধাতু নিষ্পন্ন। ইহাব অর্থ সেবা।

> ভজ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবাযাং পবিকীর্ত্তিতঃ।
>
> তস্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তা ভক্তিশব্দেন ভূযসী ॥ গরুড় পুবাণ।

'সর্ব্বভূতের সেবাই' সেবা অর্থে বুঝায়। নাবদভক্তিসূত্রে আছে "সা কস্মৈ পবম-প্রেমরূপা" অর্থাৎ কাহাবও প্রতি পবম প্রেমভাবই ভক্তি। "ক" শব্দেব অর্থে "পরম সুখ-স্বরূপ ভগবানকে" ও বুঝায়। শাণ্ডিল্য সূত্র—"সা পবানুবক্তিবীশ্ববে" বা 'ঈশ্ববে পবানুবক্তিকে' ভক্তি বলেন। নাবদপঞ্চবাত্রে—

> অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
>
> ভক্তিবিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনাবদৈঃ ॥

অন্য কোন বিষয়ে মমতা না থাকিয়া, একমাত্র বিষ্ণুতে যে প্রেমযুক্ত মমতা হয় তাহাই ভীষ্ম, প্রহ্লাদ উদ্ধব, নাবদ প্রভৃতি কর্ত্তৃক ভক্তি বলিয়া কথিত হয়। এ মমতা, বিশিষ্ট ও ভেদশীল পতিপুত্রাদিতে নহে। 'সর্ব্বভূতে শ্রীভগবান্ অবস্থিত'

এই ভাবে সর্ব্বভূতাত্মক বিষ্ণুতে মমতাই, ভক্তি। এ মমতায় কর্ম্ম-বন্ধন হয় না; তাই শাস্ত্র বলেন—

মম এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
তস্মাদেব সংযোজ্য পরাত্মনি সুখী ভবেৎ॥

মমতা বন্ধন ও মোক্ষের হেতু, বিষয়ে মমতাই বন্ধন, ভগবানে মমতাই মুক্তি। ভগবানে এইরূপ মমতা যখন আপনা হইতেই হৃদয়ে উদিত হয়, যে অনুরাগে কোন হেতু নাই, কোনরূপ কামগন্ধ নাই, আত্মেন্দ্রিয় প্রীতির ছায়া নাই, তাহাই অহৈতুকী ভক্তি। ইহাই নিগুর্ণ ভক্তি।

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নিগুর্ণস্যহ্যদাহৃতং।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥ ভা—৩।২৯।১১-১২

'সাগরে গঙ্গাসলিল-ধারার ন্যায় যে মনোগতি আমার গুণশ্রুতিমাত্র, ফলানুসন্ধান না করিয়া, ভেদদর্শন রহিত হইয়া, সর্ব্বান্তর্যামী আমাতে অর্থাৎ পুরুষোত্তমে, অবিচ্ছিন্নভাবে, তৈলধারার ন্যায় নিহিত হয়, সেই মনোগতিরূপ ভক্তি—নিগুর্ণ ভক্তিযোগের লক্ষণ। এই নিগুর্ণ ভক্তিতে বিশেষ 'অহং' নাই, সুতরাং মোক্ষকাম-নাও নাই,—ধর্ম্ম, অর্থ, কামের ত কথাই নাই। তাই চরিতামৃতে বলেন—

তার মধ্যে মুক্তি বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।

এ মুক্তিবাঞ্ছা ভেদভাবে অবস্থিত 'আমি'কে সংসারস্রোত হইতে নিরাময়ভাবে স্থাপনের ইচ্ছা মাত্র। মান, গর্ব্ব, অহঙ্কার, দ্বেষ প্রভৃতি ভেদমূলক ভাবগুলি পরিত্যাগ করিয়া, অভেদ ভাবে, সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত ভগবানের সেবাই, ভক্তির লক্ষণ। 'প্রতি জীবে কৃষ্ণ অধিষ্ঠান', সর্ব্বক্ষেত্রে তাঁহারই অভিব্যক্তি,— ভক্তির উপদেশ। বস্তুতঃ জগতে অদ্বিতীয় পরিপূর্ণ-স্বরূপ ভগবানই আছেন। যাহা কিছু জগতে আছে, তদতিরিক্ত কিছুই নাই। ভাগবতে স্পষ্টই বলা হইয়াছে—

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্‌যৎ সদসৎপরং।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহং॥ ২।৯।৩২

"সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল আমিই ছিলাম, তৎকালে কি সূক্ষ্ম পদার্থ, কি স্থূল পদার্থ, কি তাহাদের কারণভূত প্রধানতত্ত্ব, কিছুই ছিল না। সৃষ্টির পরেও

আমি রহিয়াছি, এই যে বিশ্ব প্রপঞ্চ দেখিতেছ, ইহাও আমি। অবশেষে বিশ্বের যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাও 'আমি।' ফলতঃ 'আমি' অদ্বিতীয় অনাদি ও অনন্ত, অতএব পরিপূর্ণ-স্বরূপ।" সর্ব্বভূতে আত্মার বা 'আমির' ভগবদ্ভাব যাঁহাতে স্থির হইয়াছে, তিনি ভাগবতশ্রেষ্ঠ।

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মে ভাগবতোত্তমঃ॥ ভা ১১।২।৪৫

গীতাতেও ভগবান্ বলিয়াছেন—

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।

যিনি সকল ভূতে স্বীয় ভগবদ্ভাব বা আত্ম-স্বরূপভাব দেখিতে পান, এবং ভগবতাত্মাতে সর্ব্বভূতকে দর্শন করেন অর্থাৎ অনুলোম বিলোম ক্রমে 'সর্ব্ব'-বস্তুতে এক অদ্বিতীয় অহংরূপ ভগবানকেই প্রত্যক্ষ করেন; সুতরাং "যাঁহার আমি ভগবদ্ভাবপ্রাপ্ত, এবং যাঁহার জগৎ ভাবও ভগবদ্ভাবে পর্য্যবসিত এবং তজ্জন্য যিনি সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বভূতাত্মরাত্মা ভগবানকে আপনার পরম স্বরূপ বলিয়া দেখিয়া পরম একতা লাভ করেন, তিনিই পরম ভাগবত।

মহা ভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তার শ্রীকৃষ্ণস্ফুরণ॥
স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥ চৈতন্যচরিতামৃত।

জগতের নাম ও রূপ তাহা চিত্তে আর ফুটেনা, তিনি ভেদের ক্ষেত্রেও একই ভগবানকে দর্শন করেন। এইরূপে ভগবদ্ভাবে যাঁহার 'আমিটী' অনুপ্রাণিত, তাঁহার ধন ও দেহ-বিষয়ে 'নিজ' "ও পর" ভেদ নাই। তিনি সর্ব্বভূতে সম বা একতত্ত্বদর্শী ও শান্ত, কারণ, ভেদ ও গতি জ্ঞান তাঁহাতে নিবৃত্তি হইয়াছে।

ন যস্য স্বঃ পর ইতি বিত্তেষ্বাত্মনি বা ভিদা
সর্ব্বভূতসমঃ শান্তঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥ ভা—১১।২।৫২

যিনি আত্মপরে সামান্য মাত্রও ভেদদর্শী, ভগবান্ মৃত্যুস্বরূপ হইয়া তাঁহার ঘোরতর ভয় বিধান করেন। ভগবান কপিলদেব এই কথা বলিয়াছেন—

আত্মনশ্চ পরস্যাপি যঃ করোত্যন্তরোদরং।
তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যু বিদধে ভয়মুল্বণং॥ ভা—৩।২৯।২৬

এই ভেদের সীমা অতিক্রম, একি সহজ কথা ? উপনিষদও বলেন 'মৃত্যু-মাপ্নোতি য ইহ নানাত্ব পশ্যতি।' আমরা বিষয়ের কীট, ও বিষয় হইতে ক্ষণকালের জন্য আপনাকে স্বরূপে স্বতন্ত্র রাখিতে পারি না; প্রকৃত ভাগবত বা বৈষ্ণব ত্রিভুবনের বৈভবের নিমিত্তও ক্ষণকালের জন্য ভগবৎ-চরণ হইতে বিচলিত হইবেন না। কারণ তিনি জানেন যে ভগবান্ ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ নাই।

ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠ-স্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্মৃগ্যাৎ।

ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাৎ, লবনিমিষার্দ্ধমপি যঃ স বৈষ্ণবাগ্রঃ॥

প্রকৃত ভক্তি ভগবত্তত্ত্ব পরিজ্ঞান।

এই ভক্তি রাগাত্মিকা ও বৈধী ভেদে দ্বিবিধ। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদের যে একান্ত অনুরাগ, তাহাই রাগাত্মিকা ভক্তি। কারণ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত তাহাদের অন্য অভিলাষ নাই। তাহারা "তদর্থ বিনিবর্ত্তিত সর্ব্বকাম"। সর্ব্ব, বা 'বহুর' প্রতি কাম, সর্ব্বাত্মিকা প্রবৃত্তির সহিত ভগবানে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। গোপী-অনুগত ভক্তির নাম রাগানুগা। গোপীদের প্রেমে শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা নাই, স্বতঃই প্রাণ মনের অবিচ্ছিন্ন ধারা শ্রীভগবানে পরিসমাপ্ত। ভেদের নিবাস জন্যইত শাস্ত্র যুক্তি, ভেদ নাই, সুতরাং শাস্ত্রও নাই। ভেদ আছে, তাই শাস্ত্র "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং" প্রভৃতি উপদেশ দেন। এখন ত ভেদ নাই, কার্য্যে শাস্ত্র ও শাস্ত্র-জ্ঞানের আবশ্যকতা নাই।

রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসী জনে।

তার অনুগত ভক্তি রাগানুগা নামে॥

শাস্ত্র যুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি। চরিতামৃত।

কাম-গন্ধহীন গোপীদের প্রেম, ভেদাত্মক-অহংভাবে অবস্থিত জীবের ত সহজে বোধগম্য হয় না। যে ভক্তি শাস্ত্রের আজ্ঞায় অনুষ্ঠিত হয়, যখন পরম একত্ব সাক্ষাৎ প্রতীত না হয়, অথচ ভগবানের প্রতি আকর্ষণও জন্মিয়াছে, তখন শাস্ত্রবিধির সাহায্যে যে ভক্তি প্রকট হয়, তখন তাহার নাম বৈধী ভক্তি।

রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।

বৈধী ভক্তি বলি তাঁরে সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়॥

হৃদয়ে ভগবানের আকর্ষণ প্রকট হয় নাই; কিন্তু শাস্ত্র ত বলিতেছেন যে 'তিনি

আছেন ও তিনিই সর্ব্ব' এবং 'ভক্তিহীন জন বর্ণাশ্রমধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হয়,' তাই জীব ভক্তির অর্জ্জনে চেষ্টা করে—

ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥ ভা ১১।৫।৩

শাস্ত্রের আদেশ—

তস্মাৎ ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।

শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছাতোভয়ং ॥ ২।১৫

প্রথমে শাস্ত্রের আজ্ঞায় ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে, পরিশেষে পরাভক্তি লাভ হইতে পারে। তখন আপনিই—

জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান।

সর্ব্বজীবে শ্রীভগবানের অধিষ্ঠান দর্শনই উত্তমা ভক্তির সর্ব্বপ্রথম স্তর। আজকাল কয়জন ভক্ত এ মহাসত্য সাধনে তৎপর। দেবহুতি উপাখ্যানে শ্রীভগবান্ কপিল-দেব বলেন—

যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ ॥
দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ।

ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ভা ৩।২৯।২২-২৩

"যে সর্ব্বভূতে আত্মারূপে অবস্থিত ঈশ্বরকে ত্যাগ করিয়া, মূঢ়তা বশতঃ অন্য ভাবে অর্চ্চনা করে সে ভস্মে আহুতি দেয়। ভেদদর্শী বিশিষ্ট-আত্মাভিমানী ব্যক্তিগণ আমাকে পরকায়ে দ্বেষ করে। ভূতের প্রতি বদ্ধ-বৈরভাব প্রযুক্ত, তাহাদের মন কখন শান্তি লাভ করিতে পারে না।" যাঁহার উদ্দেশে সমস্ত সাধনা, তাঁহাকে কি করিয়া জীব জানিবে ? আর না জানিলেই বা কি প্রকারে তাঁহাকে ভক্তি করিবে ? পরিচ্ছিন্নপ্রায় জীবে যে এক উচ্চতর সত্ত্বা আছে, শ্রীভগবান্ যে সর্ব্ব জীবে আপনিই বিহার করিতেছেন তিনি যে 'সর্ব্ব', এই সব ভাষা, জীবসেবা না করিলে শিখা যায় না। তবে ভগবদ্ভাব-বর্জ্জিত হইয়া জীবসেবায় ফল হয় না। সেই জন্য ভগবান্ কপিল-দেব বলেন—

মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্বহুমানয়ন্।

ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি ॥ ভা ৩।২৯।৩৪

"সেই লক্ষ্যস্বরূপ ভগবান্ যে জীব কলা বা জীবশক্তি সাহায্যে সর্ব্বদেহে অনু-

প্রবিষ্টপ্রায় আছেন, তাহা বুঝিয়া সকল জীবকে সদা পরম-পদেস্থিত ও পরম-পদের অভিব্যক্তি বা ক্ষেত্ররূপে মান্য করতঃ, মনে মনে সর্ব্ব জীবকে প্রণাম করিবে।” এইরূপ ভাবে, ব্যক্ত ও পরিচ্ছিন্ন জীবের মধ্যে ভগবানের চিহ্ন বা প্রকাশ স্থান দেখিতে চেষ্টা করিলে ক্রমে ব্যক্তাতীত সত্ত্বার বোধ জন্মিতে থাকে। ভগবান্‌কে 'সর্ব্ব'ভাবে দেখিতে দেখিতে হৃদ্‌গত কাম ও অহঙ্কার-প্রবৃত্তি নষ্ট হয়, এবং সাধক মায়ার ক্ষেত্রেও পরম-তত্ত্বের ইঙ্গিত পান। অন্যত্রও ভাগবত বলেন—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ॥ ১১।২।৩৫

যিনি স্বীয় ভগবদ্ভাব এবং ভগবদাত্মাতে সর্ব্বভূতকে দর্শন করেন, তিনিই উত্তম ভাগবত। সর্ব্বভূতে ভগবানের অধিষ্ঠান দর্শন না করিলে, সর্ব্ব কর্ম্ম কখনও শ্রীভগবানে অর্পিত হইতে পারে না। সর্ব্ব কর্ম্ম না অর্পণ করিলে, অহঙ্কারের মোহ অতিক্রম করা যায় না, এবং ভেদ-বুদ্ধির নাশ হয় না। তাই সর্ব্ব জীবে শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠান দর্শনই, ভক্তির প্রথম স্তর।

গীতাতেও ভগবান্ ভক্তের শ্রেণী বিভাগ করিয়া বলিয়াছেন —

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥ ৭।১৬।১৭

এই চারি প্রকার ভক্তের মধ্যে আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী ভক্তেরা কামনাবশে ভগবানের ভজনা করে। জ্ঞানী অর্থাৎ “বিষ্ণোস্তত্ত্ববিৎ” নিত্যযুক্ত ভক্ত শ্রেষ্ঠ। কারণ, জ্ঞানী সর্ব্বত্রই ভগবান্‌কে দর্শন করেন—

যেন ভূতান্যশেষাণি দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি।

তাঁহার ভগবানের অতিরিক্ত দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য মন্তব্য কিছুই নাই। এই শ্রেষ্ঠ ভক্তিতে, ভেদজ্ঞান একেবারে পরিত্যাগ করিতে হয়। এই মূল মন্ত্র হারাইয়া, এখন কতকগুলি আনুষ্ঠানিক আচার পদ্ধতিই, বৈষ্ণবধর্ম্মের লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই কথায় কেহ যেন এরূপ মনে না করেন, যে ভক্তি-প্রধান বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রকৃত ভাগবত ভাব নাই, ইহাই বলা যাইতেছে। আজকাল সকল বিষয়েই বাহিরের কপটতার বৃদ্ধি পাইয়াছে। যে বাহিরে বৈরাগ্যের ধ্বজা উড়াইয়া “অর্থমনর্থং” ইত্যাদি বক্তৃতা করিয়া অন্তরে কার্য্যতঃ তদ্বিপরীত আচরণ করে, তাহাকে

বৈষ্ণব বা ভক্ত বলা যায় না। কিন্তু যাঁহার বাহিরের আড়ম্বর নাই, সরল অকৃত্রিম-ভাবে যিনি সকলের সহিত প্রেম করেন ও জাতি-কুল বিচার না করিয়া সকলের চরণধূলি লইতে কুণ্ঠিত নহেন, তিনিই বৈষ্ণব। সকল ধর্ম্মের ভিতর এখন ভেদ-বুদ্ধি প্রবেশ করিয়াছে। ধর্ম্মের সার-সত্যের দিকে লক্ষ্য না করিয়া, বাহিরের পরিচ্ছদ লইয়াই, এখন বিচার চলিতেছে। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের উপদিষ্ট ভগবৎ-প্রেম আধুনিক ন্যাড়ানেড়ি দলের পাপ-কলুষিতায় পরিণত হইয়াছে। কত অধর্ম্ম এক্ষণে ধর্ম্মের নামে পরিচিত হইতেছে। আজ কাল 'ধর্ম্মধ্বজী' হইবার প্রয়াসই বেশী, কিন্তু ভিতরে খাঁটী হইবার জন্য চেষ্টা প্রায় দেখা যায় না। বাহিরে প্রেমিক সাজিতে আমরা সিদ্ধ হইয়া পড়িতেছি, কিন্তু "আমাদের নয়নের অশ্রু বিন্দু, এতে প্রেম নাই এক বিন্দু, কেবল লোক দেখান প্রেমিক সেজে মুখে হরি হরি কই।" বাহিরে বৈরাগ্যের ভাণকে চৈতন্যদেব 'মর্কট বৈরাগ্য' আখ্যা দিয়াছেন। রঘুনাথের প্রতি মহাপ্রভুর উপদেশ অমৃত-স্বরূপ। এই উপদেশাবলী আলোচনা করিলে, সার সত্য কতকাংশে বুঝা যাইবে।

পূর্ব্বে শান্তিপুরে রঘুনাথ যবে আইলা।
মহাপ্রভু কৃপা করি তারে শিখাইলা॥
মর্কট বৈরাগ্য ছাড়ি হৈলা বিষয়ীর প্রায়।
ভিতরে বৈরাগ্য, বাহিরে করে সর্ব্বকর্ম্ম॥

মহাপ্রভুর সংক্ষিপ্ত উপদেশ কিরূপ উপাদেয়, এবং তাহার সার-সত্য কিরূপ দেখা যাউক।

গ্রাম্যকথা না শুনিবে গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥
অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে॥
এইত সংক্ষেপে আমি কৈনু উপদেশ। চরিতামৃত।

তিনি ধনীর সন্তান রঘুনাথকে তাঁহার উপযুক্ত শিক্ষা দিলেন। মহাপুরুষদিগের শিক্ষাই এইরূপ। বৈষয়িক কথাই গ্রাম্যকথা। প্রথম উপদেশ,—বৈষয়িক কথা পরিত্যাগ। কারণ, এই আলোচনায় লিপ্ত থাকিলে তাহাতে আসক্তি জন্মে, আসক্তি হইতে ভোগের বাসনা, বাসনা হইতে বন্ধন, তাহা হইতেই স্বরূপ

হইতে বিচ্যুতি, এবং ক্রমে বুদ্ধি নাশ, এইরূপে জীব অধঃ পতিত হয়। গীতাতেও ভগবান্ বিষয় চিন্তার পরিণামের ক্রম দেখাইয়াছেন ;—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্‌বুদ্ধিনাশঃ বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥ ২।৬২।৬৩।

দ্বিতীয় উপদেশ, আহার ও পরিচ্ছদ সম্বন্ধে। এই দুইটী মনুষ্যের প্রয়োজনীয়; তাই প্রভু কিরূপ আহার ও পরিচ্ছদ সাধকের আবশ্যক, তাহার উপদেশ করিলেন। বিলাসিতায় মানুষের দেহাত্মভাব জাগিয়া উঠে ; সুতরাং বিলাসিতার পরিত্যাগ প্রয়োজনীয়। জিহ্বার লালসায় ভাল আহারের প্রবৃত্তি জন্মে ; সাধকের তাহার আবশ্যক নাই।

বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায় তার, হয় রসের বশ॥
বৈরাগীর কৃত সদা নাম সঙ্কীর্ত্তন।
শাক পত্র ফল মূলে উদর পূরণ॥
জিহ্বার লালসে যেবা ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ, কৃষ্ণ নাহি পায়॥ চরিতামৃত।

ভাল আহার ও ভাল পরিচ্ছদ, আমাদের কল্পিত অভাব। ইন্দ্রিয়ের সেবা করিতে করিতে আমরা তাহাদের দাস হইয়া পড়ি। তখন তাহা না হইলে, আর চলে না। শরীর সুস্থ রাখিয়া জীবন ধারণার্থ, যাহা যাহা প্রয়োজন, সে অতি সামান্য। কারণ—

স্বচ্ছন্দবনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্য্যতে॥ হিতোপদেশ

এ সম্বন্ধে মহাত্মা যীশুখ্রীষ্ট যাহা বলিয়াছেন, তাহাও অতি সুন্দর এবং সারগর্ভ।

"Therefore I say unto take no thought of your life; what ye shall eat or what ye shall drink; nor yet for your body, what ye shall put on. Behold the fowls of the air · for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns;

and your Heavenly Father feedeth them Wherefore if God doth so clothe the grass of the field, which to-day is and to-morrow is cast into the woven, shall He not much more clothe you, O, ye of little faith? (Matthew VI 25, 26, 30) "তোমরা জীবন-ধারণের জন্য, কি আহার করিব, কি পান করিব, কিম্বা তোমাদিগের শরীরের জন্য কি পরিধান করিব, এইরূপ চিন্তা করিও না। আকাশ-ভ্রমি বিহঙ্গমগণকে দেখ, কাহার দ্বারা ইহারা জীবিত? তারা বীজ বপনও করে না, ফসলও কাটেনা, শস্য সংগ্রহ করিয়াও রাখে না। তথাপি তোমাদের স্বর্গীয় পিতা ইহাদিগকে আহার করাইয়া থাকেন। ভগবান্ যদি মাঠের সামান্য ঘাস,—যাহা আজ আছে কাল তুন্দরের ভিতরে নিক্ষিপ্ত হইবে, তাহাকে সাজাইলেন, তবে কি তোমাদিগকে আরও বেশী করিয়া সাজাইবেন না। তাই হে অল্পবিশ্বাসিগণ! কল্যকার জন্য চিন্তা করিও না।"

তৃতীয় উপদেশ—অমানী-মানদ ভাবে, কৃষ্ণনাম গ্রহণ। 'অমানী' অর্থাৎ নিজধর্ম্মের অভিমান পরিত্যাগ, এবং 'মানদ' বা পরধর্ম্মের সৎকার করিয়া কৃষ্ণনাম লইবে অর্থাৎ নিজধর্ম্মের আচরণ করিবে। সকল ধর্ম্মেই ভগবান্ অন্তর্নিহিত, তবে সাধককে অবস্থানুসারে নিজ ধর্ম্ম আচরণ করিতে হইবে। মহাপ্রভু স্বীয় জীবনে সকল স্থলেই এই দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। দিক্‌বিজয়ী মহাপণ্ডিত কৃত শ্লোকে নানা দোষ দেখাইলেন, পণ্ডিতের বুদ্ধি-বিপর্য্যয় হইল। তখন শিষ্যগণ হাসিতে লাগিল। প্রভু তাঁহাদিগকে নিষেধ করিয়া পণ্ডিতকে বলিলেন, -

তুমি বড় পণ্ডিত মহাকবি শিরোমণি
যার মুখে বাহিরায় ঐছে কাব্যবাণী ॥

*　　*　　*

শৈশব-চাঞ্চল্য কিছু না লবে আমার।
শিষ্যের সমান মুই না হই তোমার ॥
আজি বাসা যাহ, কালি মিলিব আবার।
শুনিব তোমার মুখে শাস্ত্রের বিচার ॥

কাশীতে প্রকাশানন্দের সহিত কথোপকথনে প্রভু তাঁহার দীনতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। প্রকাশানন্দ বলিলেন—

বেদান্ত পঠন ধ্যান সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি কেনে কর ভাবকের কর্ম্ম॥
সন্ন্যাসী হইয়া কর নর্ত্তন গায়ন।
ভাবক সব সঙ্গে লইয়া কর সংকীর্ত্তন॥

তদুত্তরে মহাপ্রভু তৎক্ষণাৎ আপনার যুক্তি ও তর্কজাল বিস্তার করিয়া, তাঁহার ঐ মত খণ্ডন করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহার প্রয়াস পান নাই। তিনি তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া বলিলেন—

* * * শুন শ্রীপদ ইহার কারণ।
গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিলা শাসন,—
"মূর্খ তুমি তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।
কৃষ্ণ মাত্র জপ সদা, এই মাত্র সার॥"

* * *

এই আজ্ঞা পাইয়া নাম লই অনুক্ষণ।
নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হৈল মন॥

শ্রীক্ষেত্রে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহিত মিলনেও, তাঁহার সেইরূপ অমানী-মানদ ভাব।। তিনি বলিলেন—

আমি বালক সন্ন্যাসী ভাল মন্দ নাহি জানি।
তোমার আশ্রয় লৈনু গুরু করি মানি॥

অল্পদিনের মধ্যেই ভট্টাচার্য্য, প্রভুকে বেদান্ত শ্রবণ করিতে বলিলেন। প্রভু বলিলেন—

———— মোরে তুমি কর অনুগ্রহ।
সেই ত কর্ত্তব্য আমার তুমি যেই কহ॥

অবশেষে এইরূপে সাতদিন বেদান্ত শ্রবণ করিলেন। প্রভুর মৌনভাব দেখিয়া সার্ব্বভৌমের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল, তাই তিনি প্রশ্ন করিলেন—

সাতদিন কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ॥
ভালমন্দ নাহি কহ রহ মৌন ধরি।
বুঝ কিনা বুঝ ইহা, বুঝিতে না পারি॥

মহাপ্রভুর "আত্মারাম" শ্লোকের ব্যাখ্যা জগতে অতি অদ্ভুত। সেই ব্যাখ্যা যাঁহার বদন হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, তিনি তৎকালীন পণ্ডিতাগ্রগণ্য সার্ব্বভৌমের সম্মানের সামান্যও ত্রুটী করেন নাই। তিনি নিরভিমান ভাবে আপনার দৈন্যতা জানাইলেন—

———মূর্খ আমি, নাহি অধ্যয়ন।
তোমার আজ্ঞাতে মাত্র করি যে শ্রবণ॥

এইরূপে নিরহঙ্কার হইয়া পরধর্ম্মের সৎকার করিয়া, নিজ ধর্ম্মের আচরণ মহাপ্রভুর মহাশিক্ষা। (ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস।

দুর্গা।

(১)

চলেছে স্বরগ পানে শারদীয় শুভধার,
নিখিল পরশ ধারা মুছাইয়ে ম্লানভাব,
চাঁদিমার দীপ্ত কোলে ছুটে আসি আবাহন
বিহ্বল করেছে, সুপ্ত আকাশের প্রাণ মন।
রূপগুণে গান গেয়ে 'অভেদের' বোধ পানে,
ছুটেছে, অমৃতময় একধারা সঙ্গোপনে।
মন যেথা নাহি যায়, স্মৃতি যেথা ভাষাহীন,
বুদ্ধির বিকল তন্ত্রী যে পরশে অতি দীন।
সে যে এক অভিনব দ্বন্দ্বহীন ভাবরাশি,
'বিশ্বের' অতীত গতি, ব্রহ্মরূপে যায় পশি।
অনন্ত ভেদের মাঝে বহুত্বের আবরণে
'সাকার শকতি' ল'য়ে খেলে সদা আনমনে।
অথচ যে মহাসাম্য গুণাতীত সত্ত্ব পানে,
অক্ষয় অমৃত ধারা ধাইতেছে অনুক্ষণে॥

(২)

আজি এ ভারত জুড়ে ফুটায়েছ রূপরাশি,
আজি এ শ্যামল-ক্ষেত্রে ছড়ায়েছ কত হাসি,
দ্বন্দময় কত ধারা নানারূপ ভাব ল'য়ে,
বিষ্ণুশক্তি 'গোত্র' ভাব প্রতি পত্রে যায় বয়ে ॥
কিন্তু কোন্ গতি বশে ব্রহ্ম অভিমুখী হয়ে,
নিষ্কল অব্যক্ত ধারা অবিশেষ-জ্ঞান ছেয়ে,
দ্বন্দ্বহীন শেষ-হীন নামরূপ পর পারে,—
প্রেমময়-প্রাণ সেজে ছুটিতেছে তাঁর তরে ?
অতুলন জ্যোতি-রাশি সন্ধান বিহীন ধার,
বিশ্বের রাজার তরে, তু'লে লবে 'বিশ্ব'-ভার,
নিখিল আবেগ ভরা পরাণের মাঝ খানে,
কি এক প্রশান্ত ভাব, জাগায়েছ নিরজনে ?
সে এক অন্তঃসরী ঊর্দ্ধমুখী মহাধারা,
স্বপনের আবরণে অবিকৃত বক্ষ-হারা ॥

(৩)

আজি এ ভারত মাঝে জাগিতেছে তব গান
আজি এ শ্যামল ভূমে উঠিতেছে নব তান ॥
একই তব মহাভাব, বিশ্ব অভিমুখী হ'য়ে,
প্রকাশে ব্রহ্মাণ্ডরূপে বহু স্তর ছবি ছেয়ে,
আবার যে প্রতি পাত্রে, তব ভাব উঠে জেগে
আলোকের প্রতি-ছত্রে, তব প্রাণ লয় বেগে ॥
আবার নিবৃত্তি রূপে, বহুস্তর ভাবগণ,
বায়, বুদ্ধি, স্পৃহা-রূপে করি সদা সংহনন,—
কোথা লয়ে যাও সবে, অন্তঃহীন-স্রোত পরে
পার-হীন পরব্রহ্মে নির্ব্বাণের ছায়া ঘেরে ?
এত যে প্রপঞ্চ-ধারা, পুনঃ তারে করি লয়,
জ্ঞানময়ী যোগিনী! মা! নিত্যভাবে ভরি তায়,—

বস্তুত্বের মিথ্যাভাব দাও জীবে বুঝাইয়া,
অশেষ প্রপঞ্চ-মালা লও পুনঃ লুকাইয়া॥

(৪)

এ বিশ্ব ছুটেছে তব, মহাকালীরূপ পথে ;
এ আলোক আসে ছুটে তব মহামায়া পথে।
বিশ্ব-হৃদি ভেদকরি উঠে ব্রহ্ম-গুণ গান,—
উচ্ছ্বাসিত আবেগের প্রেমময় ভক্তি দান।
যেই অনাহত গাথা অণু পরমাণু লয়ে
বিশ্বের অতুল ছবি রচিয়াছে গুণ দিয়ে।
আজি এ ভারত-ক্ষেত্রে সাধকের প্রাণ মন
তব জ্ঞানময়ী রূপে হ'য়ে গেছে নিমগন।
বিকল প্রবৃত্তিগণ সেই রূপ গাথা শুনি
তৃপ্ত-প্রাণ মাঝে শুনে সেই অকথিত বাণী।
'সামান্য" গতির রূপে একতার সুদ্ধ তানে
কর সদা সংযমিত বিশিষ্ট পদার্থগণে।
কিন্তু এই স্রোতে হ'য় অদ্বিতীয় মহাজ্ঞান,
অসামান্য বোধসত্ত্বা, হয় সদা প্রকটন,
জীব যে প্রবৃত্তি-স্রোতে তীর না খুঁজিয়া পায়,
স্থাপিতে সে মহাভাবে নিশিদিন ব্যগ্র ধায়।
কিন্তু যবে বুঝে, চিতি— সাগরের মহাগীত
অচল-প্রতিষ্ঠ, শান্ত, পূর্ণ, এক, লোকাতীত।
অক্ষয়-অমৃত ধারা, অজানিত পরশন,
নিষ্ফল রবির মত, শুদ্ধ পর-দরশন।
গতিশূন্য হ'যে যবে অচলের স্থির গায়
'নামরূপ' ত্যাগ করি, 'একত্বে' মিশিয়ে যায়, —
তবে সে মানব, তব অসামান্য গতি হেরি
বিস্ময়ে বিকলতন্ত্রী আপনারে পরিহরি,—
সাগরের মহাস্রোতে মিশে গিয়া কোন্ ক্ষণে

আমিত্বের ক্ষুদ্রজ্ঞান   ত্যজে কোন্ পরশনে।
তখনি জাগিয়া দেখে   মনোময় দীপ্তাসনে
কর্ম্মের 'বন্ধন শক্তি',   'সম্বন্ধের' জ্ঞান সনে
আছে, সদা অধিষ্ঠিত   'অসম্বন্ধ' রূপ ল'য়ে,
নিত্য কোন্ স্থিরভাবে,   শান্তিময় মহালয়ে।
'গুণ' 'বস্তু' 'কর্ম্ম' আদি, আশ্রয়-বিজ্ঞান সব,
এবং সেই দেখাতেছে,— নিরাশ্রয় শুদ্ধভাব,—
নিত্যতৃপ্ত, এক, শান্ত,   অভিন্ন-সত্তার গীত,
কর্ম্ম ও কারণে কবি   অনুরূপে সমন্বিত।
তুমি সেই মহাপ্রাণ   স্থির আত্মভাব ল'য়ে
অন্তঃহীন স্রোতরূপে   আছ ব্রহ্ম-জ্যোতি ছেয়ে।
তুমি, মা, কারণাতীত,   ভেদ-দৃষ্টি অগোচর।
আদি-জ্ঞান, অদ্বিতীয়   পরব্রহ্ম পরাৎ-পর।

শ্রীনরেশভূষণ দত্ত।

মুরলী-শিক্ষা।

বৈষ্ণব-কবির অপূর্ব্ব অমৃতময় কাব্যে "মুরলী-শিক্ষা" নামে একটী ক্ষুদ্র অধ্যায় আছে। ইহা ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু পদ্মমধুবৎ মিষ্ট, পারিজাত তুল্য সুগন্ধী। ইহার বাহ্যরূপ যেমন সুন্দর, ইহার অন্তর্নিহিত তত্ত্বও তেমনি চিত্তগ্রাহী। আমরা প্রথমে ইহার আখ্যান-ভাগ বর্ণনা করিয়া পরে, ইহার মর্ম্ম-গ্রহণে সচেষ্ট হইব।

একদা গৌরাঙ্গদেব নির্ঝুম মধ্যাহ্নে গঙ্গাতীরে আপনার মনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তাঁহার হৃদয় কৃষ্ণ-প্রেমে ভরপূর, দৃষ্টি কৃষ্ণচন্দ্রের মানসীমূর্ত্তি দর্শনে বিহ্বল, পদ-বিক্ষেপ ভাবাতিশয্যে বিলম্বিত ও অসতর্ক। সহসা চিত্ত-সিন্ধু কি এক অপূর্ব্ব অভিনব ভাব-তরঙ্গে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল; প্রকৃতির সুলকায়া

দেখিতে দেখিতে বিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তিনি দেখিলেন সম্মুখে বৃন্দাবন-পাদ-বাহিনী যমুনা কুলুকুলু নাদে বহিয়া যাইতেছে, এবং তিনিও তাহার তীরে প্রেমময়ী কোন্ গোপবধূর অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন।

সোঙরি পূরব-লীলা শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
মুরলী শবদ করি বদন বাজায়॥

সেই প্রেম-পাগলের অদ্ভুত বদন-বাদ্য শ্রবণ করিয়া, আর এক পাগল—যিনি এই নবদ্বীপ-চন্দ্রের কৃষ্ণাবেশ হইলে আপনাকে শ্রীমতীর প্রতিচ্ছায়া-রূপ, রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের কৃষ্ণ-স্মৃতি সর্ব্বদা সঞ্জীবিত করিয়া রাখিতেন,—সহসা তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

শুনিয়া মুরলী-রব গদাধর আইল।
"মুরলী শিখিব" বলি বামে দাঁড়াইল॥

তখন গদাধরের—

এ কথা শুনিয়া প্রভু মনে মনে হাসি।
"আমি [illegible]"
গদাধর বলে,—"[illegible]।"
বংশী কহে—"নয়ন-বাঁকা ত্রিভঙ্গ-আকার।"

কবি বংশী কহিতেছেন—"যে কেহ শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী শিখিতে চায়, যে কৃষ্ণের মতন বাঁশী বাজাইয়া রসজ্ঞদের প্রাণ-মন হরণ করিতে বাসনা করে, তাহার শিক্ষা চাই,—নাগরালী; তাহার থাকা চাই,—বাঁকানয়ন, ত্রিভঙ্গগঠন।" এই অপূর্ব্ব কথার ভঙ্গীতে, এই বিচিত্র ইঙ্গিতে, কবি কি বুঝাইতে চাহেন—"যিনি এ সংসারে "চতুর", যিনি এই সংসারের বিষকুম্ভ-পয়োমুখ ভাব বুঝিয়া, তাহার সহিত চাতুরালী করিতে পারেন, যিনি সংসারের সৌন্দর্য্যকে অনিত্য জানিয়া, সংসারের সুখকে মোহ-পাশ জানিয়া, পঙ্কমধ্যে মৎস্যবৎ নির্লিপ্ত অবস্থায় অবস্থান করেন, আবার যিনি এই বিশ্বের সর্ব্ববিধ বিচিত্রতা ও অনিত্যতার মধ্যে এক নিত্য-প্রবহমান আনন্দ-রস পান করিয়া রসিক-শেখর-রূপে বিরাজ করেন, সানুরাগা নারীর স্পর্শ কিংবা মৃত্যুর হিম-আলিঙ্গন, যাঁহার হৃদয়কে বিহ্বল করে না, যাঁহার বিষয়ে বিদ্বেষ বা লোভ নাই, লাভ বা অলাভ,—ক্ষতি বা বৃদ্ধি নাই, ভাবে বা অভাবে হর্ষামর্ষ নাই; যিনি বালকবৎ সর্পরজ্জুরূপী শুভ এবং অশুভ উভয় লইয়া

সমভাবে ক্রীড়ারত রহেন, যিনি চিন্তার মাঝে নিশ্চিন্ত, ইন্দ্রিয়গণসত্ত্বেও ইন্দ্রিয়তা বিবর্জ্জিত, যিনি এই জগৎকে ইন্দ্রজাল ভাবিয়া ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় শুদ্ধা মায়ায় ভুবনবাসীকে মুগ্ধ করেন, অথচ নিজে মুগ্ধ হন না, যিনি সংসার-মরুভূমে থাকিয়া, বিষয়রূপ মরীচিকার অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া বারংবার তাহা নেত্রপথে সমুদিত হইতে দেখিয়াও আর তাহার মোহে ভ্রান্ত হন না,—তিনিই যথার্থ "নাগরালী" শিখিয়াছেন?" পুনঃ, "নয়ন বাঁকা" বলিতে কি কবি বলিতে চাহেন—'যে নয়ন জগতের বাহ্যরূপে নিপতিত থাকিয়াও চিত্তের অভ্যন্তরে নিবদ্ধ; যে নেত্রে বাহ্যদৃষ্টি বর্ত্তমান থাকিলেও অন্তর্দৃষ্টি পরিস্ফুট, যে চক্ষু বাহ্যভাবে বিষয়-সুখের ক্ষণিকতা দেখিয়া, এবং অন্তর্গূঢ় চিদ্ঘনমূর্ত্তির রূপাতীত অবিনাশিতা বুঝিয়া, মৃদুহাস্যে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে, যে নয়ন সর্ব্ব-বস্তুতে মর্ম্ম-মধ্যস্থ ধ্যেয়বস্তুর অনিন্দ্য-সুন্দর মধুর মূর্ত্তি দর্শন করে, এ কি সেই নয়ন?" পায়ের উপর পা রাখিয়া, ক্ষীণ কটি ঈষৎ হেলাইয়া, মস্তকের শিখি-পুচ্ছ বাঁকাইয়া, বৃন্দাবন-বিলাসীর যে ত্রিভঙ্গমূর্ত্তি কবির চিত্তপটে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল,—যে ভঙ্গিমায় সচ্চিদানন্দ-রূপের কোনরূপ ভাবত্রয়ের বাহ্যবিকাশ পরিস্ফুরিত, এই "ত্রিভঙ্গ আকার" বলায় কবি কি তাহারই ইঙ্গিত করিতেছেন? আবার এই একটি মাত্র পদে কবি কি বলিতেছেন—"যে বাঁশী শ্যামের কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া ধরণীকে উন্মাদিনী করিয়াছিল, সে বাঁশী বাজাইতে হইলে বাদকরূপী সাধককে শ্যামরূপ ধারণ করিতে হইবে, ধ্যেয়, ধ্যাতা ও ধ্যান, এই ত্রিভাবের একত্র সমাবেশ করিতে হইবে,—যে বাঁশী থাকিয়া থাকিয়া জগতের জীবকে মধুরস্বরে পাগল করিতেছে, যে বাঁশীর স্বরে এই বিশ্ব-হৃদয়-বিহারিণী ভক্তি-যমুনা উজান বহিতেছে, সেই বাঁশীটি বাজাইবার যদি কাহারও সাধ হইয়া থাকে, তবে সে গদাধরের ন্যায় শ্রীগৌরাঙ্গের রাতুল-চরণে শরণ লউক, একান্তমনে ভক্তি-পূরিত হৃদয়ে তাঁহার সমীপে "মুরলী-শিক্ষার" জন্য ব্যাকুল-ভাবে নিবেদন করুক, তবেই তাহার "মুরলী-শিক্ষার" সূত্রপাত হইবার সম্ভাবনা হইবে।"

গৌরচন্দ্রিকায় শ্রীগৌরাঙ্গ গদাধর বিষয়ক পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবনা লিপিবদ্ধ করিয়া বৈষ্ণব কবি রাধাকৃষ্ণের "মুরলী-শিক্ষা" বিষয়ক অপূর্ব্ব ঘটনার গান গাহিতেছেন।

একদিন শ্রীমতী অন্তঃপুরে নির্জ্জনে বসিয়া মনে মনে ভাবিতেছেন—"যে বাঁশীর স্বর একদিন কাণের ভিতর দিয়া আমার মরমে পশিয়া, সহসোত্থিত পবন

সঞ্চালনে শুষ্কপত্রবৎ আমাকে কোন্ শূন্যে উড়াইয়া লইল, যে বাঁশীর উন্মাদক-সঙ্গীতে ব্রজের প্রতিনারী বাউরা হইয়া নাথের শ্রীচরণে আত্ম-সমর্পণ করিল, যে বাঁশীর মধুরগানে ব্রজবালাগণ আত্মহারা হইয়া শ্যামচাঁদের পশ্চাতে ছায়াবৎ পরিভ্রমণ করিতেছে, সে বাঁশীটি কি আর কেহ বাজাইতে পারে না ?"

"ঘর হইতে শুনিয়াছি মুরলীর গান।
আহীর-রমণী, কুলে দিল সমাধান॥
মোহিত সবার মন মুরলীর তানে।
সতী কুলবতী হেন বধিল পরাণে॥
বঁধুর মুরলী-রব শুনিয়া শ্রবণে।
যুবতী, ত্যজিয়া পতি প্রবেশে কাননে॥
অপরূপ শুনিয়াছি মুরলীর নাদ।
শিখিব বিনোদ বাঁশী করিয়াছি সাধ॥"

হৃদয়ে এইরূপ ভাব ধারণ করিয়া, শ্রীমতী উন্মনা হইয়া শ্যাম-সমীপে উপনীত হইলেন, এবং আগ্রহ সহকারে কৃষ্ণচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন :—

"ঘর হৈতে এলাম্ বাঁশী শিখিবার তরে।
নিজ দাসী রাধা বলি, শিখাও আমারে॥
মুরলী শিখিব বঁধু! মুরলী শিখাও।
যেমন করিয়া তুমি আপনি বাজাও॥"

"আমি ত জানিনা—কেমন করিয়া বাঁশী বাজাইতে হয়, কেমন করিয়া বাঁশী ধরিতে হয়, কেমন করিয়া ঐ বাঁশের বাঁশীর ভিতর দিয়া তোমার মতন এমন প্রাণপাগলকরা 'জাতি'-কুল-নাশা ধ্বনি তুলিতে হয়। একবার আমাকে তাহা শিখাইয়া দাও, আমি একবার প্রাণের সাধে বাজাইয়া তোমারি এই বাঁশীর স্বরে তোমাকে আমারি মত পাগল করি।"

"শিখাও পরাণ-বঁধু! যতনে শিখিব।
জানাইয়া দেহ, ফুক্ মুরলীতে দিব॥"

কিন্তু মুখে বলিলে ত হবে না, হাতে হাতে শিখাইতে হইবে,—

"অঙ্গুলী নোঙায়ে, বঁধু! দেহ হাতে হাত।
বাজাইতে শিখাইয়া দেহ, প্রাণনাথ।"

বধুহে! আমাকে শিখাইয়া দাও—

"যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে নিশ্চয় করিয়া।
(জ্ঞানদাস কহে) বাঁশী দেহ শিখাইয়া,—

"তোমার মুরলীর মধ্যে এতগুলি রন্ধ্র কেন? আবার এক একটি রন্ধ্রে, এক এক রকমের সুর ফুটে কেন? বাঁশী কেন এমন করিয়া গড়িলে, তাহা যদি শুনাইতে না চাও, তবে তাহা শুনাইয়া কাজ নাই। কেবল আমাকে শিখাইয়া দাও:—

কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী অতি অনুপাম।
কোন্ রন্ধ্রে "রাধা" বলি ডাকে আমার নাম॥
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী সুললিত ধ্বনি।
কোন্ রন্ধ্রে 'কেকা' শব্দে নাচে ময়ূরিণী॥
কোন্ রন্ধ্রে রসালে ফুটয়ে পারিজাত।
কোন্ রন্ধ্রে কদম্ব ফুটয়ে, প্রাণনাথ।
কোন্ রন্ধ্রে ষড়-ঋতু হয় এক কালে।
কোন্ রন্ধ্রে নিধুবন হয় ফুলফলে॥
কোন্ রন্ধ্রে কোকিল পঞ্চম-স্বরে গায়।
একে একে শিখাইয়া দেহ, শ্যামরায়॥
কোন্ রন্ধ্রের গানে নদী বহয়ে উজান।
কোন্ রন্ধ্রের গানে গোপীর হরল গেয়ান॥
কোন্ গানে গাভী বৎস তৃণ-মুখে ধায়।
কোন্ রন্ধ্রের গানে, শ্যাম! পাষাণ মিলায়॥"

প্রাণাধিকা শ্রীরাধিকার এই অপরূপ সাধের কথা শুনিয়া রসিকশেখর শ্যামসুন্দর বলিতেছেন:—

"মুরলী শিখিবে রাধে! শিখাব মনের সাধে,
যে বোল বলিয়ে, শুন ধনি।
ছাড়হ নারীর বেশ, উচ করি বান্ধ কেশ,
বামে চূড়া করহ টালনী।
ঘুচাহ সিন্দূরের ঘটা, পরহ বিনোদ ফোঁটা,
দূরে রাখ নাসার বেশরে।

কাঁচলি ঘুচায়্যা ফেল, মৃগ-মদে হও কালো,
তবে বাঁশী বাজিবে অধরে॥
লেহ মোর পীতধড়া, পর আঁটি কটিবেড়া,
অঙ্গুলী নোড়াও, শিখাইব।
তুয়া নাম-গুণ, রাই! যে রন্ধ্রে সদাই গাই
একে একে জানাইয়া দিব॥
গৌর অঙ্গুলী তোর, সোণা-বান্ধা বাঁশী মোর,
ধর দেখি রন্ধ্র মাঝে মাঝে।
তিন ঠাই হও বাঁকা, পাচনীতে দেও ঠেকা,
তবে সে বিনোদ বাঁশী বাজে॥" (গোবিন্দদাস)

এ সংসারে প্রকৃতি-প্রসূত জীবমাত্রেই নারী, আর এ জগতে একমাত্র পুরুষ আছেন। তিনি ত্রিভুবনের অধীশ্বর, সকলের হৃদয়ের রাজা, যাঁহার মধুর আহ্বান প্রেম-রূপী মুরলীর রন্ধ্রে ধ্বনিত হইয়া জীবের মর্ম্ম-কন্দরে অনুপ্রবিষ্ট হয়, এবং তাহাকে শুভমুহূর্ত্তে প্রেমময় ভগবানের আসঙ্গ লিপ্সায় আকুল করিয়া তোলে। যে গান শুনিয়া ভক্ত মাঝে মাঝে মায়ার গণ্ডী ছাড়াইয়া, বিষয়ের পাশ ছিন্ন করিয়া, ভগবানের প্রেমের রাজ্যে বিচরণ করিতে প্রয়াসী হয়,—যে তান সর্ব্বদা জীবকে নাম ধরিয়া ডাকিতেছে এবং ধীরে ধীরে সেই পরম-পুরুষের চরণ-সরোজে ভৃঙ্গবৎ আনন্দ-মধু-পানের জন্য লালায়িত করিতেছে, সে গান—সে তান কি আর কাহারও কণ্ঠে ধ্বনিত হইতে পারে? কৃষ্ণচন্দ্র আমাদিগকে তাঁহার বাঁশী শিখাইবার জন্য সর্ব্বদা আমাদের অপেক্ষায় বসিয়া আছেন, এবং আমরা যখন সরলান্তঃকরণে সত্যই তাহা শিখিতে চাই, তখন তিনি আমাদিগকে উপযুক্ত দেখিলে স্বয়ং হাত ধরিয়া শিক্ষা দিয়া থাকেন।

শ্যামসুন্দরের উক্তি শুনিয়া শ্রীমতী তাঁহাকে সেইভাবে সাজাইয়া দিতে বলিতেছেন। তখন :—

এলায়্যা কবরী-ছান্দ চূড়া বান্ধে শ্যাম চাঁদ,
রাই অঙ্গ করে ঝলমলে।
কহিছে জ্ঞেয়ান দাসে বাঁশী শিখিবে বঁধু পাশে,
মুরলী ধরিয়ে করতলে॥

তখন শ্রীরাধার কুঞ্জে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য উথলিয়া পড়িল। তখন :—

নিকুঞ্জ-মন্দিরে দেখ অদভূত রঙ্গ।
দুঁহু শিরে শোভে চূড়া, দুঁহেই ত্রিভঙ্গ॥
রাই শিখয়ে বাঁশী, নাগর শিখায়।
একে বাঁশী আধ আধ, ধরিল দোঁহায়॥
রাই ভেল বিনোদ মুরলী শ্রুতি-ধর।
অঙ্গুলী লোলায়ে ভেদ জানাইছে নাগর॥
শ্যাম কহে—"একবার বাজাও দেখি রাই।
যেই নামে উপাসনা সদাই ধেয়াই॥"
নিজ নামে রাই বাঁশী পূরিল অধরে;
"শ্যাম-নাম" ডাকিছে আপন রাধা-স্বরে॥
রাই কহে—"নিজ নাম বাজাও দেখি শ্যাম!
তোমার মুখে তোমার বাঁশী কেমন অনুপাম॥"

কিন্তু একি! যে বাঁশীতে কৃষ্ণচন্দ্র যখনি ইচ্ছা "রাধা" নাম ফুটাইয়াছেন, যে বাঁশীটি তাঁহার অধর-স্পর্শে বিশ্ব-বিমোহিনী মাধুরীর সৃষ্টি করিয়াছে, আজ সেই বাঁশীতে কিছুতেই ত তাঁহার নিজ নাম ফুটিল না!

নিজ নামে শ্যাম তখন বাঁশী পূরে আধা।
নাহি বাজে "শ্যাম"-নাম, বাজে "রাধা রাধা"॥
ফিরিয়া আপন নাম বাজাইতে চায়।
শ্যামের মুখে শ্যামের বাঁশী, রাধা-গুণ গায়॥

কেন, এমনটি হইল? যাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য জীবের চিত্ত জন্ম হইতে জন্মান্তরে প্রধাবিত, সেই রস-স্বরূপ শ্রীভগবানও ত জীবের সহিত মিলিত হইবার জন্য যুগে যুগে অপেক্ষা করিতেছেন। এক হইতে যেমন দুইএর উৎপত্তি, একের মধ্যেই তেমনি দুইএর মহামিলন? তাই বুঝি কবি বলিতেছেন :—

রাই কহে—"এক রন্ধ্রে দুঁহে দিব ফুক।
না জানি কেমন বাজে, দেখিব কৌতুক॥"
এক রন্ধ্রে ফুক তবে দেই রাধা-কানু।
"রাধা-শ্যাম" দুটি নাম বাজে ভিনু ভিনু॥

বসেব হিল্লোল উঠে দোঁহাকাব গানে।
মোহিল সবাব মন মুবলীব তানে॥
গান শুনি সাবী শুক কোকিল আনন্দ।
তরু লতা কুসুমে ঝবয়ে মকবন্দ॥
জ্ঞানদাস কহয়ে 'বিবিঞ্চি অগোচবী,—
লীলায় বিহবে দোঁহে কিশোব কিশোবী,—

সত্যই এই মব-জগতে যখন জীব 'আমি' ভুলিয়া, সর্ব্বস্ব ভুলিয়া মবম-সুন্দবের সঙ্গে অন্তর্মিলনে মিলিত হয়, যখন জীবেব সুব সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কাবী শ্রীভগবানের বিশ্ব-বিমোহন সুবেব সহিত এক হইয়া যায়, তখনি এই সচল পবিণামী জগৎ মুহূর্ত্তের জন্য অচল হইয়া যায়, এবং সেই অনন্ত মুহূর্ত্তে ভক্ত-ভগবানেব অপূর্ব্ব মিলনে আনন্দেব ধাবায় বিশ্ব ভাসিয়া যায়।

কবি চণ্ডীদাস চৈতন্যচন্দ্রেব পূর্ব্ববর্ত্তী হইলেও, তাঁহাব অমব-তুলিকায় সেই ভাবী-মিলনেব বিচিত্র কাহিনী ধ্যান-সহায়ে বহুদিন পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ কবিয়া গিয়াছেন। অদূব ভবিষ্যেব সেই অলৌকিক সঙ্গীত, প্রবন্ধ-শেষে পাঠকের প্রীত্যর্থে সংযোজিত কবিলাম।

আজু কেগো মুবলী বাজায়। এত কভু নহে শ্যাম-রায়॥
ইহাব গৌব ববণে কবে আলো। চূড়াটি বান্ধিয়া কেবা দিল॥
তাহাব ইন্দ্রনীল কান্ত তনু। এ'ত নহে নন্দ-সুত কানু॥
ইহাব রূপ দেখি নবীন আকৃতি। নটবব বেশ পাইল কতি॥
বনমালা গলে দোলে ভাল। এ না বেশ কোন দেশে ছিল॥
কে বনাইলে হেন রূপ খানি। ইহাব বামে দেখি চিকণ ববণী॥
হবে বুঝি ইহার সুন্দবী। সখীগণে কবে ঠাবা-ঠাবি॥
কুঞ্জে ছিল কানু-কমলিনী। কোথা গেল কিছুই না জানি॥
আজু কেনে দেখি বিপবীত। হবে বুঝি দোঁহাব চরিত॥
চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে। এ রূপ হইবে কোন দেশে॥

আবাব কবে এই অপূর্ব্ব মিলনে ভারত-ভূমি গোলোক হইতেও জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিবে, কে বলিতে পাবে?

শ্রীভুজঙ্গধর বায় চৌধুরী।

পথহারা।

(শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার লিখিত)

কি সুন্দর আকাশ! আকাশ ত চিরকালই সুন্দর; কিন্তু আজ আকাশের এই শারদীয় নির্ম্মলতা ও মাধুর্য্য কি যেন এক নূতন প্রাণে ও ভাবে অনুপ্রাণিত। আকাশ, তাহার প্রশান্ত-গম্ভীর হৃদয়-খানি এই জগতের উপর বাড়াইয়া দিয়া, যেন কোন্ দিব্য প্রেমের আকুল-আহ্বানে সকলকেই আহ্বান করিতেছে। আজ সর্ব্বগত আকাশের এই মহান্ আনন্দের আলিঙ্গন, চির সুন্দর হইতেও সুন্দরতর, চির মধুর হইতেও মধুরতর, চির প্রশান্ত হইতেও প্রশান্ত-তর। দিগঙ্গনাগণ শিশু-কুমারীর বেশে, সুমিষ্ট স্বর্গীয় সঙ্গীতে দিগন্ত মাতাইয়া তুলিতেছেন। তাঁহাদের প্রশান্ত ভাব রাশি, লহরে লহরে নূতন লহরী তুলিয়া বিহঙ্গের কাকলীতে, জীবের কল-প্রবাহে, গৃহস্থের কণ্ঠ-স্বরে, নাচিয়া নাচিয়া, চারিদিকে আনন্দের, বা প্রেমের সৃষ্টি করিয়া প্রতিজীবের অনুভূতির অন্তর্ভূত হইয়া, কি এক মহত্তর আনন্দময়-স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। স্বর্গের মন্দাকিনী কি আজি স্বর্গের সঙ্কীর্ণ-কুল বিদীর্ণ করিয়া মর্ত্ত্যগণকে নবপ্রাণে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য স্বীয় প্রসাদ ও পবিত্রতায় সমগ্র আকাশতত্ত্বকে প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হইলেন?

ওই দেখ বায়ু, বৃক্ষ-বল্লরীর মধ্যদিয়া সর্ সর শব্দে প্রবাহিত হইতেছে, সে আজি কি এক নূতন সংবাদ প্রচার করিয়া গেল,—কি প্রেমময়, কি আনন্দময় ভাবে, কি মধুর সম্ভাষণে, জগৎকে আলিঙ্গন করিয়া গেল! স্পর্শ সুখের মধ্যদিয়া, শীতোষ্ণ-দ্বন্দ্বের মধ্যদিয়া, কি এক অভিনব আনন্দ প্রবাহে জগৎ ভাসাইয়া দিল। বৃক্ষ সকল আনন্দে আন্দোলিত হইল; লজ্জাবতী লতা মুহূর্ত্তের জন্য শিহরিয়া অন্তর্মুখী হইয়া সঙ্কুচিত হইল,—প্রস্ফুটিত সেফালিকা-কুল শারদীয়া প্রকৃতির কোলে, প্রণত মস্তকে পরম-দেবতার চরণে আত্মবিসর্জ্জন করিল! এ সকল প্রাকৃতিক ঘটনা অতি প্রাচীন, ঐ ঘটনা মধ্যে যে উদ্দেশ্য ও ভাব-ব্যঞ্জনা আছে, তাহাও আসৃষ্টি প্রাচীন হইলেও, আজ যেন অভিনব সুন্দর। তাই পিতা পুত্রকে বুকে করিয়া, ভ্রাতা ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করিয়া, যেন এক অনন্ত ও অপরিসীম প্রেমের ইঙ্গিত মাত্র পাইয়া, স্ব স্ব ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র-বুদ্ধিকে

এক মহান্ আনন্দের অকূল পাথারে ভাসাইয়া দিতেছে। এই মহান্ "সংগ্রহের" ভাবই বায়ুতত্ত্ব; তাই বুঝি, সমীরণ চেতন ও অচেতন উভয় জগৎকে এক অপরূপ স্রোতে ব্যক্ত-বিশ্বের অগ্রে লইয়া যাইতেছে। মেঘ-মুক্ত শরতের বালার্ক, আজি কি আনন্দে আত্মহারা হইয়া জগৎকে উদ্ভাসিত করিতেছে। কি এক বিশ্বব্যাপী প্রসাদ, সবিতা ও তাঁহার বরণীয় ভর্গতে উছলিয়া পড়িতেছে। তাই আজ দৃষ্টি-শক্তি কি যেন এক নূতন প্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া, তাহার ভোগ্য বিষয় সকলের মধ্যে কি এক নব ভাব দেখিয়া তৎপ্রতি ধাবিত হইতেছে। আর ওই শ্যামাঙ্গিনী প্রকৃতি বক্ষে শ্রীভগবানের মূর্ত্তি অঙ্কিত করিবার জন্য আত্মগত অভিনব কারু-কুশলতার পরিচায়ক পশুপক্ষী সকলের রূপ-বৈচিত্রে, মোহ-বিমূঢ় নরনারীর রূপলাবণ্যে, ও সুসজ্জিত নগর ও জনপদের পারিপাট্যে, কি এক বিশ্বব্যাপী সমরস, কি এক অসামান্য আনন্দ-রসের তৃষ্ণাতে, জীবকুলকে আকুল করিয়া তুলিয়াছে। যেন রূপ-সাগর উন্মথিত হইয়া এই বিশ্বকে নিত্য-নূতন, বিচিত্র-সুন্দর শোভার আস্পদ করিয়া তুলিয়াছে।

হে সলিল, তোমার অধিষ্ঠাত্রী দেবতাও কি এই বিশ্বব্যাপী আনন্দে আত্মহারা হইলেন? তাহা না হইলে, কেন নদনদী সকল এই নূতন আনন্দ-রসে আপ্লুত? আসমুদ্র সমগ্র রস-জগৎ, নব আনন্দে উদ্বেলিত? তাই যেন, আজ তৃষ্ণার নূতন নূতন তরঙ্গ, নূতন নূতন ভোগের সৃষ্টি করিয়া ইন্দ্রিয় ও মনকে কোথায় কাহার দিকে প্রধাবিত করিতেছে।

মা ধরণি! তুমি মা আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। তুমি ত সর্ব্ব-তত্ত্বের অংশ হইতে উৎপন্ন, ও সকলের আধার ও প্রকাশ-স্থান। তোমাতে আকাশের শব্দ, বায়ুর স্পর্শ, অগ্নির রূপ ও সলিলের রস, সকলই আছে। বল, দেবি! কিন্তু আজি কি অভিনব নূতন তরঙ্গ, কি সাম্য-রসের সৃষ্টি করিয়া সমগ্র জগৎকে এক সূত্রে গাঁথিয়া, আনন্দে ও আনন্দ-চেষ্টায় এত অভিভূত করিয়া তুলিয়াছ? জনপদ, নগর, পর্ব্বত, প্রান্তর, কুটীর, অট্টালিকা সকলই কেন এত হাস্যময়ী? কি ভাবে এই পাঞ্চভৌতিক দেহ এত উৎফুল্ল? কি বায়ু, কি আকাশ, কি রূপ, কি রস, সকলেই চতুর্দ্দিক্ পরিব্যাপ্ত করিয়া, কেন, কি আনন্দ সমাচার ঘোষণা করিতেছে? বল দেবি, এই আনন্দের অনন্ত-উৎস কোথায় হইতে উদ্ভূত;—যে আনন্দ বস্তু-সম্পর্কে সম্পর্কিত না হইয়া, ইন্দ্রিয়

বৃত্তির দ্বারা সীমাবদ্ধ না হইয়া, কোন বিশিষ্ট ভাবের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন না হইয়া স্বয়ং-জ্যোতি স্বপ্রকাশ স্বরূপে আজ বিরাজমান ?

শারদীয়া প্রকৃতির এই ভুবন-ভুলানো অভিনব ভাব, বাহ্য-প্রকৃতি হইতে ইন্দ্রিয়ে, ইন্দ্রিয় হইতে মনে, মন হইতে বুদ্ধি ও আত্মাতে এবং পুনরায় বাহিরে আসিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়ে স্বতঃই যে স্ফুরিত হইতেছে। চন্দ্রমার প্রেম-আকর্ষণ যেমন বারিধিকে নিজ বক্ষের দিকে তুলিতে থাকে, এবং সাগরের হৃদয়-বৃত্তিগুলিকে লালসা-ক্ষুব্ধ ও উদ্বেলিত করিয়া আপনার সুদূরস্থ নির্ম্মল ভাবের দিকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া লইয়া যায়, তেমনই আজ কে যেন অদৃশ্য থাকিয়া এই সমগ্র তত্ত্বরাজি, দেবতা পশু ও মানবমণ্ডলীকে কি এক প্রেমে আকর্ষিত করিয়া, সমগ্র বিশ্বকে উদ্বেলিত করিয়া অদ্ভুত কি এক অভিনব প্রবৃত্তি-রূপে প্রবাহিত করিতেছে। সমুদ্র তাহার প্রেমের দেবতাকে দেখিতে পায়, জ্যোৎস্নার প্রেম-সম্মিলনে সম্মিলিত হইয়া আবার ফিরিয়া আসে। কিন্তু আমরা ত আমাদের প্রাণের দেবতাকে দেখিতে পাই না, অথচ আবার ফিরিতে পারি নাই,—কেবল তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া, এবং অনেক সময় তাঁহার প্রেম-আকর্ষণে আকর্ষিত হইয়াও তাঁহার দিকে ছুটিতে গিয়া, বিপরীত অবস্থা প্রাপ্ত হই। এই বিশ্বখানিকে, এত সুন্দর, এত মনোরম দেখিয়াও প্রাণের দেবতাকে—সেই অনন্ত-সুন্দর নিত্য নূতন দেবতাকে বুঝিতে পারি না,—সেই সর্ব্ব-সৌন্দর্য্যের অনন্ত ভাণ্ডারকে দেখিতে পাই না। বুঝিতে পারি না, কেন এত আকর্ষণ; গভীর বিষাদের মধ্যেও কেন সুদূর-শ্রুত অস্পষ্ট নিশীথ-সঙ্গীতের ইঙ্গিতের ন্যায়, কি এক সুখের আশা, কোথা হইতে আসিয়া হৃদয়কে কেন এত মোহিত করিয়া ফেলিয়া দেয়।

হৃদয়, ওই শুন তোমার প্রশ্নের অভ্রান্ত উত্তর, আজি হিন্দুর গৃহে গৃহে ধ্বনিত হইতেছে। গৃহে গৃহে, মঙ্গল-বাদ্য গগণমণ্ডল ভেদ করিয়া আনন্দময়ী মায়ের আহ্বান সূচক অনন্ত-মধুর জয়ধ্বনি শব্দে মিলিত হইয়া উত্থিত হইতেছে। তাই বুঝি আজি বিশ্ব হাস্যময়। তাই বুঝি, আজি আকাশ হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত অভিনব প্রসন্নতায় পরিপূর্ণ। আকাশের যিনি আকাশত্ব, বায়ুর যিনি বায়ুত্ব, অগ্নির যিনি অগ্নিত্ব ও পৃথিবীর পৃথিবীত্ব; প্রাণের যিনি প্রাণ, হৃদয়ের যিনি হৃদয়, চেতনায় যিনি চৈতন্য, আনন্দময় ভাবে যিনি আনন্দ, প্রত্যেক জীবে যিনি

একমাত্র অস্তিত্ব, ক্রিয়াতে যিনি একমাত্র শক্তি, প্রত্যেক কাবকেব যিনি এক-মাত্র মূল-কাবক, সেই আনন্দময়ী মা আজি বিশ্বকে তাঁহাব প্রেমের আকর্ষণে আকর্ষিত কবিয়াছেন,—হৃদয়েব সন্নিহিত হইয়া, বিশ্বেব সন্নিহিত হইয়া অভিনব প্রেমেব তবঙ্গ জাগাইয়া তুলিয়াছেন। তিনি চিবকালই সন্নিহিত,—অতি সন্নিহিত অতি স্থিব ও অতি প্রশান্ত। কিন্তু আমবা যে অজ্ঞ, তাই দয়াময়ী ম. সন্তান-গণেব ধূলা-খেলায়, কাম ও অভিসন্ধিপূণ জীবনেব মধ্যে খেলাব ব্যপদেশে, মাযা স্বীকাব কবিয়া সন্তানগণেব সহিত খেলিতে খেলিতে, সন্তানগণকে ক্রোড়ে কবিয়া তাহাদেব কাম-বাসনাব মধ্যে তাঁহার অমৃতময়ী কামাতীত প্রেমেব ভাষাব সঞ্চাব কবেন। আমাদেব পূজাও ত ছেলে-খেলা! আত্মতৃপ্তি ইহাব যে মূল-কাবণ, বাসনাই ত ইহাব প্রেবক! কিন্তু আনন্দময়ী এই খেলাব পূজাও সার্থক কবেন। "ধনং দেহি পুত্রং দেহি"-রূপ তৃষ্ণার্ত্ত আহ্বানেব মধ্যেও কোথায় বা শান্তিরূপে, কোথায় বা জ্ঞানরূপে, কোথায় বা নিবাশাব অন্ধতমেব মধ্য দিযা জীবেব অতীত, ব্রহ্মেব ছায়া বা স্বরূপেব আভাষ ইঙ্গিত কবেন। কাহাবও নিবাশাব কাবণ নাই, কেননা আনন্দময়ী নিজে আমাদেব ক্ষুদ্র তৃষ্ণা ও আনন্দেব মধ্যে কি এক ভূমা ভাবেব সঙ্কেত কবিতেছেন। শিশুসন্তানগণেব খেলায় তৎপবা হইয়া মা, কাম-অভিসন্ধিব মধ্যেও খেলিতেছেন। কোন সন্তান ধূলা খেলাব মধ্যে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া যদি একবাবও তাঁহার দিকে ধাবমান হয, তখনই তাহাকে কোলে কবিয়া সর্ব্বশাস্ত্রেব সাবভূত অমৃতরূপ ভগবানে বতি-রূপ স্তন-দুগ্ধে তাহাকে তৃপ্ত কবেন। জীব একক্ষণেব জন্যও সংসাবেব ও দ্রব্যযজ্ঞেব ছেলেখেলা ছাড়িয়া সদা হৃদ্দেশে অবস্থিতা চৈতন্যরূপিণীব ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ কবিলে, তাহাব হৃদয়ে কি এক আনন্দ-ঘন মহাভাব পবিস্ফুট হয়, এবং নব প্রাণে প্রাণিত ও নূতন উৎসাহে উৎসাহিত কবিয়া তাহাকে শাশ্বত শান্ত মহান্ আত্মাতে উপনীত কবে। তাই আজ প্রতি অণু পবমাণু হইতে বৃহৎ হইতে বৃহত্তব যাহা কিছু আছে, তাহা সকলই আকর্ষণে আনন্দিত হইয়া মুহূর্ত্তেব জন্যও বাহ্যভাব অতিক্রম কবিয়া, কি এক আনন্দ-স্রোতে কোন্ গন্তব্যেব দিকে, ওই দেখ, প্রবাহিত হইতেছে।

এই যে অনন্ত কোটী নবনাবী বাসনাব অনন্ত তবঙ্গে মাতোয়াবা হইয়া, সেই লীলাময়ী মাতাব ধর্ম্মার্থকামমোক্ষদায়িনী আকর্ষণে আত্মহাবা হইয়া,

বিবশ-ভাবে ভাসিয়া যাইতেছে, ইহার মধ্যে তুমিই ত আছ মা! এই বাসনা-তরঙ্গের অবশ্যম্ভাবী সুখ-দুঃখের ও বিষাদের যে মৃদু-মন্দধ্বনি তরঙ্গে তরঙ্গে মনুষ্যকণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে তাহাও ত গৌণভাবে আনন্দ-মূলক? কেন না তাহাদের এই বাসনার মধ্যে, ঐ দুয়ের অন্তরালে একটা গতি আছে, একটা গন্তব্যের প্রতি লক্ষ্য আছে। বিশিষ্ট বস্তু লাভের চেষ্টাতে বিফল-মনোরথ মানব, তোমারই আকর্ষণে নব নব আয়োজন করে;—তাহার প্রাণে নূতন আশার সঞ্চার হয়। কিন্তু যে পথহারা,—যে এই বিস্তৃত ভূমণ্ডলে লক্ষ্যহারা,—যাহার একটা গন্তব্য স্থানের নির্দ্দিষ্টতা নাই, যে বায়ুবক্ষে ক্ষুদ্র বেণু-কণার ন্যায় ভাসিয়া যাইতেছে, তাহার দুঃখই বা কি,—সুখই বা কি? সুখও নাই, দুঃখও নাই। তবে কি আছে,—সে'ত তাহাও জানেনা;—যে স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে তাহাও যে তুমি, সে ত তাহা বুঝে না। শুনিয়াছি লক্ষ্যহারা হইলে, অভিসন্ধান শূন্য হইলে, তুমি নাকি আবির্ভূতা হইয়া মানব চিত্তের প্রেরণা কর। কিন্তু সে ত তা' বুঝে না। সুখ দুঃখ না রাখ, ক্ষতি নাই—যদি তোমাকে অবলম্বন করিতে পারি। তাও ত পারি না।

মা আনন্দময়ি, যেমন বসন্তের সমাগমে মুখরিত তরুরাজি মধুপ-ঝঙ্কারে বসন্তের আরাধনা করে, তেমনই উৎফুল্ল নরনারী কামনার শত শত প্রস্ফুটিত প্রসূন হৃদয়ে সাজাইয়া প্রতি বৎসর তৃষ্ণা ও কামের মধ্যে ইঙ্গিতরূপে প্রকটিত তৃষ্ণারাবিণী তোমারই আরাধনা করে। কিন্তু মা, মা হইয়া অবোধ সন্তান-গণকে নিতান্ত শিশু বলিয়া, বৎসর বৎসর ছলনা করিয়া যাও কেন? সেই বাসনার ফুলগুলি তোমার চরণ সরোজে স্থান পায় কৈ মা? তোমার আশীর্ব্বাদে শত সহস্র গুণে বর্দ্ধিত হইয়া, তেমনই হৃদয়-বৃন্তে ঝরিয়া যায়,—তোমার শ্রীচরণে কৈ মা অর্পিত হয় না কেন? সকলই 'আমার আমার' বলিয়া হৃদয়-মূলে বদ্ধ করিয়াছি,—প্রদান করিবার সময় হইতে পর পর্য্যন্তও 'আমার' বলিয়া জ্ঞান অক্ষুণ্ণ থাকে। সুতরাং যাহা ঐ পাদপদ্মে অর্পণ করি, তাহাও ত তোমার হয় না। মা, তোমাকে প্রদান করিতে গেলে যে কামকে আমূল উৎপাটন করিতে হয়—মর্ম্মস্থল উৎপাটন করিতে হয়। তবে যদি এতকাল যাহাকে 'আমি' বলিয়া আসিয়াছি, তাহাকে তোমার বলিয়া ওই রাঙ্গা পায় সমর্পণ করিতে পারি, মা চামুণ্ডে! সেই জ্ঞান দাও। মা,—মর্ম্মস্থল উৎপাটন কর। মা,—তুমি না করিলে কে

করিবে, মা? কিন্তু মা, ছেলের মোহ-প্রসূত দুঃখ ভাবিয়া তাহাকে মোহের খেলায় খেলিতে দিয়া গেলে, তাহার মর্ম্মস্থলে হাত দিলে না। তবে এই বিশ্বে প্রকট হইয়া সন্তানের কি উপকার করিয়া গেলে মা?—মিথ্যার দুফোঁটা আঁখি জল! সে'ত তাহার পক্ষে সত্য? তাই তুমি তাহার হৃদয়ে প্রকট হইয়া ঐ মোহের অশ্রুও গ্রহণ করিলে, আর তৎপরিবর্ত্তে হৃদয়ে একটু শান্তি ঢালিয়া দিলে। মা! আমরা আমার বলিতে জানি; কিন্তু তোমার বলিয়া,—তোমারই ভাবিয়া, তোমায় দিতে যে কখনই শিখি নাই। তাই ভাবি, মাগো, আঁখি-জল মুছাইলে কৈ? মর্ম্মস্থল উৎপাটন করিয়া আঁখি জল নিবারণ করিলে কৈ? তাইত মা এই সুখের দিনে কাঁদিয়া মরি! পূজার উপকরণ পাই না,—মন্ত্র খুঁজিয়া পাই না,—পথ হারাইয়া, কূল হারাইয়া বসিয়া থাকি। আমায় পথ ধরাইয়া দাও মা। মা বীর-প্রসবিনী কুন্তী দেবী কুরুক্ষেত্রের সমরাবসানে অসীম দুঃখ-ভোগের পর যখন সুখ ও ঐশ্বর্য্যের আশা মাত্র পাণ্ডবদিগের অদৃষ্ট-গগনে দেখা দিয়াছিল,—তখন যেমন শ্রীমাধবের নিকট নিরন্তর বিপদ্ ও দুঃখের কামনা করিয়াছিলেন,—তেমনি যদি দয়া করিয়া দুঃখের ভিতর প্রকটিত তোমার মোক্ষদায়িনী ভাবটী প্রকাশ কর, তবে হয়ত আমাদের জীবনের গতি, ফিরিলেও ফিরিতে পারে;—এই অন্ধকারের মধ্যে আমরা পথ খুঁজিয়া পাইলেও পাইতে পারি।

পথই বা হারাই কেন, মা? এই ব্রহ্মাণ্ড-ময়ত তোমারই পথ পড়িয়া রহিয়াছে। সামান্য ধূলি-কণা হইতে এই অসীম আকাশ-মণ্ডল পর্য্যন্ত যাহা কিছু ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, তাহা তোমারইত ব্যঞ্জনা করিতেছে। তাহারা তোমারই অভিব্যক্তিতে অভিব্যক্ত, তোমারই সৌন্দর্য্যে সুন্দর। এই বিশ্ব প্রপঞ্চের অনন্ত-কোটী বিষয়, অনন্ত অঙ্গুলি নির্দ্দেশে, তোমাতে যাইবার অনন্ত-কোটী পথ দেখাইয়া দিতেছে। কিন্তু যতদিন প্রকৃত ধারণা হয় না, ততদিন এই বৈচিত্র দেখিয়া মন ত সহজেই বাহ্য-ভাবে, ব্যক্ত-ভাবে মোহিত ও ভ্রান্ত হইয়া পড়ে। তাই মা, বিষয়ের মধ্যে তোমায় না দেখিতে পাইয়া, মিথ্যার মোহগর্ত্তে পতিত হইয়া, পথ হারাইয়া ঘুরিয়া বেড়াই। ভ্রমর যেমন পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে বৃথায় ঘুরিয়া বেড়ায়, মধু আহরণ করিতে পারে না, তেমনই মা, বৃথায় বিষয়-পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইলাম; কিন্তু মধু ত আহরণ করিতে পারিলাম না।

আমরা যে মধু বিষয় হইতে পান করি, তাহা 'ত' ভোগ্য নহে, উহা সদ্যঃপ্রাণহর গরল। কিন্তু তুমি 'ত' মা সুধা-রূপে, বিষয়-মধ্যে সতত বর্ত্তমান। মা! মধু-বিলাসিনী, কবে বিষয় হইতে মধু আহরণ করিয়া, এই বিষয়সুখ তোমায় অর্পণ করিতে পারিব? কবে বিষয়-কুসুমে ঘুরিয়া, তোমার 'একরস' মধু সংগ্রহ করিয়া শ্রীরাঙ্গাচরণে অর্পণ করিব?

শুনিয়াছি এ-জগতে 'গুরু' বলিয়া এক দুর্লভ শক্তি বা তত্ত্ব আছেন;— তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তোমার পথ পাওয়া যায়। সাধুগণ তাঁহাকে 'ব্রহ্মানন্দং পরম-সুখদং' ইত্যাদি স্তবে প্রণাম করেন। কিন্তু মা আমিত' কৈ কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। আবার কেহ বলেন, 'অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং, তৎপদং দর্শিতং যেন'—তিনিই গুরু। মা, একথা যে অনেক বড়। এ অখণ্ড সত্ত্বার ত কিছু বুঝিতে পারিলাম না। শুনিলাম "অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া, চক্ষুরুন্মীলিতং যেন" এ শুনিয়া কতকটা সাহস হইল। জগতে এমন কে আছেন,—এমন দয়াময় পুরুষ বা এমন দয়াময়ী শক্তি কে আছেন, যিনি অজ্ঞানীকে জ্ঞান দিতে পারেন, পাতকীকে উদ্ধার করিতে পারেন? পথহারা আবার পথ খুঁজিয়া পাইতে পারে, দিশে-হারা আবার দিক্-নির্ণয় করিয়া লক্ষ্য বুঝিতে পারে, আত্মহারা আপন আত্ম-তত্ত্ব বুঝিতে পারে। জীব আত্মতত্ত্ব বুঝিয়া, বিদ্যাতত্ত্ব বুঝিয়া, শিবতত্ত্ব বুঝিয়া, তোমার সহিত মিলিত হইয়া, তোমায় সুধা অর্পণ করিতে পারে। মা, আমি যে সুধা আহরণ করিতে আসিয়াছিলাম। মা! এখন যাহা আহরণ করিলাম এ যে সব গরল,—আত্মেন্দ্রিয়ের প্রীতিরূপ সদ্যঃপ্রাণ-হর বিষ! হায়, আমায় কে পথ দেখাইয়া দিবে মা! বিষে জর্জ্জরিত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াই; এখন, এ পাতকীকে পথ কেমন করিয়া দেখাইয়া দিবে মা! এমন দয়াময় কে আছেন যে আমার এই হত-চৈতন্য হৃত-জ্ঞান 'আমিকে' কোলে করিয়া তুলিয়া, মা, তোমার শান্তিময় কোলে শোয়াইয়া দিবে।

ওই মা, শারদীয়া শুভ-সপ্তমীর মঙ্গলবাদ্য বাজিয়া উঠিল। কেন ওই মঙ্গল-ধ্বনিতে হৃদয় তালে তালে নাচিয়া উঠিল? কেন, ওই মঙ্গলবাদ্য মা? কা'র মঙ্গল? ও—তোমার মঙ্গল, না আমার মঙ্গল? তোমার মঙ্গল হইতে পারে না,—যিনি একই মুহূর্ত্তে ব্যাঘ্র ও ব্যাঘ্র-কবলিত হরিণীকে তুল্য-স্নেহে

সমভাবে দেখিতে পাবেন, তাঁহার কি মঙ্গলামঙ্গল হইতে পারে? যাঁহার সম্মুখে ধর্ম্ম, পৃষ্ঠে অধর্ম্ম; যাঁহার এক হস্তে পদ্ম, ও অন্য হস্তে নবকপাল; যাঁহার এক হস্তে করালদর্শন খড়্গ, ও অন্য হস্তে অভয়; তাঁহার,—সেই বৈষ্ণবীশক্তির, কি মঙ্গল হইতে পারে? কোটী কোটী বিশ্ব লয় হইলে, যাঁহার অস্তিত্বের ও স্বভাবের কোন পরিণাম বা পরিবর্ত্তন হয় না, কোটী বিশ্ব সৃষ্টি করিলেও যাঁহার অদ্বিতীয়-সত্বার কোন বৈলক্ষণ্য হয় না, তাঁহার আবার কি মঙ্গল হইতে পারে? মহাশ্মশানে দেহাত্ম-বুদ্ধিকে পদতলে চূর্ণীকৃত করিয়া করাল অসি লইয়া, অবিভাজ্য কালকেও তোমার বশবর্ত্তী করিয়াছ,—তোমার আবার মঙ্গল বা অমঙ্গল কি? সংসারের যাবতীয় অমঙ্গল ও অশুভ, সকলই যে তোমার অঙ্গের ভূষণ। না, না, বোধ হয়, সন্তানগণের মঙ্গল কামনা করিয়া, সন্তানগণের "আপদ্ বালাই" তোমার অঙ্গের ভূষণ করিয়াছ। তবে কি আমার মঙ্গল? মা, যে দিন হইতে তুমি তোমার কোল হইতে এত-টুকু স্ফুলিঙ্গ-মাত্র অহংজ্ঞান দিয়া সন্তানকে বিযুক্ত করিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিলে, সেই অশুভ মুহূর্ত্ত হইতে তুমি ও আমি পৃথক্ হইয়াছি। সেই দিন হইতেই, এই দেহে আপনাকে অনুভব করিয়া দেহ হইতে পৃথক্ বস্তুতে, আমি হইতে পৃথক্ বস্তুতে, "বিজাতীয়" বোধে পার্থক্য অনুভব করিতে শিখিয়াছি, তখন মঙ্গল কোথায়? আবার জীবনের একমাত্র ভরসা স্থল, একমাত্র অবলম্বন, সন্ধি-রূপে-স্থিত তোমাকে, সন্ধ্যা-বন্দনার সময় 'সোঽহং' এই শাস্ত্রবাক্যের মিথ্যা অর্থ—'আমাকেই' অবলম্বন করিয়া, কল্পনার "স্বগত" বোধে, তোমা হইতে আমাকে নিরন্তর পৃথক্ করিতে শিখিয়াছি, আমার আবার মঙ্গল কি মা? আমার সুখ হইতে দুঃখ পৃথক্, ধর্ম্ম হইতে অধর্ম্ম পৃথক্, বস্তু হইতে দৃষ্টি পৃথক্, দৃষ্টি হইতে মন পৃথক্, মন হইতে বুদ্ধি পৃথক্, বুদ্ধি হইতে স্মৃতি পৃথক্, স্মৃতি হইতে 'আমি' পৃথক্, 'আমি' হইতে 'তুমি' পৃথক্,—তবে আবার মঙ্গল কি মা? আচ্ছা, এই ভেদজ্ঞানটীর আরও একটু বৃদ্ধি হউক না কেন? "আমাতে" আর "আমাকে" যখন ভাল বুঝিতে পারি না, তখন আমাতে এ বিষয়-বুদ্ধি আসিয়া তরঙ্গে তরঙ্গে আমার সহিত কেন এক হইয়া মিলাইয়া যায়? দেহ থাক্, চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি থাক্, রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ, থাক্; জ্ঞান, বুদ্ধি, মন, অহঙ্কার থাক্; বিভিন্ন হইয়া থাক্। আমার সহিত তাহাদের সম্বন্ধ স্থাপিত হয় কেন? এ চক্রান্ত কার? এই সম্বন্ধ, জগন্ময়ে!

সর্ব্বাত্মিকে। এ ত' তোমারই চক্রান্ত মা। অসুরগণের রুধির পান করিয়া কি তোমার তৃষ্ণার শান্তি হয় না, মা! তাই সন্তানগণের দুর্দ্দশা দেখিয়া তোমার নিষ্ঠুর অন্তঃকরণের নিষ্ঠুর ক্রীড়া-কৌতুক চরিতার্থ করিতেছ মা, হয় পূর্ণ 'ভেদ-জ্ঞান' দাও, না হয়, পূর্ণ 'অভেদ-জ্ঞান' দাও; যেথা হইতে আসিয়াছিলাম, সেথায় চলিয়া যাই। যখন তুমি কোলে করিবে না, সন্তান বলিয়া স্নেহ-বক্ষে ধারণ করিবে না, তখন এই ভেদাভেদজ্ঞান লইয়া উভয় সঙ্কটে থাকা অপেক্ষা, পথহারা—দিশেহারা হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাঙ্গালের মত—অন্ধের মত—দিন-যাপন অপেক্ষা,—একেবারে বিলীন হওয়া সহস্র-গুণে শ্রেয়।

যখন 'বিশ্ব' একার্ণব ছিল, যখন 'সব' ছিল না, যখন মহাবিষ্ণু যোগনিদ্রায় 'স্বগত' ভাবে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তখন'ত' বেশ ছিল, মা। তখন আমরা সকলেই সুধু 'আমি'-অংশে—সুধু 'আমি'-ভাবে,—পরম 'আমিতে'—পরমাত্মাতে, মিশিয়া ছিলাম। তখন সেই 'আমি'ও সুষুপ্ত। কাজেই 'সব' আমিই সুষুপ্ত ছিল। তবে তোমাতে সৃষ্টির সংকল্প উদয় হইল কেন? কেন মা, তোমাতে এই ক্রীড়া-কৌতুক উপস্থিত হইল। তোমার 'ত' ঐ ক্রীড়া, আমাদের যে মরণ। কেন মা, সেই এক 'আমিকে' স্ফুলিঙ্গ-রূপে বিকীর্ণ করিলে; কেন জলার্ক-বৎ জীবরূপে প্রতিভাত করিলে? কেন আবার তুমি বিষয়-ভাব হইতে বিলক্ষণ প্রবৃত্তি, সেই ক্ষুদ্র 'আমি' গুলির ভিতর সঞ্চারিত করিলে? কেন মা, ব্রহ্মার চিত্তে স্মৃতি-রূপে ভেদবুদ্ধি জাগাইয়া দিলে? এই বুদ্ধির জন্যই 'ত' বিষ্ণুকর্ণোদ্ভূত 'মল' নির্ভিন্ন হইয়া, বিকট দৈত্যদ্বয় উৎপন্ন হইল। সেই দৈত্য 'মধু'-তৃষ্ণায়—রসাস্বাদন আগ্রহে—নিরতিশয় স্পৃহায় পরবশ হইয়া, তোমারই নিকট মধু ভিক্ষা করিল। সেই দৈত্য মূর্ত্তিমান্ স্পৃহা ও ভোগ-সুখানুসন্ধান রূপে বিচরণ করিতে লাগিল। 'কীটের' ন্যায় সূক্ষ্ম, ও ক্ষুদ্র বিশিষ্ট বিকাশে বা বদ্ধভাবে পরিপুষ্ট, কৈটভ নামে আর এক দৈত্য, অপর কর্ণ হইতে নির্ভিন্ন হইল। সেই—'কৈতব'-গুণসম্পন্ন দৈত্য কৈটভ, তৃষিত 'মধু'-দৈত্যের সঙ্গে মিলিত হইয়া সেই শুদ্ধ-সত্ত্বময়, ও যোগনিদ্রায় পরম-তত্ত্বে অবস্থিত, পরম-পুরুষ হইতে বিযুক্ত হইলেও—সেই বিষ্ণু-শরীরেই অব্যাকৃত জগৎ-ভাবের মধ্যে, বিষ্ণু-অনুসন্ধান-তৎপর হইয়া বিচরণ করিতে লাগিল। সৃষ্টি-সঙ্কল্পে ভগবান্ পদ্মযোনি বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়া, সেই অসুরদ্বয়কে তদ-

বন্যায় বিচরণ করিতে দেখিয়া ভীত হইয়া, মা যোগনিদ্রে, তোমারই স্তব করিতে লাগিলেন। সেই বৈরাজ-পুরুষ তখনও নিদ্রিত,—পরম-ভাবে স্থিত, এবং আনন্দ-রসে সেই সত্ত্বগুণময় শুদ্ধ পুরুষ পরিপূর্ণ, ও সৃষ্টি-বিষয়ে নিশ্চেষ্ট। দৈত্যদ্বয়, তখন ব্রহ্মাকে হননোদ্যত হইল। কেন মা যোগনিদ্রে! তুমি বিষ্ণুর চৈতন্যকে নামাইয়া আনিয়া সৃষ্টি-সঙ্কল্প-স্থিত ব্রহ্মার প্রাণরক্ষা করিলে? কেন বীজরূপী 'সর্ব্ব' ভাবের মধ্যে, 'বহুত্বের' প্রবৃত্তি প্রকাশ করিলে? জীবকে স্থির ও দৃঢ় করিবে বলিয়া?—পৃথিবীকে সৃষ্টির উপযুক্ত করিবে বলিয়া? সৃষ্টিতে তোমার প্রয়োজন কি, মা? নৃত্য করিবে বলিয়া?—শ্মশানে শ্মশানে নৃত্য করিবে বলিয়া? ইহাই যদি তোমার প্রিয়, মা, তবে প্রতি-মুহূর্ত্তে লক্ষ লক্ষ সন্তানকে চিতা-শয্যায় শায়িত করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে তুমি লক্ষ লক্ষ জ্বলন্ত চিতার পার্শ্বে নৃত্য করিয়া, বিকট হাসি হাসিয়া বেড়াও, তাহাতেও কি তৃপ্তি হয় না মা? বুঝিয়াছি, যে দিন সন্তানগণকে অহং-বুদ্ধির কণা মাত্র দিয়া, এই মধুকৈটভের মেদ হইতে সন্তানগণের দেহ গঠন করিয়া অবনী-তলে পাঠাইয়া দিলে,—মা! সেই দিনই হইতে তুমি সন্তানের দুঃখ দেখিয়া উন্মাদিনী হইয়াছ। তাই অনাবৃত-বক্ষ হইয়া, সন্তানগণের আকর্ষণ জন্য উন্মুক্ত-বক্ষ হইয়া, সন্তান-বিরহ-সন্তাপ জুড়াইবার জন্য ভেদ-বুদ্ধির মহাশ্মশানে দগ্ধ-প্রায় অহংকারের চিতায় উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য কর।

মা শ্মশানবাসিনি! ইহাতে কি সন্তানগণের দুঃখ দূর হইবে? তা'দের জীবন্ত দেহে জ্বলন্ত-দহন নিবৃত্ত হইবে মা? বিদ্যা হারা হইয়া সন্তানের যে অনন্ত যাতনা, তাহার শান্তি কি হইবে মা? অসুর বধ করিতে পার, সামান্য অঙ্গুলি-চালনে সৃষ্টি ও প্রলয় করিতে পার, আর পাতকীকে উদ্ধার করিতে পার না মা? বল, কেন সেই অশুভক্ষণে, সৃষ্টি-কামনায় মধুকৈটভের মেদ হইতে মেদিনীকে সৃষ্টি করিয়া, সেই উপাদানে সন্তানগণের দেহ গঠন করিলে মা? সেই তৃষ্ণার্ত্ত অসুরের তৃষ্ণা দিয়া, সুখানুসন্ধানে তৎপর করিয়া, সন্তানগণকে বহির্ম্মুখী করিয়া সৃষ্টি করিলে, মা? কৈটভের সহায়তায় আবার সেই রস-স্পৃহা দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতেছে,—যত দিন গত হয় মা, ততই দৃঢ় হইতেছে। মা গো, তাহার ভোগ-বাসনা কিছুতেই অন্তর্ম্মুখী হইতে চায় না,—তৃষ্ণার্ত্ত মনের বিষয়াভিমুখী গতি কিছুতেই ত' প্রত্যাবৃত্ত হইতে চায় না। মা, মধু-

কৈটভ নিধন প্রাপ্ত হইল কৈ? তখন তাহারা দুইটী শরীরে মাত্র আবদ্ধ ছিল; এখন মা তাহারা সমুদয় মর্ত্ত্যলোক ও জীবকে আশ্রয় করিয়া অশরীরিভাবে বিরাজ করিতেছে। তাহারা এখন 'অনন্ত' ভাবে বিভক্ত হইয়া, অতৃপ্ত ও অদৃপ্ত বাসনা লইয়া, সেই সকল দেহে স্বীয় বাসনা চরিতার্থ করিতেছে। সমস্ত তত্ত্বগণ দূষিত হইয়াছে; ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি পর্য্যন্ত ছাইয়া ফেলিয়াছে। তাই কি আকাশ, কি বায়ু, কি সূর্য্য, কি সলিল, কি পৃথিবী, সমস্ত চরাচর বিশ্বে মধু-তৃপ্তি প্রবল। তাই মানব বহির্মুখী-বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া, - তৃষ্ণা ও রসানুসন্ধানে তৎপর হইয়া, মাতৃচরণ পরিত্যাগ করিয়া, এক অপরিবর্ত্তনীয় অভিনিবেশে বিষয়-ভোগ-লালসা চরিতার্থে তৃষ্ণায় ধাবিত হইয়াছে। এই বৃত্তি জড় পদার্থেও আছে; তাই তাহাদের স্থিতিশীলতা ও চৈতন্যের বিরুদ্ধভাব। না, মা, বুঝিয়াছি,—ওই অপরিমেয় তৃষ্ণাদ্বারাই তুমি আমাদের পরিপূর্ণতা ও ব্রহ্মস্বরূপে পরিসমাপ্তি করিতেছ, বিষয় মধুর ভিতর দিয়া ব্রহ্মরূপ মধুর রসজ্ঞান শিখাইতেছ। "মধুমেতু মাম্" "ব্রহ্মমেব মধুমেতু মাম্"। ওই মধু সর্ব্বত্রই বিরাজিত। "মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্ণঃ সন্তোষধীঃ মধুনক্ত মুতোষসি। মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধুদ্যৌরস্তু নঃ পিতা। মধুমান্নোবনস্পতির্মধু মা অস্তু সূর্য্যঃ,—" সমস্তেই এই মধু ক্ষরিত হইতেছে। সেই জন্যই বুঝি মধুর-মেদে সৃষ্টি করিলে। আকুল পিপাসায় বিশ্ব-কবলিত করিয়া যখন অতৃপ্ত-হৃদয়ে ফিরিব, তখন দেখিব যে এই তৃষ্ণাতে কেন্দ্ররূপ কি এক ভাব আছে। দেখিব, বিশ্বের উপবেষ্টিত শান্ত, স্থির, 'সর্ব্ব'তৃষ্ণার পরিসমাপ্তিরূপ আমার এক 'আমি' আছে। তোমার প্রবৃত্তিকে ছোট করিয়া দেখি বলিয়াই, তৃষ্ণারূপিণি মা, বিষয়ের খোলস লইয়া খেলা করি। তুমি মা, স্বরূপে প্রতিষ্ঠিতা হইলে, তোমার সর্ব্বাত্মিকা প্রবৃত্তি উপরত হইলেই,—ওই তৃষ্ণা, ওই অনুসন্ধানশক্তি আমাদিগকে মধু-ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত করিবে। বস্তু-বোধ ত্যাগ করিয়া, যাহাতে বস্তুর গতি ও লয়াদি লক্ষ্য করিতে পারি, একবার সেই তৃষ্ণারূপে, এস, আমাদের হৃদয়ে খেল মা,—একবার সেই ভাবে আমাদের বুদ্ধিকে প্রেরণা কর;—খেলার নিবৃত্তি কর। জীবন সার্থক হউক; সৃষ্টি জয়যুক্ত হউক; শ্রীভগবানের মহিমা ও ভগবানে রতি প্রতি হৃদয়ে ফুটিয়া উঠুক; তুমি মা অমৃতের সেতু। জ্ঞানময়ি, আনন্দময়ি, সদাশিবান্বিতা, নিজ পূজার সার্থকতা কর।

জীবের বাহ্য-খেলা ভাঙ্গিয়া দিয়া, মিথ্যাভূত জগৎজ্ঞান দূর করিয়া, প্রীতি হৃদয়ে 'শিবম্ অদ্বৈতম্' তত্ত্বে পরিসমাপ্ত হও।

"কাত্যায়নীয় বিদ্মহে কন্যাকুমারি ধীমহি তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ ॥"

'লোকানাং বরদা ভব।'

'দিশেহারা'

দূরে কি নিকটে ?

(১)

যত ডাকি আমি
"কোথা আছ নাথ !"
তত সাড়া পাই
"আছি তব সাথ।"
আমি বলি "নাথ।
কই দেখা দাও ?"
বল হেসে তুমি
"দেখিতে কি চাও ?"
আমি বলি "আজ
কতদিন হ'তে,
"কত জনমের
বিরহ-ব্যথাতে,
"আসি দেখ, আছি
মরমে মরিয়া,
"হৃদয়ের বল
গিয়াছে ভাঙ্গিয়া।
"দেখ কাঁদি আমি
নিরাশ হৃদয়ে।

"তুমি কর ছল
বিরলে বসিয়ে।
"কতদিন হ'তে
ধরা দিতে চাও
" 'এস' যেই বলি
কোথা চলে যাও।
"বুঝেছি বুঝেছি
দীন হীন ব'লে
"দেবে না'কো ধরা
তাই কি কৌশলে—
"দেখ দেখ" বল
কই দেখা পাই
"তুমি বল 'এই'
আমি বলি "নাই"
"তুমি দেখা দাও,
হবে বুঝি তাই।
"আমি যে অন্ধ
দেখিতে না পাই।

(২)

তুমি বল 'আছি
সকল স্থানেতে'
আমি ত খুঁজিয়া
না পাই জগতে।
এত দিন বল,
দেখা তো' দিলে না,
আমাকেই দোষ—
"কই দেখিলে না ?"
কত খুঁজি আমি
কই দেখা পাই ?
তবু বল তুমি
'আছি সব ঠাই।'
গিরি গিরি ধাই
ফিরি উপবন,
পাতি পাতি খুঁজি,
পাইনা দর্শন।

ধায় নির্ঝরিণী
করিয়া কল্লোল,
আমি ভাবি,—তব
মধুমাখা বোল।
মম প্রতিধ্বনি
উঠে উচ্চতর,
আমি ভাবি,—কারে
করিছ আদর।
যাই, গিয়ে দেখি
কোথা কিছু নাই ;
নয়নের নীরে
ভাসে আঁখি তাই।
শ্রান্ত হ'য়ে বসি'
বিটপীর ছায়,
ক্ষণে উর্দ্ধে হেরি
দেখিনা তোমায়।

(৩)

তবে 'তুমি আছ
সকল স্থানেতে'—
মিথ্যা প্রচারিত
হয়েছে জগতে।
যতবার ভাবি
এই কথা মনে,
ভাবিতে এ কথা,
ব্যথা পাই প্রাণে।
ভাবিতে ভাবিতে
হই আত্মহারা,

ভাল নাহি লাগে
শোভন্ এ ধরা।
জলভারে ভ'রে
আসে দুনয়ন,
কি যেন ভাবিতে
কি ভাবি তখন।
এই অপরূপ
নিখিল ভুবন,
এই বর্ত্তমান,—
সকলি স্বপন।

এই হাসি-খেলা
প্রেম ভালবাসা
সব শূন্য হায়
সকলি তামাসা।
তবে বৃথা কাঁদি,
বৃথা আশা করি,
বৃথা আশা, বক্ষে
বহে 'বহে' মরি।
তুমি ত আসনা
মুছাইতে ব্যথা,
করনা সোহাগ
কহ না'ত কথা।

(৪)

ভাবি আর কাঁদি
এইরূপে হায়,
কি যে ভাবি,—
শুধ্ পাগলের প্রায়।
একে একে, সব
চিন্তা নিবে যায় ;—
স্বপনের মত
ভেসে কি বেড়ায়।
নীরব সঙ্গীতে
ডুবে যায় প্রাণ
কি অতলে চিত্ত
করিল প্রয়াণ।
ক্ষণ পরে দেখি
ভাঙ্গি নীরবতা
গাহে পিকবর
কি মাধুরী গীতা।
উঠি চমকিয়া
ব্যাকুল পরাণে,
ভেসে যায় প্রাণ
বিহগ কূজনে।
বাতুলের মত
চাহি চারিদিকে,
কি দেখিতে আঁখি,
কিবা যেন দেখে।
চেয়ে থাকি দূরে,
দেখি দূরে চরে
হরিণ হরিণী,-
কানন মাঝারে,—
হর্ষে কভু ধায়
কাঁপে উরঃস্থল,
ক্ষণে ক্ষণে ভীত্
নয়ন চঞ্চল,
আকর্ণ-বিস্তৃত
নয়ন ভরিয়ে
কি যেন নেহারে
আকুল হইয়ে।
মনে ভাবি, 'ছিল
আসিবার কথা
বুঝি আসিয়াছে
দেখে মম ব্যথা।'

ধেয়ে যাই,—দেখি
কেউ কোথা নাই,
যত কাঁদি, তত
চারিদিকে ধাই।

কত খুঁজি বন
দেখিতে না পাই
ভাবি তবে 'তুমি
বুঝি আস নাই।'

(৫)

মৃগশিশু সব
মুখপানে চায়;
দেখে, মোরে রহে
স্তম্ভিতের প্রায়।
মনে মনে কাঁদি,
উঠি যত বার,
ভূমেতে লুণ্ঠিত
হই তত বার।
এ ঘোর যাতনা
গুমরিছে বুকে,
আছ কাছে,—তবু
নয়ন না দেখে।
কাঁদি পড়ে পড়ে
ভূমেতে পড়িয়া,
উঠিলাম পুন,
কি যেন শুনিয়া।
সুধাকণ্ঠে বলে'
শুনিতে পেলাম,—
"কেন বসে বসে
কাঁদ অবিরাম।
"আছি কাছে কাছে,
দেখিয়ে দেখনা

"তবু বলিতেছ
'দেখা ত দিলে না।'
"তুমি দেখিবে না,
সে কি দোষ মোর
"উঠ, একবার,
শুন কথা মোর।
"তুমি যে ভাবেতে
ভাব নিশিদিন
"সে'ত নহে সোজা,
বড় যে কঠিন।
"যদিও আমায়
যে ভাবে যে ভাবে
"আমি দেখা দিই
তারে সেই ভাবে।
"সব নব নারী
আমাকে পাইবে
"সত্য সত্য বলি
ভুল্ না ভাবিবে।
"তবু দেশ, কাল,
পাত্র বিচারিয়া,
"আছে কিছু ভেদ
দেখনা বুঝিয়া।

"তুমি চা'ও মোরে
হেরিতে অন্তরে ;
"আমি যে তোমার
অন্তরে বাহিরে।
"শুধু কি অন্তরে
খুঁজিয়া দেখিবে ;
"বাহিরে যে 'আমি'
ফিরে না চাহিবে ?
"হৃদি-মাঝে রূপ
হেরিতেছ যার

"বাহিরেও হের
প্রতিবিম্ব তার।
"হৃদয়-মুকুরে
যার ছায়া হের,
"এ বিশ্ব-মুকুরে
তা'রে নাহি হের !
"যে ওঁকার বাশী
হৃদয়ে বাজিছে,
"সেই নাদ শুন
জগতে উঠিছে।

(৬)

"যে'রূপ হেরিবে
হৃদয়-মন্দিরে, —
"হের সে প্রতিমা
প্রতি জীবে, নরে।
"যার পূজা তরে
পাগল হয়েছ ;
"সে পূজে তোমায়
দেখে না দেখিছ।
"তুমি কেঁদে কেঁদে
খুঁজি'ছ যাহারে,
"ভাব সে কি আছে
না খুঁজে তোমারে ?
"সেও তব তরে
কাঁদিতেছে কত,

"দেখনা চাহিয়া
ঐ বসে সে ত'।
"তুমি চাও তাঁ'রে
দেখিতে সদাই,—
"তব পিছু দেখ
ঘুরিছেন তাই।
"তুমি ভুলে থাক
বিষয়ে-মগন
'তিনিই ত' দেন
ভাঙ্গিয়া স্বপন।
"তব তরে' তাঁ'র
হৃদি কত কাঁদে,
"তা'রি প্রতিধ্বনি
উঠে তব হৃদে।

(৭)

"দশ মাস যাঁর
কোলেতে ঘুমালে,
"গর্ভবাস পরে
যে মুখ হেরিলে,—
"সেই প্রীতি-মাখা
স্নেহ-নির্ঝরিণী—
"সেই প্রাণ-ভরা
আকুল চাহনি—
"সেই মুখ,—সেই,
আদরের কথা,
"সেই যে জননী —
স্বরগের লতা।
"সেই মহাগুরু,—
স্নেহভরা বুক,
"প্রীতি-প্রফুল্লিত
জনকের মুখ।

"সেই ভাই ভগ্নী,
সম্বন্ধ মধুর,--
"দেখ, কত বেশে,
তোমারি ঠাকুর,—
"করিছেন পূজা
তোমারে যতনে,
"তুমি তা' না দেখি
কাঁদ বনে বনে॥
"প্রেমভরা আঁখি
স্নেহভরা বুক,
"সখা, সখি, হেরি
পাওনা' কি সুখ ?
"তবে বল কেন,
'দেখিতে না পাই,'
"দেখিতেছ,—ভুলে,
ভাব দেখি নাই।

(৮)

"দেখ তব তরে
কুসুম ভিতরে,
"তৃণ, লতা, পাতা,
ধূলির মাঝারে,--
"মানব, মানবী,
পশু, পক্ষী, মাঝে
"পতঙ্গ ও কীট -
বহুরূপ সাজে
"নীল নভঃ তলে
অনলে, অনিলে,

"নদী-কলরোলে
সাগর-সলিলে,
"আপন মহিমা
করিয়া প্রকাশ
"বিরাজেন তিনি
জগত-নিবাস॥
"কত সাজে সাজি
তোমার লাগিয়া,
"তব পথ চাহি
আছেন বসিয়া।

"অনন্ত সৌরভ
আছে দেহে তাঁর,
"কুসুম সুবাসে
বিকাশ তাঁহার।
"সবে দয়া তাঁ'র ,—
জলধারা হয়ে,

"কর দেন গায়ে
কিরণ হইয়ে।
"মকরন্দ গন্ধে
ছোটে অলিকুল,
"অঙ্গ-গন্ধে তাঁর
ভুবন ব্যাকুল।

(৯)

"তুমি ভাল বাস
কণ্ঠস্বর তাঁর ,—
"দেখ গাহিছেন
তাই বার বার;—
"পাখীর কূজনে
মলয় স্বননে,
"দামিনী-গর্জ্জন
ভ্রমর-গুঞ্জনে।
"পবন-হিল্লোলে
বন দুরগমে,
"কোটি কণ্ঠে কথা
লোক-সমাগমে।
"গম্ভীর নিনাদে
কল্লোলিনী বুকে
"গাহিছেন গান
কত না কৌতুকে।

"কোটি কণ্ঠ-পূরে
কল কম্বুনাদে,
"গাহিছেন গান
হরষ বিষাদে।
"কত যে রাগিণী,
কত তান, লয়,—
"উঠিছে নিবিছে
দেখ, বিশ্বময়॥
"জগতের শোক্
হাহাকার ধ্বনি
"নহে সে রোদন,—
বেহাগ রাগিণী।
"জননী যতনে
আদরে তনয়,
"তাঁ'রি ভালবাসা
সে হৃদে উদয়॥

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল।

প্রণব।

K. V. Seyne & Bros

ব্রহ্মবিদ্যা-রহস্য।

(১)

বর্ত্তমান সময়ে সকলেরই অন্তঃকরণে, উচ্চ হইতে উচ্চতর ও উচ্চতম বিষয়-সমূহের আলোচনার বাসনা অতীব বলবতী হইয়াছে। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, তদ্বিষয়ে তাঁহারা স্বকীয় অধিকার ও সামর্থ্যের প্রতি দৃষ্টি প্রদান করিবার অবসর পান না। তা'ই তাঁহারা নিজের মনীষা ও প্রতিভা বলে, শাস্ত্রকে নিজের অধীন করিয়া ব্যাখ্যা করিতে, কিম্বা লোকসমাজে প্রচার করিতেও, বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত হন না। সাধারণ লোকেও সত্যাসত্য নিরূপণ করিতে অসমর্থ হইয়া প্রথিত-নামা ব্যক্তিগণের উক্তি সমূহ যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে। যাঁহার লোকসমাজে যতদূর প্রতিষ্ঠা, তাঁহার বাক্য তত অধিক পরিমাণে প্রচারিত ও গৃহীত হইয়া থাকে। সে অবস্থায় প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞব্যক্তির যথার্থ শাস্ত্র-মীমাংসা প্রবল স্রোতের অভিমুখে নিপতিত তরণীর ন্যায় ভাসিয়া যায়। ইহা দ্বারা সমাজের প্রভূত অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে; সুতরাং "অন্ধস্যেবান্ধলগ্নস্য বিনিপাতঃ পদেপদে" এই মহাজন বাক্যের যথার্থতা প্রতিপন্ন হইতেছে।

আজ-কাল সভা-সমিতিতে এবং সংবাদপত্র সমূহে "ব্রহ্মবিদ্যার" ভূয়সী আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি ব্রহ্মবিদ্যা সংবাদপত্র-রূপে পরিণত হইয়া গৃহে গৃহে বিরাজ করিতেছেন। সুতরাং ইদানীং সত্যযুগ উপস্থিত কিনা, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু যাঁহারা গৃহে গৃহে ব্রহ্মবিদ্যা বিতরণ করিয়া তাপত্রয়-নাশের জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন, তাঁহাদের মহৎ উদ্দেশ্য স্বীকার করিতে সকলেই বাধ্য। কিন্তু তাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যার কতটুকু ফল-লাভে অধিকারী হইয়াছেন. তাহা আমরা বুঝিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। ত্রিলোক-জননী ভগবতী শ্রুতি বলিয়াছেন—"ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি, "অশরীরং বাবসন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ", "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "তজ্জলান্ শান্ত উপাসীত" ইত্যাদি;—অর্থাৎ ব্রহ্মকে যিনি জানেন তিনি ব্রহ্মই হন; যাঁহার শরীরের প্রতি অভিমান নাই, সুখ দুঃখাদি—তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না;

এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, যেহেতু ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতেই স্থিতি ও লয় হয়; সুতরাং রাগ ও দ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া উপাসনা করিবে। এই সমস্ত শ্রুতিবাক্য দ্বারা জানা যাইতেছে, যে ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলে সুখ-দুঃখাদি কিছুই থাকে না, এবং অভেদজ্ঞান হওয়ায় পরপীড়াদির প্রতি প্রবৃত্তি জন্মে না। কিন্তু এ সমস্ত ফল, অধুনা কয়জনের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়? সুতরাং ইহাকে আধুনিক লোকের মনঃকল্পিত পারিভাষিক ভিন্ন, উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যা বলা যায় না। তথাপি নামাদির সাদৃশ্যে 'প্রতিকৃতি সিংহের' ন্যায়, লোকের সত্য বলিয়া ধারণা জন্মে। যাহা হউক, বর্ত্তমান প্রবন্ধে ব্রহ্মবিদ্যা-সম্প্রদায় নিরূপণই আমাদের উদ্দেশ্য, কিন্তু অবসরক্রমে অন্যান্য বিষয়ের সংশয় অপনয়ন করা যাইবে।

আজকাল প্রায় সর্ব্বত্র শুনিতে পাওয়া যায় যে, 'পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মবিদ্যা জানিতেন না; তাঁহারা ক্ষত্রিয়গণের নিকট হইতে লাভ করিয়া শিষ্য প্রশিষ্যক্রমে প্রচার করিয়াছেন।" যাঁহারা এই মত প্রচার করেন, তাঁহারা ছান্দোগ্যোপনিষদের 'পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা' এবং বৃহদারণ্যকে 'গার্গ্য ও অজাতশত্রুর সংবাদ' প্রভৃতি উদাহরণ দিয়া স্বমত দৃঢ় করিতে প্রয়াস পান। ছান্দোগ্যোপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শ্বেতকেতু পাঞ্চালরাজার সভায় উপস্থিত হইলে, রাজা প্রবাহন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন—"বৎস। তুমি কি তোমার পিতার নিকট হইতে কিছু শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়াছ?' তচ্ছ্রবণে শ্বেতকেতু বলিলেন—"ভগবন্, পিতা আমাকে শাস্ত্র-শিক্ষা দিয়াছেন।" অতঃপর রাজা তাঁহাকে পাঁচটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন; কিন্তু শ্বেতকেতু প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে বলেন—'আমি জানিনা'। তখন রাজা বলিলেন—"যে এ কথার উত্তর দিতে পারে না, সে কিরূপে বলে যে আমি বিদ্যা-শিক্ষা করিয়াছি।" রাজার বাক্য শুনিয়া শ্বেতকেতু দুঃখিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ তদীয় পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "পিতঃ! রাজা আমাকে পাঁচটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন; তন্মধ্যে আমি একটীরও প্রত্যুত্তর দিতে সমর্থ হইলাম না।" আপনি আমাকে কি শিক্ষা দিয়াছেন?" তখন শ্বেতকেতুর পিতা গৌতম বলিলেন—"ইহার উত্তর আমিও জানি না, তোমাকেই বা কি শিক্ষা দিব?" এই বলিয়া গৌতম অবিলম্বে রাজার নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিতে গমন করিলেন। রাজা প্রবাহন তাঁহার যথোচিত সৎকার করিয়া

ধনবস্ত্রাদি দানেব বিষয় বিজ্ঞাপিত করিলে, তিনি তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন ; এবং বলিলেন "আমি ধনবস্ত্রাদিব জন্য আসি নাই। বৎস শ্বেতকেতুর নিকট যে পাঁচটী প্রশ্ন কবিয়াছেন, তাহাবই উত্তর আমাকে বলুন।" তাহা শুনিয়া রাজা নিতান্ত দুঃখিত হইলেন।

এস্থলে এরূপ শ্রুতিবাক্য দৃষ্ট হয়—"তং হ চিবং বসেত্যাজ্ঞাপয়াঞ্চকার তং হোবাচ যথা মা ত্বং গৌতমাবদো যথেয়ং ন প্রাক্ ত্বত্তঃ পুরা বিদ্যা ব্রাহ্মণান্ গচ্ছতি, তস্মাৎ সর্ব্বেষু লোকেষু ক্ষত্রস্যৈব প্রশাসনমভূদিতি তস্মৈ হোবাচ।" ৫।৪।৭ অর্থাৎ, বাজা ব্রাহ্মণকে প্রত্যাখ্যানেব অযোগ্য বিবেচনা করিয়া, দীর্ঘকাল অবস্থিতিব জন্য অনুজ্ঞা কবিলেন, এবং তাঁহাকে বলিলেন—"হে গৌতম! তুমি সর্ব্ববিদ্যায় অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ হইযাও, যখন আমাব (ক্ষত্রিয়ের) নিকট এই বিদ্যা শিক্ষা কবিতে আসিয়াছে, তখন ইহা জানিও যে এই বিদ্যা তোমার *পূর্ব্বে কোন ব্রাহ্মণেব নিকট ছিল না। ক্ষত্রিয়-পবম্পরায় ইহা চলিয়া আসিয়াছে।* তজ্জন্য সমস্ত লোকে ক্ষত্রিয়েবই প্রভুত্ব ছিল" এই বলিয়া বাজা তাঁহাকে "অসৌ-বাব লোকো গৌতমাগ্নিঃ" ইত্যাদি বাক্যদ্বাবা বিদ্যা প্রদান কবিলেন।

এই ত' গেল ছান্দোগ্যোপনিষদেব কথা। বৃহদাবণ্যকে দ্বিতীয় অধ্যায়ে দৃষ্ট হয—

"দৃপ্তবালাকির্হানূচানো গার্গ্য আস স হোবাচাজাতশত্রুং কাশ্যং ব্রহ্ম তে ব্রবাণীতি সহোবাচাজাতশত্রুঃ সহস্রমেতস্যাং বাচি দদ্মঃ।' (২।১।১) অর্থাৎ—বিদ্যাগর্ব্বী বাগ্মী বলাকাব-পুত্র গার্গ্য, কাশীবাজ অজাতশত্রুকে বলিলেন—'আমি তোমাকে ব্রহ্ম বিজ্ঞাপন কবিব।' তাহা শুনিয়া অজাতশত্রু বলিলেন—'ইহা বলিতে পাবিলে সহস্র গো প্রদান কবিব।'

কিন্তু গার্গ্য, চক্ষু প্রভৃতিতে বিশিষ্ট-ব্রহ্মভাসকে ব্রহ্ম বলিয়া নিরূপণ করিলেন। রাজা অজাতশত্রু তাহাবই অব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন কবিতে লাগিলেন। অবশেষে গার্গ্য আর কিছু বলিতে না পাবিয়া, তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। এখানে এবংবিধ শ্রুতি পবিলক্ষিত হয়—"স হোবাচাজাতশত্রুবেতাবন্নূ৩ ইত্যেতাবদ্ধীতি নৈতাবতা বিদিতং ভবতীতি। সহোবাচ গার্গ্য উপত্বা যানীতি" (২।১।১৪), অর্থাৎ রাজা অজাতশত্রু গার্গ্যকে বলিলেন—এই পর্য্যন্তই বা এই প্রকার বিশিষ্ট বুদ্ধিতে জানিলে, ব্রহ্ম জানা যায় না।' তখন গার্গ্য বলিলেন "আমাকে উপদেশ প্রদান করুন।"

উল্লিখিত শ্রুতিবাক্য সমূহ দ্বারা "ক্ষত্রিয়েব নিকট হইতে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্তি সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়" এ কথা, যাঁহাবা বলেন তাঁহাদের উক্তি কতদুব যুক্তিযুক্ত তাহা পবীক্ষা কবা যাউক। ব্রহ্মবিদ্যাব প্রাপ্তি নিরূপণের পূর্ব্বে, ব্রহ্মবিদ্যা যে কি পদার্থ, তাহা অগ্রে জানা আবশ্যক। ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান ইহাই উপনিষৎ শব্দেব প্রতিপাদ্য। উপ+নি+ষদ্+ক্বিপ্ প্রত্যয়দ্বাবা উপনিষৎ পদ সিদ্ধ হয়। "ষ্ দ্ ৯ (সদ্) বিশবণগত্যবসাদনেষু"; সদ্ ধাতুব বিশবণ (বিনাশ), গতি ও অবসাদ অর্থ। অর্থাৎ, যাহা সংসার-কাবণভূত অবিদ্যাব সহিত সংসাবেব উচ্ছেদ সাধন কবে, তাহাবই নাম উপনিষৎ; উপনিষৎকে ব্রহ্মবিদ্যা বলে। ভগবান্ শঙ্কবাচার্য্য বৃহদাবণ্যক-ভাষ্যেব প্রথমেই লিখিয়াছেন,— "সেয়ং ব্রহ্মবিদ্যোপনিষচ্ছব্দবাচ্যা তৎপবাণাং সহেতো সংসাবস্যাত্যন্তাবসাদনাৎ। উপনিষপূর্ব্বস্য সদেস্তদর্থত্বাৎ। তাদর্থ্যাদ্‌গ্রন্থোঽপ্যুনিষদুচ্যতে।" অর্থাৎ, ব্রহ্মবিদ্যাকেই উপনিষৎ বলে; যাঁহাবা ব্রহ্মকে জানেন, তাঁহাদেব পক্ষে সংসার ও তাহাব কাবণ অবিদ্যা উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়, উপ ও নি পূর্ব্বক সদ্ ধাতুব 'কাবণেব সহিত সংসারেব উচ্ছেদই' অর্থ। গ্রন্থ ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপাদন কবে, এই হেতু তাহাকেও উপনিষৎ বলা যায়। বস্তুতঃ ব্রহ্মবিদ্যাবই নাম "উপনিষৎ।"

ছান্দোগ্যোপনিষদে বাজা প্রবাহনেব উক্তি দ্বাবা জানিতে পাবা যায়— "যথেয়ং ন প্রাক্‌ত্বত্তঃ পুবা বিদ্যা ব্রাহ্মণান্ গচ্ছতি" অর্থাৎ "তোমাব পূর্ব্বে এই পঞ্চাগ্নিবিদ্যা কোন ব্রাহ্মণ জানিতেন না।" ইহা দ্বাবা ব্রহ্মবিদ্যা যে ক্ষত্রিয়-গত ছিল, ইহা প্রমাণিত হয় না। কিন্তু এই বাক্যদ্বাবা কেবল 'পঞ্চাগ্নিবিদ্যাই'—ক্ষত্রিয়-মাত্রে পর্য্যবসিত ছিল, ইহাই অবগত হওয়া যায়। বস্তুতঃ পঞ্চাগ্নিবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যা এক নহে। * সে এখানে 'বিদ্যা' শব্দের অর্থ উপাসনাবিশেষ বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মবিদ্যাব অর্থ ব্রহ্মজ্ঞান। জ্ঞান ও উপাসনাব মহান্ ভেদ পবিলক্ষিত হয়। জ্ঞান বস্তু-পবতন্ত্র হইয়া নিরূপিত হয়। প্রকৃত অগ্নিতে অগ্নি-বুদ্ধিকে

---

* বিশেষ ক্ষেত্র বা শক্তি-ভাবাপন্ন 'আমি এই' জ্ঞানকে অগ্নিশব্দে লক্ষিত করা হয়। এই অহং ক্ষেত্রে কার্ত্তিকেয় প্রকট হন। ইনি monad বা হংস শব্দ বাচ্য। এই হংসতত্ত্ব হইতে আর চারিটী অহং প্রতি-বিম্ব (Reflection) পাতিত হয। এই পাঁচটীব বিশেষ তত্ত্বনির্ণয়ই পঞ্চাগ্নিবিদ্যা—পং সং

জ্ঞান বলা যায়। কিন্তু অগ্নি হইতে অত্যন্ত ভিন্ন মনোক প্রভৃতিতে অগ্নিবুদ্ধি করার নাম উপাসনা। উপাসনা মানসী ক্রিয়া; উপাসক অন্য বস্তুকে অন্য ভাবে উপাসনা করিতে পারে। কিন্তু নয়নেন্দ্রিয়ের সহিত বহ্নির সংযোগ হইলে, তাহাকে অগ্নি না জানিয়া অন্য বস্তু বলিয়া জানিতে পারা যায় না। এতদ্বিষয়ে শারীরক ভাষ্যেও উক্ত আছে—

"নন্বু জ্ঞানং নাম মানসীক্রিয়া, ন, বৈলক্ষণ্যাৎ। ক্রিয়া হি নাম সা যত্র বস্তুস্বরূপনিরপেক্ষৈব চোদ্যতে, পুরুষচিত্তব্যাপারাধীনা চ। যথা 'যস্যৈ দেবতায়ৈ হবির্গৃহীতং স্যাৎ তাং ধ্যায়েদ্বষট্ করিষ্যন্' ইতি। 'সন্ধ্যাং মনসা ধ্যায়েৎ' ইতি চৈবমাদিষু। ধ্যানং চিন্তনং যদ্যপি মানসং, তথাপি পুরুষেণ কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা বা কর্ত্তুং শক্যং, পুরুষতন্ত্রত্বাৎ। জ্ঞানঞ্চ প্রমাণজন্যং। প্রমাণঞ্চ যথাভূতবস্তু-বিষয়মতো, জ্ঞানং কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা বা কর্ত্তুমশক্যং; কেবলং বস্তুতন্ত্রমেব তৎ। ন চোদনাতন্ত্রং, ন পুরুষতন্ত্রম্। তস্মানসত্বেঽপি জ্ঞানস্য মহদ্বৈলক্ষণ্যম্। যথা চ 'পুরুষোবাব গৌতমাগ্নিঃ' 'যোষাবাব গৌতমাগ্নিঃ',—ইত্যত্র যোষিৎপুরুষয়ো-রগ্নিবুদ্ধি র্মানসী ভবতি, কেবলং চোদনাতন্ত্রত্বাৎ, ক্রিয়ৈব সা পুরুষতন্ত্রা চ। যা তু প্রসিদ্ধেঽগ্নাবগ্নিবুদ্ধির্ন সা চোদনাতন্ত্রা, নাপি পুরুষতন্ত্রা। কিং তর্হি? প্রত্যক্ষবিষয়বস্তুতন্ত্রৈবেতি জ্ঞানমেবৈতৎ ন ক্রিয়া। এবং সর্ব্বপ্রমাণবিষয়বস্তুষু বেদিতব্যং। তত্রৈবং সতি যথাভূতব্রহ্মাত্মবিষয়মপি জ্ঞানং ন চোদনাতন্ত্রম্।" অর্থাৎ এক্ষণে আপত্তি হইতেছে যে, জ্ঞানও যখন মানসী ক্রিয়া, তখন ক্রিয়ার সহিত আর পার্থক্য কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—তাহা নহে; জ্ঞান ও ক্রিয়ার পরস্পর বৈলক্ষণ্য পরিদৃষ্ট হয়। যাহা বস্তুর স্বরূপকে অপেক্ষা না করিয়া নিরূপিত হয়, তাহাকে ক্রিয়া বলে, ক্রিয়া পুরুষের চিত্ত-ব্যাপারের অধীন। যেমন যে 'দেবতার উদ্দেশে হবি গৃহীত হয়, বষট্ পূর্ব্বক তাঁহার ধ্যান করিবে।' 'সন্ধ্যাকে মনের দ্বারা চিন্তা করিবে' ইত্যাদি। ধ্যান শব্দের অর্থ চিন্তা; যদ্যপি ধ্যান মানসী ক্রিয়া, তথাপি পুরুষ তাহা অনুষ্ঠান করিতে পারে, অনুষ্ঠান নাও করিতে পারে, কিংবা অন্য প্রকারেও অনুষ্ঠান করিতে পারে। যেহেতু ক্রিয়া পুরুষের অধীন। কিন্তু জ্ঞান প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ হইতে উৎপন্ন হয়; প্রমাণ যথার্থ বস্তু বিষয়ক। অতএব কোন ব্যক্তি ইচ্ছামত জ্ঞানকে অন্য প্রকার করিতে পারে না। অর্থাৎ ঘটজ্ঞান হইলে ইহা ঘটজ্ঞান নয়, এরূপ পুরুষ ইচ্ছা দ্বারা

সাধন করিতে পারে না। যেহেতু জ্ঞান কেবল মাত্র যথার্থ বস্তুর অধীন; বিধি কিংবা পুরুষের অধীন নহে। সুতরাং ধ্যানাদি ক্রিয়া যদ্যপি মনোবৃত্তিরূপ, জ্ঞান ও মনোবৃত্তিরূপ, তথাপি জ্ঞান ও ক্রিয়ার মহৎ পার্থক্য বিদ্যমান্ আছে। যথা—'হে গৌতম! পুরুষকে অগ্নিরূপে উপাসনা করিবে,' 'যোষিৎকে অগ্নি বলিয়া জানিবে' এস্থলে পুরুষ ও যোষিৎ (স্ত্রী) কে অগ্নিরূপে জানা যদ্যপি মানসিক ব্যাপার, তথাপি ইহা কেবল বিধির অধীন। ইহাকেই ক্রিয়া বলে, এবং ক্রিয়া মাত্রই পুরুষের অধীন। প্রসিদ্ধ অগ্নিতে অগ্নিজ্ঞান বিধি বা পুরুষের অধীন নহে। তবে কিসের অধীন এই প্রশ্নে বলিতেছেন—প্রত্যক্ষ বিষয়ক বস্তুর অধীন, ক্রিয়া বস্তুর পরতন্ত্র নহে। এইরূপ সমস্ত প্রমাণই বস্তুপরতন্ত্র জানিবে। তাহা হইলে যথার্থ ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব-জ্ঞান, চোদনা (বিধি) পরতন্ত্র নহে; যথার্থ বস্তুর অধীন বলিতে হইবে।'

উল্লিখিত শাঙ্করবাক্য, জ্ঞান এবং উপাসনার পরস্পর বিশেষরূপ পার্থক্য প্রতিপাদন করিতেছে। গৌতমোক্ত পঞ্চাগ্নিবিদ্যাও যে প্রকৃতব্রহ্মবিদ্যা হইতে অন্য, তাহা ভাষ্যে ইঙ্গিত হইয়াছে, সুতরাং পঞ্চাগ্নিবিদ্যা ব্রাহ্মণে না জানিলেও ব্রহ্মবিদ্যায় ব্রাহ্মণের অজ্ঞানতা প্রমাণিত হয় না। এক্ষণে এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যদি পঞ্চাগ্নিবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা হইতে পৃথক্, তবে ব্রহ্মপ্রতিপাদক উপনিষদ্ গ্রন্থে উহার উল্লেখ কেন? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে—প্রতীক-উপাসনা চিত্তশুদ্ধি সম্পাদনপূর্ব্বক, জ্ঞান উৎপাদন করে বলিয়া, এবং জ্ঞান ও উপাসনার মানসত্ব প্রযুক্ত, ব্রহ্ম-প্রতিপাদক উপনিষদেও তাহার বিষয় বিবৃত হইয়াছে।

ছান্দোগ্যোপনিষদের বাক্য দ্বারা ক্ষত্রিয়জাতির ব্রহ্মবিদ্যার আচার্য্যত্ব প্রমাণিত হইল না। এক্ষণে যাঁহারা বৃহদারণ্যকের গার্গ্য ও অজাতশত্রুর উপাখ্যান দ্বারা ক্ষত্রিয়ের ব্রহ্মবিদ্যার উপদেষ্টৃত্ব প্রতিপাদন করেন, দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের পরবর্ত্তী শ্রুতিটীর প্রতি দৃষ্টি পড়ে না। সেই শ্রুতিটী এইরূপ—"সহোবাচাজাতশত্রুঃ প্রতিলোমং চৈতদ্ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়মুপেয়াদ্ব্রহ্ম মে বক্ষ্যতীতি ব্যেব ত্বা জ্ঞপয়িষ্যামি।" অর্থাৎ যখন গার্গ্য ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিতে অক্ষম হইয়া অজাতশত্রুর নিকট শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন, তখন অজাতশত্রু বলিলেন—"উত্তমবর্ণ ব্রাহ্মণ, হীনবর্ণ ক্ষত্রিয়ের নিকট 'আমাকে ব্রহ্ম জানাও' একথা বলিয়া শিষ্যত্ব স্বীকার করা অতীব বিপরীত; অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ই ব্রাহ্মণের নিকট শিষ্যত্ব স্বীকার করে, কিন্তু

তুমি তাহার বিপরীত আচরণ করিলে! আচ্ছা, তোমাকে ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করিব।"

অজাতশত্রুর উক্তিদ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, ব্রাহ্মণই বিদ্যামাত্রেরই আচার্য্য ; এবং ব্রাহ্মণের,ক্ষত্রিয়ের নিকট যাইয়া শিষ্যবৃত্তি দ্বারা বিদ্যাশিক্ষা করা,শাস্ত্র, স্বভাব ও আচার বিরুদ্ধ। এই শ্রুতির ব্যাখ্যায় ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন— "সহোবাচাজাতশত্রুঃ প্রতিলোমং বিপরীতং চৈতৎ, কিং তদ্ যদ্ব্রাহ্মণ উত্তমবর্ণ আচার্য্যত্বেঽধিকৃতঃ সন্ ক্ষত্রিয়মনাচার্য্যস্বভাবমুপেযাচ্ছিষ্যবৃত্ত্যা, ব্রহ্ম মে বক্ষ্যতীত্যেতদাচারবিধিশাস্ত্রেষু নিষিদ্ধম্, তস্মাত্ত্বং তিষ্ঠ আচার্য্য এব সন্। বিজ্ঞপয়িষ্যাম্যেব ত্বামহম্। যস্মিন্ বিদিতে ব্রহ্ম বিদিতং ভবতি যত্ত্বম্মুখাৎ ব্রহ্ম বেদ্যম্॥" ইত্যাদি। এই ভাষ্য-গ্রন্থে শঙ্করাচার্য্য 'ক্ষত্রিয়কে অনাচার্য্য-স্বভাব অর্থাৎ ক্ষত্রিয় জাতি কখনও আচার্য্য হইতে পারে না, ইহাই বলিয়াছেন। তথাপি দৈববশতঃ যদি ক্ষত্রিয়ের নিকট ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন করিতে যান, তবে ব্রাহ্মণই আচার্য্যের মত, থাকিবেন। তদবস্থায় ক্ষত্রিয় আচার্য্য না হইয়াই তাঁহাকে উপদেশ দিবেন।' সুতরাং শ্রুতি ও ভাষ্য দ্বারা স্পষ্টই জানা যায় যে, অজাতশত্রু কোন ব্রাহ্মণের নিকট ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া গার্গ্যকে তদ্বিষয়ে উপদেশ মাত্র দিয়াছিলেন। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—"অব্রাহ্মণাদধ্যয়নমাপৎকালে বিধীয়তে।" ইত্যাদি ;— অর্থাৎ আপৎকাল উপস্থিত হইলে অব্রাহ্মণের নিকট অধ্যয়ন করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহা মুখ্য-কল্প নহে। সুতরাং বৃহদারণ্যকের বাক্য দ্বারাও ক্ষত্রিয়ের ব্রহ্মবিদ্যার আচার্য্যত্ব সিদ্ধ হইল না ;—বরং তদ্বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক আচার্য্যত্ব দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইল।

অপি চ এই ব্রহ্মবিদ্যা মূল-বক্তা ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া সম্প্রদায়পরম্পরায় চলিয়া আসিয়াছে। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের বেদাদি অধ্যয়নে অধিকার থাকিলেও, অধ্যাপনে অধিকার নাই। শাস্ত্র-মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া ভগবান্ রামচন্দ্র বশিষ্ঠের নিকট হইতে শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। পূর্ণ ভগবান্ কৃষ্ণ স্বয়ং সর্ব্বজ্ঞ হইলেও লোকমর্য্যাদা রক্ষার জন্য সান্দীপনি মুনির নিকট বেদ অধ্যয়ন করিয়া ব্রাহ্মণের আচার্য্যত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছেন। * শাস্ত্রে দুই প্রকার বংশের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে এক প্রকার বংশ বিদ্যা-নিবন্ধন, অর্থাৎ গুরুশিষ্য সম্প্রদায়,

---

* ভাগবত ১০।৮৫।৩১। দেখ।

যেমন পাণিনি, কাত্যায়ন প্রভৃতি। বৃহদারণ্যকে ব্রহ্মবিদ্যার উৎকর্ষ প্রতিপাদনার্থ মধুকাণ্ড ও যাজ্ঞবল্ক্য কাণ্ডের যে বংশ বর্ণিত আছে, তাহাতে কোন ক্ষত্রিয়েরই নাম নাই। উক্ত বংশ-গ্রন্থে পৌতিমাস্য-প্রমুখ শিষ্য হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত ব্রহ্ম বিদ্যার উপদেশকের নাম পাওয়া যায়; কিন্তু ক্ষত্রিয়ের নাম গন্ধ পাওয়া যায় না। যদি ক্ষত্রিয়গণই ব্রহ্মবিদ্যার আচার্য্য হইতেন, তবে ব্রহ্মবিদ্যার পরম্পরা-বর্ণনায় তাঁহাদের নাম নাই কেন? মধু-বিদ্যা যে ব্রহ্মবিদ্যা, তৎপক্ষে কাহারও সন্দেহ নাই। ব্রহ্মাই ব্রহ্মবিদ্যার মূল উপদেষ্টা। তাঁহা হইতে পৌতিমাস্য পর্য্যন্ত দুইবার যে সমস্ত নাম উক্ত হইয়াছে, তৎসমুদায় ব্রাহ্মণেরই। তদ্ভিন্ন ছান্দোগ্যো-পনিষদের অন্তে যে বংশ বর্ণিত আছে, তাহা দ্বারাও ক্ষত্রিয়গণের নিকট হইতে ব্রহ্মবিদ্যা-প্রাপ্তি প্রমাণিত হয় না। তথায় এবংবিধ শ্রুতি পরিদৃষ্ট হয়—"তদ্ধৈতদ্ ব্রহ্মা প্রজাপতয়ে উবাচ প্রজাপতির্মনবে মনুঃ প্রজাভ্যঃ।" মনুও প্রজাপতির নিকট হইতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যা যে ক্ষত্রিয়পরম্পরা-প্রাপ্ত, এ বাক্য কতদূর যুক্তিসহ, সহৃদয় পাঠকগণ! নিরপেক্ষ-ভাবে বিচার করিয়া তাহার সত্যাসত্য নির্ণয় করুন।

আরও এক কথা, তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য-জনিত অদ্বয়-জ্ঞানকে ব্রহ্মজ্ঞান বলে। ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়—শ্বেতকেতু যখন দ্বাদশবর্ষ-কাল গুরুকুলে বাস করতঃ চারিটী বেদ অধ্যয়ন করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসেন, তখন তদীয় পিতা আরুণি পুত্রকে গর্ব্বিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি তোমার আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে,—যদ্দ্বারা অশ্রুত-পদার্থ শ্রুত হয়, অতর্কিত-পদার্থ তর্কদ্বারা নিরূপণ করা যায় এবং অবিদিত বিষয় জানা যায়?* তখন শ্বেতকেতু বলিলেন "ইহা কি প্রকারে হইবে?" অতঃপর পিতা আরুণি, উপদেশ দ্বারা পুত্র শ্বেতকেতুকে প্রতিবোধিত করিলেন। এস্থলে প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্যারই উপদেশ করা হইয়াছে। "তত্ত্বমস্যাদিবাক্যোত্থং জ্ঞানং মোক্ষস্য সাধনম্।" সমস্ত উপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয় এই স্থানেই বিবৃত হইয়াছে। আরুণি এই স্থলে স্বীয় পুত্র শ্বেতকেতুকে 'স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো!' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা নয় বার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। সমস্ত উপনিষৎ

* ঐ প্রকার একত্ব-জ্ঞানের psychology or বিজ্ঞান, লেখক মহাশয় পরিস্ফুট করিয়া লিখিলে সকলের মঙ্গল হইবে; এবং ঐ বিষয়ে আমরা তাহাকে অনুরোধ করি। সং পং

পর্য্যালোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি উপদেশই সমস্ত উপনিষদের উপজীব্য। এই স্থলেই ব্রহ্মবিদ্যার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। অন্যান্য শ্রুতিবাক্য এই মহাবাক্যের কেবল এক একটী শাখা প্রশাখা মাত্র। পরন্তু সমস্ত উপনিষদের সারভূত এই 'তত্ত্বমসি' বাক্যের উপদেশে, ক্ষত্রিয়ের নাম পর্য্যন্তও পাওয়া যায় না। আরুণি স্বয়ং ব্রাহ্মণ, তিনি তদীয় পুত্র শ্বেতকেতুকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিয়াছিলেন। 'ব্রহ্মবন্ধুরিব ভবতি' এই বাক্য দ্বারা আরুণির ব্রাহ্মণত্বে সন্দেহের লেশমাত্র থাকিতে পারে না।

ছান্দোগ্যোপনিষদে বর্ণিত আছে নারদ ভগবান্ সনৎকুমারের নিকট হইতে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন। তথায় "তং স্কন্দ ইত্যাচক্ষতে" এই শ্রুতি দৃষ্ট:হয়। তাহা দ্বারা কোন কোন ব্যক্তি সনৎকুমারের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করিতেও শঙ্কিত হন না। বস্তুতঃ পুরাণাদি পাঠে সনৎকুমারকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই অবগত হওয়া যায়। পুরাণে অবগত হওয়া যায় যে, ভগবান্ সনৎকুমার দেবাদিদেব মহাদেব কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া কার্ত্তিকেয়-শরীর ধারণপূর্ব্বক তাঁহার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। "তং স্কন্দ ইত্যাচক্ষতে" অর্থাৎ সনৎকুমারকে স্কন্দ বলে, এই শ্রুতির পুরাণের সহিত এক-বাক্যতা বুঝিলে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। সনৎকুমার জন্মান্তরে মহাদেবের পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহারই নাম কার্ত্তিকেয়। একই জন্মে সনৎকুমার ও কার্ত্তিকেয়ের একত্ব কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে? প্রাচীন কোষাদিতে কার্ত্তিকেয়ের পর্য্যায়ে যেরূপ 'স্কন্দ' শব্দ পাওয়া যায়, তদ্রূপ সনৎকুমারের নাম পাওয়া যায় না। এমন কি উৎপত্তি সম্বন্ধে উভয়ের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

যদ্যপি তর্কের খাতিরে মানিয়া লওয়া যায় যে জন্মান্তরে কার্ত্তিকেয় ও সনৎকুমার একই ব্যক্তি, তথাপি কার্ত্তিকেয়ের ক্ষত্রিয়ত্ব কিরূপে সম্ভবে? কার্ত্তিকেয়ের পিতা শিব, মাতা দুর্গা; যদি ইঁহাদের ক্ষত্রিয়ত্ব সিদ্ধ হয়, তাহা হইলেই কার্ত্তিকেয় ক্ষত্রিয় হইতে পারেন। শিবের ক্ষত্রিয়ত্ব বিষয়ে কোনই প্রমাণ নাই। দেবতাগণের মধ্যে অগ্নি ব্রাহ্মণ, এ কথা উপনিষদে কথিত হইয়াছে। এ অবস্থায় যদি শিব, ক্ষত্রিয় জাতির অন্তর্ভুক্ত হন, তবে তিনি ব্রাহ্মণ, ও অগ্নি হইতেও নিকৃষ্ট হইলেন। কিন্তু কে এরূপ অসঙ্গত কল্পনা করিতে সাহসী হইবে? অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি জীব-কোটির মধ্যে পরিগণিত; সুতরাং তাঁহারা জাতি প্রভৃতি

দ্বারা পরিচ্ছন্ন হইতে পারেন। ভগবান্ শিব স্বয়ং ঈশ্বর। ত্রিগুণাতীত হইলেও যখন তমোগুণ তাঁহার উপাধি হয়, তখন তিনি 'শিব' আখ্যা প্রাপ্ত হন। তিনিই সংসার-কর্ত্তা বলিয়া কথিত হন। এবংবিধ পরব্রহ্মে, ক্ষত্রিয় জাতির পরিকল্পনা স্বস্থ ব্যক্তি কখনই করিতে পারে না। কিন্তু তাঁহারই গুণভেদে সৃষ্টিকর্তৃত্বাদি, শ্রুতিস্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে। সুতরাং জগৎ-সৃষ্টির ন্যায় তাঁহা হইতে কার্ত্তিকেয়ের উৎপত্তি-কল্পনায়, নূতন কিছুই নাই। অতএব কোন প্রমাণেই, কার্ত্তিকেয়ের ক্ষত্রিয়ত্ব সিদ্ধ হয় না। পরশুরাম, দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণ হইয়াও যখন অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তখন ষড়ৈশ্বর্য্যশালী দেবশ্রেষ্ঠ কার্ত্তিকেয় ক্ষত্রিয় না হইয়াও যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ হইবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে ?

শ্রুতিস্মৃতি পুরাণ ইতিহাস প্রভৃতি শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিলে জানিতে পারা যায়, ব্রাহ্মণ ব্যতীত কেহই আচার্য্য-পদ লাভ করিতে পারে না। সুতরাং বিদ্যাশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্যায় আচার্য্য ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপরে হইতেই পারে না, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। পূর্ব্বোক্ত অজাতশত্রুর উক্তি দ্বারা ক্ষত্রিয়ের নিকট ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন এবং ক্ষত্রিয়ের আচার্য্য পদলাভ, যে শাস্ত্র ও আচার বিরুদ্ধ, ইহা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে। পূর্ব্বে অভ্যুপগমবাদ (স্বীকার) আশ্রয় করিয়া পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা ক্ষত্রিয়গত ছিল, ইহা বলা হইয়াছে। বাস্তবিক উহা পঞ্চাগ্নিবিদ্যার প্রশংসা-সূচক অর্থবাদমাত্র। উহার তাৎপর্য্য, বিদ্যার উৎকর্ষ বর্ণনা বিষয়ে, ক্ষত্রিয়ের আচার্য্যত্ব প্রতিপাদন বিষয়ে নহে। শাস্ত্রবাক্য ও যুক্তি দ্বারা ব্রাহ্মণের আচার্য্যত্ব যখন সিদ্ধ হইল, তখন শাস্ত্রে যে স্থলে ক্ষত্রিয়ের নিকট হইতে ব্রাহ্মণের বিদ্যা-প্রাপ্তির বিষয় বর্ণিত আছে, সে সমস্ত বাক্য অর্থবাদ বা আপৎকাল-বিষয়ক বুঝিতে হইবে। ছান্দোগ্যে 'বৈশ্বানর-বিদ্যা'রও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া লইতে হইবে। বিদ্যালাভ করিতে হইলে বিনয়াদি সম্পন্ন হইতে হয়, এই আখ্যায়িকা দ্বারাই ইহাই প্রতীত হইতেছে। যদি ক্ষত্রিয়গণই আচার্য্য হইবেন, রাজা জান-শ্রুতি স্বয়ং ক্ষত্রিয় হইয়া কেন ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণ উরক্কের নিকট ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন ?

'পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা কেবল কর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, সুতরাং ক্ষত্রিয়েরা ব্রহ্মবিদ্যা আলোচনা করিতেন,' এরূপ কল্পনা করাও নিতান্ত অসঙ্গত। যেহেতু ক্ষত্রিয়দিগের রাজ্যশাসন ও যুদ্ধাদিব্যাপারে সর্ব্বদা লিপ্ত থাকা প্রযুক্ত, তাহাদের কর্ম্ম ও জ্ঞান

উভয়েব প্রাপ্তিই দুষ্কর ছিল। শাসন ও যুদ্ধাদি বহির্ব্যাপার-পবম্পরাও ব্রহ্মজ্ঞানের উপযোগী নহে। 'তমেতমাত্মান বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি, যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেন' এই বাক্যে 'বেদানুবচনেন', 'যজ্ঞেন', 'দানেন', 'তপসা' এই তৃতীয় শ্রুতি থাকায় বেদপাঠ, যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্ম ব্রহ্মজিজ্ঞাসা বা ব্রহ্মবেদনের উপযোগী বলিয়া জানা যায়। যুদ্ধাদি বাহ্যব্যাপাব পবম্পরা উপযোগী নহে। আরও বংশবর্ণনায ব্রহ্মবিৎ বহু ব্রাহ্মণেব নাম পাওয়া যায়; সুতরাং পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ কেবল কর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, একথা কিরূপে সঙ্গত হয়? যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মনিষ্ঠ ছিলেন। রাজর্ষি জনকও যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট হইতে ব্রহ্মবিদ্যালাভ কবিয়াছিলেন। তবে একশ্রেণী ব্রাহ্মণ কর্ম্মপরায়ণ, এবং আর অপবশ্রেণী ব্রহ্মপবায়ণ ছিলেন, ইহাই বলিতে হইবে।

ক্ষত্রিযেব মধ্যে বাজর্ষি জনকের ন্যায় ব্রহ্মবিৎ অন্য কেহ ছিলেন কি না সন্দেহ। তাঁহাব ব্রহ্মজ্ঞানেব বিষয়, শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদিতে বিস্তৃতভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণেব নিকট হইতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। বৃহদাবণ্যকে তৃতীয়াধ্যায়েব প্রথম ব্রাহ্মণে দৃষ্ট হয়—'ওঁ জনকো হ বৈদেহো বহুদক্ষিণেন যজ্ঞেনেজে তত্র হ কুরুপাঞ্চালানাং ব্রাহ্মণা অভিসমেতা বভূবুস্তস্য হ জনকস্য বৈদেহস্য বিজিজ্ঞাসা বভূব কঃস্বিদেষাং ব্রাহ্মণানামনূচানতম ইতি।" অর্থাৎ বিদেহবাজ জনক বহুদক্ষিণ নামক যজ্ঞ কবিয়াছিলেন, তথায় কুরু ও পাঞ্চাল দেশেব ব্রাহ্মণগণ সমবেত হইয়াছিলেন। বাজা জনক বলিলেন 'আপনারা সকলেই ব্রহ্মজ্ঞ বটে, তন্মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ?'

উল্লিখিত শ্রুতিবাক্য দ্বারা জানিতে পাবা যায় যে জনকের যজ্ঞে যে সমস্ত ব্রাহ্মণ সম্মিলিত হইয়াছিলেন, তাঁহাবা সকলেই ব্রহ্মবিৎ ছিলেন। দুঃখের বিষয়, এত বড় একটি বাজসভায় একজন ব্রহ্মজ্ঞ ক্ষত্রিয়ের আগমন ঘটে নাই। যদি তাহাই হইত, তবে উক্ত বাক্যে তাঁহারও পরিচয় পাওয়া যাইত। ক্ষত্রিয়গণই ব্রহ্মবিদ্যার আচার্য্য হইতেন, তবে এরূপ একটী ক্ষত্রিয়রাজসভায় তাঁহাদের আহ্বান হয় নাই বা কেন? জনক নিজে ক্ষত্রিয় হইয়া ক্ষত্রিয়েব নিকট ব্রহ্মজিজ্ঞাসা না করিয়া, কেনই বা ব্রাহ্মণের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন? ইহা দ্বারাও প্রমাণিত হইতেছে ক্ষত্রিয়েরা স্বভাবতঃ ব্রহ্মবিদ্যা জানিতেন না; এবং তাঁহাদেব উপদেশ দেওয়াও, শাস্ত্র এবং আচাব বহির্ভূত।

উপসংহারে ইহাই বক্তব্য বিশুদ্ধ-ক্ষত্রিয়-সন্তান জনক ব্রাহ্মণের নিকট হইতে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া আপনাকে কৃতকৃত্য বিবেচনা করিয়াছিলেন, শাস্ত্রমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ব্রাহ্মণের নিকট শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু যাঁহাদের ক্ষত্রিয়-বৃত্তি নাই, যাঁহারা ক্ষত্রিয়ের ধার দিয়াও যান না, ক্ষত্রিয়ের আচার্য্যত্ব প্রতিপাদনে যাঁহাদের বিন্দুমাত্রও লাভ নাই, তাঁহারা শাস্ত্র ও শিষ্টাচারকে পদদলিত করিয়া সমাজে বিশিষ্ট-জাতির বৃদ্ধি করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। প্রকৃত ক্ষত্রিয় কখনই ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা তিলমাত্র নষ্ট করিতে বাসনা করিবেন না। ব্রাহ্মণের রক্ষণ, ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম। কিন্তু বর্ত্তমানে অনেকে নিজকে ক্ষত্রিয় মনে করেন বটে, কিন্তু গো, ব্রাহ্মণ, শাস্ত্র প্রভৃতি রক্ষার সময়, তাঁহাদের প্রবৃত্তি অন্যরূপ দেখা যায়। কালের ভীষণ স্রোতে পড়িয়া অনেকেই প্রকৃত পথ দেখিতে পান না, তাই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের উচ্ছেদ-সাধন করিবার জন্য, অনেকেই জ্ঞাত বা অজ্ঞাতভাবে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন। ব্রাহ্মণের নিন্দা ও শাস্ত্রের নিন্দা আজকাল এক প্রকার সভ্যতার লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। এই সমস্ত লোক নিজেও সনাতন পথ হারাইযাছে। এবং অপরকেও সেই পথ হইতে ভ্রষ্ট করিতেছে। এই ভীষণ দুর্দ্দিনে অধর্ম্মের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য, আস্তিক মাত্রের যত্নবান্ হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

ব্রাহ্মণের অলৌকিক ত্যাগ-স্বীকারের ফলে আজিও ভারতে শান্তি-প্রস্রবণ প্রবাহিত হইতেছে। আজিও ব্রাহ্মণের অমূল্য তপস্যার ফলে, আর্য্যজাতি অকাল মৃত্যু, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি আধিব্যাধির অতীত এক প্রধান লক্ষ্যে ধাবিত হইতেছে। যাহা কিছু আর্য্যজাতির গৌরবের বস্তু, ব্রাহ্মণ-জাতিই তৎসমুদায়ের মূল। এ অবস্থায় যাহারা বরেণ্য ব্রাহ্মণজাতির উপর কটূক্তি বর্ষণ করেন, তাঁহারা বিবেচনা করিয়া ধর্ম্মের ভিত্তিতে ঐ প্রকার আঘাত দিবেন। অদ্য এই পর্য্যন্ত। অতঃপর ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারাদি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে।

কাব্য-সাংখ্য-বেদান্ত-মীমাংসাতীর্থোপাধিক
শ্রীঅক্ষয়কুমার শাস্ত্রী।

বালিকার স্তুতি।

(অষ্টম-বর্ষীয়া বালিকা প্রণীত।)

আসিছে আনন্দময়ী এ বঙ্গ-ভবনে!
আনন্দিত বঙ্গবাসী, শুভ-আগমনে,
মঙ্গলদায়িনী মা'য়ে করিতে পূজন,
দুঃখ, দৈন্য, নব-বাসে করি আবরণ,
আবাল বনিতা বৃদ্ধ হরষে মগন।
বিপনি, আপন-মালা বিলাস-সম্ভারে
সুসজ্জিত হইয়াছে, আজি থরে থরে।
ভিক্ষুকে গাহিছে ওই 'আগমনি' গান,
প্রবাসী ছুটেছে গৃহে, আনন্দিত প্রাণ।
প্রকৃতি বরষা-স্নাতা, নয়ন-রঞ্জন
শ্যামল হরিত-বাসে সেজেছে কেমন।
পূর্ণ সরোবরে শোভে প্রফুল্ল নলিনী,
মেঘ-মুক্ত রবি-করে উজ্জ্বল ধরণী,
শারদ-চন্দ্রমা শোভে সুনীল গগন
কুসুম সুবাস ল'য়ে বহে সমীরণ!

(২)

বিমল আনন্দ ধারা করিয়া প্রদান,
যুগে যুগে দেব নরে করিয়াছ ত্রাণ,
প্রাতঃ-সন্ধ্যা বঙ্গবাসী, তাই ভক্তিভরে
জননী আনন্দময়ি! স্মরে গো তোমারে।
সম্মিলিত-দেবগণ-তেজঃপুঞ্জ মিলে
মহা-তেজোময়ী দেবী, সমুদ্ভূতা হ'লে;
সমগ্র অমরবৃন্দ দুর্গতি নাশিতে,
সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বৈশ্বর্য্য অর্পিয়া তোমাতে,
মহাশক্তি-রূপে মাগো পূজিলা তোমারে।

(৩)

হে জননী মহাদেবী সর্ব্বার্থ-সাধিকে !
দুর্গতি বিনাশি, ধন দিয়েছ যাহাকে—
শক্তি ও গুণের ক্রিয়া নিরুদ্ধ করিয়া,
উভয়ের আয়োজনে উন্মত্ত হইয়া,
জীবের কল্যাণ-হীন অনুষ্ঠান ভবে,
তামসিক পূজা তব আজি তার ঘরে।
বরদে গো ! তব পদে যাচি এই ভিক্ষা,
দুর্গতি-বিনাশি-মন্ত্রে দাও মাগো দীক্ষা,—
সিদ্ধি, ঋদ্ধি জ্ঞান, শক্তি মহামূর্ত্তি মাঝে,
নিত্য শুভময়, গূঢ় মহাতত্ত্ব বাজে।
মোহ-নিদ্রা অপসৃত করি, মহামায়া !
অজ্ঞান-আঁধারে জ্যোতি বিকাশ করিয়া,
জ্ঞানময়ি ! জ্ঞানানন্দ করি বিতরণ,—
সে তত্ত্বের আবরণ কর উন্মোচন !

(৪)

প্রদীপ্ত উৎসাহ, মরি কি মহিমাময়,
নীচতা, হীনতা, পাপ ভয়েতে লুকায়।
জড়তা, বিপদ, দৈন্য, হিম-অবসাদ,
দূরে যায়, পেয়ে তব চরণ-প্রসাদ।
জীবসেবা ভিন্ন নাহি হইবে সাধন—
পরমার্থ শিব-সেবা, অশিব-নাশন।
ধনে, ধান্যে, শৌর্য্যে, বীর্য্যে, জ্ঞানে অতুলন
ধরামাঝে ছিল, ধন্য ভারত ভুবন,
সেবার অভাবে আজি কি দশা তাহার,—
গৌরব-সমাধিক্ষেত্র, হইয়াছে সার!

অর্পিতে তোমার ওই চরণকমলে
অদেয় ছিলনা কিছু এ মহীমণ্ডলে।

(৫)

বিদেশী, ছুটিয়া আসি করুণ হৃদয়ে,
বর্ত্তমান দুর্দ্দশায় ব্যথিত হইয়ে,—
কায়, মন, বাক্য, ধন, করি নিবেদন,
করিল কি সুকঠোর তপস্যা সাধন!
তবুও মা জাগেনা'কো ঘরের সন্তান,—
দেশের দুর্গতি হেরি, কাঁদেনা পরাণ!
কোন্ শক্তি আছে মাগো, এই বঙ্গভূমে,
নিয়োজিত হবে, যাহা তব পূজা তরে;
বর্জ্জিত বাণিজ্য কৃষি, রুদ্ধ ঋদ্ধি-দ্বার;
শক্তি, সিদ্ধি, ঐক্য বিনা হয়না সঞ্চার।
কুহেলি তিমিরাবৃত জ্ঞান-বিভাকর
অশেষ দুর্দ্দশাপন্ন, ভারতের নর।
দেবভাষা, ধর্ম্মভাব, করিয়া বর্জ্জন,
নবীন সভ্যতা-স্রোতে হইয়া মগন,
বিলাসের হুতাশনে যোগায় ইন্ধন,
ব্রহ্মচর্য্য-হীন-বিদ্যা করিছে অর্জ্জন।
কি দরিদ্র, মধ্যবিত্ত, বাসনা সবার,
পাশ্চাত্য বিজ্ঞানলব্ধ ভোগ্য-উপচার!
জ্ঞান, কর্ম্ম, শিব-শক্তি, এই ধ্রুব নীতি
শিক্ষা দিলে আর্য্যগণে নাশিতে দুর্গতি,
ঘুচাতে দেশের এই মহা-দুখভার
নব দুর্গোৎসব, দুর্গে! হউক প্রচার।

কুমারী নির্ম্মলা বসু।

উপনিষদের ধর্ম্ম।

(১)

'মানবের সভ্যতা কোন্ সময়ে অত্যুন্নত অবস্থায় উপনীত হয়' এই প্রশ্নের উত্তর যদি কেহ এইরূপ দেয় যে—যখন মানব পরের জন্য স্বার্থত্যাগ করিয়া আত্যন্তিক তৃপ্তিলাভ করে, তখনই মানব পূর্ণ সভ্য,—তাহা হইলে বোধ হয় কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তিই আপত্তি করিতে উদ্যত হয়েন না। দেবতার উপাসনা লইয়া মানুষের মধ্যে বিস্তর মতভেদ। কেহ দেবতার অস্তিত্ব মানে না, কেহ অস্তিত্ব মানে, কিন্তু উপসনার আবশ্যকতা বোধ করে না। কাহার মতে দেবতা এক; কেহ বলে দেবতা নানা। কেহ বলে একটী দেবতারই উপাসনা করিতে হয়; কেহ বলে সকল দেবতাই উপাস্য; আবার কাহারও মনে নিজের কুলদেবতাই উপাস্য। কেহ বলে 'যাহাকে ভাল লাগে, সেই দেবতার উপাসনা করিলে চলিতে পারে।' কেহ বলে 'দেবতার উপাসনা নিকৃষ্ট অধিকারীর কর্ত্তব্য।' আবার কাহার মতে 'জ্ঞান হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট সকল অধিকারীরই পক্ষে দেবতা উপাস্য',—ইত্যাদি মতভেদ যে কত প্রকার তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু স্বার্থত্যাগের আদর্শকে উপাসনা করিতে, সকল সভ্য মনুষ্য-সমাজই "অহমহমিকার" সহিত আগ্রহে অগ্রসর। ঐশ্বর্য্যের বিচিত্র শক্তি দেখিয়া মানব বিস্মিত হয়, বা ভয় করে। সম্পদের অত্যাধিক্য দেখিয়া মানব স্তম্ভিত হয় বা ঈর্ষা করে। বিদ্যা বুদ্ধি ও শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়া, অসমর্থ ব্যক্তি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া প্রশংসা করে; আর সমর্থ অথচ অকৃতার্থ ব্যক্তি, হৃদয়ে মৎসরের অনল পোষণ করিতে করিতে বাহিরে কৃত্রিম স্তুতিবাদ করে। কিন্তু আত্মত্যাগের দৈবী-বিভূতি দেখিতে পাইলে, পূর্ব্বোক্ত সকল শ্রেণীর মানবই কৃতজ্ঞতা-ভাবে নম্র হয়, এবং ভক্তিভরে আগ্রহের সহিত উপাসনা করিতে উদ্যত হয়। ইহার দৃষ্টান্ত সকল সভ্য মানব-সমাজেই জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। আমরা আমাদের অমর-কীর্ত্তি পূর্ব্বপুরুষগণের সভ্যতার পরিমাণ করিতে অগ্রসর হইয়া যখনই বৈদিক সাহিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করি, তখনই এই আত্ম-ত্যাগের দৃঢ় বিস্তৃত ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত প্রাচীনতম আর্য্য-

সভ্যতার বিশ্ব-বিস্ময়কর মহিমা বিলোকন করিয়া যুগপৎ বিস্ময় হর্ষ ও ভক্তিভরে জড়ীভূত হইয়া পড়ি। উপনিষৎসমূহের মধ্যে বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ যে একখানি অতি প্রাচীন উপনিষদ্, সে বিষয়ে বোধ করি কাহারও বিমতি নাই। সেই বৃহদারণ্যকে এই স্বার্থত্যাগের উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিতে যাইয়া, শ্রুতি কি বলিতেছেন শ্রবণ করুণ ;—

"তদেতদেব এষা দৈবী বাগনুবদতি স্তনয়িত্নুর্দদদইতি; দাম্যত দত্ত দয়ধ্বং; তদেতত্ এয়ং শিক্ষেৎ দমং দানং দয়ামিতি।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে—'ঐ মেঘরূপে দেবতার বাণী সেই একই কথা বলিয়া থাকে; কি বলে? বলে 'দ' 'দ' 'দ'; অর্থাৎ দম (ইন্দ্রিয়-দমন) কর, দান কর, এবং দয়া কর। এই তিনটীই অর্থাৎ দম, দান ও দয়া, মানব শিক্ষা করিবে।" মুসা, বুদ্ধ, ঈশা বা মহম্মদের জন্মিবার কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, জলধারার ধীর গম্ভীর ধ্বনিতে, ভারতের পূত-হৃদয় ঋষিকুল এই 'দ'কারত্রয় শুনিতে পাইয়া মানব-জীবনের কর্ত্তব্য নির্ণয়ে সমর্থ হইয়াছিলেন,—তাহা নির্ণয় করিয়া বলিতে পারে, এমন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ এখনও কেহ জন্ম গ্রহণ করেন নাই।

মানব সভ্যতার এই সুদৃঢ় ও বিস্তৃত ভিত্তির আবিষ্কার করিতে যাইয়া, প্রাচীনতম ঋষিকুল কতকাল ধরিয়া তপস্যা ও সমাধি নিরত ছিলেন তাহার নিরূপণ করিবার উপায় নাই। কিন্তু মানবীয় উৎকর্ষের যে চরম সীমা এই উপনিষদ্ মন্ত্রের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে, ও তাহা হইতে উচ্চতর সীমা এ পর্য্যন্ত কোন মানব-শ্রেষ্ঠ আর প্রদর্শন করাইতে সমর্থ হয়েন নাই,—ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে।

বাস্তব কথা বলিতে কি, দম দান ও দয়া এই তিনটী বস্তুই স্বার্থত্যাগেরই প্রকার ভেদ ছাড়া আর কিছু নহে। দম কি? 'ইন্দ্রিয়ের উচ্ছৃঙ্খলতা বা যথেচ্ছাচারিতাকে নিরুদ্ধ করাই' দম। এই দমই ত স্বার্থত্যাগের প্রথম সোপান! জন্মের সঙ্গে সঙ্গে, মানব দেহ ও ইন্দ্রিয়-সমূহে আত্মাভিমান লইয়াই শরীর-গ্রহণ করে। দেহ ও ইন্দ্রিয়ের প্রতি এই আত্মাভিমান যত প্রবল হইবে, ততই আমাদের যথেচ্ছাচারিতা বা ইন্দ্রিয়ার্থপরতা বাড়িতে থাকিবে, ইহা কে না স্বীকার করিবে? সেই ইন্দ্রিয় ও মনকে নিরুদ্ধ করিতে হইলে, নিজের চিরাভ্যস্ত এবং চিরাকাঙ্ক্ষিত সুখ পরিত্যাগ করিতেই হইবে। জগতে, নিজের

সুখের মাত্রা ও স্পৃহা যতই বাড়াইবার চেষ্টা করিবে, ততই অপরের স্বার্থের হানি হইবে। সুতরাং অপরের দুঃখের পথ সঙ্কুচিত করিয়া, তাহার সুখের পথকে প্রশস্ত করিবার জন্য, আত্ম-বিসর্জ্জন আবশ্যক। এই আত্মবিসর্জ্জন বা স্বার্থত্যাগ অভ্যাস করিতে হইলে, নিজের সুখ-লালসা কমাইতে হইবে; নিজের ভোগোন্মুখ ইন্দ্রিয়-নিচয়ের যথেচ্ছাচারিতা ক্রমে ক্ষীণ করিতে হইবে। এই প্রকার মনের ও বহিরিন্দ্রিয়ের দমন বা যথেচ্ছাচারিতার নিগ্রহই দম। সুতরাং দম, স্বার্থত্যাগেরই একটী ভাবান্তর ভেদ। তাহার পর, 'দান কর'। দান করিতে হইলেও স্বার্থত্যাগ যে একান্ত আবশ্যক, তাহা বিশদ করিয়া বুঝান নিষ্প্রয়োজন। প্রাণপণে আমরা যাহা অর্জ্জন করি, যাহার প্রভাবে সম্পদে আমার জন্য সকল সুখের দ্বার উন্মুক্ত, আর যাহার সাহায্যে এ জগতে সর্ব্বপ্রকার বিপদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব-পর মনে করি, সেই অর্থকে অপরের অভাব দূর করিবার জন্য অকাতর-ভাবে বিসর্জ্জন করিতে হইলে, স্বার্থত্যাগ-প্রবৃত্তি কত বলবতী হওয়া উচিত, ইহা দাতা ছাড়া অপরে কে বুঝিবে! তাহার পর তৃতীয়, দয়া। এই দয়াই স্বার্থ-ত্যাগের পরা-কাষ্ঠা। আত্ম-বিস্মৃতি বা "আমিত্বের প্রসার" এই দয়ারই নামান্তর। পরের আত্মার সহিত নিজের আত্মার ভেদ-জ্ঞান যে পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিবে, সে পর্য্যন্ত মানবের দয়া পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। পরের চক্ষে জল দেখিলে নিজের চক্ষে যে জল পড়ে; পরকে রোদন করিতে দেখিয়া, নিজে যে না কান্দিয়া থাকিতে পারা যায় না; অপরের বিপদ্-সমুদ্র দেখিয়া, তাহাতে নিমগ্ন হইয়া পরকে উঠাইবার যে প্রাণের ব্যাকুলতা, তাহা পরকে 'পর' বলিয়া মানব যতক্ষণ ভাবে, ততক্ষণ হইতে পারে না। সুতরাং এই দয়া স্বার্থ-ত্যাগের চরম-ভূমি। এই ভূমিতে মানব যখন উপনীত হয়, তখন মানব আর মানব থাকে না; সে তখন দেবতা। এক কথায়, সে তখন জীবজগতের আত্মা। এই জীব-নিবহের আত্মা হইতে গেলে, যে জাতীয় দার্শনিক চিন্তার আবশ্যকতা, অদ্বৈত-বাদই আমাদিগের মধ্যে সেই দর্শনের উপদেশ দিয়াছে। অদ্বৈতবাদের পূর্ণ বিকাশ বৈদিক যুগে হইয়াছিল। তাই বৈদিক যুগের ঋষিগণ মেঘের অব্যক্ত ধ্বনিতেও শুনিতে পাইতেন,—"দম, দান ও দয়া"। এই দম, দান ও দয়া রূপ ত্রিধাবিভক্ত আত্মত্যাগ বা আমিত্বের প্রসার-রূপ মহাধর্ম্ম, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের এক ভিত্তি। এই ভিত্তির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, যাহারা

বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সংস্কার বা উন্নতি প্রার্থনা করেন, তাঁহারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সংস্কারক নহেন; তাহাঁরা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সংহারক।—থাক্, আজ আর সে কথা বলিব না। আবার অবসর হইলে, এই বেদোক্ত স্বার্থত্যাগরূপ মূল-ধর্ম্মের সহিত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের প্রকৃত সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য চেষ্টা করিব।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

সৃষ্টি-বৈচিত্র।

খনির তিমিরে মণি সাগরের তলে নিধি,
প্রকৃতির এ সম্পদ কেমনে গড়িলে বিধি?
এই যে শ্যামল ক্ষেত্র, পার্শ্বে নদী কালো জল,
পশ্চিমে সুনীল গিরি, ঊর্দ্ধে নীল নভস্তল,
এই যে নিদাঘ শেষে বরষা জলদ-রাশি,
নিশার আঁধার পরে, প্রভাতের শুভ্রহাসি,
শিশির তুষার গেলে, মাধবের মধুবায়
মৃদু মৃদু সন্ধ্যালোকে কি পুলকে গাণে গায়।
তামসী যামিনী গতে, এই যে জ্যোছনা-রাতি,
এই যে গগন-গায় অগণিত জ্বলে বাতি,
এই যে মালতী বেলা পারুল যুথিকা যাঁতী;
শেফালী রজনীগন্ধা গোলাপ কানন ভাতি,—
এই যে পতঙ্গ কীট, সুচিত্রিত প্রজাপতি,
বিহঙ্গ মধুর-বাক, কুরঙ্গ চটুল-মতি,
এই যে শ্বাপদ কুল নয়ন-মোহন-কর,
অরণ্য প্রান্তর মরু, এই উৎস সরোবর,
এই যে শতধা ধ্বনি উঠিতেছে অহরহঃ
প্রাণারাম কেহ তা'র, কেহ তা'র ভয়াবহ,
সবার উপরে, এই মানবের মহাপ্রাণ
কোথা হতে পেলে, বিধি! এ সর্ব্বের উপাদান?

(২)

সুমেরু শিখর পরে, মৃদু মন্দাকিনী তীরে
স্তূপাকারে ফলেছে কি নন্দন-মন্দার শিরে ?
সুরভির প্রতিরোমে বিন্দু বিন্দু সুধাক্ষীরে,
দেবতার ভাষে হাসে নিশ্বাসে নয়ন নীরে ?
কে দিল সে মহাশক্তি, কে দিল সে মহাপ্রাণ ;
কে দিল বিপুল পুণ্য, রচনা-নিপুণ-জ্ঞান ?
জানিনা কেমনে, তুমি এ বিশ্ব নিখিল গড়,
নির্জ্জীবে জীবন দেও, সজীবনে কর জড় ?
অথবা আপনি তুমি আপন কল্পনা বলে
ছড়ায়ে পড়িলে, বিশ্বে, স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতলে,
বিহঙ্গে, পতঙ্গে, কীটে, কুরঙ্গ, শ্বাপদে, নরে,—
সচেতনে, অচেতনে উদ্ভিদে, অমরে, মরে।
ভুলিলে আপনা তুমি, আপনার লীলা বশে
সুখে দুঃখে, পাপে পুণ্যে হিংসা, দ্বেষে প্রীতিরসে ?

(৩)

তোমার একত্ব, নাকি, ভাঙ্গিয়াছ স্ব ইচ্ছায়,
সৃষ্টিরূপে 'বহু' হয়ে জনমিলে কল্পনায়,
রহিলে, বাড়িলে, তুমি, জরিলে, মরিলে, প্রভু !
শতবার, লক্ষবার, লীলা নহে শেষ তবু ?
আনিলে তাহার মাঝে কাল্পনিক 'কর্ম্মফল',
হাসিলে খেলায় হাসি, ফেলিলে নয়ন জল।
কেমনে ভাঙ্গিবে ঘুম, স্বপন ছাড়িবে চোখে ?
জীবনের অন্ধকার ঘুচে যাবে, কি আলোকে ?
কেমনে আবার তুমি, দাঁড়াইবে এক হয়ে,
মিলাবে সমগ্র সৃষ্টি, 'দ্বন্দ্বাতীত-বোধ' হয়ে ?
প্রকাশিবে পূর্ণানন্দে উছলিয়া দেশ, কাল,—
চরাচর এই বিশ্ব, সংসার মায়ার জাল ?

শ্রীনলিনীমোহন মুখোপাধ্যায়

জগদম্বার মানসপূজা।

(তন্ত্রোক্ত মানসপূজা অবলম্বনে লিখিত)

ওঁ নমঃ পরমদেবতায়ৈ।

মা, আজি শরৎ আসিয়াছে। জগদম্বে! তুমি আসিবে বলিয়া, আজি সমস্ত বিশ্বের অভ্যন্তরে কি এক অপূর্ব্ব আনন্দোচ্ছ্বাস উত্থিত হইয়াছে। তাহারই বাহ্য বিকাশে, আজি আকাশ এত নির্ম্মল, সমীরণ এত সুখস্পর্শ, চন্দ্র এত হাস্যময়, চন্দ্রিকা এত স্বচ্ছ ও শীতল, সলিল এমন প্রসন্ন ও মধুর, ধরা লতা-কুসুমরাজির সৌন্দর্য্যে এত অলঙ্কৃত। সমস্ত 'বিশ্ব' আজি তোমাকে পূজা করিবার জন্য আনন্দে উৎফুল্ল ও আকাঙ্ক্ষায় উজ্জীবিত।

মা, তুমি ত আমার ক্ষুদ্র আবদ্দেবে বিশিষ্ট 'আমি'টাকে নিলে না। না নেও, যতদিন তোমার ইচ্ছা না হয় ততদিন ওটাকে রাখিয়া দেও। ইচ্ছাময়ী তুমি, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। তা' মা, যদি ওটাকে রাখিয়াই দিলে, তবে তোমার পূজা ও সেবা করা ভিন্ন, উহার যেন আর কোন কর্ত্তব্য না থাকে।

আজি সুখের শরৎ-সমাগমে সমস্ত 'বিশ্ব' তোমাকে পূজা করিতে উদ্যত। অতএব, হে জগদাহ্লাদজননি! তোমার এই দীন-সন্তানের পূজা গ্রহণ কর।

এস মা! কোথায় আসিবে তুমি? তুমিত' অন্তর ও বাহির সকলই পূর্ণ করিয়া বসিয়া আছ, তবে তোমার আবার আবাহন কি? তোমার আসা যাওয়া কি? তুমি যে সর্ব্বত্র সমভাবে আছ। তথাপি, হে জগৎ-রঞ্জনকারিণি, তাহারই মধ্যে একটু বিশেষ-রূপে আইস; নতুবা তোমার পূজা ত' সম্ভব হয় না।

এস মা! কোথায় তোমার আসন দিব? তুমিত' 'সর্ব্বাধার'. সবই ত তোমার প্রকাশ-ক্ষেত্র! তবে তোমার আবার আসন কোথায়? তবু এস। আমি জন্ম-জন্মান্তর হইতে,—কত অগণিত কাল হইতে—তোমারই জন্য হৃৎপদ্মাসন পাতিয়া আছি;—অতি যত্নে, অতি সন্তর্পণে, তাহার সমস্ত কঙ্কর প্রস্তরাদি কঠিন পদার্থগুলি বাছিয়া ফেলিয়া, তাহা কোমল হইতে কোমলতর করিয়া রাখিয়াছি। সেইখানে আসিয়া ব'স মা, তোমার কোন কষ্ট হইবে না। হে সুকুমারি! অন্য কোথায়ও বসিও না। তোমার সুকুমার অঙ্গে কঙ্কর বিঁধিবে।

আসিলে মা! এক্ষণে কি দিয়া তোমাব পাদ্য বচনা করি? তুমি যে অতি স্বচ্ছ, অতি নির্ম্মল, অতি শুদ্ধ। তোমার আবাব পাদ্য, অর্ঘ্য, স্নান, আচমন কি? তবু মা কিছু লইতে হইবে। অন্য বাবি তোমাব পাদ্য হইতে পারে না; তাহাতে তোমাব নির্ম্মল নিষ্কল পা' দুখানি মলিন হইবে। তাই মা—তুমি যখন আমাব সহস্রাবে পবম শিবেব সহিত সঙ্গত হও, তখন যে অমৃত ক্ষরিত হয়, তখন যে নির্ম্মল জ্ঞানানন্দঘন বস নির্গত হয়,—তাহাই আমি তোমারই জন্য কুণ্ডলী-পাত্র ভরিয়া অতি যত্নে সঞ্চিত করিয়া বাখিয়াছি। সেই অমৃত-বাবিব কিয়দংশ দিয়া, তোমাব সুন্দব পা' দুখানি ধুইয়া দিই, ও তাহাবই অবশিষ্টাংশ দিয়া তোমাব আচমন ও স্নান কবাইব।

মা, কি দিয়া তোমাব অর্ঘ্য বচনা কবি? আমাব ত' কোন মূল্যবান্ দ্রব্য * নাই। মা, তুমি যে আমাকে সংকল্প-বিকল্পাত্মক মনটা দিয়াছ, সর্ব্বাত্মিকে! সে তোমাব ত' সেই সর্ব্বাত্মক ভাব দেখিতে দেয় না; শুধু বহুত্বেব ও নানাত্বেরই কল্পনা কবিয়া তোমায় 'পবমাদ্বয়তা শিবা'-ভাব ডুবাইয়া দিয়া সে আমাকে সদাই জ্বালাতন করে। তথাপি, হে বিকল্পাতীতে! আমি সেই বহুত্বের মূল্য বা মান-নির্দ্দেশকাবী মনটাকেই বহুমূল্য বলিয়া ধবিয়া থাকি। আজি আমাব সেই 'বহুমূল্য' মনটাকেই তোমায় নিবেদন কবিতেছি, তুমি সে'টাকে অর্ঘ্য-স্বরূপে গ্রহণ কব, তাহাকে গ্রহ বা ক্ষেত্ররূপে স্বীকাব কর; আমার সমস্ত জ্বালা জুড়াইয়া যাক্।

হে সর্ব্বাবরণহীনে! তোমাব আবাব বস্ত্র কি? তত্রাপি হে দিগম্ববি! তোমারই প্রণীত অতি সূক্ষ্ম, অতি নির্লিপ্ত ও সর্ব্বতোব্যাপী আকাশ-তত্ত্বই, আজি তোমাব বসন হউক! সে বসনে তোমাব সর্ব্বাত্মিকা-ভাব আবৃত হইবে না, অথচ আমাদেব ক্ষুদ্র আঁখিব দর্শন লাভ হইবে। তুমি নির্লেপ! তোমার আবাব গন্ধের প্রয়োজন কি? তথাপি হে পুণ্যে, হে সর্ব্বপুণ্যগন্ধময়ে! যে গন্ধ-তন্মাত্র দ্বাবা তুমি এই ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড প্রকট করিয়াছ, সেই গন্ধ-তত্ত্বই আজি গন্ধ-স্বরূপে গ্রহণ কর।

তুমি বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য্যের একমাত্র উৎপত্তি স্থল; বিশ্ব তোমারই অপরিমেয় কা'ম-সংকল্প-হীন সৌন্দর্য্যেব চিত্র মাত্র। তোমাকে আমি পুষ্পাদি দিয়া কি

* অর্ঘ ধাতুব অর্থ মূল্য।

সাজাইব? তথাপি, হে সৌম্যে, হে জগদেকসুন্দরি! আমি তোমার জন্য অতি যত্নে নানা ফুল তুলিয়া রাখিয়াছি। তন্মধ্যে, আমার চিত্তই প্রধান পুষ্প; আমার অমায়া, অনহঙ্কার, অরাগ, অমদ, অমোহ, অদম্ভ, অদ্বেষ, অক্ষোভ, অমাৎসর্য্য, অলোভ,এই দশটী ক্ষুদ্র পুষ্প; ও আমার অহিংসা, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ,দয়া,ক্ষমা ও জ্ঞান এই পাঁচটী বৃহৎ পুষ্প। আজি তোমার চরণে এই কত শত জন্মে অর্জ্জিত সযত্ন-সঞ্চিত, ভক্তি-শিশির-সিঞ্চিত কুসুম-রাশি নিবেদন করিয়া কৃতার্থ হই। মা, এ গুলি যদি তোমার সেবায় না লাগিল, তবে এ গুলির প্রয়োজন?

মা! তোমারই সৃষ্ট গন্ধ-তত্ত্ব-বিকার আমার এই দেহ, যে পঞ্চ-প্রাণ দ্বারা নিরত ধূপিত হইতেছে, তোমার ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি বিশ্বাত্মিক ভাবে তাপিত ও ব্যক্ত হইতেছে। হে সুমুখি, আজি তোমার পূজার জন্য, আমার সেই দেহ তোমার ধূপের কার্য্য করুক! তোমার পরাভাবের গন্ধরূপ প্রথম ভাব-সঙ্কেত সর্ব্বজীবে প্রকট হউক।

তুমি স্বপ্রকাশা! কোন্ দীপের দ্বারা তোমার প্রকাশ-সম্ভাবনা। তত্রাপি তোমারই সৃষ্ট তেজস্তত্ত্ব আজি কথঞ্চিৎ রূপে দীপ-রূপে তোমার ব্যঞ্জনা সম্পাদন করুক।

হে নিত্যতৃপ্তে, তোমার ত নৈবেদ্য সম্ভব হয় না। তত্রাপি হে জগতের তৃপ্তি-স্বরূপিণি! তুমি যে রসতত্ত্ব সৃষ্টি করিয়া সমস্ত ভূতের তৃপ্তি বিধান করিতেছ, সেই রস-তত্ত্বই, আজি তোমার নৈবেদ্যে নিযুক্ত হউক।

হে সৌমে, হে জগতের একমাত্র আরাম-ভূমি। তোমাকে বীজন করিতে আমি কোথায় কি পাইব? যে স্পর্শ-তন্মাত্র দ্বারা তুমিই সমস্ত বিশ্বকে বীজন করিতেছ, হে সর্ব্বমঙ্গলে, আজি সেই বায়ু-তত্ত্বই চামর হইয়া তোমায় বীজন করুক।

হে সর্ব্ব-সৌভাগ্য-সুন্দরি! আজি সর্ব্ব জগতের প্রকাশ-স্বরূপ ভগবান্ সূর্য্যদেব তোমার দর্শন হউন; সমস্ত বিশ্বের শৈত্য-বিধায়ক ভগবান্ শীত-কিরণ চন্দ্রমা, আজি তোমার ছত্রের কার্য্য করুন। হে সৌম্যা-সৌম্যতরা-শেষ-সৌম্যেভ্য-স্থতি-সুন্দরি, তোমার আবার অলঙ্কার কি? তত্রাপি তুমি যে জগতের সুষমা-রাশি হইয়া বসিয়া আছ, প্রত্যেক জীবের ভিতর দিয়া বিকীর্ণ হইতেছ, সেই জগৎ-ভরা সুষমা-রাশি আজি তোমার মেখলা হউক। আর তুমি যে আনন্দরূপিণী

হইয়া সমস্ত বিশ্বকে এক আনন্দসূত্রে গাঁথিয়া বাখিয়াছ, সেই বিশ্বমোহন অথচ বিশ্বাতীত আনন্দ আজি তোমার হাব হউক। হে মঙ্গলময়ি, কি এক মঙ্গল নিক্বণে আজি তুমি সমস্ত জগৎ মোহিত কবিয়া নিজেব প্রতি আকর্ষণ করিতেছ। হে জগন্মোহিনি! হে জগদাকর্ষণকবি! সেই তোমার মঙ্গলোৎসবে আমি কি সামান্য ঘণ্টা-নিনাদে, তোমাব সেই সর্ব্বমঙ্গলা ভাবেব ঘোষণা করিব? আজি তোমাব সৃষ্ট সেই বিশ্বের হৃদয়োত্থিত পরমাদ্বয়তা-রূপ অনাহত-ধ্বনিই তোমার ঘণ্টা-নিনাদ হউক।

হে মহামায়ে, তুমি আমার ইন্দ্রিয়েব ও মনেব যে চাঞ্চল্য—যে স্পন্দন-প্রবণতা দিয়াছ, তাহাই আজি তোমার মঙ্গলোৎসবে নৃত্য-কার্য্য করুক। সেই চাঞ্চল্য যেন, আব তোমা ব্যতীত অন্যদিকে প্রধাবিত না হয়, তুমি সেইরূপ বিধান কর।

মা, আমাব কাম ও ক্রোধরূপ দুইটী ছাগ আছে। তাহারা নিয়তই বিষয়-রসে পবিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত। বাহ্য 'বহুব' ভাবে জায়মান হইয়াও, তা'বা সম্পূর্ণ-ভাবে প্রকট হয় না বলিয়া, তাহাদিগেব প্রসব-ধর্ম্ম বোধ কবিতে পাবি না। হে 'সর্ব্ব'-গ্রাসিনি, সেই সুগঠিত ও সুপরিপুষ্ট, অজ, ছাগ-যুগলকে তুমি বলি-স্বরূপে গ্রহণ কর। আর ঐ সঙ্গে সঙ্গে আমাব বিশিষ্ট অহং-ভাবেব স্থাপযিতা, অহঙ্কাবরূপ যে প্রকাণ্ড বুদ্ধিহীন ও বলদৃপ্ত মহিষটী আছে, হে মহিষমর্দ্দিনি! ঐ সঙ্গে সঙ্গে সেটাকেও প্রধান বলি-স্বরূপে আত্মসাৎ কব। তোমাব 'আমিতে' লয় কর।

মা, এখন তোমার মন্ত্র জপেব জন্য কি মালা আহবণ কবি? হে সংসারৈক-সারে! সামান্য মালা দ্বাবা তোমার মন্ত্রেব জপ হয় না। তুমি নিজে, প্রকাশ-ক্ষেত্রে, যে পঞ্চাশৎ প্রকাশ-কেন্দ্রে পঞ্চাশৎ মাতৃকা-বর্ণ-রূপে প্রকটিত হইয়া আছ, আজি তাহাতে তোমাব 'নাদ-শক্তি' প্রভৃতি ব্যক্তভাব সহিত 'কলা' 'মাত্রা' ও 'বিন্দু' সংযুক্ত করিয়া, চেতনার কুণ্ডলী-সূত্রে গাঁথিয়া, যেন মালা প্রস্তুত করিতে পারি। হে মহাযোগিনি, তাহাবই অনুলোম ক্রমে তোমাব মন্ত্র জপে, আমি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে তোমার সর্ব্বাত্মিকা-রূপ দর্শন করিযা কৃতার্থ হই; ও হে মহা-বিদ্যে! তাহারই বিলোম-ক্রমে তোমাব মন্ত্র-জপে প্রপঞ্চ হইতে প্রপঞ্চাতীত যে তোমার অমাত্র পরমরূপ আছে, তাহা লক্ষ্য করিয়া প্রপঞ্চকে তোমাতে

যেন হারাইয়া ফেলি। হে সর্ব্বান্তরাত্মনিলয়ে, হে স্বান্তঃ-জ্যোতি-স্বরূপিণি, হে জগদম্বে! আমার এই অন্তর্জপ গ্রহণ কর।

তুমি বেদ-বাক্যের অতীত। আমি এমন কোন কথা পাই না, যাহা দ্বারা তোমার স্তব রচনা, ও তোমার নিষ্কল মহিমা প্রকট করি। তুমি সমস্ত বিশ্ব ভরিয়া দাঁড়াইয়া আছ, আমি এমন স্থান পাই না, যেখানে দাঁড়াইয়া তোমাকে প্রণাম করি। তুমি অন্তর ও বাহির পূর্ণ করিয়া বিরাজ করিতেছ, তোমাকে আমি কোথায় বিসর্জ্জন করি? অতএব হে শিবে, তোমার স্তব, প্রণাম ও বিসর্জ্জন করা দায়; সেইজন্য স্তবের ভার যেন বিশ্ব গ্রহণ করে। সর্ব্বজীবে ও সর্ব্বভাবে যেন, তোমাকে সর্ব্বজীবের মঙ্গলার্থ আমি বিসর্জ্জন করিতে পারি। তা'তে যদি দোষ হয়, তবে আমার সেবাপরাধ লইও না। হে সর্ব্ব-লক্ষ্মীময়ি, তুমি আমার হৃদয় ভরিয়া নিরন্তর বিরাজ কর; আমি কোন কথা কহিব না, কোন চেষ্টা করিব না; কেবল কল্প-কল্পান্ত ধরিয়া তোমার অনুপম সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া কৃত কৃতার্থ হইব।

আমি—

তপোনৈব কুর্ব্বন্ বপুঃ খেদয়ামি
ব্রজন্ নাপি তীর্থং পদে খঞ্জয়ামি।
পঠন্ নাপি বেদং জনিং যাপয়ামি
ত্বদঙ্ঘ্রিদ্বয়ং মঙ্গলং সাধয়ামি ॥*

ওঁ তৎসৎ ওঁ তৎসৎ ওঁ তৎসৎ হরিঃ ওঁ।

শ্রীশ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য।

---

* আমি তপস্যা করিয়া শরীরকে কষ্ট দিব না, আমি তীর্থে হাঁটিয়া হাঁটিয়া পদযুগলকে খঞ্জ করিব না, আমি বেদ পাঠ করিয়া জন্ম যাপন করিব না, আমি কেবল তোমার ঐ মঙ্গল শ্রীপদ-যুগলের সাধনা করিব।

পাগলের পত্র।

বহুদিন পবে আমাদেব সেই চিব-পরিচিত পাগলটীব সহিত দেখা হইল। এবার দেখি, তাহাব অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। "কোথায় এতদিন ছিলে?" জিজ্ঞাসা করায় সে 'বিজি বিজি' কবিয়া কি বলিল; কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। দেখিলাম, সে একেবাবেই কাজেব বাহিব হইয়া পডিয়াছে, সে কখন হাসে, কখন কাঁদে, কখন চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, কখন উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে থাকে। আমি ভাবিলাম, তাহাকে স্নান কবাইয়া আহাবাদি কবাই;—বোধ হয়, স্নানাহার করিলে উহার মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হইতে পাবে। প্রকাশ্যে, তাহাকে বলিলাম "তোমাকে একটা কথা বলি, তোমাব খাওয়া দাওয়া ত' হয় নি, আজ এখানেই খাও; স্নান কব্‌বে?" সে আমাব এই কথা শুনিয়া উচ্চহাস্য কবিয়া উঠিল; বলিল "আমার আবার খাওয়া, আমাব আবার নাওয়া।" তাব পব কি মনে কবিয়া শত-গ্রন্থিযুক্ত নিজ বস্ত্রখণ্ড হইতে এক টুকরা কাগজ বাহিব কবিয়া আমাব হাতে দিল, বলিল—"এইখানে বসিয়া থাক। প্রিয় সখা যখন এইদিকে আসিবেন, তাঁহাকে এই পত্রখানা দিও।" এই বলিয়াই সেখান হইতে দৌড়। আমি পিছু ছুটিলাম, কিন্তু তাহাকে ধরিতে পাবিলাম না। পবিশ্রান্ত হইয়া একটি বৃক্ষতলে বসিয়া বেচাবাব দুবদৃষ্টেব কথা ভাবিতে লাগিলাম। তথন হঠাৎ সেই পাগলের কাগজখানাব প্রতি দৃষ্টি পড়ায়, তাহা উল্টাইয়া দেখিলাম। দেখিলাম, কি লেখা বহিয়াছে। লেখাটা জডানে গোচের, কিন্তু পড়া যায় পড়িয়া দেখিলাম লেখাটা ঠিক পাগলেব মতই নয়। পত্রখানি "পন্থাব" পাঠক-বর্গকে উপহাব দিলাম।

শ্রীমৎ হৃদয়ানন্দ স্বামী

পবমানন্দ-সচ্চিদানন্দধাম-নিত্যনিকেতনেষু।

প্রিয়তম,

বহুদিন হইতে তোমাব 'অখিল জগতেব ভালবাসা মাথা'-মুখখানি দেখিবাব জন্য মন প্রাণ বড়ই আকুল হইয়া উঠিয়াছে। তুমি যে কোথায় থাক, তা'ত আমি জানি না। একদিন হঠাৎ চকিতের মত তোমাব জগ-জন-মনোহর,

ভুবন-মোহন মধুর মুরতিখানির ছায়া মাত্র দেখিতে পাইয়াছিলাম; সেই হইতে আমার মন আর ত' আর মনের মত নাই। তোমার করুণ-কোমল আঁখির চকিত-চাহনী আমার আঁখির দৃষ্টিকে কাড়িয়া লইয়াছে। তার পর যখন দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইলাম, তখন আর সে বিশ্ব-বিমোহন ছবি দেখিতে পাইলাম না বটে, কিন্তু আমার আঁখিতে তোমার রূপ যেন লাগিয়া রহিল। সেই দিন হইতে, আর কিছুই দেখিতে ভাল লাগে না। তোমার মুরতিখানি আর একটিবার দেখিবার জন্য কত নরনারীর কাছে কাছে ফিরিলাম। তাহাদের মুখ-শোভার মধ্যে তোমার মুখকান্তি দেখিতে পাইব ভাবিয়া, কতবার তাহাদের মুখপানে আগ্রহাতিশয্য-সহকারে চাহিয়া রহিলাম, কিন্তু কাহারও রূপের সহিত সে রূপের তুলনা হইল না। প্রভাত-সমীরণের সঙ্গে সঙ্গে যখন বালারুণের স্বর্ণ-জ্যোতি ফুটিয়া উঠে, গোধূলি-ধূসর সান্ধ্য-গগনের সুদূর প্রান্তে অস্তোন্মুখ সূর্য্যের হিরণ-কিরণ ছটায় যখন পশ্চিমাকাশ বিবিধ বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠে, মহাসমুদ্রের দিগন্ত-বিস্তৃত নীলিমা-শোভায়, এবং তারকমণি-মণ্ডিত নীলাম্বরের স্থির-মহিমায়,- কতদিন, কতবার, সে সুন্দরকে অন্বেষণ করিলাম। কিন্তু মন আমার, তেমন করিয়া আর ভরিয়া উঠিল না; সে অপরূপ রূপ-রাশি আর কোথাও দেখিতে পাইলাম না। যখনই ভাবি আর কখনও তোমার সঙ্গে দেখা হইবে না, তখন হৃদয়ে শত শত বৃশ্চিক-দংশন-জ্বালা অনুভব করি। সংসারের দুশ্ছেদ্য-বন্ধন মায়া-মোহ যেন আমার পানে চাহিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিল। সংসারের নিদারুণ দুঃখ-সন্তাপ, আমার হৃদয়ের আর্দ্রতা টুকু নষ্ট করিয়া দিতেছে, অশ্রু শুকাইয়া আসিতেছে। তবে তোমার রূপে যারা পাগল তাদে'র আর শান্তি-সুখ কোথায়?

প্রভু! তোমার দর্শন আশায় লোকে, কত তীর্থে তীর্থে ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়; কত সাধু-সজ্জন ভক্তদের সঙ্গ করে। আমার কিন্তু সে সকল শুভসংযোগ ঘটিয়া উঠিল না। আমি তীর্থে তীর্থে কত ঘুরিলাম, কত সাধু-মহাত্মার চরণ-ধূলায় লুটাইলাম; কিন্তু আমার প্রতি কাহারও ত' দয়া হইল না। যাঁহারা খুব দয়া করিলেন, তাঁহারা এইটুকু মাত্র বলিলেন,—

"ডর নাই কুছো,   ডগুরা না পুছো,
বাঁশরী শুনত কবীরা বাঢ় যাই।"

তাই, আমি হতাশ হইয়া, আমার এই ভগ্ন জীর্ণ কুটিরটির মধ্যে বেদনা-ভার বক্ষে, তোমার পথপানে চাহিয়া বসিয়া আছি। অন্য আর কোন্ তীর্থে যাইব, কোথায় তোমার সন্ধান করিব, কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া, "আমার" মধ্যেই তোমার সন্ধান করিয়া ফিরিতেছি। শুনিয়াছি, এই শরীরটী তোমার আলয়; তাই, কেহ কেহ ইহাকে দেবালয় বলে। তুমি দেব! স্বয়ংই ইহার অধিষ্ঠাতা-দেবতা। তাই এখানেও তোমার দর্শন আশে, পিপাসিতা বিহঙ্গিনীর মত, তোমার এক কণা করুণা-বারির আশায় অদৃশ্যপানে চাহিয়া আছি। প্রভো! কৃপা-বারি বরিষণে কি আমাকে তৃপ্ত করিবে না? আমি ধন-সম্পদের ভিখারিণী নহি, মান-মর্য্যাদা, খ্যাতি-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষিণী নহি, শুধু তোমার চরণ-ধূলার প্রার্থিনী; আমার এ আকাঙ্ক্ষা কি মিটিবে না? ক্ষণকালের জন্যও তোমার দরশন যে কত আনন্দের, তাহা মনে হইলেও আমি অধীরা হইয়া পড়ি। এ জনমে আর তোমার দরশন, কি আমার অদৃষ্টে ঘটিবে?

হে নাথ! যদি এ জনমে আর দেখা নাই দাও,—আমার ত' কোন জোর নাই,— তবে আমার প্রাণের কথাগুলি তোমার পাদপদ্মে নিবেদন করিতেছি। কেন করি তাহা জানি না,—তুমি ত' অন্তর্যামী। পরে, যাহা ইচ্ছা করিও। আমি আর কি বলিব?

নাথ! লোক-পরম্পরায় শুনিতে পাইলাম, আমরা যে বাড়ীখানিতে থাকি, তাহা নাকি আমাদের নিজস্ব নয়। তুমিই দয়া করিয়া থাকিতে দিয়াছ, তাই আমরা এ বাটীর অধিকার লাভ করিয়াছি। লোকমুখে শুনি তুমি এই বাটীর মধ্যেই কোথায়ও থাক। কিন্তু তবু তোমাকে দেখিব মনে করিলেই দেখা যায় না। আমাদের এই ঘরটির নির্ম্মাণ-কৌশল এমন বিচিত্র, যে এক ঘরের লোক আর এক ঘরের লোককে দেখিতে পায় না। এই বাড়ীতে প্রবেশ জন্য, চারিদিকে অনেকগুলি পথ আছে। কিন্তু যে পথ দিয়াই প্রবেশ করি, ঘুরিয়া ঘুরিয়া শেষে এই ঘরেই আসিয়া উপস্থিত হই। এ গোলক-ধাঁধাঁর মত গৃহে থাকিয়া, কেবল কয়েকটি চিরপরিচিত লোকেরই নিত্য সাক্ষাৎ পাই। কখন কখন যদিও কোন অপরিচিত মুখের সাক্ষাৎকার লাভ করি বটে, কিন্তু তাহাদের সহিত আলাপ পরিচয় হয় না। তাহারা বিদ্যুতের মত ক্ষণকাল থাকিয়া কোন্ অদৃশ্য-গৃহে লুকাইয়া যায়। এ গৃহটি নাকি চতুর্দ্দশ-তল, আমরা সব নীচের তলাটিতেই

থাকি। যে কারণেই হউক, নিম্নের ঘরগুলি বড অস্বাস্থ্যকর, কেমন অন্ধকার অন্ধকার। আমার এখানে থাকিতে মোটেই ভাল লাগে না। একে ত' স্থানটি অস্বাস্থ্যকর; তা'র উপর, যে সকল আত্মীয়েরা আমার সঙ্গে বাস করে, তা'দের দেখ্‌লে আমার কেমন কেমন আতঙ্ক হয়। মনে হয়, তা'রা যেন এই ঘরের মধ্যে আমাকে জোর ক'রে বন্ধ ক'রে রেখেছে। যতদিন ছেলে-মানুষ ছিলাম, ততদিন বিশেষ কোন কষ্ট অনুভব করি নাই, এখন বড় হয়ে, আর এ রকম আটকে থাকতে ভাল লাগে না।

আমি যতটুকু দেখিযাছি, তাহাতেই বুঝিয়াছি, তুমি বডই সুন্দর চিত্ত-বিনোদক পুরুষ। যে তোমাকে একবার দেখা'র মত দেখিতে পায়, সে তোমাকেই দেখে, আর কাহাকেও দেখিতে চায না। একটিবার, এক পলকের মত সময়ের জন্যও, যে তোমাকে দেখিযাছে, সেও তোমার জন্য পাগল হইয়া যায়। না জানি, তোমার রূপে কি মাদকতাই আছে,—কি মোহিনী-শক্তিই আছে!! সেদিন বুঝি, স্বপ্নাবেশে তোমার মূরতিখানি একবার চকিতের মত দেখিয়াছিলাম বলিয়া মনে হইল,—অস্পষ্ট হ'ক, কিন্তু তবুও সে ধারণা আর ঘুরিবার নহে। তখনও ঘুমঘোর কাটে নাই, তা'রি মাঝে তোমাকে পলকের মত দেখিলাম। স্বপ্ন-জডিমা কাটিয়া গেল, কিন্তু তোমার রূপরাশি যেন তীরের মত হৃদয়-দেশে বিঁধিয়া রহিল। সেই থেকে, এ ক্ষুদ্র প্রাণখানি, আপনিই মনে মনে আপনাকে, তোমার চরণে সমর্পণ করেছি। আমি চেষ্টা করিলেও তাহাকে, বুঝি, আটকাইতে পারিতাম না। তুমি কি তাহা লইয়াছ? আমার নিজের ত' গুণ নাই; তা'ই ভয় হয়, তুমি কি আমায লইবে?

শুনিয়াছি, তোমার প্রাণটী বড় করুণামাখা, ও নিরাশ্রয়া অনাথার একমাত্র ভরসা। তা'ই, বড় সাহস করিয়া তোমাকে এই পত্র লিখিতে বসিয়াছি; জানিনা, তুমি এই পত্র তোমার পডিবার উপযুক্ত মনে করিবে কি না? চিরদিনই তোমারই রাজ্যে, তোমারই গৃহে, বাস করিতেছি বটে; কিন্তু কখন তোমাকে দেখিবার কথা পূর্ব্বে মনে হইত না। কিন্তু যেদিন হইতে তোমাকে দেখিয়াছি, সেদিন হইতে আমার চিত্ত বিবশ হইয়া গিয়াছে। এ'কি তাহার দুরাকাঙ্ক্ষা! কোথায় তুমি রাজ-রাজ্যেশ্বর, কোথা আমি ভিখারিণী;—কোথা তুমি বিশ্ব-সুন্দর, কোথায় আমি কুরূপা, মলিনা, আভরণ-হীনা। আমার অবস্থা

আমি জানি, তুমি যে সর্ব্বথা আমাব পক্ষে দুবধিগম্য, তাহাও বুঝিতেছি। তথাপি এ অবোধ অশান্ত মন ত' কিছুতেই বুঝিতে চাহে না। সে কি দেখিয়াছে, কি বুঝিয়াছে, জানিনা। কিন্তু সে তোমাকেই ববণ কবিতে চাহে ;—মৃত্যুকেও ববং আলিঙ্গন কবিতে চাহে, কিন্তু এ দুবাকাঙ্ক্ষাকে তবু ছাডিতে চাহে না। কোন দিনই যদি সে তোমাকে আব না পায়, তথাপি সে তোমাবই আশাকে, তোমাবই স্মৃতিকে বুকে কবিয়া মবিবে ; অন্য আব কিছুকে মনে স্থান দিতে পাবিবে না।

যত দিন কাটিযা যাইতেছে, তোমাকে পাইবাব আশা হৃদয়ে ততই বলবতী হইয়া উঠিতেছে। অবশ্য ইহাতে অনেক বিপদ্ আছে ; নানা লোকে, নানা কথা বলিবে, বুঝিতেছি, জন-সমাজেব মুখেব বাক্য-সমূহকে নীবব কবিযা বাখা অসম্ভব। জানি, চাবিদিকে আমাব শত্রুও অনেক ;—তোমাকে ভাল-বাসিতে গেলে আবও অনেকেব শত্রুতা অর্জ্জন কবিতে হইবে,—তাহাও জানি। কিন্তু, নিরুপায ? এই বাটীতেই এমন অনেক শত্রু আছে, যদি তাহাবা আমাব সঙ্গে লাগে, আমি তাহাদিগকে আঁটিযা উঠিতে পাবিব না। এই আমি যে তোমাকে একটু ভালবাসি, বা আমাব এই তুচ্ছ জীবন-যৌবন তোমাব শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ কবিতে চাই, একথা আমাব হৃদযেব নিভৃততম কক্ষেই লুক্কায়িত ছিল ; একথা ঘুণাক্ষবেও পূর্ব্বে কাহাবও নিকট প্রকাশ কবি নাই। কিন্তু এমনই আমাব অদৃষ্টেব ফেব, একদিন অত্যন্ত বিবহ-সন্তপ্তা হইয অতিশয় চাঞ্চল্যপ্রযুক্তই, প্রিয়সখী নির্ম্মলাকে আমাব হৃদয়েব লুকানো কথাটি বলিয়া ফেলিয়াছিলাম। দৈব-বিডম্বনা বশতঃ, প্রশংসা-প্রিয়তা নাম্নী আমাদের একটি সম্পর্কীয়া ভগিনী, নির্ম্মলাব সহিত আমাব আলাপ লুকাইয়া থাকিয়া সমস্ত শুনিয়া ফেলিয়াছে, এবং একথা সে সর্ব্বত্রই বাষ্ট্র কবিয়া দিয়াছে। সেই অবধি, আমাব বিপদেব আব অন্ত নাই। আমাব সহোদব ভ্রাতা বৈবাগ্য, কোথায় চলিয়া গিযাছে। সহোদবা শ্রদ্ধাও তাহাব অনুসবণ কবিয়াছে। তাহাবা থাকিলে হয়ত' আমাব প্রাণেব কথা বুঝিতে পাবিত। কিন্তু আমাব বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণ অজ্ঞান মোহাদি, এই কথা শুনিয়া যৎপবোনাস্তি আমাকে তিবস্কাব করিতেছে ; এবং লোক-সমাজে আব আমাকে মুখ দেখাইতে দিবে না বলিয়া শাসন কবিতেছে।

তাহারা প্রথমে মুখে যাহা বলিয়াছিল, এখন কাজেও দেখিতেছি, তাহাই করিতেছে। চারিদিকে, ঘরে বাহিরে রাষ্ট্র, "আমি নাকি তোমার সঙ্গে নষ্ট ;—তুমি অদৃশ্যভাবে কি রকমে, এক গুপ্তগৃহে থাকিয়া আমার সহিত মিলিত হও।" প্রাণাধিক! একথা যে কতদূর অসত্য, তাহা ত' তুমি সমস্তই বুঝিতেছ। এ অপবাদ বাস্তবিক সত্য হইলে, আমার দুঃখের কোন কারণ ছিল না। কিন্তু অকারণ, এই অপবাদে আমি বড়ই মর্ম্মাহতা হইয়াছি।

অনেক দিন হইতে, আমি তোমার আশায় ছিলাম, ভাবিয়াছিলাম বুঝি তোমাকে আর একবার দেখিতে পাইব। কিন্তু আমার অন্তঃপুরে এখনও তোমার আসা অসম্ভব জানিয়া, অত্যন্ত প্রগল্‌ভার মতই এই পত্র খানি লিখিতে বাধ্য হইলাম। হয়, তুমি আমার কাছে আসিয়া আমার তাপিত-বক্ষ শীতল কর,—আমার কলঙ্কিনী নামের সার্থকতা কর ;—নয়, এই 'মিথ্যা জনরব' হইতে আমাকে মুক্ত কর। শুধু শুধু আর লোকের গঞ্জনা সহ্য করা যায় না।

কিন্তু নাথ! যখন আমার মনে হয় "এখনও ত' তোমার সঙ্গে আমার মিলনের সময় আসে নাই" তখন হৃদয়ে যেন আমার শত শেল বিদ্ধ করে! সুদারুণ হিমঋতুর অবসানে মধুকর-গুঞ্জিত কত মধু-যামিনী আসিয়াছে, আবার অতীতের গর্ভে অবসান লাভ করিয়াছে, নব আম্রমুকুলের মধুর গন্ধে অন্ধ হইয়া, কত কোকিলই পঞ্চম স্বরে আবার গাহিয়া উঠিয়াছে,—কত ফুল, কত গন্ধ, কত জ্যোৎস্না, কত আনন্দ, এই বিশ্ব-ভুবনে নৃত্য করিয়া চলিয়া গিয়াছে, বসন্তের শুভাগমনে আবার তাহারা ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু আমার হৃদয়ের সরস-বসন্তের সে সুমধুর আর্দ্রতা, সে স্নিগ্ধতা, এখনও ত' ফিরিয়া আসিল না। শারদ পূর্ণিমার স্বচ্ছ আভায় প্রস্ফুটিত মল্লিকার সুরভি-মদিরায়, মন প্রাণকে আজও বিহ্বল করিয়া তুলে নাই,—আমার হৃদয়-কুঞ্জে বিরহ-বিধুরা কোকিলাও আজও ত' তেমন করিয়া গাহিয়া উঠিল না,—তবে কেমন করিয়া তোমার শুভাগমন আশা করিতে পারি। হায় এ যাত্রা, কি আর তোমার পাদপদ্মের সরস-পরশে আমার হৃদয়-কমল বিকশিত হইয়া উঠিবে?

আমি সুন্দরী নহি, যে তোমায় রূপে মুগ্ধ করিব। আমার কোন গুণ নাই যে, তুমি গুণে মুগ্ধ হইবে। আমার কি আছে, যে তা' দিয়া তোমার প্রীতি-বিধান করিব? ব্যাকুলতা ছাড়া এ দুঃখিনী অনাথার আর কি আছে? তুমি ত্রিলোক-

নাথ, জগতের একমাত্র অধিপতি, অখিল ভুবনের রাজ অধিরাজ তুমি ; আমাকে কি তোমার মনে লাগিবে ?

শুনিয়াছি, ভক্তি ও শান্তি তোমার চির-সঙ্গিনী ;—তাঁহাদের অনুমতি ব্যতীত কেহই তোমার সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারে না। শুনিয়াছি, তাঁহারাও বড় দয়াময়ী, এবং তাঁহারা আমাদের খুব পরও নহেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও, এই পুর মধ্যে, তাঁহাদের কোন সন্ধান করিতে পারি নাই। সম্প্রতি একজন দয়ার্দ্র ব্যক্তি করুণা-পরবশ হইয়া তাঁহাদের সন্ধান বলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু আমার মত দরিদ্রার পক্ষে,—তাঁহাদের মত রাজরাণীর সমীপস্থ হওয়া, এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার বলিয়াই ত' বোধ হইতেছে। সেই অপরিচিত দয়ালু ব্যক্তিটি বলিয়াছিলেন, "তোমার রাজভবনের দ্বার সতত উন্মুক্ত। বৈরাগ্য ও শ্রদ্ধা—তাহারা আমারই সহোদর ও সহোদরা,—তোরণ-দ্বারে প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।" বড় ভরসায় ছুটিয়া আসিলাম, আসিয়া দেখি সিংহ-দ্বার রুদ্ধ—অর্গল-বদ্ধ। আমারই সম্পর্কীয়া ভগ্নীদ্বয়, কপটতা ও প্রশংসা-প্রিয়তা, রুদ্ধ দ্বারের সম্মুখে বসিয়া বিকট হাস্য করিতেছে। আমি ভয়ে লজ্জায়, অধোমুখ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া আসিয়াছি। এখন তুমিই বল আমার উপায় কি ?

শুনিয়াছি 'ভক্তি' রাণী ত' চতুর্থতলে দ্বার-বন্ধ করিয়া শুইয়া আছেন ; 'নিষ্ঠা' রুচি ও সাধনা নাম্নী কন্যাত্রয়, ও 'আত্মজ্ঞান' নামক পুত্র ব্যতীত কাহারও তথায় প্রবেশাধিকার নাই। সুতরাং তাঁ'দের সহিত মিলিয়া, যে তোমার চরণ দর্শন করিতে পারিব, এ আশাকেও আমি মনে স্থান দিতে পারিতেছি না। আর 'শান্তি' দেবী ত' সপ্ততলে তোমার পদ-সেবা করিতেছেন,—তাঁ'র দর্শন লাভ ও তোমার দর্শন লাভ, সমানই কথা। বুঝিলাম, তুমি কৃপা না করিলে আর আমার গতি নাই। আমি একেই ত' ইহ সংসারের অযোগ্যা হইয়াছি ; এখন যদি তোমার কাছেও স্থান না হয়, তবে আমার দুকুল নষ্ট হইল। তাই, আমি কুল মান রাখিবার জন্য, অকূল-কাণ্ডারীর অভয়-পদে শরণ গ্রহণ করিলাম। আশা করি, 'তোমার বৃন্দারক-বৃন্দ-বন্দ্য কমলা-সেবিত সুচারু চরণের সুশীতল ছায়ায়, এই শরণাগতা চরণাশ্রিতা অনাথা বালিকাকে আশ্রয় দান করিয়া তাহার জীবন সফল করিবে।'

পাঠক-বর্গ, ইহা কি পাগলের প্রলাপ নহে ?

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সান্ন্যাল।

দীক্ষা-রহস্য।

"অধিভূত।"

সত্যঘটনামূলক আখ্যায়িকা।

(১)

"এ কি তব লীলা! অধ্যাত্মন্ কিছুই ত' বুঝিতে পারিতেছি না। দেড় বৎসর পূর্ব্বে, অদ্য তারিখে দেখা দিবেন বলিয়াছিলেন। তাই কল্য হইতে, বিধি-মত সংযম করিয়া, আজি রাত্রি শেষ হইবার পূর্ব্বেই ৺গঙ্গাস্নানপূর্ব্বক আদেশ-মত হৃদয়ে আসন পাতিয়া, যে বসিয়া আছি। কিন্তু কই, দয়াময়! তুমি ত' প্রকট হইলে না,—দেড় বৎসরের সাধ মিটাইলে না।...... .... একি! মাথা কি হঠাৎ ঘুরিয়া গেল! স্মৃতি ও বুদ্ধি কি হঠাৎ লয় হইয়া গেল! তীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাতে হৃদয়ের মর্ম্মস্থল যেন ছিন্ন হইতেছে * * * এ ত' আমারই ঘর। কিন্তু 'আমি কে' তাহা ভুলিয়া যাইতেছি। 'আমি দেবেন্দ্র' এই আমার 'ফটো রহিয়াছে * * * না। আমি ত' দেবেন্দ্র নহি * * হাঁ, বুঝিয়াছি,—আমি বুঝি ঐ ছবিটী। না—না—চেয়ারটী, * * * একি হ'লো, কিছুতেই, আর "আমি" কে নির্দ্দেশ করিতে পারিতেছি না। ঘরের প্রত্যেক পদার্থই 'আমি' বলিয়া বোধ হইতেছে; কিন্তু সেই ভাবে, যাই স্থির করিতে যাইতেছি, অমনি তাহার প্রত্যেক বিশেষ-রূপটী পড়িয়া যাইতেছে; এবং জ্ঞানটীও কোথায় অনির্দ্দেশ্যভাবে মিশিয়া যাইতেছে! * * * * * আমি কি অমুকের পুত্র? না।—তা' ই বা কই!—কে কার পুত্র! * * * দয়াময়! একি হইল; আমি পাগল হইলাম। জগদম্বে! রক্ষা কর—'সব' গেল—আমার 'আমি' গেল। সবই 'আমি' বলিয়া মনে হয়, কিন্তু কিছুই ত নয়! উঃ, সব গেল,—সব গেল! সব বিশিষ্ট নামরূপ কোথায় মিশিয়া গেল।" এইরূপে কাতর হইয়া দেবেন্দ্র আসন-পৃষ্ঠে শুইয়া পড়িলেন।

ইত্যবসরে আমরা দেবেন্দ্রের পূর্ব্ব-পরিচয় পাঠকগণকে বলিয়া দিব। হুগলীর এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণবংশে দেবেন্দ্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন; এখন বয়স চব্বিশ, পঁচিশ বৎসর। স্বভাবে, শীলে, উদার-প্রকৃতিতে, তাহার মত যুবক প্রায়ই

দেখা যায় না। বাল্যকাল হইতেই, তিনি কায়মনোবাক্যে জীব-সেবা-ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন; কাহার চক্ষে একবিন্দু জল সহ্য করিতে পারেন না। দরিদ্রের দুঃখ, রোগীর রোগ, সন্তাপিতের তাপ,—তাহার হৃদয় মথিত করিয়া, তৎপ্রতীকারার্থে সর্ব্বদাই তাহাকে প্রণোদিত করে। যে কোন কার্য্যে জীবের মঙ্গল হয়, তাহাতেই তাহার উদ্‌যোগ ও উৎসাহ। হিন্দু, মুসলমান সকলেই, তাহাকে বন্ধু বলিয়া জানে। পাপী, তাপী, সকলেই তাহার সহিত পরামর্শ করে। এইরূপে জীবন অতিবাহিত করিতে করিতে, তাহার গুরুলাভ হইল। গুরুর নিবাস চব্বিশ পরগণায়। গুরু-লাভের পর, দেবেন্দ্র বুঝিতে পারিল যে, "ভগবানের সেবাতেই সমস্ত জগতের তৃপ্তি। তাঁহার প্রীতিতেই সর্ব্ব জীবের প্রীতি ও সেবা।" তৎপরে, তিনি শ্রীভগবানের পরিতুষ্টি-লাভার্থে ইন্দ্রিয়াদি সংযম, ও ধ্যানাদি কার্য্যে মন দিলেন। এইরূপে জীব-সেবায় বাহ্য-শুদ্ধি, এবং ধারণা ও ধ্যানে তাহার অন্তঃশুদ্ধি লাভ হইল। ক্রমে তিনি ভগবৎ-প্রেমে বিভোর হইয়া পড়িলেন। দেড় বৎসর পূর্ব্বে দেবেন্দ্রের পরিস্কৃত চিত্তে, পরম ভাগবত মরুঋষির প্রকাশ হইল, দেবেন্দ্র তাঁহাকে পরম-গুরু বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। পরম-গুরুদেবের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে, দেবেন্দ্রের হৃদয়ে অখণ্ড-জ্ঞানানন্দ-ঘন এক অভিনব সত্তার আভাস জাগিয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন, যে মানব-চৈতন্যের মধ্য দিয়া ওতঃপ্রোত-ভাবে চৈতন্যের আনন্দময়ী একটী পরা প্রবৃত্তি বহিয়াছে। পরম-গুরু বুঝাইয়া দিলেন যে "এই চৈতন্যময়ী প্রবৃত্তিই মহামায়া দেবী। সর্ব্বদা ইঁহার স্মরণ গ্রহণ করিলে, এক দিন পর-তত্ত্বে উপনীত হইতে পারিবে। দেড় বৎসর পরে শ্রীশ্রী৺শ্যামা-পূজার দিন, আমি প্রকট হইব। এক্ষণে সমাহিত-চিত্তে, সর্ব্বাত্মিকা দেবীর আশ্চর্য্যময়ী প্রবৃত্তির অনুসরণপূর্ব্বক, সর্ব্বজীবে তাঁহার লীলা-ক্ষেত্র বুঝিতে চেষ্টা কর।" তাই আজ ৺শ্যামাপূজার দিন, সমাহিত চিত্তে দেবেন্দ্র পূজায় বসিয়াছিলেন।

মোহ ভঙ্গ হইলে, দেবেন্দ্র পুনরায় উঠিয়া বসিল, এবং ধ্যান-পথে মন-প্রাণ, ইষ্টদেবীর উদ্দেশে প্রেরণা করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু চিন্তা করিবা-মাত্রই, পুনরায় বিশিষ্ট 'আমি' জ্ঞানটী, কোথায় মিশিয়া যাইতে লাগিল। বিধি-মতে চেষ্টা করিয়াও 'আমি' বোধটীকে স্থির করিতে পারিল না;—কিছুতেই স্বাভাবিক স্মৃতি ও জ্ঞানের সাহায্যে অস্মিতা-মাত্রাটীকে কোন বিশিষ্ট-ভাবে স্থির

করিতে পারিল না। অবশেষে, সে হতাশ হইয়া, উন্মত্ত-প্রায়, আসন ত্যাগ করিয়া বাহ্য-কর্ম্মে মনঃসংযোগ করিতে প্রয়াস করিল। বাটীর নিকটে একটী রোগী ছিল, তাহাকে দেখিবার জন্য দেবেন্দ্র তথায় উপনীত হইল। রোগীর নিকটে বসিয়া রোগ-পরীক্ষা করিতে যাইবামাত্র, রোগীর শরীর-ক্ষেত্রে তাহার অহং প্রতীতি হইয়া গেল। সে দেখিল, সেই রোগীই 'আমি'; রোগীর জীবন-বৃত্তান্ত, তাহারই আপন জীবনের বৃত্তান্ত; রোগীর জ্ঞান ও স্মৃতি, তাহারই আপন জ্ঞান ও স্মৃতি। এইরূপে এক অভিনব ভাবে রোগীর বর্ত্তমান ভূত, ভবিষ্যত সমস্তই, এবং রোগের প্রকৃত কারণ ও গতি, রোগীর জীবনের রহস্য,—সমস্তই আত্ম-প্রত্যয়ের মধ্যে বিস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারিল। সে সেই ভাবে, সেই মহা-জ্ঞানে রোগীর কর্ত্তব্য নিরূপিত করিয়া দিল। পুনঃ পরক্ষণেই সংশয় হইল; ভাবিল "আমি ত রোগী; তবে দেবেন্দ্র কোথায় গেল।" অমনি ভয়ে ও অভি-নিবেশে তাহার চিত্ত আকুল হইয়া উঠিল। এইরূপে বৃক্ষলতা, পশু, পক্ষী প্রভৃতি প্রত্যেক বিশিষ্ট পদার্থে, একটী বার, এক ক্ষণ আপন "আমিকে" চিনিতে পারিয়া, পরক্ষণেই আবার দেখিতে লাগিল, যে কোনও বিশিষ্ট ভাবে তাহার 'আমি'টীকে স্থির করিয়া, লঙ্গর করিয়া, রাখিতে পারা যায় না। অনন্ত বিশেষের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হইলেও ঐ 'আমি' পরিসমাপ্ত হইতেছে না। পরন্তু প্রতিক্ষণেই বিশেষ ভাবটীকে অতিক্রম করিয়া, চৈতন্যের 'আমি অভিমুখী' স্রোত কোথায় মিশিয়া যাইতেছে। এইরূপে থাকিতে থাকিতে, দেবেন্দ্র মানস-পথে, প্রথমে তাহার গুরুর নিকট, এবং তৎপরে ৺কালীঘাটে যাইবার আদেশ স্পষ্ট শুনিতে পাইল।

(২)

সেই রাত্রেই, দেবেন্দ্র চব্বিশ-পরগণায় রওনা হইল; ও মূলাজোড়ে তাহার বাহ্য-গুরু রামকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইল। বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয় অনেক কালের সাধক। তিনি বলিলেন "সৌভাগ্য-বশেই তোমার মরু ঋষির সহিত সাক্ষাৎ ও তাঁহার কৃপায় তুমি 'অধিভূত' দীক্ষা লাভ করিতে পারিয়াছ। চৈতন্যের যে প্রবৃত্তি সর্ব্বদা নামরূপাদি বিশিষ্ট বস্তুভাব পরিত্যাগ করিয়া, তা'দের অতীত অভিনব "আমি" রূপে থাকিতে প্রয়াস করে, তাঁহাকেই 'দেবী' বা 'দৈবী প্রকৃতি' বলে। এই প্রকৃতি, বিশ্বাত্মিকা প্রকৃতি বা রূপ-ক্ষেত্র

হইতে সদা উদ্গীতা হইয়া, সর্ব্বদা শ্রীভগবানের দিকে প্রধাবিতা। তবে বদ্ধ-জীব এই বিশ্বাতিগ গতির 'অন্ত' দেখিতে পায় না; সুতরাং আপনাপন জ্ঞান, বুদ্ধি ও সামর্থ্য অনুসারে, এই গতিতে পরিচ্ছিন্ন করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন অহং-ভাবের স্থাপনা করে। গঙ্গার স্রোত সর্ব্বদাই সাগরাভিমুখী, কিন্তু সাধারণ মানব সেই স্রোতকে ক্ষুদ্র কামনা-প্রকৃতির পরিতুষ্টির জন্য ব্যবহার করে। এমন কি, অবশেষে, নদীর সাগর-রূপে পরিসমাপ্তির কথাটীও ভুলিয়া যায়। তদ্রূপ, কামনা ও আংশিক জ্ঞানে পরিচ্ছিন্ন জীব, জীবভূতা পরা-বিদ্যা-প্রকৃতিকে, বিশিষ্ট নামরূপ এবং কাম্য পদার্থ ও তৎফলভূত সুখতৃষ্ণাতে নিঃশেষিত বা পর্য্যবশিত করিতে চেষ্টা পায়,—স্থূলভাবে ব্যাপৃত থাকিয়া, অহং পদার্থকে স্থূলোৎপন্ন ও বিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে করে। কিন্তু যখন ভ্রাতৃভাব বা প্রেমের বশে, পরস্পর বিচ্ছিন্ন-প্রায়, অনন্ত, জীব-রূপী স্রোতাংশ গুলিকে একত্র করিয়া দেখিতে শিখে, তখন ধর্ম্ম, বিজ্ঞান প্রভৃতি সংযোগিনী বুদ্ধি ও শক্তির সাহায্যে 'জীবশক্তি'র সার্ব্বজনীনতা সিদ্ধ হয়। পরে গুরুর সাহায্যে, যখন শ্রীভগবানে এই স্রোতের পরিসমাপ্তি দেখিতে পায়, তখনই 'প্রথম' বা 'অধিভূত' দীক্ষা লাভ করে। সাধারণ জীব যেরূপে ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবের মধ্যে, চৈতন্যের খেলা দেখিয়া, তদ্দ্বারা আপনার পরিচ্ছিন্ন দেহাত্মবুদ্ধি-প্রসূত অহং-জ্ঞান উপলব্ধি করিয়াই স্থির হয়, দীক্ষিত ব্যক্তির হৃদয়ে আর তদ্রূপ পরিচ্ছিন্নতার মোহ জাগিতে পারে না। তিনি জানেন যে, বিচ্ছিন্ন, বিশ্লিষ্ট ভূতসকলের আধারভূত জীবঘন পরাৎপর শ্রীভগবানের পরা ভাব আছে, ঐ ভাবে তিনি সকল আশয়ে নিয়ন্ত্রীরূপে খেলিতেছেন। এই সর্ব্বভূতাশয় শ্রীভগবানকে তৃপ্ত করায়, ষাট হাজার শিষ্য সমেত দুর্ব্বাসা ঋষি, ও সমস্ত জগৎ তৃপ্ত হইয়াছিল। তোমার চিত্তে সেই সর্ব্বাধার ভগবানের 'বৈশ্বানর' বা অধিভূত 'আমিটী' ফুটিতেছে। তুমি আর পরিচ্ছিন্ন অহং ভাবে তৃপ্ত থাকিতে পারিবে না। কি নিজ দেহে, কি পর দেহে, সেই বিশ্বাত্মক অথচ বিশ্বাতিগ "আমিকে" একমাত্র সত্য বলিয়া বুঝিয়া, 'সর্ব্ব'ভাবে তাঁহারই সরণ গ্রহণ কর। তাহা হইলে, নামরূপাতীত একত্বে এক দিন অবস্থিতি করিতে সক্ষম হইবে। লক্ষ লক্ষ পরিচ্ছিন্ন "আমিকে" যোগ করিলে, এই মহান "আমি" লাভ হয় না। যেমন মাটি, জল, আকাশের সমষ্টি করিলে, স্বদেশরূপ মহা-ভাবের স্ফুরণ হয় না, তদ্রূপ কেবল সভা-সমিতি প্রভৃতি বাহ্য কার্য্যে লিপ্ত হইলে,

ভগবৎ-স্বরূপের প্রথমপাদ 'অধিভূত' বা 'বৈশ্বানর' চৈতন্যকে জানিতে পারা যায় না। অতএব বিশিষ্ট অহং-পরিস্থাপনের পিপাসা একেবারে পরিত্যাগ কর। 'সর্ব্ব'ভাবে সেই মহান্ 'জীব ঘন' 'পর' "অহং"-ভাবের স্মরণ গ্রহণ করিয়া, বিশ্বরূপ অবয়বের অবয়বী শ্রীভগবানের অধিভূত-মূর্ত্তি নিজ চৈতন্যে অঙ্কিত করিতে চেষ্টা কর। তিনি অধিভূত ভাবে আছেন বলিয়াই, সর্ব্ব প্রত্যয়ের মধ্যে প্রকাশিত, প্রত্যয়ানুরূপভাবে লক্ষিত, এক "আমিকে" সত্য বলিয়া গ্রহণ কর। বিভিন্ন কাষ্ঠখণ্ডে প্রকটিত অগ্নির রূপ দেখিতে বিভিন্ন হইলেও, উহা যেমন এক অগ্নিতেই পরিসমাপ্ত, তদ্রূপ শ্রীভগবান্ অধিভূত-ভাবে সকল জীবের বুদ্ধিতে বিভিন্ন ভাবে পরিলক্ষিত হইলেও, তিনি এক ও আনন্দ-স্বরূপ শুদ্ধ চৈতন্য। অনেকে দীক্ষার সময় যে সকল নানাত্ব-বাচক ঘটনাবলী দেখেন, তাহা বাস্তবিক পক্ষে অলীক। তাঁহাদের চৈতন্য 'এক'রূপে অবস্থিতি করিতে পারে না বলিয়াই, তাহারা আপন সংস্কারানুসারে সেই নিত্য-সিদ্ধ, শুদ্ধ, 'আমি'কে বুঝিতে পারে না, এবং নাম, রূপ, স্থান, মন্ত্র, অবস্থা প্রভৃতি বিশিষ্ট ভাবের সাহায্যে 'বহু'-ভাবে আঁকিবার চেষ্টা করে। ও গুলি দীক্ষার রঙ্গমঞ্চে, সিন্ ও দড়ি-দড়া। এই কথাগুলি বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখ, তাহা হইলে ৺কালীঘাটে অলৌকিক অমানুষী ভাষায় এই একেরই তত্ত্ব বুঝিতে পারিবে।"

(৩)

সপ্তমীর রাত্রে দেবেন্দ্র ৺কালীঘাটে আসিয়া পৌছিল। পরদিন প্রাতে স্নান করিয়া শুদ্ধচিত্তে মন্দিরে উপস্থিত হইল। সমস্ত দিন অনাহারে থাকিয়া মন্দির-প্রাঙ্গণে কাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল। প্রাণের ভিতর দিয়া এক অপূর্ব্ব আনন্দের ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি দশটা বাজিল; মন্দির-রক্ষকগণ একে একে যাত্রি-গণকে বাহিরে যাইতে অনুরোধ করিল। সকলের সঙ্গে দেবেন্দ্রও নিষ্ক্রান্ত হইল; কিন্তু 'কোথায় যাইব' তাহা স্থির করিতে পারিল না। যে কার্য্যের জন্য আসিয়াছে তাহার সংসিদ্ধির জন্য কোন উপায় দেখিতে পাইল না। এই রূপে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে, সে গঙ্গার একটি ঘাটে উপস্থিত হইল। ঘাটের উপর একটি ৺শিব-মন্দির আছে; এবং সে মন্দিরের সম্মুখস্থ দালানে অশীতিবর্ষপর এক সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইল। দেবেন্দ্র অনুসন্ধানে জানিল যে উঁহার নাম "খ"—বাবা।

সন্ন্যাসীর পার্শ্বে, ৩০।৪০ বৎসরের এক প্রৌঢ়া, সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিতা রমণী বসিয়া আছে। সন্ন্যাসীকে দেখিয়া দেবেন্দ্রের মনে ভক্তি-ভাবের উদ্রেক হইয়াছিল; কিন্তু রমণীকে দেখিয়া তাহার মনে সন্দেহ হইল 'সন্ন্যাসী বুঝি বামাচারী তান্ত্রিক।' তখন দোলায়িত-চিত্তে দেবেন্দ্র সন্ন্যাসীর নিকটে উপবেশন করিল। সন্ন্যাসী শাস্ত্র-ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, এবং তাঁহার ব্যাখ্যাতে সকলেই মুগ্ধ হইতেছিল। ক্রমে রাত্রি হইতে লাগিল, একে একে সমবেত ভক্তগুলি আপন আপন গৃহে প্রত্যাগত হইল। তখন সন্ন্যাসী দেবেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "কেমন, মনে বড়ই সন্দেহ হইয়াছিল; এমনই তোমাদের সংস্কার! 'বাম' ও 'দক্ষিণ' মার্গের কি জান?" সাধু মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়াছেন জানিয়া, দেবেন্দ্র বিস্মিত হইল, কোন প্রত্যুত্তর করিল না। সন্ন্যাসী তখন বলিলেন "তোমার নাম দেবেন্দ্র, শ্রীশ্রী৺শ্যামাপূজার দিন তোমার চিত্তে এক অভিনব ভাবের বীজ পড়িয়াছে, তাহাতে তোমার লৌকিক বুদ্ধির বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। কিন্তু এরূপ হইবার ত' কোন কারণ দেখিতেছি না। তোমার গুরু 'ভট্টাচার্য্য মহাশয়' তোমাকে ত' বেশ বুঝাইয়া দিয়েছেন, তবুও তোমার বিশিষ্ট অহংকারের মোহ যাইতেছে না। 'সাধুর' এই বাক্য শুনিয়া দেবেন্দ্র বিষম সমস্যায় পড়িল,—একদিকে বুঝিলেন, সন্ন্যাসী তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষ, সামান্য সাধক নহেন। অপর দিকে সে ত' এই সন্ন্যাসীর নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতে, বিশিষ্ট আদেশ প্রাপ্ত হয় নাই। সন্ন্যাসীও যেন তা'র মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন "এত সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। তুমি মরু ঋষির কৃপা প্রাপ্ত হইয়াছ; তিনিই আমার এবং অন্যান্য অনেক সন্ন্যাসীর গুরুদেব। ঐ ঋষি-সঙ্গ হইতে, জীবের হৃদয়ে ভগভক্তি ও ভগবৎ-তত্ত্ব-বিজ্ঞানরূপ চৈতন্য-স্রোত অবিরত প্রবাহিত হইতেছে। যে আধার বা ক্ষেত্র যেরূপ উপযোগী, ঐ স্রোতের সাহায্যে তাহার হৃদয়ে তদ্রূপ নিষ্ঠা উৎপন্ন হয়,—গৃহস্থ ও সংসারিগণের মধ্যে তাহাদের উপযোগী ধর্ম্মভাব প্রকটিত হয়, আবার সন্ন্যাসী ও সাধকগণের হৃদয়ে বিশুদ্ধ, নিষ্কল ব্রহ্মজ্ঞান ও নিষ্ঠা উদ্রিক্ত হয়। চল, আমার সহিত শ্মশান মধ্যে বসিবে চল, আপনিই বুঝিতে পারিবে।" এই বলিয়া সন্ন্যাসী দেবেন্দ্রকে লইয়া শ্মশানে প্রবেশ করিলেন।

শ্মশানে গিয়া কি হইল, তাহা সাধারণের জানিবার আবশ্যকতা নাই।

তবে এই মাত্র বলা যায়, যে দেবেন্দ্র বুঝিল যে "শ্রীভগবানের চরণ-কমল হইতে নিয়ত চৈতন্যরূপী বিশ্বার স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, ঐ স্রোতকে মানব 'গুরুশক্তি' বলিয়া লক্ষিত করে। ঐ স্রোতের মধ্যে যে সৌভাগ্যবান্ জীব পতিত হয়েন, তাঁহার আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তি-মোহ অপসারিত হইয়া যায়, ও বিশিষ্ট অহং-জ্ঞানের পরিবর্ত্তে পরম অদ্ভুত, অগাধ-বোধ, বিশ্বাতিগ, নিষ্কল, এক, পরম অহং-ভাব অন্তর হইতে জাগিয়া উঠে।" সে বুঝিল যে "দীক্ষার দ্বারা মানব-চিত্তের ক্ষুদ্র অহং ভাব পড়িয়া যায়, এবং তৎপরিবর্ত্তে শ্রীভবানের চৈতন্যের ভাষা অল্পে অল্পে প্রকটিত হইতে থাকে।" দেবেন্দ্র দেখিল যে, ক্ষুদ্র মানব-চৈতন্য ভূতগণকে কবলিত করিয়া, তাহাদের সাহায্যে বিশিষ্ট অহং-ভাবের পরিস্থাপন-জন্য প্রয়াস পাইতেছে, এইরূপে ধর্ম্মের সাহায্যে ধার্ম্মিক 'অহং', অধর্ম্মের সাহায্যে অধার্ম্মিক 'অহং', স্থূলের সাহায্যে স্থূল 'অহং', সূক্ষ্ম ভাবের সাহায্যে সূক্ষ্ম 'অহং' প্রভৃতি ক্ষণিক অহং-প্রবাহগুলি এইক্ষণে উৎপন্ন হইয়া পরক্ষণে শরীরাদি আধারের নাশের সহিত যেন বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে। ইহাই শ্রীভগবানের 'সদ্যোজাত' মূর্ত্তি—"অধিভূত ক্ষরোভাব।" কিন্তু যখন জীব এই ব্যক্ত 'ক্ষর' বিশিষ্ঠ অহং-ভাবকে পরিণামী জানিয়া সর্ব্বজীবের মধ্যে অনুস্যূত এই প্রবৃত্তির রহস্য বুঝিতে চেষ্টা করে, তখন সে 'অধিভূত' অর্থে এক উচ্চতর শাশ্বত, সমরূপী ভগবৎসত্বার আভাস দেখিতে পায়। বিশিষ্ট ভূতগণে অধিষ্ঠিত 'অহং', ক্ষর ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে না। বিশিষ্ঠ কাষ্ঠখণ্ডের দ্বারা যেরূপ অগ্নির রূপ নির্ণয় হয়, তদ্রূপ ভূতগণে পর্য্যবসিত করিলে তদ্দ্বারা অহং-তত্ত্বের ক্ষর-রূপমাত্র স্থিরীকৃত হয়, তদ্দ্বারা অহং ভাবের প্রকৃত অদ্বিতীয়তা ও অঞ্জন-শূন্যতা সিদ্ধ হইতে পারে না। পরে যখন সর্ব্বজীবে এই 'আমি'র সংসিদ্ধিরূপ প্রবৃত্তি দেখিতে পাইয়া, সর্ব্বাত্মক ভাবে ঐ প্রবৃত্তির কারণ নির্ণয় করিতে যাওয়া যায়, তখন দেখা যায়, যে সমস্ত জগৎ ব্যক্ত করিয়া, অন্য এক ভাবের অধিভূত চৈতন্য রহিয়াছে। ভূত সকলের অধিকরণ বা একমাত্র আধার ও লয়-স্থান, ঐ অদ্ভুত অধিভূত মহাভাব। জীব যেখানেই পদবিক্ষেপ করুক না কেন তদ্দ্বারা যেমন পৃথিবীর নির্ব্বিশেষ আধার-ভাব পরিলক্ষিত হয়, তদ্রূপ ভেদ-দুষ্ট চিত্তে ভূত সকলকে কবলিত করিয়া, জীব যে ক্ষুদ্র অহং ভাব স্থাপনা করুক না কেন, তাহারই মধ্য দিয়া এই আধার-ভূতা চৈতন্যময়ীর 'পরা' প্রবৃত্তিই পরিলক্ষিত হইতেছে। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সাহায্যে

সমস্ত কার্য্য করিয়া, কামনার মোহে আমরা সেই শক্তিকেই বিস্মৃত হই। তদ্রূপ বিশিষ্টতার মোহে, কামনার বশে, সমস্ত বিশিষ্ট জ্ঞানের আধার-ভূতা, সর্ব্বকামনার পরিসমাপ্তি, সদা সমরূপিণী চৈতন্যময়ীর অস্তিত্ব ও তাঁহার ভাষা ভুলিয়া যাই। আধার-ভূতা দেবী আছেন বলিয়াই, স্থূল অন্নে দেহ পুষ্ট হইতে পারে, ও পুষ্ট শরীরের সাহায্যে চৈতন্যের বিকাশ হইতে পারে। ভগবানের এই আধাররূপ চৈতন্যের ভাষা বা প্রবণতা নিত্য বর্ত্তমান রহিয়াছে বলিয়াই, বিশিষ্ট জ্ঞান ও ক্রিয়াদির মধ্যেও জীব-হৃদয়ে অবিশেষ ব্যক্তাতীত অদ্বয় জ্ঞান, প্রেম বা প্রীতির ভাব প্রকাশিত হইতে পারে। "আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি" এই আধার-রূপিণী ব্রহ্মযোনি মহামায়া দেবীর উপাসনা বর্জ্জিত হইয়া আজ আমাদের এত মোহ।' দেবেন্দ্র বুঝিল, যে –

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥"

সাধু বলিলেন "চৈতন্যময়ীর যে মহা-ভাষা বুঝিতে পারিলে, 'ইহাই সামবেদ'। ইহা 'জীবঘন পুরীশয়'। এতদ্দ্বারা ক্ষুদ্র অহংকার-প্রসূত বিশ্লিষ্টতা ও পরস্পর প্রবিভক্ত প্রায় লৌকিক বিচ্ছিন্নতা-জ্ঞান অতিক্রম করিয়া, সর্ব্বদা সর্ব্ব ব্যাপারে এই পরম একত্বে অবস্থিত হইবার জন্য চেষ্টা করিবে। ইহাই তোমার সাধনা। বিচ্ছিন্ন জগৎ-বস্তুর মধ্যে, প্রথমে তৎসমষ্টি-ভূত বিরাট্ অবয়বকে বুঝিতে পারিয়া, অবয়ব হইতে অবয়বীকে চিনিতে চেষ্টা কর। এইরূপে সম্প্রজ্ঞাত হইতে অসম্প্রজ্ঞাতে উপনীত হইতে চেষ্টা কর, তৎপরে শ্রীভগবানের 'অধিদেব' 'অধ্যাত্ম' ভাষা গুলি যথাসময়ে বুঝিতে পারিবে। যাও বৎস, সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন কর; তোমার একত্বজ্ঞান-দ্বারা ভেদভাবাপন্ন জীবগণের মধ্যে শ্রীভগবানের প্রথম পাদ 'অধিভূত' চৈতন্যের ঘোষণা কর। 'সংসারে' ধর্ম্ম-সংস্থাপনের চেষ্টা কর। 'জীবে দয়া' ও 'নামে রুচি' প্রচার কর। ঐ দেখ, এখান হইতেই মন্দিরের ভিতরে প্রকটিতা মহামায়া ব্যোম-স্বরূপিণী ব্রহ্মযোনির বিদ্যারূপ দর্শন কর। এস তাঁহাকে নমস্কার করি। তিনি প্রসন্না না হইলে অবিদ্যা-ভাব ঘুচিবে না।

এস পুনর্ব্বার, জগদম্বা বিদ্যা-স্বরূপিণী দেবীকে নমস্কার করি।"

বিদ্যা-প্রার্থী।

উৎকর্ষ-চিন্তা।

রে মন!
তবু কি চৈতন্য তোর হ'ল না এখন?
বক্ষে ধরি প্রাণ-ধন
ভাবিতে যা'বে আপন,
একে একে গেল কত, জ্বলন্ত চিতায়,
বহু যত্নে রাখিতে না পারিলি কখন,—
তবু কি চৈতন্য তো'র হ'ল না এখন?

নিয়ত জল্পনা মুখে 'আপন আপন'!
আপন যে জন ভবে,
চিরসঙ্গী হ'য়ে রবে,
ছে'ড়ে গেলে কেমনে সে হইল আপন?
অসার আসক্তিসূত্রে, ভোগ জ্বালাতন;
তবু কি চৈতন্য তো'র হ'ল না এখন?

ধূলী-কণা-সংযোজনে অদ্রির গঠন,
বিশ্লেষণে পুনরায়,
কোথা সে যে চলে যায়,—
দেখিতে দেখিতে হয়, অস্তিত্ব-বিলোপ,
আকর্ষণ বিকর্ষণে, উত্থান পতন,
তবু কি চৈতন্য তো'র হ'ল না এখন?

ভাইবন্ধু, দারাসুত, প্রিয় পরিজন,
সকলেরি অই দশা
মিছা সব ভালবাসা—
পথের আলাপ মাত্র,—প্রকৃতির খেলা।

বিবর্ত্তন-চক্র-গতি কে করে বারণ ?
তবু কি চৈতন্য তো'র হ'ল না এখন ?

যা'রে তুমি ভালবাস ভাবিয়া স্বজন,
তুমি যথা আছ, নাই,
তা'র দশা ঠিক তাই ,
ভব-আশা মৃগতৃষা ভিত্তিহীন সদা ,
মায়ার বন্ধনে হয়, হর্ষ বা রোদন।
তবু কি চৈতন্য তো'র হ'ল না এখন ?

ত্যজি নীড়, দেহ, গৃহ, করিলে গমন
শেষ হয়ে যায় 'সব',
প'ড়ে থাকে মাত্র শব,
শৃগাল-কুক্কুর-ভোজ্য অস্পৃশ্য অসার ;
সকল সম্বন্ধ হায় ! ফুরায় তখন।
তবু কি চৈতন্য তো'র হ'ল না এখন ?

'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বলে জ্ঞানিগণ,—
অন্ধ ব'লে দৃষ্টি নাই
দ্বৈত-মোহে ভুলি তাই ,
সাধনার বল চাই, ভাবনার পথে।
আর কেন ? কর এবে চক্ষুরুন্মীলন ,
তবু কি চৈতন্য তো'র হ'ল না এখন ?

কৃতান্ত দুর্দ্দান্ত অতি , তাহার শাসন
এড়াইবে সাধ্য কা'র ?
স্থান নাই পালাবার ,
শুন মন্ত্র আসে ওই ! ভাঙ্গি মোহ-ঘোর।
'ধর সেই সারাৎসার শমনদমন'
তবু কি চৈতন্য তো'র হ'ল না এখন ?

শ্রীগোকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

নিমেষ।

মাগো—

জীবনেব অতিক্ষুদ্র নিমেষ আমার
দেখাইযা দেয, তো'বই অনন্তেব দ্বাব।
তোমাব মন্দিব-দ্বাবে এ-ক্ষুদ্র নিমেষে
কি মহা-সঙ্গীত উঠে, কি লীলা বিকসে ?
দেখি যে নিমেষ ক্ষুদ্র বৃথা চলে যায,
মোব ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ-গন্ধ মাখি গায়।
কেঁদে মবি নিবন্তব, আকুল ব্যথায়
এমনি নিমেষে মোব পবমায়ু যায়।
কিন্তু মাগো, ওই এক নিমেষ যে তো'ব
বিশ্বব্যাপি কবিতেছে কি যে কাণ্ড ঘোব।
কত ফুল উঠে ফুঠে, কত গায় টুটে,
কত বিশ্ব, কত লক্ষ, কত কক্ষে ছুটে,
কত গ্রহ তাবা ছুটে ও মহান্ মন্দ্রে,
কত সংঘর্ষণ হয কত গ্রহ চন্দ্রে।
কত অভিনব জীব, কত নব বিশ্বে,
হাসে কাঁদে, নাচে গায়, কত নব দৃশ্যে।
কত যে নবীন বিশ্ব উঠিছে জাগিয়া,
কত পুবাতন বিশ্ব যেতেছে ভাঙ্গিযা ;
কত নব জ্যোতিষ্কেব নব জ্যোতি কণা
অনন্তেব মহা-জ্যোতি কবিছে ঘোষণা।
কোটী কোটী কত ক্রোশ ভ্রমিয়া নিমেষে
দাডায়েছে পুন নব ব্রহ্মাণ্ডেব পাশে।
কত লক্ষ কোটী বর্ষ ববিয়া ভ্রমণ
কেহ নব ব্রহ্মাণ্ডেতে দিতেছে দশন।
বসি কোন পৃথিবীব উদ্যানেব কোণে,
অলক্ষিতে কুসুমেবে ফুটায় যতনে।
অতিক্ষুদ্র জীবাণুব স্নেহ-বক্ষপবে
সন্তানেবে পালিতেছে কতই আদবে।
কত হাস্যে মুখবিত সুখেব সংসাব,
কূটকলহেব বিষে হয ছাব খাব

একটী নিমেষ মাত্র 'যেতে নাহি যেতে'
কি মহা উদ্বেগলীলা উঠিছে বিশ্বেতে।
অনন্ত অবোধগম্য আসনেতে বসি
কি মহা তাণ্ডব খেলা, খেল এলোকেশী!
তোমার অখণ্ড ওই চৈতন্য-অঙ্গনে
উনমত্ত পরব্রহ্ম তাণ্ডব নর্ত্তনে।
অনন্ত ব্যাপিত এই কি মহা খেলায়,
নাচিতেছে মহাকাল কি মহা লীলায়।
কালের ডমরু-ধ্বনি নিমেষের ছন্দে
অনন্ত সঙ্গীতে তব শ্রীচরণ বন্দে।

চিন্তাহরণ।

চিত্র-পরিচয়।

ওঁকার বা প্রণব, সমস্ত সনাতন-ধর্ম্মের সারভূত, পরম-তত্ত্ব, একমাত্র-বেদ্য, ব্রহ্ম বা শ্রীভগবানের বাচক। মাণ্ডুক্যোপনিষদে একই প্রণব-তত্ত্ব বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই ওঁকারই পরব্রহ্মের অবলম্বন ও স্বরূপ। প্রণব-রহস্য বুঝিতে পারিলে, সকল শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হওয়া যায়। আমরা আগামী সংখ্যা হইতে, এই পরম-তত্ত্বের যথাসাধ্য আলোচনার প্রয়াস করিব।

যে বিদ্যার সাহায্যে অবিদ্যাকৃত দ্বৈত-প্রপঞ্চের উপশম হয়, তাহাই ব্রহ্মবিদ্যা। "দ্বৈতপ্রপঞ্চস্যাবিদ্যাকৃতত্বাৎ বিদ্যয়া তদুপশমঃ স্যাদিতি।" অবিদ্যা দ্বারা অহং এবং মদতিরিক্ত জগৎ বোধ হয়। আত্মাতে এই দ্বন্দ্ব বা ভেদ বুদ্ধির নাশই বিদ্যার কার্য্য। বিদ্যা সর্ব্বাত্মিকা, সর্ব্বময়ী, এবং ব্রহ্ম প্রতিপাদিকা। শ্রীশ্রীদুর্গা সেই মহাবিদ্যা মহামায়া; তাঁহার শরণ গ্রহণের নামই গায়ত্রী-উপাসনা। গায়ত্রী দ্বারা জীব সর্ব্বাত্মক চৈতন্যে স্থাপিত হইয়া মিথ্যাভূত ভেদবুদ্ধিজনিত অবিদ্যা নাশ করিয়া, পরমএকত্বে উপনীত হয়। চৈতন্যময়ী দেবীর মাহাত্ম্য যথাসাধ্য এই সংখ্যায় প্রকাশিত করা হইল।

পাঠকগণের চিত্ত যাহাতে ৺মহাপূজার দিনে শ্রীভগবানের ও ব্রহ্মযোনি দেবীর শ্রীচরণ-কমলকে আশ্রয় করিতে পারে, সেই জন্য, এই উভয় তত্ত্বের প্রতি-বোধক চিত্র প্রকাশিত হইল। একবার, ক্ষণিকের জন্যও, জ্ঞান, প্রেম বা ভক্তি রসে, যে কোন ভাবেই হউক না কেন, যদি পাঠকগণের চিত্তে পরম দেব ও দেবীর চরণ-কমল-মকরন্দ পানে প্রবৃত্তি হয় তাহা হইলে আমরা আপনাদিগকে কৃত কৃতার্থ মনে করিব। পন্থার ও পাঠকগণের—সেবকগণ।

বজ্র প্রতিষ্ঠিত শ্রীবৃন্দাবনের গোবিন্দজীউ।

(বর্ত্তমান জয়পুরে বিরাজিত)।

FINE ART PRESS —CALCUTTA

মায়া-চৈতন্যময়ী।

ওঁ নমঃ পরমদেবতায়ৈঃ।

'পন্থার' নূতন পর্য্যায়ে সম্পাদকগণ "মায়াবিদ্যা ও অবিদ্যা" নামক প্রবন্ধে মায়ার স্বরূপ কি ও বিদ্যা ও অবিদ্যাভেদে মায়ার ক্রিয়া কি রূপ, তাহার আলোচনা করিতেছেন। এইরূপ আলোচনা যতই অধিক হয়, ততই মঙ্গলের বিষয়। বস্তুতঃ যে সমস্ত গূঢ় বিষয়ের উপর সাধনা ও ধর্ম্মবিশ্বাস নির্ভর করে, সেই সমস্ত বিষয়ের স্থস্পষ্টতা সম্পাদনে সমাজের যত কল্যাণ হয়, তত আর কিছুতেই নহে।

পন্থায় প্রকাশিত উল্লিখিত প্রবন্ধটী অনুশীলন করিলে আমরা স্থূলতঃ এই কয়টী সিদ্ধান্তে উপনীত হই :—

(১) মায়া বা প্রকৃতি অচিন্ত্যশক্তি শ্রীভগবানের চৈতন্যরূপিণী 'আত্মশক্তি', মায়া ভগবান্ হইতে পৃথক্ নহেন।

(২) এই মায়া অবিদ্যারূপে সংসারচক্রে প্রকাশমানা, কিন্তু বিদ্যারূপে ঈশ্বরকে প্রকাশশীলা। মায়ার সগুণভাব অবিদ্যার ক্ষেত্র, ও নির্গুণভাব বিদ্যার ক্ষেত্র। বিশিষ্ট 'অহং'-বিশিষ্ট-জীবের নিকট মায়া অবিদ্যা। ভগবানের অভিমুখীভাবে তিনি বিদ্যা।

(৩) এই মায়াই পরিদৃশ্যমান জগৎকে প্রকাশ করেন, ও তিনি উপরতা হইলেই মোক্ষ হয়,—নতুবা নহে।

এই সিদ্ধান্তগুলিকে পরিস্ফুট করিতে উক্ত প্রবন্ধে লেখকগণ শ্রুতি ও পুরাণাদি হইতে বহু প্রমাণ উদ্ধার করিতেছেন। আমার মনে হয়, এই সিদ্ধান্ত-

গুলি সম্বন্ধে তন্ত্রশাস্ত্রের অভিমত সংকলিত হইলে তাঁহাদেব আলোচনার যৎকিঞ্চিৎ সহায়তা হইতে পাবে। তাই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতাবণা।

তন্ত্রশাস্ত্রে মায়াকে সাধাবণতঃ 'শক্তি' এই আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। এই মায়া বা শক্তি চৈতন্যরূপিণী। 'মায়াতন্ত্রে' কথিত আছে, "যা চিচ্ছক্তিঃ সৈব মায়া" "যিনি চিৎশক্তি তিনিই মাযা।" বৌদ্ধ শাস্ত্রে তাঁহাব নাম প্রজ্ঞা।

তন্ত্রে মায়াব অপব নাম 'প্রকৃতি', অর্থাৎ মায়া, শক্তি ও প্রকৃতি মায়ার এই তিন নাম। এই মায়া, শক্তি বা প্রকৃতি যে ব্রহ্ম বা ভগবানেব সহিত অভিন্না ও তাঁহাবই প্রকাশিকা, তাহা বহু তন্ত্রে কথিত আছে। আমবা 'গন্ধর্ব্বতন্ত্রে' দেখিতে পাই—

একমাসীৎ পবংব্রহ্ম নিত্যং সূক্ষ্মতীন্দ্রিয়ম্।
নিত্যানন্দময়ং ধাম তেজোরূপং সনাতনম্॥
তদেব প্রকৃতিঃ সাতু তেজোরূপা সনাতনী।
নিত্যানন্দবপুর্দ্দেবী তদ্রূপা তৎপ্রকাশিনী॥

নিত্য, সূক্ষ্ম, অতীন্দ্রিয়, নিত্যানন্দধাম, তেজোরূপও এক পবব্রহ্ম বিবাজ কবিতেছিলেন। তাঁহাব প্রকৃতি,—তিনিও তেজোরূপা সনাতনী, নিত্যানন্দবপু, দ্যোতনশীলা, তদ্রূপা (পবব্রহ্মরূপা) এবং তৎপ্রকাশিনী অর্থাৎ সেই পবব্রহ্ম-প্রকাশকাবিণী।

এই 'তদ্রূপা' ও 'তৎপ্রকাশিনী' এই দুইটী বিশেষণেব উপব লক্ষ্য বাখিতে হইবে। মায়া বা প্রকৃতি চৈতন্যময়ী, ও পবব্রহ্ম হইতে অভিন্না। সেইজন্য তাঁহাকে 'তদ্রূপা' বলা হইল। তিনি যাহা প্রকাশ কবেন, তাহাও পরব্রহ্ম ভিন্ন আব কিছুই নহে। সেই জন্য তাঁহাকে 'তৎপ্রকাশিনী' বলা হইল।* বস্তুতঃ এক পরব্রহ্ম ভিন্ন আব কিছুবই সত্তা নাই বা থাকিতে পাবে না। সেই 'সৎ' যেন আপন স্বরূপ আপনি উপভোগ করিবাব জন্য, আপনাব শক্তি 'মায়া' প্রভাবে, আপনাকেই প্রকাশ কবিলেন, এবং যাহা একত্ব, প্রকাশক্ষেত্রে তাহা যেন সর্ব্বত্বে পরিণত হইল।

---

* তৎপ্রকাশিনী শব্দের দুই প্রকার অর্থঃ বহির্মুখীনভাবে মায়া ব্রহ্মের 'সর্ব্বত্বে'র প্রকাশিনী ও অন্তর্মুখীনভাবে তিনি ব্রহ্মের 'একত্বে'র বা বা 'জ্ঞ'র প্রকাশিনী।

তন্ত্রে অনেক সময় পরব্রহ্মকে 'সদাশিব' ও ঈশ্বরকে 'শিব' আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে ; এবং সময় সময় 'শিব' শব্দেও পরব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হয়। এই সদাশিব বা শিব ও তাঁহার শক্তি পরস্পর ভিন্ন ভাবে থাকিতে পারেন না।

ন শিবেন বিনা শক্তিঃ ন শক্তিরহিতঃ শিবঃ।
অবিনাভাবসম্বন্ধ স্তয়েবানন্দ রূপয়োঃ ॥

"শক্তি, শিব ভিন্ন থাকিতে পারে না, ও শিবও শক্তি ভিন্ন থাকিতে পারে না। আনন্দরূপ শিবও ও আনন্দরূপা শিবা, ইহাঁদের অবিনা-ভাব সম্বন্ধ।" অর্থাৎ শক্তিও শক্তিমান্-উভয়েই এক।

এই শক্তি চৈতন্যময়ী, তাঁহাতে জড়ত্ব নাই, ও তিনি পর-ব্রহ্মে নিত্য অধিষ্ঠিতা। এই সম্বন্ধে 'সময়াতন্ত্রে' দেখিতে পাই·—

"সদাশিবো মহাপ্রেতো নির্গুণঃ পরমেশ্বরি,
তন্নিষ্ঠা পরমাশক্তি গুর্ণাতীতা সুনির্ম্মলা ॥

"হে পরমেশ্বরি সদাশিব মহাপ্রেত (মহা শব অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়) ও নির্গুণ, ও সেই পরমা শক্তি, যিনি গুণের অতীতা ও সুনির্ম্মলা, তিনি তাঁহাতেই অধিষ্ঠিতা আছেন।"

বস্তুতঃ ব্রহ্মে কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। এই যে ঐন্দ্রজালিক জগৎপ্রপঞ্চ তাহা তাঁহার শক্তি কর্ত্তৃকই প্রকাশিত ও লয় প্রাপ্ত হয়। এই বিষয়ে উল্লিখিত তন্ত্রে লিখিত আছে—

রুদ্রো বিষ্ণুস্তথা ব্রহ্মা ক্রমাদেব পরস্পরম্।
ঈশ্বরে লয়মায়াস্তি ঈশ্বরশ্চ সদাশিবে।
পুনশ্চ শক্ত্যধীনাস্তে আবির্ভাবং প্রযান্তিচ।
পূর্ণত্বাৎ পরমানন্দে ন কর্ত্তৃত্বং সদাশিবে ॥
স সাক্ষী পশ্যতি জগৎ পরমাত্মা গুণত্রয়ং।
তদধিষ্ঠানমাসাদ্য পরমানন্দরূপিণী।
সৃজত্যেষা পালয়তি সংহরত্যেব মেবচ ॥

রুদ্র, বিষ্ণু, ও ব্রহ্মা পরস্পর ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরে লয় প্রাপ্ত হয়েন, ও ঈশ্বরও সদাশিবে (পরব্রহ্মে) লয় প্রাপ্ত হয়েন। পুনশ্চ শক্তির অধীন হইয়া তাঁহারা

আবির্ভাব প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু পূর্ণত্ব হেতু সদাশিবে (পর-ব্রহ্মে) কোন কর্তৃত্ব নাই। সেই পরমাত্মা সাক্ষী-স্বরূপে ত্রিগুণাত্মক জগৎকে দর্শন করেন, ও তাঁহার পরমানন্দরূপিণী শক্তিই এইরূপ সৃষ্টি স্থিতি ও লয় সম্পাদন করেন।

মায়ার দুই ভাব—বিদ্যা ও অবিদ্যা। তৎসম্বন্ধেও তন্ত্রে কথিত আছে,—

যদা সা পরমাশক্তি র্গুণাধিষ্ঠানমাচরেৎ।

প্রকৃতিত্বং ভবেৎ তস্যাঃ পুরুষঃ স্যাৎ সদাশিবঃ॥

"যখন সেই পরাশক্তি সত্ত্ব, রজ ও তমঃ এই গুণ ত্রিতয়ে অধিষ্ঠান করেন, তখনই তাঁহার প্রকৃতিত্ব হয় অর্থাৎ তখনই তিনি প্রকৃতি* হইয়া যান ও সদাশিব সেই সময়ে পুরুষ হয়েন। অর্থাৎ অবিদ্যাক্ষেত্রে সদাশিব ও তাঁহার শক্তি 'পুরুষ প্রকৃতি' রূপে প্রতীয়মান হয়েন।

আবার সেই শক্তি যখন শিবোন্মুখী হয়েন, তখন তিনি তাঁহার সহিত অভেদ হইয়া যান যথা ;—

"শিবোন্মুখী যদা শক্তিঃ পুংরূপা সা ভবেৎতদা"

"সেই শক্তি যখন শিবোন্মুখী হয়েন, তখন পুরুষ অথবা চৈতন্যরূপিণী হয়েন।" তন্ত্রান্তরে কথিত আছে শক্তি যখন জীবোন্মুখী হয়েন তখন তিনি অবিদ্যা, ও যখন শিবোন্মুখী হয়েন তখন তিনি বিদ্যা। বস্তুতঃ অবিদ্যোপহত হইলেই জীব, ও অবিদ্যামুক্ত হইলেই শিব। এই জন্য দেখিতে পাই—

নির্গুণঃ সচ্চিদানন্দস্তদংশাঃ জীবসংজ্ঞকাঃ

অসত্যবিদ্যোপহতাঃ যথাগ্নৌ বিস্ফুলিঙ্গকাঃ

"ব্রহ্ম নির্গুণ ও সচ্চিদানন্দ, অগ্নিতে যেমন বিস্ফুলিঙ্গ, জীব সমূহ সেইরূপ তাঁহাতে তাঁহার অংশ। কেবল অসতী (Illusory) অবিদ্যা কর্তৃক উপহত হইয়া তাহার পৃথক্ পৃথক্ প্রতীয়মান হয়।"

তন্ত্রান্তরে, 'বিদ্যা সা যা বিমুক্তয়ে' বলিয়া সেই বিদ্যাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

বস্তুতঃ মায়ার এই অবিদ্যা ও বিদ্যা ভাবকে লক্ষ্য করিয়াই তন্ত্রে মায়াকে 'ভোগদা ও মোক্ষদা' বলা হইয়াছে। তিনি যেমন আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি

---

*। গুণাত্মক জগতের স্থূল যে প্রকৃতি, এখানে 'প্রকৃতি' দ্বারা তাহাই লক্ষ্য করা হইতেছে। সাংখ্য যে "সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ" বলেন ইহা তাহাই। সাংখ্য এই প্রকৃতিকে জড় বলেন, কিন্তু বস্তুতঃ ইনি জড় নহেন। জড়রূপে প্রতীয়মান চৈতন্যেরই অন্ত্য কোটী মাত্র।

দ্বারা জীবকে বিশিষ্ট ও বদ্ধ করিয়া রাখেন তেমনই তাঁহার মোক্ষদায়িনী তৎপ্রকাশিনী শক্তি দ্বারা জীবের মোক্ষসাধন করিয়া থাকেন। মায়ার এই তৎপ্রকাশিনী শক্তি না থাকিলে জীবের মোক্ষ কখনই সম্ভব হইত না। পঞ্চদশীর "সংবাদি-ভ্রম" ও "বিসংবাদি-ভ্রমে" কুলায় না। যাহা ভ্রম, তাহা ভ্রমই ; ভ্রম সত্যকে ধরিতে পারে না।

এই বিষয়ে 'মায়াতন্ত্রের' সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্ত এই :—

মায়া গুণবতী দেবী নির্গুণানাং চিদাত্মিকা।
যদা সা বহুভিঃ পুণ্যৈঃ প্রসীদতি জনান্প্রতি।
তদৈব কৃতকৃত্যাস্তে সংসারাৎ তে বহিষ্কৃতা॥

ত্রিগুণাত্মিকা স্বরূপে ক্রীড়নশীলা মায়াই, যাহারা গুণকে অতিক্রম করিতে চাহে তাহাদের সম্বন্ধে চৈতন্যাত্মিকা। যখন সেই মায়া বহু পুণ্য ফলে মনুষ্য দিগের প্রতি প্রসন্ন হয়েন, তখনই তাহারা কৃতকৃত্য হয় ও তখনই তাহারা সংসার (অবিদ্যাক্ষেত্র) হইতে বহিষ্কৃত হয়।

অতএব আইস আমরা সেই 'ত্রিধামজননী দেবী শব্দব্রহ্ম-স্বরূপিণীকে', সেই 'শুদ্ধ চৈতন্যরূপা সা সর্ব্বগা বিশ্বরূপিণী'কে, সেই 'দিক্‌কালাদ্যনবচ্ছিন্না সর্ব্ব-বেদান্বয়া শুভাকে,' সেই 'সর্ব্ববেদময়ী দেবী সর্ব্বমন্ত্রময়ী শিবা'কে, সেই 'যোগিনাং হৃদয়াম্ভোজে নৃত্যন্তী নিত্যমঞ্জসাকে", "সেই 'নিত্যানন্দ বসুদেবী তদ্রূপা তৎপ্রকাশিনীকে" "ত্বমেকা পরংব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা" বলিয়া বারংবার স্মরণ ও প্রণাম করিয়া কৃতকৃতার্থ হই॥ ইতি ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ॥

শ্রী শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

মুখবন্ধ।

পত্রিকার পাঠকগণের স্মরণ থাকিবে, ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্র নাথ দে মহাশয় কর্ত্তৃক গীতান্তর্গত 'বিশ্বরূপ' স্তোত্রের পদ্যানুবাদ ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা তাহার সম্পূর্ণ মূলানুস্মৃতি ও অন্যান্য গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে ঐভাবে

সমগ্র গীতার পদ্যানুবাদ করিতে অনুরোধ করি। সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথিতনামা অনেক ধুরন্ধর কবি কৃত গীতার পদ্যানুবাদ থাকা স্বত্ত্বেও, যে আমরা তাঁহাকে এরূপ অনুরোধ করিয়াছিলাম, তাহার কারণ এই—আমরা যতদূর দেখিয়াছি, তাঁহাদের কাহারও অনুবাদ আক্ষরিক নহে। সকলেই ছন্দের অনুরোধে মূলের প্রতি তাদৃশ সম্মান প্রদর্শন করেন নাই। ফলে, মূলের শ্লোক হইতে প্রচুর পরিমাণে পদ পরিত্যক্ত হইয়াছে, এবং অনেক স্থলে পূর্ব্ব অনুবাদকগণ নিজ ইচ্ছায় বিস্তর পদ অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন। সুতরাং অনেক ক্ষেত্রে এরূপ ঘটিয়াছে যে, অনুবাদকের নিজ মতানুযায়ী গীতা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বলা বাহুল্য সেরূপ ব্যাখ্যা যদিও সমাদরযোগ্য হয়, তাহা অনুবাদের আখ্যা পাইবার কখনও যোগ্য হইতে পারে নাই। আমাদের বিশ্বাস, গীতার মূলের উপর কোন স্বাধীনতা লওয়া চলে না। এমন কি শ্রীভগবান্ বা অর্জ্জুন যিনি যে নামে যেখানে সম্বোধিত বা অভিহিত হইয়াছেন, সেখানে সেই নামটীরও বিশেষরূপে সার্থকতা আছে। তৎপরিবর্ত্তে অন্য নাম বসাইলে প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণের পক্ষে ব্যাঘাত জন্মে। সেইজন্য অনুপদে ছন্দ ও কবিতার অনুরোধে 'গীতা' অতিরিক্ত শব্দও বন্ধনীতে দেওয়া হইয়াছে।

পরম আহ্লাদের বিষয় শ্রীভগবানের কৃপায় ভ্রাতা শ্রীভবেন্দ্রনাথ কৃত গীতার পদ্যানুবাদ সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং আমরা পন্থার পাঠকগণকে তাহা উপহার অর্পণ করিতে সমর্থ হইলাম। এই সংখ্যা হইতে তাহা ধারাবাহিকরূপে নিয়মিত প্রকাশিত হইবে।

লেখকের অনুরোধ, পন্থার সুধী পাঠকগণ যদি তৎকৃত অনুবাদে কোথাও মূল হইতে বিচ্যুতি ঘটিয়াছে দেখিতে পান, যেন অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন। পদ্যের উৎকর্ষসাধন বিষয়েও তাঁহাদের উপদেশ প্রার্থনীয়।

সংসার-সাগর ঘোর তরিবারে চাহে যেই।
গীতা-নৌকা সমাশ্রয়ি' সুখে পারে যায় সেই।—গীতা-মাহাত্ম্য।

প্রথম অধ্যায়।

—:*:—

অর্জ্জুন-বিষাদযোগ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন—

ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধার্থী মিলি', সঞ্জয়!
কি কবিল মম পক্ষ, কিবা পাণ্ডুব তনয়? ১

সঞ্জয় কহিলেন—

ব্যূহিত দেখিয়া পাণ্ডুসৈন্যে বাজা দুর্য্যোধন
আচার্য্য পাশে গিয়া সম্ভাষে বচন তখন॥ ২
"তোমাব ধীমান্ শিষ্য দ্রুপদনন্দনকৃত
বিপুল পাণ্ডবসৈন্য, আচার্য্য! হেব ব্যূহিত॥ * ৩
মহা ধনুর্দ্ধব, বীব, বণে ভীমার্জ্জুন প্রায়
সাত্যকি, বিবাট, মহাবথ দ্রুপদ তথায়; ৪
পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, কাশীবাজ বীর্য্যবান্,
নবশ্রেষ্ঠ শৈব্য আব ধৃষ্টকেতু চেকিতান, ৫
মহাতেজা উত্তমৌজা, পবাক্রান্ত যুধামন্যু,
—যবে মহাবথী; তথা দ্রৌপদেয, অভিমন্যু॥ ৬
তব অবগতি হেতু এবে কহি, দ্বিজবাজ!
সেনাব নায়ক যেবা প্রধান মোদেব মাঝ॥ ৭
আপনি ও ভীষ্ম, বণজয়ী কৃপ আব কর্ণ,
অশ্বত্থামা, ভূবিশ্রবা, জয়দ্রথ ও বিকর্ণ॥ ৮
অন্য বহু বীব আছে আমাতবে প্রাণার্পিত।
বণেতে নিপুণ সবে, নানা অস্ত্র শস্ত্র ধৃত॥ ৯
ভীষ্মদেব-সংবক্ষিত মোব সৈন্য অপর্য্যাপ্ত।
ভীমের রক্ষিত কিন্তু ওদেব বল পর্য্যাপ্ত॥ ১০
"যথাভাগে অবস্থান কবি সর্ব্ব ব্যূহ পথে,
আপনারা সবে রক্ষা কব ভীষ্ম (মহাবথে)" ॥১১

"তেজস্বী হরষি' তারে গরজিয়া সিংহরবে,
কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ধ্বনিলা শঙ্খ ভৈরবে ॥ ১২
সহসা মাদোল তবে শঙ্খ, শিঙ্গা, ভেরী, ঢোল
উঠিল বাজিয়া, তাহে তুলিল তুমুল রোল ॥
তবে শ্বেত অশ্বযুত মহারথে অবস্থিত
মাধব অর্জ্জুন দিব্য শঙ্খ করিল ধ্বনিত ॥ ১৩
হৃষীকেশ 'পাঞ্চজন্য' 'দেবদত্ত' ধনঞ্জয়,
কুন্তিপুত্র যুধিষ্ঠির রাজ, 'অনন্ত বিজয়,'—
ভীমকর্ম্মা ভীম পূরে শঙ্খ 'পৌণ্ড্র' নামক,
নকুল 'সুঘোষ', সহদেব সে 'মণিপুষ্পক' ॥ ১৪।১৫
মহারথী শিখণ্ডী কাশীপতি শ্রেষ্ঠ ধানুকী।
দ্রুপদ, বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন, অজেয় সাত্যকি।
মহাবাহু অভিমন্যু, দ্রৌপদী-কুমারগণ
পৃথক পৃথক শঙ্খ ধ্বনিল সবে, রাজন্।১৬।১৭
তুমুল সে রোল ধরাকাশ করিয়া ধ্বনিত,
ত্বদীয় সন্ততি-হৃদি করিলেক বিদারিত ॥১৮
অনন্তর শস্ত্রপাত, রাজন্! আরম্ভ হ'লে
(রণস্থলে) ব্যবস্থিত দেখি কৌরব সকলে, ১৯
ধনু তুলি কপিধ্বজ পার্থ হৃষীকেশে বলে
"রাখ হে অচ্যুত। রথ সেনাদ্বয় মধ্যস্থলে, ২০
"—যাবৎ নিরখি আমি, যুদ্ধ কামে অবস্থিত
"কার সনে এই রণে আমার যুঝা উচিত ॥২১
"যুদ্ধাশী সবেরে হেরি যেবা হেথা উপস্থিত,
"দুর্য্যোধন দুর্ম্মতির কেবা রণে প্রিয়কৃৎ" ॥২২
গুড়াকেশ-সম্ভাষিত কৃষ্ণ তবে, হে ভারত!
সেনাদ্বয় মধ্যস্থলে রাখি' সে উত্তম রথ, ২৩
ভীষ্ম দ্রোণ প্রমুখ রাজন্য সম্মুখে তখন,
কহিলেন,—"হের পার্থ! মিলিত কৌরবগণ" ॥ ২৪

উভয় সেনার মাঝে হেরিলা কৌন্তেয় তবে,
পিতৃ-পিতামহ-বর্গ আচার্য্য, মাতুল সবে,
ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, মিত্র, শ্বশুর, তথা বান্ধবে॥ ২৫
বন্ধু সে সবারে হেরি' অবস্থিত (রণসাধে),
কহিলা করুণাবিষ্ট অতি, কৌন্তেয়, বিষাদে॥ ২৬

অর্জ্জুন কহিলেন—

সম্মুখে স্বজনে, কৃষ্ণ! দেখি' সংগ্রামোৎসুক,
অঙ্গ অবসন্ন মম, বিশুষ্ক হতেছে মুখ॥ ২৭
শরীরে দিতেছে কম্প, রোমাঞ্চ মম উঠিছে,
গাণ্ডীব খসিছে হস্তে, প্রদাহ ত্বকে ছুটিছে॥ ২৮
রসিতে না পারি আমি, ঘুরিতেছে মম মন,
হেরিতেছি হে কেশব! বিরুদ্ধ যত লক্ষণ॥ ২৯
স্বজনে সংগ্রামে নাশি', আমি নাহি হেরি ইষ্ট।
না চাহি বিজয় আমি, রাজ্য কিম্বা সুখ, কৃষ্ণ!
কি কাজ, গোবিন্দ! রাজ্যে, মোদের ভোগ্যে, জীবনে?
ভোগ, সুখ, রাজ্য মোরা চাহি যাদের কারণে, ৩০
তারাই ত সমাসীন রণে, ত্যজি' প্রাণ, ধন,
পুত্র, পৌত্র, গুরু আদি পিতৃ-পিতামহগণ—৩১
মাতুল, শ্বশুর, শ্যালা, কুটুম্ব, মধুসূদন!
—মরিলেও নাহি চাহি, তা'দিগে মারি কখন, ৩২
কিবা ছার পৃথ্বীলাভ, ত্রৈলোক্য রাজ্য কারণ।
—কৌরবেরে বধি' পুনঃ কিবা প্রীতি জনার্দ্দন? ৩৩
আততায়ী (বটে তারা তবু) বধিলে সে সবে,
জন্মিবে মোদের পাপ, তাই উচিত না হবে—
বধিতে বান্ধব সহ ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণে *।
—স্বজনে মাধব! বধি' সুখী হই বা কেমনে? ৩৪

* অথবা পাঠান্তর অনুসারে—'বধিতে স্বীয় বান্ধব ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণে।'

যদ্যপি না দেখে তা'রা হৃতবুদ্ধি লোভাবেশে,
মিত্রদ্রোহে কিবা পাপ; কিবা দোষ কুল নাশে, ৩৫
স্পষ্ট দেখি' কুলক্ষয়ে দোষ মোরা, জনার্দ্দন!
কেন না কর্ত্তব্য বুঝি, পাপ হতে নিবর্ত্তন? ৩৬
কুলক্ষয়ে নষ্ট হয়, কুলধর্ম্ম সুপ্রাচীন,
ধর্ম্মনাশে বাকী কুল হয় অধর্ম্ম অধীন॥ ৩৭
কুল-স্ত্রী দূষিতা হয়, কৃষ্ণ। অধর্ম্ম প্রভাবে,
দুষ্টা হলে স্ত্রী, যাদব। বর্ণসঙ্কর সম্ভবে॥ ৩৮
সঙ্কর নরকহেতু, কুলঘ্ন আর কুলের।
পিণ্ডোদক লোপে ভ্রষ্ট, পিতৃলোক উহাদের॥ ৩৯
কুলঘ্নের এই বর্ণসঙ্কর-কারক দোষে
সনাতন কুলধর্ম্ম আর জাতিধর্ম্ম নাশে॥ ৪০
নষ্টকুলধর্ম্ম-নরের নিয়ত জনার্দ্দন!
নরকে নিবাস হয় করেছি মোরা শ্রবণ॥ ৪১
হায়। মহাপাপ মোরা করিতে হয়েছি রত।
রাজ্যসুখ লোভে যাহে স্বজনে বিনাশোদ্যত॥ ৪২
প্রতিকারে পরাঙ্মুখ নিরস্ত্র যদিও মোরে
সশস্ত্র কৌরব বধে, ভাবির শ্রেয়ঃ অন্তরে॥ ৪৩

সঞ্জয় কহিলেন,—

হেন ভাষি' পার্থ স্থির বসিলেন রথোপরে,
শোকাবিষ্ট মনে রণে বিসর্জ্জিয়া ধনুঃশরে॥ ৪৪

(ক্রমশ)

শ্রীভবেন্দ্রনাথ দে বি, এ।

———

দাক্ষিণাত্যে তীর্থ দর্শন।

—০ঃ০—

চিদম্বর রহস্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পুরাণ কথা।

স্কন্দপুরাণান্তর্গত চিদম্বরক্ষেত্র মাহাত্ম্যে লিখিত আছে যে, পঞ্চম মনু বৃদ্ধাবস্থায় স্বকীয় রাজ্য সন্তানগণকে বিভাগ করিয়া দেন। তাহার অন্যতম পুত্র শ্বেতবর্ণ চক্রবর্ত্তি-কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত হইয়া রাজ্য গ্রহণ না করিয়া তীর্থ পর্য্যটন করিতে করিতে কাঞ্চীপুরীতে আসিয়া কোন ব্যাধ-মুখে শুনিলেন যে, চিদম্বরম্ তীর্থে ব্যাঘ্রপাদ নামক অশেষ শক্তিসম্পন্ন জনৈক ঋষি বাস করিতেছেন; তাঁহার হস্তপদ ব্যাঘ্রসদৃশ। শ্বেতবর্ণ তৎশ্রবণে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ঐ ব্যাধকে পথপ্রদর্শক করিয়া ঋষিবরের কৃপালাভার্থ চিদম্বরে আসিয়া পৌঁছেন। চিদম্বর তখন জঙ্গলাবৃত, একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে আকাশরূপী ভগবান্ শঙ্কর বিরাজমান ছিলেন। দেবগণ এবং ত্যাগী সন্ন্যাসিগণ তাঁহার আরাধনা করিতেন। এই অরণ্যে ব্যাঘ্রপাদ ঋষির আশ্রম। রাজা তাঁহার শরণাগত হইলেন। ঋষিবর মহাদেবের অনুমতি লইয়া তাঁহাকে হেমপুষ্করিণী নামক তীর্থ-সরোবরে স্নান করিতে আদেশ করিলেন। তীর্থে স্নান করিবামাত্রই মহাদেবের কৃপায়, রাজার কুষ্ঠব্যাধি আরোগ্য হইল ও তাঁহার বর্ণ হিরণ্যসদৃশ হইল! তদবধি তিনি শ্বেতবর্ণের পরিবর্ত্তে 'হিরণ্যবর্ণ' নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন। তখন চিদম্বরে শঙ্করের বিশাল মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন এবং প্রভূত ধন দান করিয়া পূজার সমৃদ্ধ ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কিন্তু দাক্ষিণাত্য তখনও বেদাচার বহির্ভূত, তাই তিনি চিদম্বরেশ্বরের অনুমত্যনুসারে বারাণসী হইতে তিন হাজার বৈদিক দীক্ষিত ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া পাঠান। তাঁহারা প্রত্যেকে এক একখানি শকটে আরোহণ করিয়া আইসেন; ক্রমে সকল শকট আসিয়া পৌঁছিলে, দেখা গেল ২৯৯৯ খানি শকট আসিয়াছে। তখন কে আসেন নাই, ইহা জানিবার নিমিত্ত রাজা অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, সভানায়কেশ্বর

নামে একজন ব্রাহ্মণ আসেন নাই। তজ্জন্ত তিনি বিশেষ দুঃখিত হইয়া চিন্তা করিতেছেন, এবং অনাগত ব্রাহ্মণের অনুসন্ধানার্থ লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন; এমন সময় আকাশবাণী হইল যে স্বয়ং মহাদেব নিজেই সেই অনাগত দীক্ষিত! সম্ভবতঃ ইঁহারা কাশীবাসী শিবরহস্যবেত্তা ও শিবপূজায় দীক্ষিত ছিলেন, বলিয়াই দীক্ষিত নামে অভিহিত হইতেন। স্কন্দপুরাণান্তর্গত সেতুবন্ধখণ্ড, ক্ষেত্রপুরাণ, শিবভক্তিবিলাস, প্রভৃতি প্রাচীন পুস্তকে চিদম্বর মাহাত্ম্য ও এখানকার অনেক ভক্তের পুণ্যকাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত আছে। শিবভক্তবিলাস নামক প্রাচীন পুস্তকের ২৪ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, চিদম্বর নামক উত্তম ক্ষেত্র দর্শন করিলে মুক্তিলাভ হয়। এখানে মহর্ষি ব্যাঘ্রপাদ ও পতঞ্জলি কনকসভায় ভগবান্ নটরাজকে দর্শন করিয়া সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণগণ যে স্তোত্রে জগৎগুরু নটরাজকে প্রণাম করিয়া থাকেন, উক্ত মন্ত্রে দেবাদিদেবকে নমস্কার করিয়া আমরা অদ্য বিদায় গ্রহণ করি। বারান্তরে মন্দির, নগর, পাণ্ডা প্রভৃতির বিষয় বর্ণনা করিয়া, আমরা প্রবন্ধ শেষ করিব।—

লোকানাহূয় সর্ব্বান্ ডমরুককনিনদৈঃ ঘোরসংসারমগ্নান্।
দত্বাঽভীতিং দয়ালুঃ প্রণত-ভয়-হরং কুঞ্চিতম্পাদপদ্মম্॥
উদ্ধৃত্যেদং বিমুক্তেরয়নমিতি করাদ্দর্শয়ন্ প্রত্যয়ার্থং।
বিভ্রদ্বহ্নিং সভায়াং কলয়তি নটনং যঃ স পায়ান্নটেশঃ॥

"যিনি ডম্বরুর ধ্বনি করিয়া ঘোর সংসারমগ্ন লোকদিগকে আহ্বান করেন, যিনি দয়াপরবশ হইয়া প্রণত ভক্তের বিপত্তি নিবারণপূর্ব্বক অভয়দান করেন, যিনি কুঞ্চিত পাদপদ্ম উত্তোলন করিয়া হস্তনির্দ্দেশপূর্ব্বক বলেন "ইহাই মুক্তির পথ" এবং যিনি কপালে ও হস্তে বহ্নি ধারণ করিয়া সভায় নৃত্য করেন, সেই নটরাজ আমাদিগকে রক্ষা করুন।" (মহামহোপাধ্যায় সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণের অনুবাদ।)

(ক্রমশ)

শ্রীপান্নালাল সিংহ।

মহামায়ার খেলা।

দশম পরিচ্ছেদ।

নবকুমার সেই পৈশাচিক কার্য্যের জন্য যখন বাটীতে গমন করে তখন বলিয়া গিয়াছিল যে দুই দিন পরে ফিরিয়া আসিব। কিন্তু যখন দুই দিন কেন সপ্তাহ কাল অতিবাহিত হইল অথচ নবকুমারের সাক্ষাৎ নাই কিংবা কোন সংবাদও নাই, তখন সকলেরই মনে চিন্তা উপস্থিত হইল। নবকুমারের বৃদ্ধা মাতা ও পত্নী ব্যতীত তাঁহার বাটীতে আর কেহই নাই। এদিকে গ্রামেও হেমলতার নিরুদ্দেশ লইয়াও নানাবিধ আলোচনা হইতেছে। নবকুমারের মাতুলালয় হইতে সংবাদ আসিল, যে সে তথা হইতে সেই রাত্রেই চলিয়া আসিয়াছে। বৃদ্ধা মাতা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া পাড়ার লোক জড় করিল। সকলে দুই চারিটী অলীক প্রবোধ বাক্য দিয়া, মুখে সহানুভূতি জানাইবার কোন ত্রুটী করিল না।

এদিকে গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা প্রায় সকলেই হেমলতার নিরুদ্দেশের সহিত নবকুমারের পলায়ন সংযোজনা করিয়া নানাবিধ কুৎসা রটনা করিতে লাগিল। পরের নিন্দা মানুষের এমনি মুখরোচক। পথে ঘাটে এবং গ্রামের অনেকস্থানেই সেই সতীর অযথা নিন্দা নানারূপ মিথ্যা গল্পে পরিণত হইতে লাগিল। তাঁহারা সাব্যস্ত করিলেন যে হেমলতা বরাবরই অসৎচরিত্রা। এই সংবাদ ক্রমে নবকুমারের স্ত্রীর কর্ণেও প্রবেশ করিল। একটী বৃদ্ধা অতীব রসিকতার সহিত তাহার নিকট গিয়া বলিলেন "বলি নাতবৌ তোমার জন্য তিনি কি একটুও ভাবেন, যে দিন নাই রাত নাই তার জন্য কেবল কান্না আর কান্না।"

নবকুমারের স্ত্রী।—যাই হ'ক তার কথার আলোচনায় আমার কাজ কি? আমি তাঁর চরণের দাসী বৈত নয়।

বৃদ্ধা।—"দেখ, ওসব কথা শুনতে ভাল বটে, কিন্তু ওতে মন ত মানেনা। একবার গাঁয়ের মধ্যে গেলে পরে বুঝতে যে লোকে কি বলেছে। আমি তোমাদের বড় ভাল বাসি, তাই তোমাদের কাঁদ কাঁদ মুখ দেখতে পারি না।

নবকুমারের স্ত্রী। "গ্রামের লোক যে যা বলে বলুক, আমার ওসব কথা

শুনিবারও দরকার নাই, তোমারও আমার কাছে বলবার কাজ নাই।" তখন বৃদ্ধা একটু বিরক্ত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

বৃদ্ধা জগুদিদির মনেও একটু সন্দেহ উপস্থিত হইল। অবশ্য হেমলতার অকলঙ্কচরিত্রের উপর তাহার বিন্দু মাত্রও অবিশ্বাস নাই। তবে নবকুমারের কৌশলজালে হেমলতা ধৃত হইয়াছে বলিয়া, তাহার মনে ক্রমে সন্দেহ ঘনীভূত হইতে লাগিল। কারণ ইতিপূর্ব্বে সে নবকুমারকে কয়েক দিন ও পাড়ায় বেড়াইতে ও ঘোরা-ফেরা করিতে দেখিয়াছে। কয়েক দিন, বিশেষতঃ যে দিন হেমলতার দরজায় আঘাত হয় সেই দিন সে হেমলতার খবর অতি আগ্রহের সহিত লইয়াছে। ত্রয়োদশীর দিন সে এখান হইতে চলিয়া যাইবে, এসংবাদও তাহার নিকট হইতে আসিয়াছে। এই সকল ঘটনা, ও তাহাদের এক দিনে গ্রাম পরিত্যাগ, ইত্যাদি চিন্তা করিতে করিতে বৃদ্ধা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইল যে নবকুমারই হেমলতাকে লইয়া না জানি কি বিপদে ফেলিয়াছে।

এই রূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে, নবকুমারের মাতা কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া এ জীবনের খেলা সাঙ্গ করিলেন। একে বয়স হইয়াছে, তাহাতে এক-মাত্র পুত্রের নিরুদ্দেশে জীবনবায়ু ক্রমে নিঃসারিত হইল। নবকুমারের স্ত্রীর আশ্রয় ভরসা আর কেহই থাকিল না। হতাশ আক্ষেপ, ও অহর্নিশি স্বামী চিন্তাই তাহার জীবনের সম্বল হইল। নবকুমারের স্ত্রীর নাম বিনোদিনী। বিনোদিনী জানিত যে তাহার স্বামীর চরিত্র ভাল নয়, কিন্তু তবুও সে স্বামীকে কোন দিন অবহেলা করে নাই, কোন দিন স্বামীর শুশ্রূষার ক্রটী করে নাই। বিনোদিনীর ক্রমে জীবনে ধিক্কার উপস্থিত হইতে লাগিল। মনে মনে ভগবানকে বলিতে লাগিল যে "কখনও স্বামীর পদসেবার অধিকারিণী হইলাম না, শুধু চোখে দেখিতাম তবুও তোমার সহ্য হইল না। তবে আর এজীবনে প্রয়োজন কি? এ ছার দেহের আবশ্যকতা কি? দুর্ব্বহ জীবন লইয়া কি করিব? আর সংসারে থাকিয়া কি লাভ।"

নবকুমার অসৎচরিত্র হইলেও তাহার পত্নী অতি সুশীলা ও সৎস্বভাবা। নবকুমার এক দিনও কি জানি কেন তাহাকে একটীও ভাল কথা বলিয়াও তাহার নিকট দাঁড়ায় নাই। বিনোদিনীর বর্ণ স্বর্ণ চম্পক সদৃশ কিংবা প্রস্ফুটিত স্থল-কমলবৎ না হইলেও, কৃষ্ণবর্ণ নহে;—উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলিলে যাহা বুঝায়,

তাহা অপেক্ষাও বর্ণ উজ্জ্বল। গঠন খর্ব্বাকৃতি; মুখখানিতে হাসির ছায়া থাকিলেও সর্ব্বদাই যেন মলিনতা মাখান। এ মলিনতা তাঁহার স্বাভাবিক নহে, স্বামীর অনাদবচিন্তাই ইহাব কারণ। চক্ষুর তারা দুটী নিবিড় কৃষ্ণ; অধর ভ্রূযুগল ললাট সুগঠনও সুকুমাব। নবকুমাব এক দিনও স্বীয় অর্দ্ধাঙ্গিনীর এ রূপের প্রতি চাহিয়া দেখে নাই। যৌবনেব প্রাবম্ভ হইতেই কুসংসর্গে কালাতিপাত করিয়া সর্ব্বদাই সেই সকল লইয়াই ব্যাপৃত থাকিত। স্বামীর সোহাগে বঞ্চিত বলিয়া বিনোদিনী একদিনও কেশবিন্যাস কবিতেন না। কেশগুলি রুক্ষভাবে পৃষ্ঠদেশে লম্বিত ভাবে পড়িয়া থাকিত। একদিনও তাঁহাব অধব তাম্বুলরাগে রঞ্জিত হইত না; অঙ্গে শাঁখা ও লোহা ব্যতীত কোন আভবণ শোভা পাইত না। তবুও সে হৃদয়ের আশায় বুক বাঁধিয়া কাল কাটাইয়াছে; এখন সে আশাব দীপ নির্ব্বাপিত। সুতরাং সে জীবন ত্যাগেব সংকল্পেব দিকে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল; ক্রমে তাহাব ক্রন্দন লোপ পাইল, সর্ব্বদাই অন্তরেব কি এক চিন্তায় নীবব, নিস্তব্ধ ও গম্ভীব,—যেন প্রবল ঝটিকার পূর্ব্বে প্রকৃতি নীরব।

তাহার সই সুবদনী পশ্চাৎ হইতে আসিয়া দুই তিন বার ডাকিয়া কোন সাড়া পাইল না; অবশেষে গায়ে হাত দিয়া ডাকিতে লাগিল। তখন একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বিনোদিনী তাহাব দিকে চক্ষু ফিবাইলেন। সুবদনী বলিল—"এমন ক'বে ক'দিন বাঁচিবে?"

বিনো। 'বেঁচে লাভ কি ভাই।'

সুব। 'কেন স্বামী বিদেশ গেলে, মর্‌তে হবে বুঝি।'

বিনো। 'বিদেশে গেলে মব্‌বে কেন? একি বিদেশ যাওয়া? আর ভুলিয়ে রেখো না। তোমাব কথাতেই এতদিন স্থিব হয়ে দেখলেম্, অপেক্ষা করলেম্। এখন ঠিক বুঝেছি যে তিনি এ জগতে নাই। তোর পায়ে ধরে বলছি আর আমায় মিছে প্রবোধ দিস্‌না। তোকে আমি প্রাণেব সঙ্গে ভাল-বাসি; তুই আমারে বলে দে স্বামী মর্‌লে কি করে সহমরণে যেতে হয়?'

সুব। 'তুই পাগল হলি দেখছি। স্থিব হ। ব্যস্ত হলে কি কাজ হয়।' বিনোদিনী কাঁদিতে লাগিল; প্রাণের আবেগে সুবদনীর গলা জড়াইয়া বলিতে লাগিল "দেখ ভাই পাগল হলেত বাচতেম্, আর যে সহ্য হয় না। আমি কি পাপ করেছিলেম্; বলতে পরি না; তাহলে তার প্রায়শ্চিত্ত করি। আমার মত

হতভাগিনীর মৃত্যুই মঙ্গল। দেখ ভাই যদি আমি শুনতে পেতেম্ তিনি বেঁচে আছেন তাহলেই—আমার যথেষ্ট। আমি তাঁকে দেখে চক্ষু সার্থক কর্ত্তে চাই না, তাঁর কণ্ঠস্বব শুনে জীবন ধন্য কর্ত্তে চাই না, তাঁব স্পর্শসুখে স্বর্গসুখ অনুভব করিতে চাই না। কেবল শুনিতে চাই—তিনি ভাল আছেন। স্বামী ভিন্ন স্ত্রীলোকের জগতে আর কি আছে ভাই। এই জগতে স্ত্রীলোকের যদি কিছু আরাধ্য বস্তু থাকে, তবে তাহা স্বামী; যদি কিছু ঐশ্বর্য্য থাকে, তবে তাহা স্বামী, যদি কিছু চিন্তা থাকে, তবে তাহা স্বামীর। সেই স্বামী আজ একাকী এই অনন্তেব কোন প্রান্তে অবস্থিত—জানিনা। কথনও তাঁহার সাক্ষাৎ পাইব কি না, বলিতে পাবি না। যথন তিনি এথানে ছিলেন, বাড়ীতে আসিলে তাঁহাব কণ্ঠশব্দ শুনিবাব জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইত। যথন আহাবে বসিতেন—তাঁহাকে দেখিলে নয়ন তৃপ্ত হইত। অকাবণে ভৎর্সনা করিলেও, আমাব নিকট তাহা প্রেমের বচন মনে হইত। লোকমুখে শুনিতাম আমাব স্বামীব চবিত্র মন্দ। তজ্জন্য একদিনও মনে দুঃখ হয় নাই; কখন তাহাব উপব বাগ করি নাই। তবে তিনি কেন চলিয়া গেলেন? দাসীকে কেন পবিত্যাগ কবিলেন?

এই বলিতে বলিতেই বিনোদিনী কাঁদিয়া ফেলিল। সুবদনী অঞ্চল দিয়া চক্ষের জল মুছাইয়া সান্ত্বনা কবিতে লাগিল। তাহাতে তাহাব ক্রন্দন হ্রাস প্রাপ্ত না হইয়া আরও বর্দ্ধিত হইল।

অনেকক্ষণ উভয়ে নীবব ভাবে বসিয়া রহিল। বিনোদিনীও কতকটা স্থিব হইল। সুবদনী বলিতে লাগিল, "তুই ভাই ধন্য, তোর মত স্বামিভক্তি আজ কাল বড দেখা যায় না। স্বামীব উপর তোর যথার্থই ভালবাসা। তোর এমন অনুরাগ দেখে, আমাব মনে হিংসা হয়। তুমিই যথার্থ সতী,—যথার্থ পতিব্রতা। আমিত ভাই তোব মতন হতে পারিনি।"

বিনোদিনী। "দেখ ভাই—স্বামীর উপর কোনদিন বিরক্ত ভাব না দেখিয়েই ত—চক্ষের জলে পথ দেখ্‌তে পাচ্ছিনা। মনে অভিমান বাক্ বিতণ্ডা করলে, না জানি আবও কি হত। আমার কর্ত্তব্যই ত যে পতির কোন কার্য্য বিচাব না কবিয়া, তাঁহাকে ভালবাসিব,—সেবা করিব,— পূজা করিব। আমাদের ইহাই ব্রত,—ইহাই সাধনা,—ইহাই—জপ তপ।

সুবদনী। 'ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন বোন্। এমন লোকের কপালে

এমন কষ্ট কখনও থাকবে না। এখনও দিন হচ্ছে, রাত হচ্ছে, সূর্য্য চন্দ্র উঠছে, ধর্ম্ম একেবারে লোপ পায় নি। তুই নিশ্চয়ই স্বামীকে পাবি।'

বিনোদিনী। 'এই জন্মে না, আব একবার ম'রে?'

সুবদনী। 'এই জন্মেই পাবি, দেখিস্ আমার কথা।'

বিনোদিনী। 'আশীর্ব্বাদ কব ভাই, যেন ভাই আবার তাঁকে পাই।'

সুবদনী বিদায় হইলে বিনোদিনী ঘবে সন্ধ্যা দিতে গেল। তখন সন্ধ্যার আঁধার দেখা দিয়াছে। (ক্রমশ)

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশ।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতেব পব)

তৎপবে "ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে কবিবে" ইহা বৈষ্ণবধর্ম্মেব গুহ্যশিক্ষা স্থিরভাবে এই কথাটীর অর্থ বুঝিবাব চেষ্টা কবা যাক।

চরিতামৃত গ্রন্থে বাগানুগা ভক্তিব দুই প্রকার সাধনের উল্লেখ আছে। একটি বাহ্য, অপবটী আন্তব—

বাহ্য অন্তব ইহাব দুই ত সাধন।
বাহ্য—সাধকদেহে কবে শ্রবণ কীর্ত্তন।
মনে—নিজ সিদ্ধদেহ কবিয়া ভাবন।
রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥ চরিতামৃত।

মানসিক কৃষ্ণসেবা ভক্তির প্রধান অঙ্গ। নবোত্তম দাস ঠাকুব সত্যই বলিয়াছেন—

সাধনে ভাবিব যাহা, সিদ্ধদেহে পাব তাহা।

মনে মনে কৃষ্ণসেবা কবিলে কৃষ্ণদশন অবশ্যই হইবে। স্থূল চক্ষু না থাকিলেও বিল্বমঙ্গল ঠাকুর ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিয়াছিলেন। তাই সাধক ভাবেন—

অন্ধজনে চক্ষু বিনে বল কেমনে দেখে তারে।

ভগবান্ গীতাতেও বলিয়াছেন যে, হে অর্জ্জুন! মন বুদ্ধি আমাতে স্থির কর তাহা হইলে আমাতেই অবস্থিত থাকিবে।

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ১২।৮

এই মন বিষয়ান্তর হইতে ফিরাইয়া, ভগবানে ন্যস্ত রাখা অতীব দুরূহ। তাই অর্জ্জুনের ন্যায় সাধকও বলিয়াছেন—

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ং।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করং ॥

মনকে অশেষ বাহ্য বৃত্তি হইতে সম্যক্‌রূপে শ্রীভগবানে আবিষ্ট করা চাই। এরূপ ভাবে তাঁহাকে স্মরণ করিলে অচিরাৎ তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ময্যাবেশ্য মনঃ কৃৎস্নং বিমুক্তাশেষবৃত্তিযৎ।
অনুস্মরন্তো মাং নিত্যমচিরাৎ মামুপৈষ্যথা ॥ ভাগবত ১০।৪৭।৩৬

মন বস্তুতঃ সাত্ত্বিক, কেবল ইন্দ্রিয় সাহচর্য্যে বহির্ম্মুখী। জীবের জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা, চতুর্থ অবস্থাই আত্মার স্বরূপ ভাব। এই এক এক অবস্থায়, আত্মা এক একটী দেহকে আশ্রয় করিয়া থাকে। জাগ্রত অবস্থায় স্থূল শরীর, স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষ্ম শরীর, এবং সুষুপ্তি অবস্থায় কারণ শরীর; ইহাই মানসিক দেহ। এই অবস্থার বর্ণনা মাণ্ডূক্যোপনিষদে দেখা যায়—

"সুষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞো মকারস্তৃতীয়া মাত্রা মিতেরপীতে র্বা মিনতিহ বা ইদং সর্ব্বমপীতিশ্চ ভবতি য এবং বেদ।

সুষুপ্তাবস্থায়, প্রাজ্ঞ, 'ম'কার অক্ষর তৃতীয় মাত্রার স্থান, ইহাই অন্তিম অথবা তত্ত্বের নির্ণয়কারী। যিনি ইহার জ্ঞান প্রাপ্ত হন, তিনি নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ তত্ত্ব নির্ণয় করেন এবং অন্তিমে পরিণাম প্রাপ্ত হন।

এই উচ্চ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া "মানসে" এই শব্দের প্রয়োগ। এই মানসিক দেহ আশ্রয় করিয়া চিন্তামণি ধামে চিন্ময় লীলা দর্শনের উপদেশ করিয়াছেন। এই লীলা নিত্য। ইহা এখনও ভক্তের প্রত্যক্ষ। "কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়, চিন্তামণি ধামে সুখময় লীলা দর্শন আশায়।" নরোত্তম ঠাকুর মনে মনে গাহিয়াছেন—

নরোত্তম দাসে কয়, এই যেন মোর হয়
ব্রজপুরে অনুরাগ বাস,

সখীগণ গণনাতে আমারে গণিবে তাতে
তবহুঁ পূরিবে অভিলাষ!

রঘুনাথ ভক্তিপথের অধিকারী; সুতরাং হৃদে বীজ বপন মাত্রই অঙ্কুরিত হইল। তিনি বৈরাগ্যের চরম সীমায় উপনীত হইলেন। তাঁহার ত্যাগ জগতের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। তাঁহার ভাব দেখিয়া, তাহার পিতা পূর্ব্বেই বুঝিলেন—

চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হইয়াছে ইহারে।
চৈতন্যচন্দ্রের বাতুল কে রাখিতে পারে॥

এই জীবন্ত ভাগবত আদর্শের চরণে কোটী কোটী প্রণাম করি। দুগ্ধফেননিভ শয্যায় যাঁহার শয়ন, নিত্য নূতন বসনে যিনি ভূষিত হইতেন, ইন্দ্রসম যাঁহার ঐশ্বর্য্য, অপ্সরাসম যাঁহার পত্নী, সেই মহাপুরুষের এইরূপ ত্যাগ কি সহজ কথা!! অথচ তিনি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট—

আনন্দে রঘুনাথের বাহ্য বিস্মরণ।
কায়মনে সেবিলেন গৌরাঙ্গচরণ॥

* * *

সাড়ে সাত প্রহর যায় যাহার স্মরণে।
আহার নিদ্রা চারিদণ্ড (সেহো) নহে কোন দিনে॥
বৈরাগ্যের কথা তার অদ্ভুত কথন।
আজন্ম না দিল জিহ্বায় রসের স্পর্শন॥
ছিড়া কানি কাঁথা বিনু না পরে বসন।
সাবধানে প্রভুর কৈল আজ্ঞার পালন॥
প্রাণরক্ষা লাগি যেবা করেন ভক্ষণ।
তাহা খাঞা আপনাকে কহে নির্ব্বেদ বচন॥

ধন্য ভক্ত রঘুনাথ! আর ধন্য সেই প্রেমিক চূড়ামণি প্রেমাবতার গৌরাঙ্গ দেব! যাঁহার কৃপায় রঘুনাথ এরূপ বৈরাগ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এই প্রেমিক-আদর্শ এক দিন গৌড় শৈলে উদিত হইয়া দেশ আলোকিত করিয়াছিল, প্রেমসিন্ধু উথলিয়া জগৎ প্লাবিত করিয়াছিল! কিন্তু এত অল্প দিনের ভিতরেই তাহার স্রোত মন্দীভূত হইল কেন? এখন সে ভাব বঙ্গে বিরল হইয়া পড়িয়াছে। ধর্ম্মের নামে অসুরের খেলা চলিতেছে। 'ভগবানের আরাধনা' করিতে গিয়া

আমরা এখন "আপনারই" আরাধনা করিতেছি। 'বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাবের' আদর্শ এখন কথার কথায় দাঁড়াইয়াছে। 'জীবের হিতকামনায়' কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া দেখি, যে জীবের হিত ভুলিয়া গিয়াছি, ব্যক্তিগত অহঙ্কারের প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত আছি। উচ্চৈঃস্বরে 'ভগবানের নাম' করিতে গিয়া দেখি "আমারই" ঘোষণা করিতেছি। "বৈষ্ণব সেবার" পরিবর্ত্তে "আমার সেবা" স্থান পাইয়াছে। তবে আমাদের উপায়? উপায় আবার,—সকলে মিলিয়া নির্গুণ ভক্তিযোগ অবলম্বন করা ও বিশ্বজনীন প্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া সকলের সহিত প্রেমপূরিতভাবে মিলিত হইয়া, সেই দয়াল শব্দ ব্রহ্মে পারগামী, পরব্রহ্মে নিষ্ণাত মহাত্মাগণের চরণে কৃপা ভিক্ষা। সেই ভক্ত গোস্বামিগণের চরণে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়া জগতে যাহাতে প্রকৃত শান্তি এবং প্রেম রাজ্য স্থাপিত হয় এবং ভগবানের জ্যোতি যাহাতে আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত উদ্ভাসিত হয়, তজ্জন্য তাহাদিগের উদ্দেশ্যে আত্মনিবেদন করিতে হয়। আশা আছে, স্মৃতি এখনও লুপ্ত হয় নাই। বীজ আছে, বীজে জল সেচন করিলে আবার অঙ্কুর হইবে, আবার পত্র পুষ্প মুঞ্জরিত হইবে; আবার গন্ধে দিগ্বিদিক্ মোহিত হইবে। বঙ্গদেশে আবার ভক্ত সঙ্ঘ উপস্থিত হইবে।

এই প্রেমভক্তি জীবের চরম ধর্ম্ম, মধুর হইতে মধুর, পবিত্র হইতে পবিত্র, গুহ্য হইতে গুহ্য। তাই শ্রীগৌরাঙ্গদেব ভক্তের প্রতি শক্তি-সঞ্চার করিয়া জগতে প্রচার করিয়াছেন, গোপনে, অন্তরঙ্গ শিষ্য সঙ্গে, লীলা আস্বাদন করিয়া গুহ্য তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। প্রেমের সে উচ্চভাব আমাদের ন্যায় অনধিকারীরা বুঝিতে গেলে বিপরীত বুঝিয়া ফেলিব। একই উপদেশে বিভিন্ন ফল, অধিকারী ভেদে দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমাদের প্রেমধর্ম্মের 'বর্ণ পরিচয়' হয় নাই, এখনই 'মহাভারত' পড়িতে যাওয়া বাতুলতা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে। ভক্তি-পথে প্রবেশাধিকার করিতে হইলে, যে সকল বাধা বিপত্তি আছে, অগ্রে তাহাই দূর করিতে হইবে। অভ্যাস দ্বারা তাহা সাধিত হইবে। নতুবা প্রথমেই—

বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি তে এব ধীরাঃ।

এই বচনের দোহাই দিয়া, প্রলোভনের ভিতর অবস্থিতি—আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তিদিগের সান্ত্বনা। এইরূপ ভাবে যে ধর্ম্মের নামে কত ব্যভিচার হইতেছে তাহা বলা যায় না। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ইহা জানিয়াই বলিয়াছেন—

দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারবী প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥
বৈরাগী হইয়া করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥
ক্ষুদ্রজীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥

ভাগবত বলেন—

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপিকর্ষতি॥ ৯।১৯।১৭

ইন্দ্রিয়ের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল চিত্তের বড়ই কঠিন। একটী মাত্র ইন্দ্রিয় দ্বারা পরিচালিত হইলেও, বুদ্ধির বিপর্য্যয় ঘটে।

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি॥ গীতা ২।৬৭

শাস্ত্র বলিয়াছেন যে কুরঙ্গ শ্রবণেন্দ্রিয়-লালসায় প্রাণ হারায়; মাতঙ্গ ত্বগিন্দ্রিয়-তৃপ্তির আশায় বন্দী হয়, পতঙ্গ সৌন্দর্য্য লালসায় অগ্নিশিখায় প্রাণত্যাগ করে; ভৃঙ্গ সৌরভে মুগ্ধ হইয়া পদ্মকোরকের ভিতর প্রাণ হারায়; মৎস্য জিহ্বার লালসায় ধৃত হয়। একটী মাত্র ইন্দ্রিয় সেবার যদি ইহাই ফল, তবে যাহারা পঞ্চেন্দ্রিয়ের সেবায় রত তাহাদের দশায় কি হইবে?

কুরঙ্গ-মাতঙ্গ-পতঙ্গ-ভৃঙ্গ-মীনা হতাঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ।
একপ্রমাদী স কথং ন হন্যতে যঃ সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ॥ গরুড় পুরাণ।

তাই সাধক রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

"পাঁচ ইন্দ্রিয়ের পাঁচ বাসনা, কেমন ক'রে ঘর করিব"

যত দিন বহির্ম্মুখী ইন্দ্রিয়গণ একমাত্র ভগবানের আভাস না দিবে, যত দিন ভেদরূপ কলুষ হইতে আপনাকে উদ্ধার না করিতে না সক্ষম হইব, যতদিন বিষয়-জালের বন্ধন হইতে মুক্ত না হইব, যতদিন দেহাত্ম জ্ঞান হইতে মুক্ত হইয়া আপনাকে ভগবৎ প্রতিবিম্ব বলিয়া না বুঝিব,—ততদিন পরাভক্তি লাভ হইবে না। ততদিন আমাদিগকে তদুদ্দেশে চিত্তের গতি শ্রীভগবানের দিকে রাখিয়া চিত্ত শুদ্ধির জন্য কর্ম্ম করিতে হইবে।

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। ভাগবত ১১।২০।৯

আরুরুক্ষো মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে ॥ গীতা

এই সকল কর্ম্ম ভগবদুদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া এই সকল কর্ম্মও ভক্ত্যঙ্গ বলিয়া বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে কথিত হয়। কিরূপে মোহান্ধ জীবের হৃদয়ে ভক্তির উদ্দীপনা হয়, শ্রীচৈতন্যদেব সনাতনকে উপদেশ করিয়াছেন,—

সাধু সঙ্গ নাম কীর্ত্তন ভাগবত শ্রবণ।
মথুরা বাস, শ্রীমূর্ত্তি শ্রদ্ধায়ে সেবন ॥
সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় (তাতে এই) পাঁচের অল্প সঙ্গ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতেও এই পঞ্চ সাধনাঙ্গের উল্লেখ আছে—

স্বজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গ স্বতো বরে।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ ॥
শ্রদ্ধা বিশেষতঃ প্রীতিঃ শ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রি সেবনে।
নাম সঙ্কীর্ত্তনং শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে স্থিতিঃ ॥

(১) যাঁহার অভিপ্রায় আত্মসদৃশ এবং যিনি আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ ও স্নিগ্ধ এ প্রকার জনের সঙ্গ (২) রসজ্ঞ ভাবুকের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতাস্বাদন (৩) শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তির পরিচর্য্যাদি (৪) নাম সংকীর্ত্তন (৫) মথুরামণ্ডলে স্থিতি। সাধুসঙ্গের যে কিরূপ মহিমা, শাস্ত্র তাহা ভূয়োভূয়ঃ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নারদ ঋষির কথা কে না জানে? তিনি এক জন্মে দাসীপুত্র ছিলেন, সঙ্গগুণে মহাভক্ত হইয়া দিবারাত্রি ভগবদ্গুণ-গানে নিযুক্ত। তিনি ব্যাসদেবকে বলিয়াছেন—

উচ্ছিষ্টলেপাননুমোদিতো দ্বিজৈঃ সকৃৎ স্বভুঞ্জে তদপাস্ত কিল্বিষঃ।
এবং প্রবৃত্তস্য বিশুদ্ধচেতসস্তদ্ধর্ম্ম এবাত্মরুচিঃ প্রজায়তে ॥ ভা ১।৫।২

"ব্রাহ্মণগণের অনুমোদিত ভিক্ষাপাত্রলগ্ন উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া আমার পাপ দূর হইল। এইরূপে বিশুদ্ধ চিত্ত হইলে তাঁহাদিগের যে পরমেশ্বর ভজনরূপ ধর্ম্ম, তাহাতে আমার মনের রুচি হইল।"

তত্রান্বহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়তা-
মনুগ্রহেণাশৃণবং মনোহরাঃ।

তাঃ শ্রদ্ধয়া মেঽনুপদং বিশৃণ্বতঃ
প্রিয়শ্রবণাঙ্গ মমাভবদ্রুচিঃ ॥ ভা ১।৫।৩৬

"তাঁহারা যে অনুগ্রহপূর্ব্বক মনোহর কৃষ্ণ কথা গান করিতেন, প্রতিদিন শ্রদ্ধার সহিত তাহা শুনিতে শুনিতে যাঁহার কথা শুনিতে মনোহর সেই ভগবানে আমার রুচি জন্মিল।"

ইত্থং শরৎ প্রাবৃষিকাবৃতূ হরে
বিশৃণ্বতো মেঽনুসবং যশোমলং।
সঙ্কীর্ত্ত্যমানং মুনিভির্মহাত্মভিঃ
ভক্তিঃপ্রবৃত্তাত্মরজস্তমোপহা ॥ ১।৫।২৮

"এইরূপে শরৎ ও প্রাবৃট্‌কালে মুনিগণ কর্ত্তৃক প্রাতঃকালে মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে গীত হরির অমল যশ শুনিতে শুনিতে রজস্তমনাশিনী ভক্তির উদয় হইল।

ভগবান্ কপিলদেবও মাতাকে উপদেশকালে বলিয়াছিলেন—

সতাং প্রসঙ্গান্ মম বীর্য্যসম্বিদো, ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদশ্বপবর্গবর্ত্মনি, শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ ভা ৩।২৫।২৫

"সাধু প্রসঙ্গে হৃদয় ও কর্ণের আনন্দজনক আমার প্রভাব পূর্ণ কথার আলোচনা শুনিতে শুনিতে অপবর্গ-পথ-স্বরূপ অর্থাৎ অবিদ্যা নিবারক আমাতে অতি শীঘ্র শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি জন্মে।" তাই শ্রীচৈতন্যদেবের সার কথা—

কৃষ্ণ ভক্তি,—জন্ম মূল হয় সাধু সঙ্গ ॥

(২) নাম সংকীর্ত্তন—ভগবানের নামরূপ-গুণাদির উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করাকে কীর্ত্তন বলে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন—

নামলীলাগুণাদিনামুচ্চৈর্ভাষাতু কীর্ত্তনং ॥

যেরূপে নাম সংকীর্ত্তন করিতে হয় তাহার উপদেশ মহাপ্রভু দিয়াছেন—

যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়।
তার লক্ষণ শ্লোক শুন রাম রায় ॥
তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥
সঙ্কীর্ত্তন হইতে সর্ব্বানর্থ নাশ।
সর্ব্বশুভোদয়, কৃষ্ণ-প্রেমের উল্লাস ॥

পদ্যাবলীতে—

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং।
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং॥
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং।
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনং॥

যাহা চিত্ত-দর্পণের মলিনতা অপসারণ করে, সংসার-দাবাগ্নি নির্ব্বাপিত করে, যাহা পরম মঙ্গল সাধনস্বরূপ কুমুদদলের জ্যোৎস্না সদৃশ, যাহা ব্রহ্মবিদ্যা বধূর জীবন স্বরূপ, যাহা আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধন এবং পদে পদে পূর্ণামৃতাস্বাদন করায়, যাহা আত্মাকে সর্ব্বতোভাবে স্নান করাইয়া আনন্দ প্রদান করে, সেই হরিসংকীর্ত্তন জয়যুক্ত হউক।

ভাগবতও বলেন যে হরিনামানুকীর্ত্তন ফলাকাঙ্ক্ষীদিগের তত্তৎফলের সাধন, মুমুক্ষুদিগের মোক্ষসাধন, জ্ঞানীদের জ্ঞানের ফল, অতএব সাধক ও সিদ্ধ কাহারও পক্ষে এতদপেক্ষায় অন্য পরম মঙ্গল নাই।

এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ং।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনং॥

হরিনামে চিত্ত-শুদ্ধি, এমন কি কৃষ্ণাকর্ষিণী পরাভক্তি, হৃদয়ে প্রকট হইতে পারে, ভক্তিশাস্ত্রের ইহাই অভিমত। শ্রীমৎ মহাপ্রভুর ন্যায় হরিনামের মহিমা কে বুঝিয়াছেন, কেই বা অমন নামে মাতোয়ারা হইয়াছেন, কেই বা জগৎকে ওরূপ উন্মত্ত করিয়াছেন? তাঁহারই বাণী—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"
প্রভু কহে এই সে তারক মহামন্ত্র।
ইহা জপ কর সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হইতে সর্ব্বসিদ্ধ হইবে সবার।
অনুক্ষণ জপ ইথে বিধি নাহি আর॥

আমরা এই হরিনামের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারি না। আমাদিগের নিকট উহা কেবল বর্ণসংযোজনা মাত্র। যে নাম পঞ্চমুখে দেবাদিদেব ত্রিপুরারি গান করেন, দেবতারাও যে নামের মহিমা বুঝিতে অক্ষম, যে নামে মত্ত হইয়া নারদাদি

দেবর্ষিগণ সর্ব্বত্যাগ করিয়াছেন, শুক সনকাদি দেবর্ষিগণ, ব্যাস বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণ, অম্বরীষাদি রাজর্ষিগণ যে নামের মহিমা কিয়ৎপরিমাণে বুঝিতে পারিয়া সর্ব্বদাই আত্মানন্দে বিভোর, যে নাম মধুর হইতে মধুর, সেই দেবদুর্লভ অমৃত-রস-পরিপূরিত চৈতন্যের-স্বরূপ নাম-নামীভেদরহিত এবং অপরিচ্ছিন্ন, মায়া-সম্বন্ধহীন নামের মহিমা কি আমাদের ন্যায় কলুষচিত্ত ব্যক্তি বুঝিতে পারে? নামে রুচি বা ভগবানের জন্য পিপাসারূপ অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে "জীবে দয়া" বা ভেদজ্ঞান ত্যাগ করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। তাই বৈষ্ণবশাস্ত্রে "নামে রুচি" জন্মিবার পূর্ব্বে কতকগুলি নামাপরাধ বর্জ্জন করিতে হয়। সেগুলি স্থূল-ভেদভাব ত্যাগ করিবার জন্য। "সতাং নিন্দা", "শ্রীবিষ্ণোঃ সকাশাৎ শিবস্য-নামাদেঃ স্বাতন্ত্রমননং" "শ্রুতিতদনুগতশাস্ত্রনিন্দনং" প্রভৃতি দশটী অপরাধ বর্জ্জন করিলে, তবে নামের মহিমা হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হইবে। সকল নামাপরাধগুলির মূলভাব ভেদজ্ঞান; ইন্দ্রিয়ের বহির্ম্মুখী ভাবই এই ভেদজ্ঞানের ফল। এইগুলি বর্জ্জন করিলে নামনামীর অভেদ ভাব হৃদয়ঙ্গম হইবে। জপ দ্বারা মনকে ইন্দ্রিয়ের বহির্ম্মুখী প্রবণতা হইতে আকর্ষণ-রূপ সাধন সুগম হয় বলিয়া, আমাদিগকে নাম জপিতে উপদেশ করিয়াছেন। এই নাম জপ করিতে আপনি আপনি প্রেম উদিত হইবে।

(৩) ভাগবত শ্রবণ;———ভাগবত সম্বন্ধে চরিতামৃত বলেন;—

শ্রীভাগবত করি সূত্রের ভাষ্যরূপ ॥

*　　　*　　　*

অতএব সূত্রের ভাষ্য শ্রীভাগবত।
ভাগবত শ্লোক উপনিষদ কহে এক অর্থ॥

তথাহি ভাগবতে———

সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ কচিৎ ॥১২।১৩।১৫

শ্রীমদ্ভাগবত সমস্ত বেদান্তের সার; ইঁহার রসামৃতে যাঁহারা তৃপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের অন্যত্র গতি হয় না। পুনশ্চ———

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতং।

পিবত ভাগবতং রসমালয়ং

মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥১।১।৩

এই ভাগবত বেদরূপ কল্পবৃক্ষের ফল, শুকমুখনিঃসৃত হইয়া অবনীতে পতিত। অতএব হে ভক্তরসিকগণ! অমৃতরসান্বিত বসস্বরূপ এই ফল মোক্ষপর্য্যন্ত মুহুর্মুহু সেবন কব। হবিভক্তিবিলাসে গড়ুর পুবাণ হইতে যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছে, তাহাও ভাগবতেব মহিমা জ্ঞাপন কবে।

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভাবতার্থবিনির্ণয়ঃ।

গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ ॥

পুবাণানাং সামরূপ সাক্ষাৎ ভগবতোদিতঃ।

দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোঽয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ ॥

গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্র শ্রীমদ্ভাগবতাবিধঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অর্থ এবং মহাভাবতের তাৎপর্য্য নির্ণয়, গায়ত্রীব ভাষ্যরূপা এবং সমস্ত বেদেব বোধক। নিখিল পুবাণের মধ্যে গবীয়ান্, শত প্রকরন্ যুক্ত, দ্বাদশস্কন্ধবিশিষ্ট, অষ্টাদশসহস্রশ্লোক সংবলিত এবং সাক্ষাৎ ভগবান্-প্রোক্ত।

তাই, শ্রীভাগবত ভক্তেব নিকট এত আদবেব। সকল শাস্ত্রেই একটী প্রতিপাদ্য বিষয় থাকে। তাহাতে যাহা কিছু বর্ণিত হয়, সকলেরই লক্ষ্য সেই প্রতিপাদ্য বিষয়টীর দিকে। জ্যামিতিব অঙ্কনাদি স্তবগুলি মূল বিষয়টীই প্রতিপন্ন করে, তদ্রূপ ভাগবতেব যে কোন বিষযেব বর্ণনাই হউক না কেন, বাসুদেব অতিবিক্ত কিছুই নহে। তাই—

দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ।

বাসুদেবাৎ পবব্রহ্মন্ ন চান্যোঽর্থোঽস্তি তত্ত্বতঃ ॥২।৫।১০

কি দ্রব্য বা মহাভূত কি কর্ম্ম বা জন্মাদির নিমিত্ত কাবণ কি কাল কি পরিণামেব হেতু "স্বভাব" কি জীব সকলই সেই ভগবানের ব্যঞ্জক। বাস্তবিক বাসুদেব অতিরিক্ত কোন অর্থ, বস্তু বা তাৎপর্য্য নাই। তাই শ্রীভাগবত বলিয়াছেন—

অত ঋষয়ো দধুস্ত্বয়ি মনোবচনাচবিতং।

কথমযথা ভবন্তি ভুবি দত্তপদানি নৃণাং ॥১০।৮৭।১৫

"সমস্তই ব্রহ্ম! বিকার বাস্তবিক নাই। এই জন্য মন্ত্রবর্ণ বা ঋষিরা ভগবানে মনের আচরিত অর্থাৎ তাৎপর্য্য এবং বচনাচরিত অর্থাৎ অভিধান ধারণ করে। যেমন মনুষ্যগণ যেখানেই পদ নিক্ষিপ্ত করুক না কেন তাহা মৃত্তিকাই হউক, পাষাণই হউক, অট্টালিকাই হউক, বাস্তবিক পক্ষে পৃথিবী; তদ্রূপ ঋষিরা বিকার-জাত যে কোন পদার্থ বস্তু, ব্যক্তি, বা জীবের কথাই বলুন না কেন, তাহার তাৎপর্য্য এবং এমন কি প্রত্যেক শব্দই ভগবানের প্রতিপাদক মাত্র। প্রত্যেক বর্ণেই ভগবানের স্ফুরণ হইবে; তাই সাধক রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

যত শোন কর্ণপুটে, সবই মায়ের মন্ত্র বটে।
কালী পঞ্চাশৎবর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে নাম ধরে॥

(ক্রমশ) সুরেন্দ্রনাথ দাস

প্রস্থান-ভেদ।

(পরম-হংস-পরিব্রাজকাচার্য্য — শ্রীমৎমধুসূদন মুনি-প্রণীত)

সনাতন আর্য্য-শাস্ত্রের-সারমর্ম্ম।

"অথ সর্ব্বেষাং শাস্ত্রাণাং ভগবত্যেব তাৎপর্য্যম্, সাক্ষাৎ পরম্পরয়াবেতি সমাসেন তেষাং প্রস্থানভেদোঽত্রোদ্দিশ্যতে, তথাহি,—ঋগ্‌বেদো (১) যজুর্ব্বেদঃ (২) সামবেদো (৩) হথর্ব্ববেদঃ (৪) ইতি বেদাশ্চত্বারঃ"।

অনুবাদ,—

অনন্তর, বেদাদি শাস্ত্র-সমূহের সাক্ষাৎ (প্রত্যক্ষভাবে) অথবা পরম্পরায় (পরোক্ষভাবে) একমাত্র (সর্ব্বনিয়ন্তা) পরমেশ্বরেই তাৎপর্য্য নিরূপিত হইয়াছে। অতএব বেদাদিশাস্ত্রনিচয়ের (অতি) সংক্ষেপে "প্রস্থানভেদের" এখানে উদ্দেশ (নামের দ্বারা কেবল বস্তু-কীর্ত্তন) করা যাইতেছে। বেদ,—সর্ব্বমঙ্গলময় পরমেশ্বর, প্রাণি-নিচয়ের প্রতি করুণাপরবশ হইয়া ব্রহ্মা প্রভৃতিকে সৃষ্টি করিয়া মুখজাদি চতুর্ব্বর্ণের, ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গ-প্রতিপাদক সাঙ্গ ও রহস্য-বেদচতুষ্টয়ের পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পানুসারে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

পরমেশ্বরই যে, ব্রহ্মাদি দেবগণের ও বেদের সৃষ্টিকর্ত্তা, এতৎসম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে স্পষ্ট লিখিত আছে, "যিনি পূর্ব্ব কল্পে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং যিনি বেদ-নিচয়কে প্রকাশ করিয়াছেন" তিনিই সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বর। (ক)

"সেই বিধাতা বেদসমূহের পৃথক্ পৃথক্ নাম ও কর্ম্ম এবং সংস্থান-ভেদ, বেদশাস্ত্র হইতে প্রজাদিগকে উপদেশ দেওয়ার নিমিত্ত প্রণয়ন করিয়াছেন"। (স্মৃতি) (খ) মহর্ষিগণ "মন্ত্র ও ব্রাহ্মণকেই বেদনামে গ) অভিহিত করিয়াছেন।" চারি বেদের মধ্যে যজুর্ব্বেদ শুক্ল ও কৃষ্ণ এই দুই ভাগে বিভক্ত। দর্শ (যাগ) ও পূর্ণমাস (যাগ) প্রভৃতি ব্রাহ্মণকাণ্ড হইতে ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞীয় মন্ত্রের যথাবিহিত রূপে ক্রম-বিন্যাস যাহাব আছে তাহাকেই শুক্ল (যজুর্ব্বেদ) বলে এবং ব্রাহ্মণভাগেব সঙ্গে অসংকীর্ণ (অসংযুক্ত) ক্রমপাঠরহিত ও ক্রমের দুর্জ্ঞেয়তা নিবন্ধন, অপর ভাগকে কৃষ্ণ (যজুর্ব্বেদ) বলে।

যজুর্ব্বেদের একটী শাখাব নাম তৈত্তিবী শাখা। দাক্ষিণাত্যের বহু ব্রাহ্মণই এই শাখাধ্যায়ী এখনও আছেন।

সকল বেদই—সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্, প্রভৃতি অবান্তর ভেদে নানা সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে (বিভক্ত হইয়াছে)। সেই মন্ত্রভাগ ও ব্রাহ্মণভাগই যথাক্রমে কর্ম্ম এবং জ্ঞানকাণ্ড নামে প্রসিদ্ধ। যে ভাগে কর্ম্মসমূহের বিষয় সুস্পষ্ট ভাবে উল্লিখিত আছে, সেই ভাগ কর্ম্মকাণ্ড। এবং যে ভাগে জ্ঞেয়ার্থ—(ভগবত্তত্ত্ব বিজ্ঞানাদিব) প্রতিপাদক বা জ্ঞান-প্রতিপাদক বিষয়

(ক) "যো ব্রহ্মাণং বিদধাতিপূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রণিহোতি তস্মৈ"।

(খ) "স্বয়ম্ভুরেষ ভগবান্ বেদো গীতস্তয়া পুরা।
শিবাদ্যা ঋষিপর্য্যন্তাঃ স্মর্ত্তারোঽস্য ন কারকাঃ॥"

(গ) "প্রত্যক্ষেণানুমানেন যস্তূপায়ো ন বিদ্যতে।
এবং বিদন্তি বেদেন তস্মাৎ বেদস্য বেদতা॥" (ভাষ্যে)
"ন কশ্চিদ্বেদকর্ত্তার বেদস্মর্ত্তা পিতামহঃ।
তথৈব ধর্ম্মং স্মরতি মনুঃ কল্পান্তরান্তরে॥" (ভগবান্ পরাশরঃ)
অনাদি নিধনাহ্যেত্বা বাগুৎ সৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা।
আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্গপ্রবৃত্তয়ঃ॥" (স্মৃতিঃ)
"অস্য বেদস্য সর্ব্বজ্ঞঃ কল্পাদৌ পবমেশ্বরঃ।
ব্যঞ্জকঃ কেবলঃ বিপ্রাঃ নৈবকর্ত্তা ন সংশয়ঃ॥" (মৎস্যপুরাণং)
"যুগান্তেঽন্তেঽর্হিতান্ বেদান সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ।
লেভিরে তপসা পূর্ব্বমনুজ্ঞাতাঃ স্বয়ম্ভুবা॥" (স্মৃতিঃ)

সকল বিদ্যমান রহিয়াছে, সে ভাগ জ্ঞানকাণ্ড। যজুর্ব্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণের শেষ ভাগস্থ (বা বাজসনে ব্রাহ্মণোপনিষদ্) বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ও ছন্দোগ ব্রাহ্মণের (সামবেদীয়) ছান্দোগ্য উপনিষদ্ প্রভৃতিকে জ্ঞানকাণ্ড সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা হইয়াছে। এই উপনিষদই সর্ব্ববিদ্যা-শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মবিদ্যা অথবা ব্রহ্মবিদ্যা। এই শাস্ত্রের সম্যক্ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা, কঠোর ধ্যান, আরাধনাদিতেই ভগবানের স্বরূপাববোধ হইয়া থাকে। প্রথমতঃ ঋগ্‌বেদের অতি সংক্ষেপে বাহ্য বিষয়ের পরিচয় দিতেছি, যথা, "যেখানে বা যাহাতে অর্থানুসারে পাদ-ব্যবস্থা রহিয়াছে," তাহাই "ঋগ্" * নামে অভিহিত। এই ঋগ্ সমূহের প্রৌঢ়-পদ-বিন্যাস, গূঢ় তাৎপর্য্যাদি দেখিয়া বোধ হয় যে, ঋক্‌ই সর্ব্ব প্রাচীন। ঋগ্‌গুলি ভাঙ্গিয়া সামাদিরূপে গীত হইয়া থাকে। ঋকের উল্লেখ যজুঃতে ও সামেও দেখা যায়। বেদ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য শিক্ষিতগণের যাহাই ধারণা থাকুক্ না কেন, পূজ্যপাদ ভাষ্যকারগণের সুবিমল, বিশদ ভাষ্যাবলি, অর্থাৎ শাকপুণি, ঔর্ণবার, ভট্ট-ভাস্কর, সায়ন, মহীধর, ঔব্বট্ আচার্য্য কৃত ব্যাখ্যা দ্বারা অকূল, অতল বেদার্ণবকে জানুদঘ্নের প্রায় করিয়া রাখিয়াছে। যাহারা বৈধ-নিয়মে গুরু সমীপে যথারীতি বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহারাই বেদার্থ-জ্ঞানের ও সমালোচনার অধিকারী। আর যাহারা বিদেশীয়গণের অনুবাদ বা ভাষান্তরিত পাঠ করিয়া সনাতন-বেদশাস্ত্রে অনন্ত দোষ দেখিতে পান, তাহা তাঁহাদের চিত্তগত অজ্ঞতা দোষই বাহিরে বিষয়-সংযোগে প্রকাশ পায়। সেই গুলি বেদের দোষ নয়।

ঋগ্‌বেদ,—ঋগ্‌বেদের পাঁচটী শাখা,—(১) শাকল, (২) বাস্কল, (৩) আশ্বলায়ন, (৪) শাংখায়ন, (৫) মাণ্ডূকেয়। ব্রাহ্মণ,—দুইটী, ঐতরেয় (১) কৌষিতকী (২)। (বাংশায়ন) উপনিষদ্,—(২) ঐতরেয়োপনিষদ্, (১) কৌষিতকী ব্রাহ্মণোপনিষদ্, শাকলায় শাখার সংহিতা প্রকাশিত আছে।

ঋগবেদের আরও বহু উপনিষদ্ আছে, তাঁহাদের নাম এখানে উল্লিখিত হওয়ার কোন প্রয়োজন বোধ করি না।

---

* "যত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থা সা ঋক্।" ধর্ম্মসূত্রম্।

কল্পসূত্র—দুই ভাগে বিভক্ত দেখা যায়। +

প্রথম শ্রৌতসূত্র, দ্বিতীয় গৃহ্যসূত্র –

শ্রৌতসূত্র দুই—শাংখায়ন শ্রৌতসূত্র (১) আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র (২) ধর্ম্মসূত্রও ইহাকে বলে।

ভট্ট কুমারিল স্বামীর মতে বশিষ্ঠ ধর্ম্মসূত্রই ঋগ্‌বেদীয় ব্রাহ্মণগণেব পাঠ্য ছিল।

গৃহ্যসূত্র তিন——শাংখায়ন গৃহ্যসূত্র, (১) শাম্বব্য গৃহ্যসূত্র, (২)

আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র (৩)

মুক্তিকোপনিষদে বেদশাস্ত্রেব বিববণ অনুসাবে ঋগ্‌বেদেব শাখা এক-বিংশতি সংখ্যক হয়।

এক একটী শাখানুসাবে এক এক খানি উপনিষদ্‌ বলিয়া উল্লিখিত আছে। ইহার অধিক শাখাদি সম্বন্ধে বিববণ মুক্তিকোপনিষদেব ব্যাখ্যায চবণব্যূহ-ভাষ্যে আছে। কল্যাণময পবমেশ্বব কর্ত্তৃক, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্বর্গ যে শাস্ত্র দ্বাবা বিজ্ঞাপিত হইযাছে, মহর্ষিগণ তাহাকে বেদ বলিয়া অভিহিত কবিয়াছেন।

অথবা—ইষ্টপ্রাপ্তি, অনিষ্টেব পবিহাব এবং এতদুভযেব অলৌকিক উপায় যে গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে (কোন কোন মহর্ষি) তাহাকে বেদ বলিযা সংজ্ঞিত করিয়াছেন।

পূর্ব্বে আমবা ঋগ্‌বেদ সম্বন্ধে বেদেব লক্ষণ বলিয়াছি; সংপ্রতি যজুর্ব্বেদেব প্রসঙ্গে পুনঃ স্পষ্টরূপে বলিতেছি। বিভিন্ন ভাষ্যকাবগণ যদিও স্বীয় স্বীয় ভাষ্য-প্রাবম্ভে নানা লক্ষণ প্রণয়ন কবিয়াছেন, তথাপি আমবা সাধাবণেব সৌকর্য্যার্থ দুই-একটী লক্ষণ নূতন কবিয়া এখানে লিখিলাম। সেই অপৌরুষেয় (পুরুষকৃত নয়) বাক্যই—(ক) উক্ত ঋগ্‌ ও যজুঃ উভয়েই মন্ত্র ভাগে নিহিত,

---

+ বেদার্থ সমূহ অনুভব কবিষা মহর্ষিগণ সংক্ষিপ্ত অর্থেব সূচক যে সূত্র রচনা করিযাছেন তাহাই "কল্পসূত্র"। এই সূত্র দুই ভাগে বিভক্ত, ১ম শ্রৌত, ২য় গৃহ্য। শ্রৌতসূত্রে যজ্ঞাদির বিষয় লিখিত আছে। গৃহ্যসূত্রে গৃহস্থের বর্ণাশ্রমোচিত সংস্কারাদি বর্ণিত আছে।

(ক) "অপৌরুষেয়ং বাক্যং বেদঃ"।

সেই মন্ত্র কালক্রমে দুই ভাগে বিভক্ত হয়। প্রথম বৈদিক, দ্বিতীয় (স্মার্ত্ত বা) পৌরাণিক।

বৈদিক মন্ত্র দুই প্রকার—(১) প্রগীত, (২) অপ্রগীত। সাম (ছন্দঃ সমূহ) কে প্রগীত বলে। অপর বৈদিক মন্ত্র অপ্রগীত, অপ্রগীতও দুই ভাগে বিভক্ত যথা,—(১) ছন্দোনিবদ্ধ, (২) ছন্দঃ শূন্য বা ছন্দঃ বিলক্ষণ। তন্মধ্যে ১ম ঋগ্, ২য় যজুঃ; নিয়ত-বর্ণ-পদনিচয়ই ঋক্। অনিয়ত বর্ণপদসমুদায় যজুঃ। * কোন মহর্ষির মতে ঋগের বহুত্ব নিবন্ধনই এই নামের হেতু, যজুর্ব্বেদের ভাগবিশেষকে "নিগদ"ও বলে। ঋক্ এবং যজুঃ লক্ষণ হইতে ভিন্ন, অনিবক্ষিত গীতপ্রধান বেদকে "সামবেদ" বলে। †

ঋগ্, যজু ও সামের লক্ষণ ভিন্ন এবং শান্তি ও পৌষ্টিক কর্ম্মনিচয়ের প্রাধান্য যাহাতে আছে, তাহাই "অথর্ব্ব বেদ" নামে খ্যাত। ব্রাহ্মণ ভাগ ত্রিবিধ,—(১) বিধি (২) অর্থ (৩) অনুবাদ। বেদের এই ব্রাহ্মণভাগ, ভাষ্যকার বিদ্যারণ্য মুনীশ্বরের মতে আট ভাগে বিভক্ত, যথা,—(১) উপনিষদ্ (২) পুরাণ, (৩) ইতিহাস, (৪) বিদ্যা (৫) শ্লোক (৬) সূত্র (৭) ব্যাখ্যা (৮) অনুব্যাখ্যা। এই বিভাগ তৈত্তিরীয় উপনিষদের দীপিকা নামক টীকাতে বর্ণিত আছে।

(১) বিধি—অর্থাৎ অজ্ঞাত বৈদিকপদার্থের প্রকৃষ্টরূপে বোধক বা জ্ঞাপক বাক্যই বিধি।

এই বিধি পুনঃ চারি ভাগে বিভক্ত—(১) উৎপত্তি বিধি (২) বিনিয়োগ-বিধি (৩) অধিকার বিধি (৪) প্রয়োগ বিধি।

(১) কর্ম্মের (দেবতার উদ্দেশে ঘৃতাদিত্যাগ) স্বরূপ মাত্র বোধক যে বিধি তাহাই উৎপত্তি বিধি। যথা—'অগ্নিহোত্র' হোমের দ্বারা ইষ্ট (স্বর্গাদি) ভাবনা করিবে। (ক)

(২) অঙ্গ ও প্রধানের (যাগের) সম্বন্ধ (অঙ্গাঙ্গিত্বরূপ) জ্ঞাপক বিধিই

---

* "শেষে যজুঃ শব্দঃ"। কল্পসূত্রম্।

† গীতিষু সামাখ্যা।" " (লৌগাক্ষিঃ)

(ক) "কর্ম্মস্বরূপমাত্রবোধকো বিধিরুৎপত্তিবিধিঃ।"

বিনিয়োগ বিধি। যথা—"দধি দ্বারা (দধিকরণক হোমের দ্বারা) স্বর্গভাবনা করিবে। (খ)

(৩) অঙ্গসমূহেব (প্রযাজাদির) ক্রমবোধক যে বিধি, তাহাই প্রয়োগ-বিধি। (গ) কর্ম্মজনিত-ফলের স্বামিত্ব-জ্ঞাপক যে বিধি, তাহাই অধিকার বিধি। (ঘ)—উদাহবণই এই বিধির উদাহবণ হইবে। এই চাবি ভাগে বিভক্ত বিধিকে কোন কোন আচার্য্য তিন ভাগে বিভক্ত কবিয়াছেন। যথা,—অপূর্ব্ব বিধি, নিয়ম বিধি ও পবিসংখ্যা বিধি।

(১) প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-দ্বাবা অপ্রাপ্ত বিষয়েব বোধক যে বিধি তাহাকে "অপূর্ব্ব বিধি" বলে।

(২) পক্ষপ্রাপ্তেব অনুবাদক যে বিধি, তাহাকে "নিয়ম বিধি" বলে।

(৩) ইতরেব বা অন্যেব কাবৃত্তিব স্বরূপ ফল যে বিধির, তাহাকে "পরিসংখ্যা" বিধি বলে। উক্ত পবিসংখ্যা বিধি দুই প্রকাব—শ্রৌতী, এবং লাক্ষণিকী। শ্রৌতী অর্থাৎ শ্রুতি বা শব্দ দ্বারা অথবা বেদবাক্য দ্বারা অভিধেয়া। লাক্ষণিকী অর্থাৎ লক্ষণাদ্বাবা বোধ্যা বা জ্ঞেয়া; যেরূপ, "শাস্ত্রোক্ত শশকাদি পঞ্চকেব ইতব বা ভিন্ন পঞ্চনখ অভক্ষ্য।"

অর্থবাদ,—শ্রেষ্ঠতা, বা অত্যুৎকৃর্ষ, এবং নিন্দা এই দুয়ের মধ্যে একতর বোধক বাক্যই অর্থবাদ। এই অর্থবাদেব লক্ষণ নানা প্রকাব নানা গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। "বিধিব উত্তম্ভক" বা অতিশয় প্রাশস্ত্য, অর্থবাদ। বিধির অতিশয় প্রাশস্ত্য, কীর্ত্তনকবা, এবং নিষেধেব স্থলে নিন্দা কবা।

পুনঃ অর্থবাদ দ্বিধা বিভক্ত—বিধি শেষ এবং নিষেধ শেষ।

নিষেধ শেষ তিন প্রকাব—যথা গুণবাদ, অনুবাদ এবং ভূতার্থবাদ। অন্য প্রমাণের বা প্রত্যক্ষাদির সঙ্গে বিবোধ ঘটিলে, অর্থ বাদগুণ-বাদ বলে। যেমন "সূর্য্য যূপ"।

প্রমাণান্তর বা প্রত্যক্ষাদি দ্বারা জ্ঞাত বিষয়ের প্রত্যায়ক অর্থবাদকে অনুবাদ বলে। যেমন "অগ্নি হিমের বা শৈত্যেব ঔষধ"।

(খ) "অঙ্গপ্রধানসম্বন্ধবোধকে বিধির্ব্বিনিয়োগবিধিঃ।"

(গ) "প্রয়োগ প্রাশুভাববোধকো বিধিঃ প্রয়োগবিধিঃ।" (ঘ) "কর্ম্মজন্যফলসাম্যবোধকো বিধিঃ।" (১) "বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্তৌ" (২) "নিয়মঃ পাক্ষিকেসতি।" (৩) "তত্র চান্যত্র চ প্রাপ্তৌ পরিসংখ্যেতি গীয়তে॥"

(৩) প্রমাণান্তর (প্রত্যক্ষ প্রমাণাদি) সঙ্গে বিরোধ-প্রাপ্তি ও তাহার পরিহার-বিষয়ের বোধককে 'ভূতার্থবাদ' বলে ;—যেমন "ইন্দ্র বৃত্রাসুরের উদ্দেশে বজ্র-উত্তোলন করিয়াছিলেন।"

এই বেদ প্রকারান্তরে পাঁচ ভাগে বিভক্ত—(১) বিধি (২) মন্ত্র (৩) নামধেয় (৪) নিষেধ (৫) অর্থবাদ। (১) বিধি দ্বারা বাক্যসমূহের অনুষ্ঠানের (কার্য্যের) বা বিধায়কত্বরূপে সার্থকতা সম্পাদিত হয়। (২) মন্ত্রদ্বারা অনুষ্ঠেয় বিষয়ের অর্থস্মারকীত্বরূপ তাৎপর্য্য নির্ণীত হয়। (৩) উদ্ভিদাদি বাক্যসমূহের দ্বারা বা নামের দ্বারা বিধেয়ার্থ পরিচ্ছেদকরূপ অর্থবত্ত্বা। (৪) বিধেয়ার্থের সাঙ্কোচক রূপে অথবা পুরুষের নিবর্ত্তকরূপে (নিষেধে) অর্থবত্ত্বা। (৫) অর্থবাদ পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের অনুবাদে বা প্রবন্ধে, মীমাংসা-দর্শনের অসীম বিষয়ের সুস্পষ্ট রূপে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব বলিয়া ক্ষান্ত হইলাম

উপবেদ চারি ভাগে বিভক্ত। (১) আয়ুর্ব্বেদ (২) ধনুর্ব্বেদ (৩) গান্ধর্ব্ববেদ (৪) অর্থশাস্ত্র (নীতিশাস্ত্র) তন্ত্রশাস্ত্র।

বেদের অঙ্গ ছয়টী (১) শিক্ষা (২) কল্প (৩) ব্যাকরণ (৪) নিরুক্ত (৫) ছন্দ (৬) জ্যোতিষ। অনাদি অনন্ত বেদরূপ মহাপুরুষের পদস্থানীয় ছন্দ (ক) এবং হস্তদ্বয়-স্থানীয় কল্প (কল্প-সূত্রাদি); জ্যোতিষ্কগণ (গ্রহনক্ষত্রাবলী) বেদ মহাপুরুষের চক্ষু স্থানীয়, নিরুক্ত (নির্ঘণ্টু গ্রন্থাদি) শ্রোত্র স্থানীয়, শিক্ষা (পাণিনীয়. নারদীয়, যাজ্ঞবল্কীয়) ঘ্রাণ স্থানীয়, ব্যাকরণ মুখ স্থানীয়, (‡)। যদিও সর্ব্বাঙ্গের মধ্যে মস্তকই প্রধান, তথাপি মুখ দ্বারা প্রায় পুরুষের সহজে পরিচয় পাওয়া যায় বলিয়া ব্যাকরণকে মুখ-স্থানীয় করা হইয়াছে। সকল শাস্ত্রের রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে ব্যাকরণে বিশদ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন; এই নিমিত্ত সকলের আগে সংস্কৃত বুঝিবার নিমিত্ত ব্যাকরণ অধ্যয়ন করার নিয়ম রহিয়াছে।

শিক্ষা,—শিক্ষধাতুর অর্থ বিদ্যাগ্রহণ করা। অনন্ত শব্দরাশি সনাতন বেদ-শাস্ত্রের তাৎপর্য্য অববোধ করিতে হইলে, শিক্ষা শাস্ত্রে জ্ঞান থাকা অতি আবশ্যক। এই শাস্ত্রে বর্ণ সমূহের উৎপত্তিক্রম, উদাত্ত. অনুদাত্ত, স্বরিত (সমাহার)

---

‡ ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য, হস্তঃ কল্পোঽথ পঠ্যতে, জ্যোতিষাময়নং চক্ষুঃ নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে শিক্ষা ঘ্রাণং তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতং তস্মাৎ সাঙ্গ মধীত্যৈব সর্ব্বলোকে মহীয়তে।" (আহ্নিকতত্ত্ব)

প্রায় নাম স্বর, হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত, অনুনাসিক, অননুনাসিক, উষ্মা, প্রভৃতি বর্ণ সমুদায় ও তৎস্বরূপ এবং পদ সমূহের বিন্যাসক্রম—বেদ-শিক্ষণের প্রকার যুক্ত মহর্ষি পাণিনি, নারদ প্রভৃতির প্রণীত গ্রন্থ বিশেষই, শিক্ষা নামে অভিহিত।

(ক্রমশ)

৭১নং কলুটোলা।

বিদ্যারত্ন-বেদান্তভূষণোপাধিক
শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র ব্যাকরণ-সাংখ্য-
বেদান্ততীর্থ।

গীতোক্ত কর্ম্মযোগ।

গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে কর্ম্মযোগ বিবৃত হইয়াছে। পবে চতুর্থ অধ্যায়েও এই কর্ম্মযোগের কথা আছে। যাহা হউক, এই তৃতীয় অধ্যায়ে কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, সেই তত্ত্ব সকল এস্থলে সংক্ষেপে আলোচনা কবা কর্ত্তব্য।

কর্ম্মযোগেব মূল সূত্র যাহা, তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। ভগবান্ সে স্থলে বলিয়াছেন যে, আসক্তি ত্যাগপূর্ব্বক, অর্থাৎ লাভালাভ জয়াজয় প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগপূর্ব্বক, সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সম জ্ঞান করিয়া, যোগবুদ্ধিতে অর্থাৎ কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে কর্ম্মানুষ্ঠান কবাই কর্ম্মযোগ। এই কর্ম্মযোগে যুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে সুকৃত দুষ্কৃত উভয়ই ত্যাগ করা যায়, ও কর্ম্ম হেতু কোন বন্ধন হয় না। বুদ্ধিযোগে যুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলেই কর্ম্মজ ফল ত্যাগ করা যায়। এই কর্ম্মযোগানুষ্ঠানের প্রধান অন্তরায়—'কাম'। যে 'কাম'কে—সর্ব্বপ্রকার কামনাকে ত্যাগ করিতে পারিয়াছে, যে 'নিষ্কাম' হইয়াছে, সেই কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠানের অধিকাবী। যে সমুদয় মনোগত কামনা ত্যাগ করিয়া আত্মা দ্বারা আত্মাতেই তুষ্ট থাকে, যে দুঃখে উদ্বিগ্ন হয় না, যে সুখে স্পৃহাহীন, যাহার রাগ ভয় ক্রোধ দূর হইয়াছে, যাহার বুদ্ধি স্থির হইয়াছে, যে কোন বাসনা দ্বারা বিচলিত হয় না, ও অশুভপ্রাপ্তিতে দ্বেষ করে না, যে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত

করিয়া তাহাদের বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিতে পারে, এবং বিষয় ভোগ করিয়াও যাহার চিত্ত অবিচলিত থাকে, যাহার চিত্ত এইরূপে প্রসন্ন ও শান্ত হয়, সেই স্থিতপ্রজ্ঞ মুনিই প্রকৃত কর্ম্মযোগের অধিকারী। সর্ব্বকাম ত্যাগপূর্ব্বক নিস্পৃহ, নির্ম্মম, নিরহঙ্কার হইয়া যে বিচরণ করে, সে কর্ম্মযোগানুষ্ঠান করিয়াও শান্তিলাভ করে, আত্মস্বরূপে অবস্থান করে, সে ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করে। ভগবান্ কর্ম্মযোগের এইরূপ উপদেশ দিয়া অর্জ্জুনকেই যোগবুদ্ধিতে ধর্ম্মযুদ্ধ করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান্ সাংখ্যজ্ঞানের উপদেশ দিয়া যুদ্ধে যে আত্মীয়স্বজনের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, তাহার জন্য অর্জ্জুনকে শোক, মোহ ও দুঃখে অভিভূত না হইবার তত্ত্ব বুঝাইয়াছিলেন।

এ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ জর্ম্মান দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ সপেনহর বলিয়াছেন,—

"In the Bhagbadgita, Krishna thus raises the mind of his young pupil Arjuna, when seized with the compunction at the sight of the arranged hosts, he loses heart and desires to give up the battle, in order to avert the death of so many thousands Krishna leads him to this point of view, and the death of the thousands could no longer restrain him. He gives the sign for the battle"

---

* "The exemption from death, which belongs to the individual only as thing in-itself, is for the phenomenon, one with the immortality of the rest of the world This is expressed in the Vedas by saying that when a man dies, his sight becomes one with the sun, his smell—with the earth, his taste—with water, his hearing—with air, his speech—with fire . ...

"What we fear in death, is the end of the individual, which it openly professes itself to be. and since the individual is a particular objectification of the Will to live itself, the whole nature struggles against death

This feeling makes man helpless But reason can step in, and overcome this influence Armed with the knowledge we have given him he would await death with indifference He would regard it as false as illusion ....He would not be terrified by endless past or future in which he would not be , for this he would regard as the empty delusion of the web of Maya. Thus he would no more fear death, than the sun fears night.

Schopenhauer's World as Will and Idea Vol. I. § 54.

যাহা হউক, অর্জ্জুন এই সাংখ্যজ্ঞান বা আত্মতত্ত্ব তখন বুঝিতে পারেন নাই, বোধ হয়। আর ভগবান্ অর্জ্জুনকে যে ধর্ম্মযুদ্ধ করিবার উপদেশ দিতেছিলেন, সেই যুদ্ধ যে হেয় কর্ম্ম, তাহা বুদ্ধিযোগে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না, এবং যে মুমুক্ষু তাহার পক্ষে জ্ঞানযোগই অনুষ্ঠেয়, কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠেয় নহে, তাহাও অর্জ্জুনের মনে হইতেছিল। এইজন্য অর্জ্জুনের প্রশ্নে, এই অধ্যায়ে, ভগবান্ কর্ম্মযোগ বিবৃত করিয়াছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে যাহা সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে, এই অধ্যায়েও পরের অধ্যায়ে, তাহাই বিস্তারিত ভাবে বিবৃত হইয়াছে।

কর্ম্মযোগ শ্রেয়ঃ।—ভগবান্ এই অধ্যায়ের আরম্ভে বলিয়াছেন যে, এই লোকে সাংখ্যদের জ্ঞানযোগ ও যোগীদের কর্ম্মযোগ—এই দুই রূপ নিষ্ঠা উক্ত হইয়াছে সত্য; কিন্তু ইহাদের মধ্যে কর্ম্মের অনারম্ভ দ্বারাই কেবল নৈষ্কর্ম্ম্য হয় না, আর সন্ন্যাসের দ্বারাও সিদ্ধিলাভ হয় না। অর্থাৎ কর্ম্মের আরম্ভ ত্যাগ, এমন কি, কর্ম্ম-সন্ন্যাস দ্বারা উক্ত জ্ঞাননিষ্ঠাতে সিদ্ধি হয় না। অতএব এই দুইরূপ নিষ্ঠা থাকিলেও, কর্ম্মযোগ নিষ্ঠাই শ্রেয়ঃ; তাহা দ্বারাই সাংখ্য বা আত্মজ্ঞানও সিদ্ধি হয়। যাহা হউক, এই কর্ম্মযোগ নিষ্ঠা যে অবলম্বনীয়, তাহার কয়েকটি কারণ ভগবান এই অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা এস্থলে সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে।

প্রথম কারণ।—মানুষ সাধারণভাবে জীবমাত্রেই) কর্ম্ম না করিয়া কখন ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। আমরা যে কর্ম্ম করি, তাহার মধ্যে কতকগুলি বুদ্ধি-চালিত এবং কতকগুলি অবুদ্ধিপূর্ব্বক কৃত। অবুদ্ধিপূর্ব্বক কৃত কর্ম্মকে ইংরাজীতে instinctive, reflex action প্রভৃতি বলে। আমাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস, আহার-পরিপাক, ফুস্‌ফুস্, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি যন্ত্রের ক্রিয়া, শরীরে রক্ত চলাচল, প্রভৃতি প্রাণকর্ম্ম স্বতঃই প্রবর্ত্তিত হয়; আমাদের শরীর গঠন, রক্ষা প্রভৃতি কর্ম্ম প্রকৃতি দ্বারা আপনই সম্পাদিত হয়, তাহারা আমাদের বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইবার অপেক্ষা রাখে না।

আমাদের নিদ্রিত অবস্থায়ও সেই সকল প্রাণনকর্ম্ম চলিতে থাকে। আমাদের জাগ্রত অবস্থায়ও ইন্দ্রিয়ের সহিত সর্ব্বদা বিষয় সংস্পর্শ হেতু সুখ দুঃখ বোধ হয়; এবং তাহা হইতে কামক্রোধ বা রাগদ্বেষ উৎপন্ন হয়, তাহারা সর্ব্বদা

আমাদিগকে কর্ম্মে নিয়োজিত করে। অতএব আমরা ক্ষণকালও কর্ম্ম ন করিয়া থাকিতে পারি না, ইহা একরূপ বুঝিতে পারা যায়।

ভগবান্ পরে বলিয়াছেন যে, প্রকৃতিজ গুণের দ্বারা সর্ব্ব কর্ম্ম অবশভাবে সম্পাদিত হয়। সেই গুণকৃত কর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করিবার শক্তি সাধারণতঃ জীবের নাই। এই তত্ত্ব এই অধ্যায়ের শেষে ও পরে ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। পরে আমরা তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। এস্থলে তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য।

এ সংসারে যে কিছু সত্ত্বের উদ্ভব হয়, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বা পুরুষ-প্রকৃতি সংযোগই তাহার কারণ। আমরা সকলে প্রকৃতিবদ্ধ পুরুষ। এই প্রকৃতি-পুরুষ সম্বন্ধ গীতায় পরে উক্ত হইয়াছে। যথা—

কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু॥" (গীতা, ১৩।২০-২২)
"প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি॥" (গীতা, ১৩।২৮)

প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা—প্রকৃতিজ গুণ তিনটি—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ।—ইহারাই দেহীকে দেহে বদ্ধ করে। ইহার মধ্যে সত্ত্ব প্রকাশস্বভাব, সুখস্বভাব, জ্ঞানস্বভাব। ১৪।৬।, আর তমোগুণ মোহস্বভাব, ইহা প্রমাদালস্য নিদ্রা দ্বারা দেহীকে বদ্ধ করে। ১৪।৮। কেবল প্রকৃতির রজোগুণ হইতে কর্ম্ম হয়। এই রজোগুণ রাগাত্মক, তৃষ্ণা ও আসক্তির উৎপাদন-কারণ ; তাহাই দেহীকে কর্ম্মসঙ্গে বদ্ধ করে। (১৪।৭।৯)।

প্রতি দেহে প্রকৃতির এই তিনগুণ নিত্য-সম্বন্ধ, তিনই এক সঙ্গে অবস্থান করে। তবে ইহারা পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করিতে চেষ্টা করে। এজন্য যখন সত্ত্ব ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া রজোগুণের বিশেষ বৃদ্ধি হয়, তখন লোভ, প্রবৃত্তি কর্ম্মের আরম্ভ, আসক্তি, স্পৃহা প্রভৃতির বিকাশ হয়। (১৪।১২)। এই রজোবৃদ্ধির ফল দুঃখ। (১৪।১৬)। এই রজোগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে কর্ম্মসঙ্গীর মনুষ্যলোকে জন্ম হয়। ১৪।১৫।।

এই প্রকৃতিজ গুণে অবশ হইয়া মানব ও অপর জীব সর্ব্বদা কর্ম্ম করে; এবং তাহারা কর্ম্ম না করিয়া ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। পুরুষঃ স্বরূপতঃ অকর্ত্তা; পুরুষ নিজে কোন কর্ম্ম করে না। কিন্তু প্রকৃতিজ অহঙ্কারবশে প্রকৃতির কর্ম্ম সম্বন্ধে সে আপনাকে কর্ত্তা মনে করে। এজন্য প্রকৃতি যে নিত্য কর্ম্ম করে, সে সেই কর্ম্মকে তাহারই কর্ম্ম মনে করে, এবং এই জন্য আপনাকে নিয়ত কর্ম্মকারিরূপে ধারণা করে।

মনুষ্যলোক রজোবিশাল। মানুষ প্রায়শঃ রাজসিক-প্রকৃতিযুক্ত, অর্থাৎ রজোগুণপ্রধান। এজন্য এই রজোগুণ দ্বারা নিত্য পরিচালিত হয় বলিয়া ক্ষণকালও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। অর্থাৎ প্রাকৃতিক রজোগুণ দ্বারা যে নিয়ত কর্ম্ম আচরিত হয়, সেই কর্ম্ম সেই করিতেছে, ইহা মনে না করিয়া থাকিতে পারে না। সাধনা-বলে মানুষের প্রকৃতি রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া সত্ত্বপ্রধান হইলেও, এই রজঃ ও তমোগুণ হইতে সে একেবারে অব্যাহতি পায় না। তাহার মধ্যেও এই রজোগুণ ও তমোগুণের কার্য্য চলিতে থাকে। তবে সে কার্য্য তখন সত্ত্বগুণের কার্য্য দ্বারা অভিভূত ও নিয়মিত হয়। সুতরাং যে সাত্ত্বিক-প্রকৃতিসম্পন্ন, যাহার জ্ঞান ও প্রকাশভাব বিশেষ বৃদ্ধি হইয়াছে, সেও এইরূপে প্রকৃতির রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা চালিত হইয়া কর্ম্ম করে। তবে প্রভেদ এই যে, সে আপনাকে অকর্ত্তা, সুতরাং সেই কর্ম্মে নির্লিপ্ত বলিয়া জানিতে পারে, এবং স্বপ্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া এই সকল গুণের বৃত্তিকে নিয়মিত করিতে পারে। কিন্তু সে কর্ম্ম হইতে একেবারে অব্যাহতি পায় না। এইজন্য ভগবান্ এস্থলে এই সাধারণ সত্যের অবতারণা করিয়াছেন যে, কেহই কখন ক্ষণকালও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না; তাহাদের প্রকৃতি স্বতঃই গুণানুসারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। অতএব, মানব কখন ক্ষণকালও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। কাজেই তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ কর্ম্মসন্ন্যাস বা কর্ম্মত্যাগ ও নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি সম্ভব হয় না।

দ্বিতীয় কারণ।—এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, কর্ম্ম না করিয়া থাকা যাইবে না কেন? যে প্রধান কর্ম্ম প্রভৃতির কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহাতে অবশ্য আমাদের হাত নাই, সে কর্ম্মে বন্ধনও নাই,—তাহার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল কর্ম্ম হয়, তাহা না করিয়া থাকা যাইবে না কেন?

মুখে বাক্য উচ্চারণ করিয়া অপরের নিকট মনের ভাব প্রকাশ করা কর্ম্ম, হাতের দ্বারা কোন বস্তু গ্রহণাদি কর্ম্ম, পদের দ্বারা গমনাদি কর্ম্ম ইত্যাদি ; যে সকল কর্ম্ম কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কৃত হয়, তাহা না করিয়া থাকা যাইবে না কেন ? মন এই কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা। মন যদি এই কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে পরিচালিত না করে, তাহা হইলে ত কর্ম্ম হয় না। এ কথা আংশিক সত্য। এজন্য ভগবান্ বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে সংযত করিতে পারে, যাহাদের প্রমাথী ইন্দ্রিয়গণ প্রাক্তন কর্ম্মসংস্কারবশে মনকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া কর্ম্মে নিয়োজিত করিতে না পারে, তাহারাও সেই প্রাক্তন সংস্কারবশে রজোগুণ দ্বারা চালিত হইয়া মনে মনে বিষয় স্মরণ ও চিন্তা করিতে বাধ্য হয়। তাহাদের বিষয়ে রস বা স্পৃহা যায় না, (২।৫৯)। তাহারা মূঢ়চিত্ত, মিথ্যাচারী। এই সকল লোক মানসিক কর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারে না। কর্ম্ম কায়িক, বাচিক ও মানসিক ভেদে ত্রিবিধ। গীতায় আছে,—

> "শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।
> ন্যায্যং বা বিপরীতং বা　　　॥ (১৮।১৫)

মনুসংহিতায় আছে—

> শুভাশুভফলং কর্ম্ম মনোবাগ্‌দেহসম্ভবম্।
> কর্ম্মজাগতয়ো নৃণামুত্তমাধমমধ্যমাঃ॥
> তস্যেহ ত্রিবিধস্যাপি ত্র্যধিষ্ঠানস্য দেহিনঃ।
> দশলক্ষণযুক্তস্য মনো বিদ্যাৎ প্রবর্ত্তকম্॥
> পরদ্রব্যেষ্বভিধ্যানং মনসানিষ্টচিন্তনম্।
> বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্ম্ম-মানসম্॥
> পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ।
> অসম্বদ্ধঃ প্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ং স্যাচ্চতুর্ব্বিধম্॥
> অদত্তানামুপাদানং হিংসা চৈবাবিধানতঃ।
> পরদারোপসেবা চ শারীরং ত্রিবিধং স্মৃতম্॥ (দ্বাদশ অধ্যায়, ৩—৭)

অতএব মনই মনোবাক্‌কায়াশ্রিত, উত্তম মধ্যম ও অধম কর্ম্মের প্রবর্ত্তক।

কাজেই যাহারা কর্ম্মেন্দ্রিয়কে মনের দ্বারা সংযত করিয়া বাহ্য কর্ম্ম না করে, তাহারাও মানসিক কর্ম্ম ত্যাগ না করিলে মিথ্যাচারী হয়।

এইজন্য ভগবান্ উপদেশ দিয়াছেন যে যখন এই কর্ম্ম প্রবৃত্তি আমাদের স্বাভাবিক, তখন ইহাকে সংযত করিতে চেষ্টা না করিয়া, মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়া, আসক্তিশূন্য হইয়া কর্ম্মযোগ অবলম্বনপূর্ব্বক সেই কর্ম্মবৃত্তিকে নিয়মিত করিবে। ইহাই কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় কারণ।

ক্রমশ

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু, এম এ।

নির্গুণ-ভক্তি।

২

"মমৈবাংশো জীবলোকো জীবভূতঃ সনাতনঃ" সনাতন জীব ঈশ্বরের অংশ। "আত্মা বৈ পুত্রঃ", পুত্র যেরূপ পিতার অংশ, সেইরূপ জীব ঈশ্বরের অংশ। কেবল মাত্র দেহ লইয়া পিতা-পুত্রের অংশ-অংশী সম্বন্ধ। কালে পুত্র-দেহ বৰ্দ্ধিত হইয়া পিতার দেহের মত হয়। মাতার শোণিত ও পিতার শুক্র, দুই প্রাকৃতিক। প্রাকৃতিক গর্ভে, প্রাকৃতিক দেহ সংগঠিত হয়, এবং প্রাকৃতিক অন্নে সেই দেহের পুষ্টি হয়। সেই জন্য অংশের পূর্ণতা কাল সাপেক্ষ ও সুগম। কিন্তু জীবের পক্ষে ঈশ্বরের পূর্ণতা লাভ তেমন সহজ নহে।

"মম যোনির্ম্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।" ঈশ্বর মহত্তত্ত্বে গর্ভের আধান করেন। তাহাতেই জীবের উৎপত্তি হয়। মূল প্রকৃতিতে অখণ্ড, অদ্বয়, নিত্য, মুক্ত, শুদ্ধ ঈশ্বর সতত স্বরূপে বিরাজমান। সেখানে অংশ নাই, জীব নাই। মহত্তত্ত্বে গর্ভের আধান হয় বটে, কিন্তু অংশের প্রকাশ হয় না। অহঙ্কারতত্ত্বে অংশের প্রকাশ হয়, সেই অংশ তত্ত্বের নিম্নতন বিকারে গভীর নিমগ্ন হয়।

ঈশ্বর সর্ব্বজয়ী। তিনি সকল তত্ত্বেরই ঈশিতা। সকল তত্ত্বেরই উৎপত্তি, স্থিতি, লয় তাঁহা হইতে। 'জন্মাদ্যস্য যতঃ'।

জীবও যখন সকল তত্ত্ব জয় করিতে পারিবে, তখন ঈশ্বরের সমান হইতে পারিবে।

সপ্তলোকী ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে, এক এক তত্ত্ব, এক এক লোকে প্রবল। পৃথিবী-তত্ত্ব-প্রধান ভূর্লোক। জল-তত্ত্ব-প্রধান ভুবর্লোক। অগ্নি তত্ত্ব-প্রধান স্বর্গলোক। বায়ু-তত্ত্ব-প্রধান মহর্লোক। এই রূপ এক এক তত্ত্ব-প্রধান, এক এক লোক।

যতদিন পর্য্যন্ত আমরা 'লোক' জয় করিতে না পারি, ততদিন পর্য্যন্ত আমরা লোক মধ্যে আবদ্ধ, ততদিন পর্য্যন্ত আমরা ত্রিগুণময়ী সমুদ্রে হাবুডুবু খেলি। যে লোক আমরা জয় করি, সেই লোক হইতে আমরা মুক্ত হই। সেই লোকের ঈশ্বর বলিয়া আমরা আপনাদিগকে পরিগণিত করিতে পারি।

বদ্ধ জীবের সগুণ ভক্তি। মুক্ত জীবের নির্গুণ ভক্তি।

গুণময়ী মায়া অতিক্রম করিবার দুই প্রশস্ত পথ,—জ্ঞান ও ভক্তি। জ্ঞানী নিজবলে লোকজয়ী হয়। ভক্ত ভগবান্‌কে আশ্রয় করিযা মায়া-সমুদ্রের পর-পারে গমন করে।

ভক্তি দ্বারা লোক-জয়, ক্রমিক। লোক সকল হইতে ক্রম মুক্তি লাভ হয়। এককালে সকল লোক জয় করা যায় না।

এই জন্য ঈশ্বর আমাদিগের সুবিধার জন্য সপ্তলোকাত্মক ব্রহ্মাণ্ডে দুটি বড় বিভাগ করিযা দিয়াছেন। ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্গলোকের সমাহারে একটি বিভাগ—ত্রিলোকী। মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক লইয়া অপর বিভাগ। সত্যলোককে, ব্রহ্মলোক কিম্বা পরমেষ্ঠিলোকও বলে। সকামতা ও নিষ্কামতা লইয়া এই দুই ভাগের ভেদ। মনুষ্য প্রথমে সকামতা দ্বারা অনেক সদ্‌গুণ লাভ করে। পরে সকামতাকে বিসর্জ্জন দিয়া নিষ্কামতা অবলম্বন করে।

পদ্মকোষং তদাবিশ্য ভগবৎ কর্ম্মচোদিতঃ।
একং ব্যভাঙ্ক্ষীদুরুধা ত্রিধাভাব্যং দ্বিসপ্তধা॥ ভা, পু, ৩-১০-৮

ব্রহ্মা পদ্মকোষে প্রবেশ করিয়া, চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক লোক-পদ্মকে বিভক্ত করিয়াছিলেন। এক ভাগ এই ত্রিলোকী।

এতাবান্ জীবলোকস্য সংস্থাভেদঃ সমাহৃতঃ।
ধর্ম্মস্য হ্যনিমিত্তস্য বিপাকঃ পরমেষ্ঠ্যসৌ॥ ৩-১০-৯

"এতাবান্ ত্রিলোকী-রূপঃ জীবলোকস্য জীবানাং ভোগস্থানস্য প্রত্যহং সৃজস্য সংস্থাভেদঃ রচনা-বিশেষ উক্তঃ।" শ্রীধর। ব্রহ্মার প্রতি দিনে, প্রতি-কল্পে জীবগণের ভোগ-স্থানজন্য এই ত্রিলোকী রচিত হয়। জীবভোগের নিমিত্ত যেমন প্রয়োজন হয়, সেইরূপ ত্রিলোকীর রচনা হয়।

"নম্বু পরমেষ্ঠিনোঽপি জীবত্বাবিশেষাৎ ব্রহ্মলোকস্যাপি কিমিতি প্রত্যহং সৃষ্টির্ন ভবতি তত্রাহ।"

ব্রহ্মাও ত একরূপ জীব। তবে কি ব্রহ্মলোকেরও প্রত্যহ সৃষ্টি হয়?

"হি যস্মাৎ অনিমিত্তস্য নিষ্কামস্য ধর্ম্মস্য বিপাকঃ ফলরূপোঽসৌ। উপলক্ষণ-মেতৎ সত্যলোকস্য মহঃ প্রভৃতি লোকানাং তদ্বাসিনাঞ্চ। ত্রৈলোক্যস্য কাম্য-কর্ম্মফলত্বাৎ প্রতিকল্পমুৎপত্তিবিনাশৌ ভবতঃ। মহঃ প্রভৃতীনাস্তুপাসনা সমুচিত নিষ্কাম ধর্ম্মফলত্বাৎ দ্বিপরার্দ্ধ পর্য্যন্তং ন নাশঃ। তত্রস্থানাঞ্চ ততঃ পরং প্রায়েণ মুক্তি-রিতি-ভাবঃ।" শ্রীধর।

মহর্লোক হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত নিষ্কাম ধর্ম্মের বিপাক। ত্রৈলোক্যবাসী লোকেরা কাম্য কর্ম্ম করিয়া থাকে। তাহারই ফলে ত্রৈলোক্যের উদ্ভব। কাম্য কর্ম্মের ফল অনিত্য। তাই ত্রৈলোক্যও অনিত্য। প্রতিকল্পে তাহার উৎপত্তি ও নাশ হয়। মহঃ প্রভৃতি উর্দ্ধতন লোকবাসিগণ উপাসনা ও নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা জন্ম-মৃত্যুরূপ সাংসারিক বিকার হইতে মুক্ত হইয়া দ্বিপরার্দ্ধ কালের অবসান পর্য্যন্ত ব্রহ্মলোকে অবস্থিতি করে। উর্দ্ধতন লোক সমূহেরও দ্বিপরার্দ্ধ কালের অবসানে লয় হয়।

শ্রীকৃষ্ণ বলেন—"আব্রহ্মভুবনাল্লোকা পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।" "যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।"

ব্রহ্মলোক হইতে ভূর্লোক পর্য্যন্ত সকলেরই পুনরাবর্ত্তন হয়। যেখানে গমন করিলে আর পুনরাবর্ত্তন হয় না, সেই আমার পরম ধাম।

এই ত্রিবিধ মৃত্যু, কালীয় মৃত্যু। কালে আমরা সকলেই এই মৃত্যু প্রাপ্ত হই।

প্রথম ও দ্বিতীয় মৃত্যু অতিক্রম করিয়া স্বর্গে বাস করা বৈদিক কর্ম্ম-কাণ্ডের চরম প্রয়োজন। "অপাম সোমমমৃতাত্যভূম" - সোমপান করিয়া আমরা অমর হইব।

উত্তর বাণীতে বেদ দেখাইয়া দিয়াছেন, অমৃত স্বর্গে নাই, স্বর্গের অপর পারে।

"ত্রৈবিদ্যামাং সোমপাঃ পূতপাপঃ যজ্ঞৈরিষ্টা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে" কিন্তু "গতাগতং কামকামালভন্তে"। সুতরাং সোমকামী হইয়া আপেক্ষিক অমরতা লাভ করিলেও, সে অমরতা অলীক।

চতুর্থ মৃত্যু।

উপনিষদে সগুণ ব্রহ্মের প্রসঙ্গে, ত্রৈলোক্য হইতে অব্যাহতিকে অমৃতত্ব বলা হইয়াছে। পুরুষ সূক্তে কথিত আছে—"ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি"।

এই সূক্তের অবলম্বনে ভাগবত পুরাণ বলেন—

"পাদেষু সর্ব্বভূতানি পুংসঃ স্থিতিপদোবিদুঃ।
অমৃতং ক্ষেমমভয়ং ত্রিমূর্দ্ধ্নোঽধায়ি মূর্দ্ধসু॥ ২-৬-১৮

শ্রীধর স্বামী বলেন—

"ব্রহ্মাণাং লোকানং মূর্দ্ধা মহর্লোকস্তস্য মূর্দ্ধানস্তদুপরিতনলোকাস্তেষু ত্রিষু যথা ক্রমং অমৃতাদিকং অধায়ি নিহিতং তত্র ত্রিলোক্যাং নশ্বরমেব সুখং।"

ত্রিলোকীর সুখ নশ্বর সুখ। মহর্লোকের উপরিতন তিন লোকেই অমৃত, ক্ষেম ও অভয় আছে। এই জন্যই ব্রহ্মলোককে সত্য লোক বলা যায়। যাহা সত্য, তাহা নিত্য। "সত্যমেব জয়তে নানৃতম্। সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।" দেবযান মার্গদ্বারা ব্রহ্মলোকেই যাওয়া যায়।

কিন্তু এও যেন 'অরুন্ধতী ন্যায়ের' কথা। যদিও ব্রহ্মলোক আপেক্ষিক রূপে সত্য, তথাপি বাস্তব সত্য নয়।

ব্রহ্মারও মৃত্যু আছে। সুতরাং ব্রহ্মলোকবাসীরও দ্বিপরার্দ্ধ কালের অবসানে মৃত্যু সম্ভব। মৃত্যুর অর্থই সাধারণতঃ প্রত্যাবর্ত্তন, এক ব্রহ্মাণ্ড হইতে অপর ব্রহ্মাণ্ডে গমন। অথবা এ মৃত্যুর অর্থ শেষ মুক্তি; যেমন ব্রহ্মার মৃত্যু, তাঁহার বোধ মুক্তি।

পঞ্চম বা বোধ মৃত্যু।

ব্রহ্মাণ্ডের মৃত্যুই বোধ-মৃত্যু। সেই মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারিলেই পরম ধাম। এই পরম ধাম, সগুণ ও নির্গুণ ভেদে, দ্বিবিধ।

"তত্র চ ব্রহ্মলোকগতানাং প্রাণিনাং ত্রিবিধা গতিঃ। যে পুণ্যোৎকর্ষেণ গতাঃ, তে কল্পান্তরে পুণ্যতারতম্যেন অধিকারিণো ভবন্তি। যে তু হিরণ্যগর্ভা-দ্যুপাসনাবলেন গতাঃ তে ব্রহ্মণা সহ মুচ্যন্তে। যে তু ভগবদুপাসকাঃ তে তু

স্বেচ্ছয়া ব্রহ্মাণ্ডং ভিত্বা বৈষ্ণবং পাদমারোহন্তি।” (শ্রীধর।) ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন করিয়া প্রাণিগণ তিন প্রকার গতি প্রাপ্ত হয়। যাহারা পুণ্যোৎকর্ষের প্রভাবে ব্রহ্মলোক গমন করে, তাহারা নূতন কল্পের আরম্ভে নূতন ত্রৈলোক্যরাজ্যের বিশিষ্ট অধিকারী হয়। যাহারা হিরণ্যগর্ভের উপাসনা বলে ব্রহ্মলোকে যায়, তাহারা দ্বিপরার্দ্ধ কালের অবসানে, ব্রহ্মার সহিত মুক্ত হয়। যাহারা ভগবানের উপাসক হয়, তাহারা স্বেচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া 'বৈষ্ণব' পরম ধাম লাভ করে।

ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে সগুণ ভক্তির অধিকার। ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গুণময়ী মায়ার প্রবাহ। স্বেচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করা, নির্গুণ ভক্তির ফল।

ভগবৎ প্রেমে গা ঢালিয়া দিয়া, ভক্ত ব্রহ্মাণ্ডের 'বিধি নিষেধ' অতিক্রম করে ; নির্গুণ ব্রহ্মার শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা জ্ঞানী মায়ার ঋণ হইতে মুক্ত হয়। জ্ঞান ও ভক্তি—উভয়েরই চরম সীমা, নিস্ত্রৈগুণ্য। দুই পথেরই অধিকারী চরম সীমায় উপনীত হইয়া এক বাক্যে বলিতে পারেন—“নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কা বিধিঃ কো নিষেধঃ”।

গোপ গোপীর প্রেম ভক্তিই, নির্গুণ ভক্তির আদর্শ ও চরম। সে ভক্তিতে ঐশ্বর্য্য কামনা নাই, ভেদ বুদ্ধি নাই, বিধি নিষেধ নাই। সে ভক্তির কাছে ব্রহ্মাণ্ড পদনত। “বেদের বিধাতা না জানে, নইলে বিধি বল্‌বে কেনে, যত অবধি ব্রজবাসী জনে”।

সেই ব্রজবাসীর নির্গুণ ভক্তিই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

(ক্রমশঃ) শ্রীপূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ।

ত্রিবেণী-সঙ্গমে।

হিমাদ্রিচরণ বিধৌত করিয়া গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী নাম্নী ত্রিধারা বিভিন্নপথে প্রবাহিত হইয়া প্রয়াগধামে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। ঐ মিলন-ভূমিকে “যুক্ত-ত্রিবেণী” বলে। তথা হইতে ঐ সম্মিলিত ধারাটি কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া পুনরায় ত্রিধারায় বিযুক্ত হইয়াছে। ঐ বিয়োগ-স্থলের নাম “মুক্ত-ত্রিবেণী”। সেখান হইতে তিনটি ধারা পুনরায় প্রবাহিত হইয়া অবশেষে সিন্ধু-মুখে নিপতিত হইতেছে। জীব দেহে মূলাধার-চক্রে স্বয়ম্ভুলিঙ্গকে বেষ্টন করিয়া যে কুলকুণ্ডলী-শক্তি বিরাজিতা রহিয়াছেন, তিনিও এরূপ সত্ত্বরজস্তমোময়ী জ্ঞানকর্ম্মভক্তি-স্বরূপিণী সুষুম্না ইড়া পিঙ্গলা নাম্নী তিনটি ধারায় প্রবাহিত হইয়া মনোভূমি

আজ্ঞা-চক্রে আসিয়া মিলিত হইয়া থাকেন। উহাকেও "যুক্ত-ত্রিবেণী" নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। তথা হইতে ভেদ-বিসর্জ্জিত সেই ধারাটি ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া পুনরায় "সৎচিৎআনন্দ" রূপী তিনটি ধারায় বিভক্ত হইয়া থাকেন। উহার নামও "মুক্ত-ত্রিবেণী"। সেই মুক্ত-ত্রিবেণী-বাহিত প্রবাহত্রয় পরিশেষে তুরীয়ধাম সহস্রার মধ্যে আত্ম-বিসর্জ্জন করে। উহাই জীবের তুরীয়াবস্থা এবং নির্ব্বাণ-লোক। পরবর্ত্তী কবিতায় এই বিষয়টি প্রস্ফুট করিবার প্রয়াস পাইয়াছি।

তুষার-ধবল তুঙ্গ হিমাদ্রির হিমশৃঙ্গ স্রুত
পুঞ্জীভূত ফেনায়িত বিভঙ্গিত গোমুখ-ঝঙ্কৃত
রবি-রুচি ঝরিছে জাহ্নবী ;
হিমাচল-পদতল পরিপ্লুত করি, স্থির নীরে,
স্নিগ্ধচ্ছায় নমেরুর শ্যাম বন ধৌত করি' ধীরে,
তরুণা যমুনা কিবা স্মেরাননা আলোক তিমিরে
ঈষত কম্পিত-কায়া কম্প্র-ছায়া দুলিছে সমীরে,
—নীলাম্বরা সুধাংশুর ছবি,
গিরির গোপন দরী ভেদ করি' স্বচ্ছ কলেবরা
নিখর নির্ম্মল-নীরা সুগভীরা দ্রবি' বসুন্ধরা
সূক্ষ্মলূতাতন্তুরূপা শুভ্র তনু বিশদ বন্ধুরা
কোন্ নিম্নতম ভূমি চুমি'চুমি' চরণ মন্থরা
সরস্বতী ভ্রমিছে অটবী,
এরূপে ত্রিপথ বহি' ভেদি' মহী ত্রিধারা-রূপিণী
জাহ্নবী যমুনা সতী সরস্বতী শৈল বিহারিণী
চলে'ছে আপন মনে নানা ভঙ্গে বিচিত্র বাহিনী,
কভু দ্রুত বিলম্বিত, কভু পীনা, কভু ক্ষীণাঙ্গিনী
কভু দীনা, কখনো গরবী।
ওই শোন কুল কুল, কল কল, খল খল ধ্বনি
ব্যোম হ'তে নিম্ন পথে অবতার প্লাবিছে অবনী
বেণু বীণা-মৃদঙ্গ নিক্কণে ;
তটিনী-শীকর-সিক্ত ঊর্ম্মি-চুম্বী উন্মদ পবন
তুলিছে কদম্ব বনে সুখ-স্পর্শ পুলক কম্পনে ;

গঙ্গার গৈরিক বাস, কালিন্দীর সুনীল বসন,
সরস্বতী তনু-বৃত' হংস-জিত অভ্র-আবরণ,
দুলে ঘন তরঙ্গ-নর্ত্তনে ;
ক্ষরিছে পীযূষ-ধারা জাহ্নবীর পীন পয়োধরে,
ঝরিছে শশাঙ্ক-সুধা যমুনার নধর অধরে,
ভরিছে অমৃত-স্যন্দ সরস্বতী-উরস ভিতরে,
ত্রিপথগা নদীত্রয় পুণ্যময় প্রবাহে সঞ্চরে,
মরতের তৃষা নিবারণে।
সর্জ্জবাসে, ধূপামোদে, চন্দনের গন্ধে আমোদিয়া
তটাঙ্গ, তরঙ্গদলে অন্দোলিয়া, কল কল্লোলিয়া,
গিরিগুহা শৈলবন জনপদ নগরী বহিয়া,
বিস্মিয়া কুটীর-সৌধ, ভিক্ষু ভূপে সম সন্তোষিয়া,
হের ধায় ত্রিধারা কেমনে !
গলিত গৈরিক ধারা গৌরাঙ্গিনী গিরিজা গঙ্গার,
নীলিম নীরদ নিভ নর্ম্মবারি নীল যমুনার,
দুগ্ধ-শুভ্র সরস্বতী নীর,
ত্রিধারা, ত্রিপথ হ'তে খর স্রোতে বহি' কল কলে,
সম্ভেদ-সম্ভোগ-ভূমি প্রয়াগের পূত পদতলে
মিশে পরস্পর সনে, আলিঙ্গনে বাঁধিয়া বিহ্বলে,
ত্রিতন্ত্রীর ত্রিসপ্তক মিলি' যেন মাধুরী উথলে
সুরে সুরে অধীর মদির ,
সে যুক্ত ত্রিবেণী শেষে একীভূত, গাঢ় বিজড়িত,
ধরি এক-রস তনু, প্রতি অণু মিলিত মিশ্রিত,
বিস্রস্ত-কুন্তলা বালা ধায় বেগে হইতে মজ্জিত
সুদূর সিন্ধুর বুকে, সর্পী সম গতি কুণ্ডলিত,
তুলি দীর্ঘ:উদাত্ত গভীর ;
তার পর ত্বরমাণা বেপমানা আকুলা ললনা
নাথের চরণ তলে ন' লুটিতে পাশরি আপনা,

"বিমুক্ত ত্রিবেণী" পুন ত্রিধারায় বহিয়ে উন্মনা
সে জাহ্নবী, সে যমুনা, সরস্বতী হারা'য়ে চেতনা
সিন্ধু মাঝে লুকায়ে শরীর।
নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, মরি—স্বয়ম্ভু, সে পুরুষ প্রবর,
গুহ্য জীব-দেহ মূলে লুপ্ত, যথা হিম-গিরিবর
ধ্যান মগ্ন মহাযোগ-ছবি ;
সহসা কি লীলা ছলে কুতূহলে ভেদি জটাজূটে
বিদরি' নিভৃত বক্ষ, বিপ্লাবিয়া পাদপদ্মপুট
সত্ব-তম-রজোময়ী প্রকৃতির ত্রিগুণ সম্পুট
সুষুম্না পিঙ্গলা ইড়া স্রোতত্রয় বিহরে ত্রিকূট
সরস্বতী যমুনা জাহ্নবী ;
প্রফুল্ল ধুস্তুর জিনি' সিতাঙ্গিনী সরস্বতী সতী,
তরুণ তপনদ্যুতি রক্তবাসা স্নিগ্ধ ভাগীরথী,
শশিমুখী নীলাম্বরা যমুনা সে ধীর স্রোতস্বতী,
জ্ঞান-কর্ম্ম-ভকতির সুধাময়ী ত্রিধারা মহতী,
ধায় নানা ভাব-তনু লভি',
পৃথ্বী-বারি বহ্নি-বায়ু-অভ্র-চক্র করি' বিদারণ,
গন্ধ-রস-রূপ-স্পর্শ-শব্দ মাঝে করিয়া ভ্রমণ ;
অনিত্যতা, নিষ্কামতা, নির্ম্মলতা করি' উদ্দীপন,
ক্রমশঃ জীবের চিতে একনিষ্ঠা করি' প্রকটন
উপনীত মানস অবধি।
উত্তরি ভ্রূযুগ মাঝে স্রোতত্রয় দ্বিদলকমলে
মানস-প্রয়াস-ধামে "যুক্ত-বেণী" আজ্ঞা-চক্রতলে
পরস্পরে করে আলিঙ্গন ;
ভেদ-বুদ্ধি বিসর্জ্জিত, একীভূত জীবের চেতনা,
মিলিত-ওঙ্কার* সম সূক্ষ্মতম সমর সত্তনা,

* মিলিত-ওঙ্কার · অ × উ × ম = ওং।

বিদ্যুন্মালা-বিলসিতা জ্যোতি-লতা অমর অঙ্গনা
বিস্তার মূরতি ধরি' ধায় বেগে বিগত-বন্ধনা
কুন্তলিনী নাগিনী মতন;
ক্রমে সে শাম্ভবী বিদ্যা অনির্ব্বাণ-শিখা-স্বরূপিণী
নিরালম্ব মহাশূন্য আত্মসাৎ করি' তরঙ্গিণী
মুক্ত-পক্ষ হংসী সম গুঞ্জরিণী কুঞ্জর-গামিনী
সহস্রার-পদ্ম-বনে সিন্ধু সনে রমা-কামিনী
চলে রঙ্গে চঞ্চল চরণ ;
রসের বিসর, মরি, রসময় সাগর সংহতি
মিলন-বিহ্বলা বালা, "মুক্তবেণী" অবতরি' সতী,
পুলক-লহর লক্ষ তুলি' বক্ষে ধায় স্রোতস্বতী,
"সৎচিৎ আনন্দের" ত্রিধারায় উথলায় রতি,
আপনারে করে বিসর্জ্জন।

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

সমালোচনা।

উৎসব—মাসিক পত্রিকাটী সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। বার্ষিক মূল্য কেবলমাত্র ১৷৷০ টাকা। পত্রিকাটী হিন্দুদিগের পাঠের উপযুক্ত। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য জড়বাদের বন্যা আমাদের আর্য্য, সনাতন, ঋষি-প্রবর্ত্তিত রীতিনীতি, ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলই ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। এ দুর্দ্দিনে শাস্ত্রালোচক উৎসবের মত পত্র দেশকে এই আসন্ন বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিতে পারে। আমাদের মাসিক পত্রিকার এইরূপ দেশ-হিতৈষী ধর্ম্মসঙ্গত উদ্দেশ্য সর্ব্বতঃ প্রশংসার যোগ্য আজকাল দেশের অদূরদর্শী লোকসকল আপাতমধুর পাশ্চাত্য রীতি-নীতির চাকচিক্যে একেবারে মোহিত হইয়া আছে। সনাতন ঋষি-প্রবর্ত্তিত লোকহিতকর মৌলিক তথ্য অনুসন্ধান করিয়া বুঝা দূরে থাকুক, তাহারা তাহা পুরাতন কুসংস্কারাপন্ন বলিয়াই মনে করে। সুতরাং এই পত্রিকার আলোচ্য বিষয়গুলির মৌলিক তথ্যগুলি যাহাতে জড়বাদমতাবলম্বী দেশের লোকের মন আকর্ষণ করিতে পারে, সেজন্য বিশেষ প্রয়াস করিতে হইবে। ইহা হইলেই পত্রিকার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হইবে সন্দেহ নাই। আমরা পত্রিকাটীর কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত হইলে বড়ই আনন্দিত হইব।

গোবর্দ্ধন ধারণ।

বিশ্বের মর্ম্ম-কথা।

জগতে এক কোণে, কোন ক্ষুদ্র অংশে তার
লভিয়া জনম্ ;—
ছুটিতেছি চিরকাল, কোন্ দীর্ঘ পথ ধরি
আজন্ম মরণ ? ১

নাহি ক্লান্তি নাহি ক্লেশ, দূরতা না হয় শেষ
(যত যাই) বেড়ে চলে পথ।
অসীম কালের ছায়া, ফিরিতেছে সাথে সাথে
চিনাইয়ে পথ ॥ ২

কোন্ পথ ? কোথা গিয়ে, এ বিশ্ব লভিবে চির
লক্ষ্য জীবনের ?
ক্ষুদ্র তৃণ হতে বিশ্ব, ধেয়ে চলে ; তাই শ্রান্তি
নাই ক্ষণেকের ॥ ৩

সংসারে জনমি চির-কাল অন্বেষণে ফিরে,
কোথা সে অনন্ত, শান্ত পৃথিবীর মাঝে ?
চারিদিকে ধায় ছুটে, বহুশ্রমে মর্ম্ম ফাটে,
কর্ম্মপাশ নাহি টুটে, বুকে শেল বাজে ॥ ৪

শেষে কাল ছুটে আসে, কোথা এ জীবন মেশে,
শক্তি-হীন শূন্য প্রাণ করে হায় হায়।
অনন্তের পানে চেয়ে, "কি যেন, হলোনা" বলে,
অনাথ আশ্রয়-হীন, কেঁদে চলে যায় ॥ ৫

কপোলে অতৃপ্ত রেখা, মুখেতে বিষাদ ছায়া,
লাজে মুখ অবনত, কাতর নয়ন।
নাহি সহচর সাথে, একাকী জীবন পথে
দিবস রজনী হায়, কাঁদিছে পরাণ॥ ৬

কি যেন পা'বার ছিল, নাহি পে'য়ে ছুটে যাই,
চিহ্নহীন অনন্তের, পরিচিত পথে।
মনে হয় ওই বুঝি, রহিয়াছে স্থান মম
চির-আকাঙ্ক্ষিত যাহা, একটু আগেতে॥ ৭

কত যুগ যুগান্তর—বহে গেল, ফিরিলাম
কতবার এই বিশ্বে, এই উপগ্রহে।
কভু কি সন্ধান তাঁর, পেয়েছি হৃদয়ে মম ?
না না, তাই বুঝি হায়, চক্ষে অশ্রু বহে॥ ৮

এই অতৃপ্তির ভাষা, করুণ রোদন শুধু,
আমার তো' নয়, ইহা বিশ্বের বেদন।
তাই মর্ম্ম-ফাটা কথা, শোণিত-সঙ্গীতে গাঁথা
গাহিতেছে কোটি কণ্ঠে, জীব অগণন॥ ৯

আপনার ক্ষুদ্র গণ্ডী—মাঝে, 'আপনার' করে,
সবাই রাখিতে চায়, বিশ্ব-চরাচরে,
ক্ষুদ্র আকর্ষণ-শক্তি, পারে না বাঁধিতে, হায় !
বিজলীর মত তাই, কোথা যায় সরে।
শুধু, হায় ! আলো দিয়ে, ক্ষণেকের তরে॥ ১০

কত ভালবাসি তাই, ধরিয়া রাখিতে চাই,
বিশ্ব-মানবেরে, এই আপনার কোলে।
কত যুগে এই এক, চেষ্টা সারা জীবনের,
তবু 'আপনার' কেহ, নাহি হলো ভুলে॥ ১১

সারা বিশ্ব মাঝে সেই, এক অতৃপ্তির কথা,—
সব চেয়ে পুরাতন,—"হবে মোর তুমি ?"

"পেতেছি আসন হৃদে, ওগো এসে হেথা দেখ,
"তোমাকেই বরিয়াছি, সব ত্যজি আমি ॥ ১২
"চিরকাল অণু পানে, ধায় শত পরমাণু
প্রীতি-স্নেহ বুকে লয়ে, উচ্ছ্বসিত মনে।"
জগতে যে অতি ক্ষুদ্র, সেও না থাকিতে চায়
ক্ষুদ্রত্ব লইয়ে তা'র, জগতের কোণে ॥ ১৩
উৎসাহ আবেগ পূর্ণ, করমের এই গীত
পরিপূর্ণ করিতেছে, এ বিশ্ব ভুবন ।
একই মধুর শব্দ, উঠিছে জগত-ময়
"যে আছ করিয়া লও, "আমারে" আপন ॥" ১৪
অতি ক্ষীণ অতি ক্ষুদ্র, হ'ক হৃদয়ের বল
তবু সে বলিতে চায়, অন্য ক্ষুদ্র জনে ।
"এস মিলে এক প্রাণে, এই দুটি ক্ষুদ্র প্রাণ
অন্তে মিশায়ে যাই, অনন্তের সনে ॥" ১৫
নীলাম্বুর বক্ষ হ'তে, ছুটিতেছে উর্ম্মিমালা
মানব হৃদয়োত্থিত বাসনার মত ।
বলিছে তারাও কেঁ'দে, গভীর গর্জ্জন করে,
"একলা যেওনা রেখে, অনাথার মত ॥" ১৬
তট কাঁদিতেছে পড়ি, সমুদ্রের সঙ্গ তরে
সমুদ্র কাঁদিয়া আসে, তীর পাশে ছুটে ।
এইরূপে মহাপ্রাণ', তবে ধায় ক্ষুদ্র প্রাণ
বৃহৎ সে ক্ষুদ্র পদে, পড়িতেছে লুটে ॥ ১৭
পৃথিবী ছুটিয়া চলে, সবিতার পদতলে
করিতে অর্পণ হৃদি, নাহি অন্য মন ।
সূর্য্য ধায় আলিঙ্গিতে, ক্রোড়ে তা'র তুলে নিতে
ক্ষুদ্র এই ধরাটিকে, করিতে চুম্বন ॥ ১৮
'জীবন' 'মৃত্যুর' মাঝে, ধাইতেছে ছুটে ছুটে,
একেবারে তা'র মাঝে, করিতে প্রবেশ ।

''মৃত্যু' আসি যাচিতেছে, জীবনের কাছে, হায় !
পে'তে তা'র হৃদি মাঝে, একটু নিবেশ ॥ ১৯
জীব চায় যেচে যেচে, ভাসি প্রেম-অশ্রু জলে
'বিশ্বাত্মার' মাঝে হায়, লভিতে বিরাম।
পরমাত্মা বিভু যিনি, তিনি কি পাবেন্ কভু,
থাকিতে গো উদাসীন, না দিয়ে আশ্রয় তারে,—
না দিয়ে আরাম ॥

সিদ্ধ কি সাধ্য ?

অনন্ত লীলা বৈচিত্র্যময়ী জগদভিব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে, জ্ঞানযোগীর অমূল্যনিধি—জ্ঞান, ভক্তিযোগীর জীবন সম্বল—ভক্তি, কোথায় যেন দিশাহারা একটুকু হইয়া নিঃশব্দে সরিয়া পড়ে এবং সহসা অপ্রার্থিত ভাবে স্বতঃই মনে এই প্রশ্ন আসিয়া উদিত হয়—'সিদ্ধ কি সাধ্য ?' এই দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসায় অতি প্রাচীন কাল হইতে বৈদান্তিক, তান্ত্রিক ও নৈয়ায়িকাদি মহামনিষী দার্শনিকগণ সর্ব্বদা নিরত, কিন্তু সকলেরই মুখে শুনি,—সেই সিদ্ধ কি সাধ্য ? যুগের পর যুগ, এই প্রশ্ন শুনিতে শুনিতে, উত্তর লাভ-হীন ব্যথিত জীবন গত হইয়াছে। তবে কি এই প্রশ্নের উত্তর নাই ? সাধারণতঃ মানবজ্ঞান যুক্তি-তর্কাবলম্বনে দুর্ভেদ্য অন্ধকার রাশি ভেদ করিয়া যতই অগ্রসর হয়, ততই অন্ধকারের পর ঘোর অন্ধকার ব্যতীত আর কিছুই অন্বীক্ষণ বা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় না। বেদান্ত যাহা উপদেশ দেন, তন্ত্র যেন তদ্বিপরীত বলিতে কুণ্ঠিত হয়েন না ; আবার ন্যায়,—যেন ন্যায়ান্যায় বোধের সম্পর্ক না রাখিয়া, ভ্রূক্ষেপেই বেদান্ত ও তন্ত্র মত সবই ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া খিল্ খিল্ হাসিতে থাকেন ; তবে উপায় কি ? কাহার শরণ লইলে এ প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পাইব ? পুস্তকের কথা ছাড়িয়া দিয়া, আশ্বস্ত হৃদয়ে সাধকগণের পাদমূলে স্থান প্রার্থনা করি ; শুনি তাঁহারা কি উত্তর দেন। যাঁহারা সমগ্র ইন্দ্রিয় নিরোধে সংসার-

ব্যাপার হইতে একরূপ পৃথক থাকিয়া, অহরহ কেবলই ভগবত-সাধনে নিযুক্ত,—সম্ভবতঃ ইঁহাদের নিকট প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পাইব। হরি! হরি! সেখানেও কপটতা, সেখানেও বাগাড়ম্বর! সেখানেও উত্তরের পরিবর্ত্তে অশ্রুজলে হৃদয় প্লাবিত করিয়া বিফলমনোরথে ফিরিলাম! সকলেরই মুখে সেই পূর্ব্ব কথা, 'সিদ্ধ কি সাধ্য'? শ্রীচৈতন্যদেব উপদেশ দিলেন—"কাহারও অপেক্ষা না রাখিয়া, ভক্তি বিশ্বাস মূলে, হরিবোল বলিয়া, অহর্নিশ প্রেমে মাতোয়ারা হও; তোমার প্রশ্নের সদুত্তর মিলিবে,—সিদ্ধ-ধন মুক্তি সাধ্য হইবে।" মনে আশা জাগ্রত হইল; হরিবোল বলিতে অগ্রসর হইলাম,—আহারনিদ্রা পরিত্যাগে, নিশিদিন হরিবোল বলিলাম;—কৈ, যে আমি সেই 'আমিই' রহিলাম;—আমার যে বন্ধন তাহাই রহিল;—ঘুচিল কৈ? মুক্তির পরিবর্ত্তে বরং বন্ধন আরও আঁটিয়া, আমার নাশের কারণ উপস্থিত করিল?

এইবার তন্ত্রাচার্য্য বাল-ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত-পরায়ণ আচার্য্য শ্রীশঙ্কর হাসিয়া বলিলেন,—"শুন, তত্ত্বার্থি! ঐ বন্ধনের আঁটই তোমার মৃত্যু ঘটাইয়া স্থূলদেহ নাশের সঙ্গেই তোমায় মুক্ত করিয়া দিবে; তুমি বন্ধনে দৃঢ়ীভূত হও।" তীব্র যন্ত্রণায় আমার অশ্রু ক্ষরণ হইল। আপনা আপনিই কে যেন আমাকে বলাইল "যদি সাধনাই করিলাম, তবে বস্তুর সিদ্ধ নামের সার্থকতা রহিল কৈ!" "সাধন"-ফলে সাধ্য বস্তুরই লাভ সম্ভব; যাহা সিদ্ধ তাহা বিনা সাধনেও মিলিবে; নতুবা সিদ্ধ আখ্যার যাথার্থ্য রক্ষা হয় কৈ?" অমনি বিজ্ঞানশাস্ত্রবিৎ কোন উপদেষ্টা বিকট দংষ্ট্রা বিকাশনে, হাসির রোল তুলিয়া, সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূভঙ্গী প্রদর্শনে উপদেশ দিলেন, –"পরমাণুই সিদ্ধ, তদ্ব্যতীত জগৎ প্রপঞ্চ, তাহারই সমষ্টি মাত্র।" এইবার আচার্য্য শ্রীশঙ্কর পুনরায় হাসিয়া বলিলেন,—'পরমাণুই যদি সিদ্ধ, তবে পঞ্চীকরণ সুকৌশলে স্থূল সৃষ্টি ঘটিত কি? যাহা সাধ্য নহে তাহা দ্বারা সাধনীয় সাধন অসম্ভব। গুণের আকর্ষণ ব্যতীত তত্তৎগুণরাশি সমষ্টিকৃত হইতে পারে না। সূক্ষ্ম তন্মাত্র হইতে পরমাণুর উৎপত্তি বা বিকাশ। সুতরাং শুন সাধক, ঐ অন্তঃসারহীন বাক্‌ছন্দে ভুলিও না,—আমার কথা শুন। চৈতন্যদেবের কথার অনুসরণে আমার উপদেশ মানিয়া চলিও; বন্ধনে বন্ধনে দৃঢ়ীভূত হও,—নিরপেক্ষ ভক্তি-বিশ্বাস-মূল সাধনা ফলে, আসক্তির সংস্কার দাগ মুছিয়া তোমার স্থূলদেহের নাশ ঘটিলে, তুমি মুক্ত হইবে। সিদ্ধ ধাতু কখনই

অঙ্কুরিত হইবে না। সুজল, সুতেজ, সুমৃত্তিকারূপ সংযোগেও কখন অঙ্কুরিত হইবে না। সুতরাং সাধনা ফলে সিদ্ধ মুক্তি তোমার করায়ত্ত হইবে।" ভাবিলাম, এইবার তিন জনের কথার সম্মিলনে সাধনপথে অগ্রসর হইয়া হরিবোল বলি,—সিদ্ধ সাধ্য হইবে। হরি! হরি! বিফল কামনা, বিফল যত্ন,—সমস্তই পণ্ড হইল। চঞ্চল মন বশীভূত হইল না, সিদ্ধ সাধ্য হইল না!

মুচ্ মোচন করা + ক্তি (ভা) —'মুক্তি' পদ বৈয়াকরণিকগণের মতে নিষ্পন্ন। মোচন করা অর্থাৎ অত্যন্ত দুঃখ-নিবৃত্তির নামই—মুক্তি। শাস্ত্র বলেন,—(মুকুম্-দা + ড—কর্ত্তৃ) মুকুন্দই নির্ব্বাণ-মুক্তিদাতা।

"মুকুমব্যয়মন্তঞ্চ নির্ব্বাণমোক্ষবাচকং।
তদ্দদাতিচ যো দেবো মুকুন্দস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥"
"মুকুং ভক্তিরস প্রেম-বচনং বেদসম্মতং।
যস্তদ্দদাতি বিপ্রেভ্যো মুকুন্দস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥"

"বিপ্র অর্থাৎ যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনারূপ ষট্‌কর্ম্ম পূরণকারী ব্যক্তিই মুক্তির অধিকারী; এবং মুকুন্দই তত্তৎ কর্ম্মীর নির্ব্বাণ মোক্ষদাতা ব্রহ্ম, তিনি না দিলে মুক্তি কখন আসিতে পারে না।" স্থূলদেহ নাশকে মুক্তি বলা অসঙ্গত; কেননা যে নাশের পর আর পুনরাগমন, পুনর্জন্ম হয় না, তাহাই প্রকৃতপক্ষে মুক্তিপদ বাচ্য। সেই জন্যই বৈয়াকরণিকগণ অত্যন্ত-দুঃখ-নিবৃত্তির নামই মুক্তি দিয়াছেন। বিনা চেষ্টায়, বিনা সাধনায়, মুকুন্দ যাচিয়া মুক্তি দিবেন কি না তাহাই বিচার্য্য। উপরোক্ত ষট্‌সাধনকারী কর্ম্মীকে তিনি যেরূপ মুক্তি দিয়া থাকেন, ঠিক তদ্রূপেই নিষ্ক্রিয়েরও বন্ধন মোচন করিয়া দেন, ইহা স্বীকার না করিলে উপায় নাই, বা তর্কও নাই। তাঁহাকে ভালবাস আর নাই ভালবাস, তিনি মুক্তিদাতা, মুক্তি দিবেনই। তাঁহার নিকট সাধক অসাধকের সমান অধিকার। বিনা কর্ম্মে তিনি মুক্তি দেন কি না—ইহাই বিচার সাপেক্ষ। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক স্বামী শ্রীধরবলেন "মুক্তি পাঁচ প্রকার,—সালোক্য (একলোকে ভগবান-সহ বাস), সার্ষ্টি (ভগবানের সহিত সমৈশ্বর্য্য), সামীপ্য-(ভগবানের নিকটবর্ত্তিত্ব) সারূপ্য-(ভগবান-সহ সমরূপতা) ও সাযুজ্য (ভগবান-সহ একত্ব)। এই সাযুজ্য মুক্তির নামান্তরই নির্ব্বাণ এবং ইহাই অদ্বৈতাবস্থা।" আবার তন্ত্র বলেন,—"মুক্তি চারি প্রকার,—সালোক্য, সারূপ্য, সাযুজ্য ও নির্ব্বাণ।" ইহা হইতে

বুঝা যাইতেছে—তন্ত্র সালোক্য, সাষ্টিতও সামীপ্যকে পৃথক আখ্যাত না করিয়া এক সালোক্য মুক্তির মধ্যেই ধরিয়াছেন। তন্ত্রে আবও উপদেশ এই--"সালোক্য —মহর্লোকে [অনাহত চক্র বা দ্বাদশ দল পদ্মে (হৃদয়ে)], সারূপ্য—জনলোকে [বিশুদ্ধ চক্র বা ষোড়শ দল পদ্মে (কণ্ঠদেশে)], সাযুজ্য—তপ-লোকে [আজ্ঞা চক্র বা দ্বিদল পদ্মে (ভ্রূমধ্যে)], এবং নির্ব্বাণ—সত্যলোকে [সহস্র দল পদ্মে (ব্রহ্মরন্ধ্রে)]"। এই ইঙ্গিত দ্বারা তন্ত্র বলিতেছেন—সাযুজ্য মুক্তি অর্থাৎ ভগবান-সহ একত্বাবস্থায়ও জীবের নিস্তার নাই,—তখনও ফলদ্বারা যুক্তাবস্থা থাকিয়া যায়। কেবল নির্ব্বাণে মনের লয় হইলে, তবে জীবের দ্বিতীয়ত্ব-রহিতে সিদ্ধ ধন প্রাপ্তি ঘটে। মুক্তি সিদ্ধপদবী বাচ্য হইলেও, তন্মধ্যে নির্ব্বাণ ব্যতীত অপর কয়টিতেও পুনরাবৃত্তির ভয় থাকে। তখনও সংস্কারের দাগ মুছিয়া যায় না। সুতরাং এক নির্ব্বাণ মুক্তিই কেবল সিদ্ধ পদবীভুক্ত। শাস্ত্রের আভাসে আবার ইহাও যেন উপলব্ধি হয় যে, সাযুজ্য মুক্তি পর্য্যন্ত পুরুষকার দ্বারা লাভ সম্ভাবনা ; কিন্তু নির্ব্বাণ দৈব-সাপেক্ষ। ইহা মুকুন্দ না দিলে জীবের প্রাপ্তি ঘটেনা। নির্ব্বাণ লাভে জীবের সকল দুঃখ, অত্যন্ত দুঃখের নিবৃত্তি হয় বলিয়া, মুক্তি কি মোচনার্থে, নির্ব্বাণই শ্রেষ্ঠ। অপর কয়টিতে নানা বন্ধনের কথক মোচন বা কথকের শ্লথ ভাব আইসে মাত্র। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম প্রাপ্তিই, অর্থাৎ অংশের পূর্ণে লয় প্রাপ্তিই, নির্ব্বাণের নামান্তর ; এবং তন্ত্রের ইঙ্গিতে যেন ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রদল পদ্মে মনের লয় করা ভাব বোধ আইসে। এখানেও কর্ম্মী তন্ত্র কর্ম্মোপদেশ দিতেছেন। কি সর্ব্বনাশ! ইহাতেও যদি, কর্ম্ম করিতে, সাধন করিতে হইবে তবেত, নির্ব্বাণ সাধ্য পদবীর অন্তর্ভুক্ত হয় ,—বাস্তবিক নির্ব্বাণ লাভ কি জীবের কর্ম্মাধীন বা কর্ম্মান্তে জীবের বিশ্রাম ?

সকল শাস্ত্রেই পুরুষকারকে জীবের কর্ত্তব্য বলিয়া বিধিবদ্ধ হইয়াছে। শাস্ত্র, অবশ্যই শ্রেষ্ঠ পুরুষেরই শাসন-বাক্য ও সর্ব্ববাদী-সম্মত। সুতরাং শাস্ত্র বাক্যে অবশ্যই পুরুষকার প্রধান হইবেই।

দৈবের-প্রতি অনুসন্ধান করিতে গেলে, বিরাট বিশ্ব প্রতি দৃষ্টিপাত ঘটে; সুতরাং তাহা হইতে কি জ্ঞান পাওয়া যায় দেখা যাউক। বিরাট বিশ্ব মধ্যে, জড় ও চেতন দ্বিবিধ রচনা নয়ন গোচরে আইসে। চেতনের জন্য শাস্ত্র বিদ্যমান ;— কিন্তু জড়ের সমাধি জন্য শাস্ত্র কিছু করেন নাই, বা করিতে ক্ষমতায় কুলায়

নাই ;—মহা প্রলয়ে বা নাশে রূপের তিরোধান বুঝি তাহাদের জন্যই আবশ্যক। তাহার শাস্ত্র তাহারই বোধগম্য। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে বিরাটের মধ্যে মানবই সৃষ্টির চরমোৎকর্ষ। মানব, জড় চৈতন্যের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার শক্তিলাভেই, শ্রেষ্ঠ রচনা। একটি ক্রিয়াশীল অর্থাৎ কর্ম্ম বা সাধন পথারূঢ় পুরুষকার পন্থী জীব—মানব, এবং আর একটি নিষ্ক্রিয় বা সাধন হীন দৈবপন্থী জড় প্রস্তর এই উভয়কে লইয়া আবদ্ধ প্রবন্ধের বিচার করা যাউক। যদিও জড় বস্তু দৈবপন্থী কি না তৎসম্বন্ধে আলোচ্য প্রবন্ধে কিছু বিচার করা উদ্দেশ্য নহে, তবে দৃষ্টান্তটি অনায়াস বোধগম্য করিবার জন্য দুই পক্ষের দুইটি দৃষ্টান্ত কল্পনা করা যাইতেছে। এখন দেখা যাউক কর্ম্মী মানব এবং অকর্ম্মী উপলখণ্ড, কে কি প্রকারে সিদ্ধ ধন নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করে এবং কাহার সমাধি বা বন্ধন সমাপ্তি অগ্রে ঘটে। এই উপলখণ্ড অবশ্যই মহৈশ্বর্য্যশালী হিমালয়াদি বিরাট পর্ব্বতের অংশ, ও কাল প্রণোদিত হইয়া চৈতন্য যোগে স্থানান্তরিতাবস্থায় আমাদের সমক্ষে পরীক্ষাধীন। জ্ঞানী মানব ঐ অজ্ঞান উপলখণ্ড নিকটে রাখিয়া সাধনে নিযুক্ত হইলেন। কালক্রমে সাধন বলে পুষ্ট হইয়া মানবের ইন্দ্রিয়গণ বশতাপন্ন হইল, এবং কর্ম্ম তাঁহাকে নৈষ্কর্ম্যাবস্থায় আনিল ;—তিনি মোহময় সংসারের প্রকৃত সত্বাবোধে তাহা হইতে স্বাধীন ও বন্ধন মুক্ত হইলেন এবং প্রাকৃতিক নিয়মাধীনে তাঁহার দেহের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটিল। ইহার পরের অবস্থা অবশ্যই লোকজগতে অব্যক্ত। এই কালমধ্যে দেখা গেল উপলখণ্ডটি কিছুদিন যাবৎ প্রকৃতির অমোঘ নিয়মাধীনে বায়ু তেজ সলিলাদির সংঘর্ষে ক্রম ক্ষয়ের পথে যাইয়া সাধারণে পরিচিত হইতেই কোন কর্ম্মকুশলী সংসারী কর্ত্তৃক স্থানান্তরিত রাজবর্ত্মের কর্দ্দম রহিতার্থে খণ্ডশঃ নিক্ষিপ্ত হইল। বিনা সাধনে উপলখণ্ডের এই এক অবস্থান্তর প্রাপ্তি ঘটিল,—দৈব নাটকের এক অঙ্ক অভিনীত হইল। পরে কিছুদিন মধ্যেই সর্ব্বগ্রাসী কালের নিয়মাধীনে বহু জীব স্রোতের পদতাড়ন, শকটাদির ঘর্ষণ প্রভৃতি বল সহকারে প্রকৃতি সহচর বায়ু তেজ জলের পূর্ণ বল সংযোগে, উপলখণ্ড প্রস্তর দেহ ছাড়িয়া চূর্ণ ও ধূলীসাৎ হইল। ইহা কি রামচন্দ্রের পাদস্পর্শে অহল্যার পাষাণ দেহের মোচন বলিব না? এইবার উপলের দ্বিতীয় অবস্থান্তর বলিতে হইবে। জড়ের কথিত অবস্থান্তরগুলি কি, তাহার মুক্তির প্রকার ভেদ নহে। নিশ্চয়ই

ইহ প্রস্তরখণ্ডের বন্ধন মোচন বলিতে হইবে। ঐ ধূলীসাৎ প্রস্তর চূর্ণ দেখিলে কেহ আর উপল খণ্ড বলিবে না। ইহারও পরের অবস্থা লোকলোচনের আয়ত্তাধীন নহে। কারণ প্রস্তরচূর্ণও অরূপী নহে, এবং তাহা হইতে আমাদের অলক্ষ্যে কত রূপের গঠন হইতেছে কে না স্বীকার করিবে? এইরূপে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া, উপল মহাপ্রলয়ে বিশ্বের রূপ নাশের সহিত অস্তিত্ব হীন হইবেই, তবে দুঃখের বিষয় ব্রহ্ম ব্যতীত, তদবস্থার সাক্ষী আমরা হইতে পারিব না। অপর পক্ষীয় বন্ধনমুক্ত মানবের স্থূল দেহ নাশের পর, অবশ্য ইন্দ্রিয়জয়ী বিধায় আসক্তি বা সংস্কার-দাগ তাঁহাতে না থাকায় তাঁহাকে না হয় সেই এক জন্মেই ব্রহ্মে লীনাবস্থায় আনিল ;—মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ কালের মুখের দিকে তাঁহাকে তাকাইয়া অপেক্ষা করিতে হইল না। ফলতঃ হইল এই, হয়ত, পুরুষকারপন্থী পূর্ব্বোক্ত মানব (সাধক), দৈবপন্থী উপলের অগ্রে ব্রহ্মে লীন হইলেন। দৃষ্টান্তটি পরিস্ফুটনার্থে আবশ্যক বোধে যাহা বলা হইল, তাহার সংঘটন হওয়া দুঃসাধ্য বা অসাধ্য। এক জীবনেই ব্রহ্ম প্রাপ্তি, জীবের পক্ষে সুদুর্লভ। বহুকালব্যাপী বহু আয়াস ফলে, সংস্কার-দাগ নিষ্প্রভ—মলিন হইতে হইতেই ক্রমে বিলুপ্ত হয়। একদিনেই সে কঠিন দাগ মুছিয়া যায় না। দৈব কর্ত্তৃক বিধিবদ্ধ ফল দৈব প্রেরিত পুরুষকার যোগে বিকাশ প্রাপ্ত হয় ;—একটিকে ছাড়িয়া অপরটি ক্ষণমাত্রও তিষ্ঠিতে পারে না। একই দণ্ডের উভয় পার্শ্বে বদ্ধ দ্বিখণ্ড চক্রের ন্যায় বিদ্যমান। একের প্রতি কোন লক্ষ্য না রাখিয়াই কেবল প্রাণপণে অপরটির প্রতি বল প্রয়োগ করিলে, দুটি চক্রই সমান চলিতে আরম্ভ করিবে, একটি ক্রিয়াশীল ও অন্যটি নিষ্ক্রিয় কখনই থাকিতে পারিবে না। দৈব পুরুষকার চক্রদ্বয়ও ঠিক ঐরূপে কালদণ্ডে দৃঢ় সংবদ্ধ। প্রদর্শিত দৃষ্টান্তটিতে উপলখণ্ডের স্থানচ্যুতিসহ খণ্ডন বিভাগ প্রভৃতি অবস্থান্তরগুলি দৈবপুরুষকারের সমষ্টিভূত কার্য্য সন্দেহ নাই। উপলের স্বীয় পুরুষকার থাকা অসম্ভব, তবে অপর কর্ত্তৃক তৎপ্রতিযুক্ত শক্তিই পুরুষকার রূপে ধরিতে হয়। শাস্ত্রে কায়ব্যূহ-রচনা ক্রমে, এক দেহান্তেই যে মুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তৎপ্রতি মনোযোগ করিলে এই বুঝা যায়—সেই শাস্ত্রপ্রণেতা পুরুষকারপন্থী। তিনি পুরুষকারের ছবি বড় করিয়া আঁকিয়াছেন মাত্র। দৈবে ঐরূপ বিধি নিশ্চিত না থাকিলে ঐকালে ঐরূপ অস্বাভাবিক কায়ব্যূহের

সম্মিলন ঘটিবে কেন? যদি কেহ বলেন যে ঐ কায়ব্যূহের মিলন নিষ্পত্তি, দৈব দ্বারাই পূর্ব্বে বিধিবদ্ধ ছিল, তবে তাঁহাকে পরাস্ত করিবার কোন যুক্তি তর্ক পুরুষকার পন্থী দেখাইতে পারেন কি?

শাস্ত্র আবার ইহাও বলেন যে, মহাপ্রলয়ের পর অর্থাৎ বিশ্ববিরাটের রূপের সমাধি অন্তে, পুনরায় এক ব্রহ্ম বহু হইবার ইচ্ছা করিলেই বিশ্বের বিকাশে পুনঃসৃষ্টি দৃষ্ট হয়। সূক্ষ্ম তন্মাত্ররূপ বীজ, কাল প্ররোচনায়, নিয়ন্তার ইচ্ছাশক্তি সাহায্যে পুনরায় বিশ্বরূপে পরিণামী হয়। পূর্ব্ব সৃষ্টিতে যাহা ছিল না, তাহার বিকাশ হয় না। অশ্ব-ডিম্ব, আকাশকুসুম, প্রভৃতি রূপ-বোধ-হীন অথচ মানব সমাজের ভাব ও ভাষা পুষ্টির অত্যদ্ভুত কল্পনা, ঔপাধিক দ্রব্যস্বত্বা, কেহ কখন চাক্ষুষ করিয়াছেন কি? ভাবরাজ্যের জন্য উহাদের কল্পনা এবং ভাব জগতেই তাহার লয় ব্যতীত উহার অন্য অস্তিত্ব সম্ভবে না। কোন শাস্ত্রকার বলেন, মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ড জলময় হইয়া রূপহীন হইবে, কেহ বলেন উদিত দ্বাদশ-সূর্য্য-তেজে বিশ্বসৃষ্টি ভস্মসাৎ হইবে ইত্যাদি। ফলতঃ অবশেষে যে মহা-সমাহার তাহা সর্ব্ববাদী-সম্মত। চৈতন্যও জড়ের সংস্কার বা সূক্ষ্মতন্মাত্র বিরাটের বিরামে সমাহিত থাকায়, পুনরায় তাহারই উন্মেষ হয়, নূতনত্ব কিছুই জন্মিতে পায় না। এখন যদি কেহ, প্রলয়ান্তে সংরক্ষিত সূক্ষ্মতন্মাত্রকে সৃষ্টির দৈবাবস্থা এবং রূপ পরিগ্রহণে দ্রব্য স্বত্বার বিকাশকে পুরুষকারাবস্থা বলেন, তবে পুরুষকার পন্থী কি উত্তর দিবেন? এখানে স্রষ্টার ইচ্ছাশক্তিই পুরুষকার এবং সূক্ষ্মতন্মাত্রই দৈব—একযোগে রচনা সমাধা করিল।

জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতবর কাতন্ত্রকার সর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য কলাপ ব্যাকরণের আদিতেই "সিদ্ধোবর্ণসমাম্নায়ঃ" বলিয়াই ব্যাকরণ আরব্ধ করিয়াছেন। তিনি,—নাদ অর্থাৎ শব্দ সৃষ্টি হইতে জগত প্রপঞ্চ উত্থিত বলিয়া, ঐরূপে বর্ণের পাঠ ক্রমকেই সিদ্ধাবস্থা বলিয়া, তদনন্তর বর্ণ সমূহের সম্মিলনে অর্থাৎ সাধনাবস্থায় বহু শব্দ-সৃষ্টি স্বীকার করিয়াছেন। এইখানেও তিনি, 'সিদ্ধ সাধ্য নহে' এই পন্থানুসরণ প্রদর্শন চেষ্টা করিয়াছেন বলিতে পারা যায়। কারণ অন্ধকারে অজ্ঞাত পথ পর্য্যটককে পথের একটি সীমা কল্পনা না করিলে চলে না। সেই জন্য বর্ণসমাম্নায়কে সিদ্ধ ধরিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য।

পরা পূজা।

(আচার্য্য শঙ্করানুসৃত ভাবাবলম্বনে অনূদিত)

বিশ্বপূর্ণ যেবা, কোথা তাঁর আবাহন ?
সর্ব্বাধার যিনি কোথা তাঁহার আসন ?
স্বচ্ছ যেই, পাদ্য অর্ঘে কি কাজ তাঁহার ?
কি নিমিত্ত আচমন, শুদ্ধ দেহ যাঁর ?
কিবা স্নান, নির্ম্মলের,—বিশ্বোদরে বাস,—
উপবীত নিরালম্বে,—পুষ্প যে নির্বাস ?
নির্লেপ জনের গন্ধে কিবা প্রয়োজন ?
রম্যদেহে কি কারণ ছার আভরণ ?
নিত্যতৃপ্তে কিবা কার্য্যে, নৈবেদ্য তাম্বুল ?
অনন্তে সান্তের পূজা, মরি কিবা ভুল।
প্রদক্ষিণ অনন্তের,—অদ্বয়ে প্রণতি,—
বেদের অজ্ঞেয় তবু, স্তোত্রের মিনতি!
স্বপ্রকাশে নীরাজন দীপ্তির কারণ।
শান্তিতরে শান্ত পূজা ভ্রান্তি অকারণ।
অন্তরে বাহিরে যেবা পূর্ণ সর্ব্বক্ষণ,
হইবে কোথায় বল তাঁর উদ্বাসন ?
'একব্রহ্ম দেবদেব বিভু সারাৎসার'
সর্ব্বদান সার এই পরাপূজা তাঁর।*

শ্রীঅক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য।

---

* লেখকের একটী সূত্রে উত্তর আছে "ইত্থং গুণভূতো হবিঃ"—পং সঃ।

গীতায় কর্ম্মযোগ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তৃতীয় কারণ।—কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন সম্বন্ধে তৃতীয় কারণ এই যে, কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান একান্ত কর্ত্তব্য। নিত্যকর্ম্ম যাহা, তাহা শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। শাস্ত্রে নিত্য ও নৈমিত্তিক ভেদে আমাদের বিহিত কর্ম্ম দ্বিবিধ। ইহার মধ্যে সন্ধ্যা বন্দনাদি, দান তপঃ প্রভৃতি, কর্ম্ম এই নিত্যকর্ম্মের অন্তর্গত। তাহা কোন বিশেষ বর্ণের বা আশ্রমের বিহিত কর্ম্ম নহে। এই নিত্যকর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠেয়। অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রথমে অর্জ্জুন সন্ন্যাসের ও ত্যাগের তত্ত্ব জানিতে চাহিলে, ভগবান্ বলিয়াছেন যে, কাম্য কর্ম্মের ন্যাসই সন্ন্যাস, এবং সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগই ত্যাগ। তখন দুইরূপ মত প্রচলিত ছিল। কাহারও মতে সমুদায় কর্ম্মই দোষযুক্ত, অতএব ত্যাজ্য। কাহারও মতে যজ্ঞ দান তপঃ কর্ম্ম ত্যাজ্য নহে—সর্ব্বথা অনুষ্ঠেয়। এই দুই মতের সমুচ্চয় করিয়া ভগবান্ বলিয়াছেন যে, যজ্ঞ দান তপঃ কর্ম্ম কখনই ত্যাজ্য নহে,—তাহা কার্য্য; কেন না তাহা মানবের চিত্তশুদ্ধিকর। এই সব কর্ম্ম, আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্য বোধে, নিশ্চয় অনুষ্ঠেয়। নিয়ত বা নিত্য কর্ম্মের সন্ন্যাস কখনই কর্ত্তব্য নহে। কেহ মোহবশে তাহা ত্যাগ করে; কেহ বা সে কর্ম্ম দুঃখকর মনে করিয়া কায়ক্লেশভয়ে তাহা ত্যাগ করে। আর যাহারা সাত্ত্বিক-প্রকৃতি-যুক্ত, তাহারা কর্ত্তব্য বোধে আসক্তি ও ফলত্যাগ করিয়া নিত্যকর্ম্ম অনুষ্ঠান করে। তাহাদের এই যে আসক্তি ও ফলত্যাগ, ইহাই সাত্ত্বিক ত্যাগ। এই সকল লোক মেধাবী, ছিন্নসংশয়, সত্ত্বসমাবিষ্ট ও ত্যাগী। ইহারা কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে কর্ম্মানুষ্ঠানকালে অকুশল কর্ম্মে দ্বেষ করে না, এবং কুশল বা সুখকর কর্ম্মেও প্রীতিযুক্ত হয় না। (অষ্টাদশ অধ্যায় ২য় হইতে ১০ম শ্লোক দ্রষ্টব্য)। ভগবান্ সে স্থলে উপসংহারে বলিয়াছেন—

নহি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥ ১৮।১১

অতএব যখন একেবারে কর্ম্মত্যাগ সম্ভব নহে, তখন রাগ, দ্বেষ, কাম, ক্রোধ, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি দ্বারা পরিচালিত হইয়া কর্ম্ম করা অপেক্ষা নিয়ত বা বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানই কর্ত্তব্য। রাগদ্বেষ পরিচালিত না হইয়া কিরূপে 'নিয়ত' কর্ম্মানুষ্ঠান করা যায়, তাহা ক্রমে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

চতুর্থ কারণ।—এই কর্ম্মযোগ যে শ্রেয়, তাহার সম্বন্ধে চতুর্থ কারণ এই যে যদি কর্ম্ম একেবারে ত্যাগ করা যায়, তবে শরীরযাত্রাও নির্ব্বাহ হয় না। যাঁহারা গৃহী, তাঁহারা এই শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ জন্য যেমন কর্ম্ম করিতে বাধ্য, সেইরূপ যাঁহারা সন্ন্যাসী, তাঁহারাও ভিক্ষাদি দ্বারা অন্নাদি সংস্থানপূর্ব্বক শরীর-যাত্রা নির্ব্বাহ না করিলে, মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এ সম্বন্ধে স্থানান্তরে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা উদ্ধৃত হইল।—

"যখন শরীর রক্ষার জন্য আমাদের খাদ্যের প্রয়োজন হয় তখন প্রকৃতি স্বয়ং ক্ষুধারূপে আমাদের অন্তরে প্রকাশিত হইয়া আমাদিগকে খাদ্য আহরণে প্রেরণ করেন। তিনি জঠরাগ্নিরূপে আমাদের অন্তরে থাকিয়া ভুক্ত অন্ন পরিপাক করিয়া ল'ন। ভগবান্ বলিয়াছেন 'অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা পচাম্যন্নং পৃথগ্বিধম্' (গীতা, ১৫।১৪)। যখন শরীরের বিশ্রামের প্রয়োজন হয়, তখন তিনি নিদ্রারূপে আমাদিগকে অভিভূত করিয়া, আমাদের বাহ্যজ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি হরণ করিয়া ল'ন। তিনিই প্রাণরূপে—জীবনীশক্তিরূপে আমাদের শরীর রক্ষণ ও পোষণ করেন, এবং শরীর রক্ষণ ও পোষণ জন্য আমাদিগকে বলে আকর্ষণ করিয়া প্রবৃত্ত করান। জ্ঞানী যখন আত্মার নিষ্ক্রিয় অবস্থা স্থির করিয়া অকর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিতে চাহেন, যখন শরীরকে তাঁহার বন্ধনের কারণ বলিয়া তাঁহাকে অবজ্ঞা করেন, যখন শোক-বিষাদ-মগ্ন আর্ত্ত শরীরকে কেবল যন্ত্রণাদায়ক মনে করিয়া তাহাকে উপেক্ষা করেন, তখনও প্রকৃতি তাঁহার মধ্যে ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি রূপে আবির্ভূত হইয়া, তাহাকে শরীর রক্ষার্থ চেষ্টা বা কর্ম্ম করিতে বাধ্য করান। সুতরাং আমরা যে আহার অন্বেষণ জন্য কর্ম্ম বা শরীর রক্ষার্থ কর্ম্মকে আমাদের নিজের কর্ম্ম—আমাদের নিজের স্বার্থ মনে করি, বাস্তবিক তাহাও আমরা ঠিক নিজে করি না। তাহাতেও আমরা প্রকৃতির দ্বারা নিয়মিত হই। আমাদের জীবন রক্ষার্থ যে কর্ম্ম, তাহার জন্য আমাদের সহজ জ্ঞান প্রকৃতির দ্বারা পরিচালিত হয়। আহার সংগ্রহে কোন সময়ে

অক্ষম হইলে, মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় পিশাচ বা রাক্ষসে পরিণত হয়, তাহা আমরা দারুণ দুর্ভিক্ষের বিবরণ হইতে জানিতে পারি।"

*   *   *   *   *

"প্রকৃতি যেমন প্রাণকর্ম্ম প্রভৃতি দ্বারা আমাদের জ্ঞানের অপেক্ষা না করিয়া আপনিই আমাদের সংস্কারোপযোগী শরীর গঠন করেন, তেমনই শরীর রক্ষা ও পোষণ জন্য আমাদের জ্ঞানকৃত কর্ম্মেও প্রকৃতি আমাদিগকে নিয়মিত করেন। আমাদের অভাব বোধ ও অভাবজন্য দুঃখানুভূতি এবং সেই অভাব দূর হইলে আমাদের সুখানুভূতি—এই সুখদুঃখানুভূতি দ্বারা প্রকৃতি আমাদিগকে কর্ম্মে নিয়োজিত করেন। শরীর পোষণ জন্য যখন আমাদের খাদ্যের প্রয়োজন হয়, তখন প্রকৃতি ক্ষুধাতৃষ্ণারূপ অভাববোধ বা দুঃখবোধের দ্বারা আমাদের জ্ঞানকে বা ইচ্ছাবৃত্তিকে সেই অভাব দূর করিবার জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত করেন।

প্রকৃতি আমাদের শরীর গঠন ও রক্ষার জন্য কি উপকরণ চাহিতেছেন, জানিতে পারিলে, আমরা সে উপকরণ সংগ্রহে ব্যাপৃত হই। সেই অন্ন প্রভৃতি উপকরণের মধ্যে কোন্ গুলি গ্রহণীয় বা কোন্ গুলি ত্যাজ্য, তাহাও প্রকৃতি সুখদুঃখানুভূতি দ্বারা আমাদের বাছিয়া লইবার অবকাশ দেন।—আবার যখন রসনা ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা আহার বাছিয়া লইয়া গ্রহণ করি, তখন শরীর রক্ষার জন্য যতদূর পর্য্যন্ত আহারের প্রয়োজন, ততদূর পর্য্যন্ত আমরা আহারে সুখ পাই। তাহার পর রসনার তৃপ্তি হয়—ক্ষুধা ও ক্ষুধানিবৃত্তিজনিত দুঃখসুখের বিরাম হয়। সে তৃপ্তি হইতে আহারের প্রয়োজন যে শেষ হইয়াছে,—প্রকৃতির এই ইঙ্গিত আমরা বুঝিতে পারি।

এইরূপে শরীরের পুষ্টি ও পরিণতির জন্য আমাদের কর্ম্মেন্দ্রিয়-পরিচালনের প্রয়োজন হয়—সমস্ত শরীরের মধ্যে গতি বা ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। এজন্য প্রকৃতিবশে বালক ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ি কাজে বা খেলায় এত উত্তেজনা বা এত সুখবোধ করে। এজন্য যুবক ব্যায়ামে আনন্দ বোধ করে। এজন্য নীরোগ ও কর্ম্মক্ষম শরীরে কর্ম্মের উত্তেজনায় আমরা এত স্ফূর্ত্তি পাই। আবার যখন কর্ম্ম করিয়া শরীর ক্ষয় হয়—শক্তি অবসন্ন হয়, যখন শরীরের বা কর্ম্মবৃত্তির বিশ্রাম ও পুনঃ শক্তিসঞ্চয়ের প্রয়োজন হয়, তখন সেই শ্রান্তিহেতু দুঃখ বা অবসাদজ্ঞান দ্বারা প্রকৃতি আমাদিগকে বিরাম জন্য প্রস্তুত করেন, বা নিদ্রারূপে

আবির্ভূতা হইয়া আমাদের বাহ্যজ্ঞান ও কর্ম্মশক্তি হরণ করিয়া ল'ন। এইজন্য পরিমিত নিদ্রায় সুখ হয়।”

*　　*　　*　　*　　*　　*

“অতএব শরীর রক্ষা ও পোষণ জন্য আমাদের শারীরিক সুখদুঃখ জ্ঞানের প্রয়োজন;—আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখবোধেরও প্রয়োজন। সে সুখ দুঃখ জ্ঞান না থাকিলে, আমাদের সংস্পৃষ্ট কোন্ বাহ্য বিষয়কে ত্যাগ করিতে হইবে, কাহাকে বা গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতাম না। অগ্নির সংস্পর্শে তাপরূপ দুঃখবোধ না হইলে, শরীর ভস্মসাৎ হইয়া গেলেও আমরা ভ্রূক্ষেপ করিতাম না। সেইজন্য আমাদের সংস্পৃষ্ট বাহ্য বিষয়ের মধ্যে কাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে, কাহাকে বা গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা কেবল সুখদুঃখানুভূতি দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি। এইজন্য সুখরূপ পারিতোষিক বা পুরস্কার, ও দুঃখরূপ দণ্ডের দ্বারা প্রকৃতি আমাদের ত্যাগ-গ্রহণাত্মক কর্ম্মপথ দেখাইয়া দেন; আমাদের ইচ্ছাবৃত্তিকে পরিচালিত করেন, আমাদের বিকাশের জন্য . শরীর রক্ষণ ও পোষণ কি জন্য কি গ্রহণ করিতে হইবে বা কি ত্যাগ করিতে হইবে, তাহা বুঝাইয়া দেন। এইজন্য সুখদুঃখানুভূতির প্রয়োজন, এইজন্য সুখদুঃখবোধ অবশ্যম্ভাবী। এই সুখদুঃখানুভূতির প্রয়োজন না থাকিলে, বাহ্য বা আন্তর বিষয়ের সহিত, শরীর ও তৎসংস্পৃষ্ট বাহ্য বিষয়ের সহিত সম্পর্কজনিত সুখদুঃখানুভূতির জন্য প্রকৃতি আমাদের সংজ্ঞাবাহী নাড়ী সৃষ্টি করিতেন না। যখন উচ্চশ্রেণীর জীবে চৈতন্য জাগরিত হয়, জ্ঞান বিকাশিত হইতে আরম্ভ হয়, যখন প্রকৃতি ইচ্ছাশক্তিরূপে জীবহৃদয়ে বিকাশিত হন, যখন প্রকৃতি সেই ব্যক্ত ইচ্ছাশক্তির প্রেরণায় জীবকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে প্রবৃত্ত হন,—তখন সুখদুঃখানুভূতির বিকাশ হইতে থাকে, তখনই সুখজ কর্ম্মে ইচ্ছা ও দুঃখজ কর্ম্মে অনিচ্ছা জন্মে,—তখনই সুখজ বিষয় ত্যাগে প্রবৃত্তি জন্মে, তখনই সুখজ বিষয়ে অনুরাগ ও দুঃখজ বিষয়ে দ্বেষ জন্মে, ও এই রাগদ্বেষ হইতে কামক্রোধাদি বৃত্তির বিকাশ হইয়া, জীব সেই বৃত্তিবশে পরিচালিত হইতে থাকে।”—সমাজ ও তাহার আদর্শ, (১০৭-৮ এবং ১৫১-২ পৃষ্ঠা।) যাহা হউক এইরূপে আমরা বুঝিতে পারি যে, শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ জন্য কর্ম্মের নিতান্ত প্রয়োজন। সাধারণতঃ আমরা সুখ দুঃখ, রাগ দ্বেষ, কাম ক্রোধ প্রভৃতি দ্বারা

এই কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হই। কিন্তু ভগবান্ উপদেশ দিয়াছেন যে, এইরূপে প্রকৃতির প্রেরণায় সুখদুঃখাদি দ্বারা অবশ হইয়া পরিচালিত হইবার পরিবর্ত্তে, বুদ্ধিযোগে তাহা অনুষ্ঠেয়। কিরূপে এই সকল কর্ম্ম বুদ্ধিযোগে অনুষ্ঠিত হইতে পারে, তাহা ভগবান্ বলিয়া দিয়াছেন।

পঞ্চম কারণ—যজ্ঞার্থ কর্ম্মানুষ্ঠানই তাহার উপায়। যজ্ঞার্থ কর্ম্ম না করিয়া যদি শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ জন্য স্বার্থবুদ্ধিতে সকামভাবে রাগ দ্বেষাদি দ্বারা পরিচালিত হইয়া সে কর্ম্ম করা যায়, তবে তাহা বন্ধনের কারণ হয়। কিন্তু যজ্ঞার্থ কর্ম্মানুষ্ঠানপূর্ব্বক সেই যজ্ঞাবশেষ ভোজনাদি দ্বারা শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিলে, আর সে কর্ম্মে বন্ধন হয় না।

এই যজ্ঞার্থ কর্ম্মতত্ত্ব পূর্ব্বে নবম শ্লোক হইতে ষোড়শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে। ভগবান্ এস্থলে বলিয়াছেন যে, যজ্ঞার্থ কর্ম্ম ব্যতীত অন্যত্র সমুদায় কর্ম্মই বন্ধনের কারণ। কিন্তু পূর্ব্বে (২।৪১-৪৫ শ্লোকে) ভগবান্ বলিয়াছেন যে, যাহারা অজ্ঞানী (অবিপশ্চিৎ) বেদবাদরত, যাহারা কামাত্মা, ও স্বর্গই যাহাদের পরম পুরুষার্থ, তাহাদের বুদ্ধি সমাধিতে বিহিত হয় না। তাহারা স্বর্গ-কামনায় ক্রিয়া-বিশেষ-বহুল ও জন্ম-কর্ম্ম-ফল-প্রদ বৈদিক যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করে। অতএব এই বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠান দ্বারা কামাত্মাগণ যদি সেই কর্ম্মফলে স্বর্গে গতি লাভ করে, ও স্বর্গভোগান্তে আবার পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করে, তবে কিরূপে বলা যায় যে যজ্ঞার্থ কর্ম্ম বন্ধনের কারণ হয় না? এই প্রশ্নের উত্তরে উক্ত হইয়াছে যে, যজ্ঞ যদি সকামভাবে নিজের ইহকালে ভোগসুখ-কামনায় অনুষ্ঠিত হয়, তবেই তাহা বন্ধনের কারণ হয়। আর যদি কেবল 'যজ্ঞের জন্য' অর্থাৎ যজ্ঞ কর্ত্তব্য ভাবিয়া তাহার অনুষ্ঠান জন্য কর্ম্ম করা যায়, তবে তাহা বন্ধনের কারণ হয় না। যজ্ঞের প্রধান প্রয়োজন যাহা, তাহা এই অধ্যায়ে ভগবান্ ইঙ্গিত করিয়াছেন যজ্ঞের মধ্যে দেবযজ্ঞ দ্বারা দেবগণকে ভাবিত করিলে, তাঁহারা বৃষ্টি দ্বারা শস্য উৎপাদন করেন, ও সেই শস্য দ্বারা প্রজার উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয়। ইহা যজ্ঞের এক প্রয়োজন। যজ্ঞ সাধারণভাবে মানবসমাজের রক্ষা ও উন্নতির জন্য প্রয়োজন। যাহা হউক, যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞকর্ত্তার গৌণ প্রয়োজনও সিদ্ধ হয়, যজমানের ইহলোকে সুখসমৃদ্ধিভোগ হয়, শত্রুজয় প্রভৃতি সিদ্ধি হয়, ও পরকালে যজ্ঞকর্ম্মাদিজনিত পুণ্যহেতু স্বর্গভোগ হয়, এবং যজ্ঞাবশিষ্ট

স্বর্গভোগ হয়, এবং যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করায়, যজমান ক্রমে সর্ব্বপাপ হইতেও মুক্ত হ'ন। ইহা গৌণ ফল।

যাহারা সকামী যজমান, তাহারা কেবল যজ্ঞের এই গৌণ ফল দেখিতে পায়। যে প্রকৃতিজ রজোগুণের দ্বারা চালিত হইয়া কামনার বশে, অর্থাৎ ইহ-পরকালে ভোগ সুখের আশায় কর্ম্ম করে, সে কখন নিষ্কামভাবে, কেবল কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিতে পারে না। তাহারা সুধু স্বার্থ ভাবিয়া কর্ম্ম করে, স্বেচ্ছায় পরার্থ কর্ম্ম করিতে পারে না। যজ্ঞ যখন সমগ্র সমাজের হিতের জন্য সমাজের সকলেরই অনুষ্ঠানের প্রয়োজন ছিল, তখন যাঁহারা সমাজের নেতা, তাহাদিগকে সমাজ রক্ষার্থ, এই সকল সকামী সাধারণ লোককে যজ্ঞকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতে হইত। দুই রূপে ইহা সম্ভব ছিল। ভগবান্ বলিয়াছেন যখন সমাজের শ্রেষ্ঠ লোক যেরূপ আচরণ করে সাধারণ লোক তাহার অনুবর্ত্তী হয়। তখন এই সকল শ্রেষ্ঠ লোক, এই যজ্ঞাদি বিহিত কর্ম্ম স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়া, সাধারণ লোককে সেই শ্রৌত যজ্ঞাদি কর্ম্মে ও স্মার্ত্ত ইষ্টপূর্ত্তাদি কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিবেন।

ইহার যাহা দ্বিতীয় উপায়, তাহা ভগবান্ বলেন নাই। বেদেই তাহার ইঙ্গিত আছে। সকামী সাধারণ লোক যখন পরার্থ কর্ম্ম, কর্ত্তব্য কর্ম্ম, অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম—এ সব কিছুই বুঝে না, তখন ইহাদিগকে যজ্ঞের এই প্রয়োজন না বুঝাইয়া, তাহাদের যে এই যজ্ঞফলে স্বর্গলাভ হইবে, ইহ-পরকালে সুখভোগ হইবে, কেবলমাত্র—যজ্ঞের এই গৌণফল মাত্র উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহা-দিগকে পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া সে কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করা কর্ত্তব্য। এই জন্য ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে—"স্বর্গকামো যজেত।" শ্রুতির এই বিধিবাদ যজ্ঞের প্ররোচনা মাত্র। যজ্ঞকালেও যজমানের অভিপ্রায় মত হোতা যে ঋগবেদ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দেবতাগণকে আহ্বান করিতেন, তাহাতেও দেবতাদের নিকট এই সকাম প্রার্থনা বেদ-সংহিতায় প্রায় প্রতি সূক্তেই পাওয়া যায়। ইহার প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া মীমাংসাকারগণ বলিয়াছেন যে, যেমন পীড়িত বালককে ঔষধ খাওয়াইতে হইলে, তাহাকে মিষ্টান্নের লোভ দেখাইতে হয়, ঔষধ সেবনের প্রয়োজন ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ উপদেশে কোন ফল হয় না, সেইরূপ সাধারণ সকাম লোককেও বৈদিক কর্ম্মে প্ররোচনার জন্য, তাহাদের যজ্ঞফলে ইহ-পরকালে সুখ সমৃদ্ধি প্রভৃতির লোভ দেখাইতে হয়,

যজ্ঞের কর্ত্তব্য তাহাদিগকে বুঝাইলে কোন ফল হয় না। এইজন্য বেদে দেবতাদের নিকট নানারূপ প্রার্থনা আছে, যজ্ঞের নানারূপ ফলশ্রুতি আছে। যাহা হউক, এই সকল সকামী লোক যজ্ঞ করিয়া তাহাদের বাসনামত স্বর্গাদি ফল লাভ করে মাত্র। তাহাদের বুদ্ধি সমাধিতে বিহিত হয় না। এজন্য তাহাদের এই যজ্ঞকর্ম্মে বন্ধন হয়।

কিন্তু যাহারা নিষ্কাম, যাহারা কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে কর্ম্ম করিতে পারে, যাহাদের চিত্ত সত্ত্ব-বিবৃদ্ধি-হেতু নির্ম্মল হওয়ায় আর কাম ক্রোধ রাগ দ্বেষ প্রভৃতি দ্বারা চালিত হয় না, ভগবান্ তাহাদের সম্বন্ধেই বলিয়াছেন যে, যদি তাহারা যজ্ঞার্থ কর্ম্ম করে, অর্থাৎ যজ্ঞই কর্ত্তব্য, এই বুদ্ধিতে যজ্ঞার্থ কর্ম্ম করে, তবে তাহাদের আর সে কর্ম্মে বন্ধন হয় না। তাহাদের সম্বন্ধেই ভগবানের এই উপদেশ। তাহারা এই মত অনুসরণ করিয়া যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিবে, অথবা যজ্ঞ করিতে হইবে বলিয়া অর্থাদি ও উপকরণাদি সংগ্রহার্থ কর্ম্ম করিবে, তাহাতে কর্ম্ম-বন্ধন হইবে না, যজ্ঞাবশিষ্টভোজী হইলে শরীরযাত্রারও কোন বাধা হইবে না, অথচ ক্রমে কর্ম্মযোগ অভ্যাস হইবে—চিত্ত শুদ্ধ হইবে।

যাহা হউক, যাহাদের চিত্ত শুদ্ধ হয় নাই বা সম্পূর্ণ সাত্ত্বিক হয় নাই, যাহাদের শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ জন্য কর্ম্মের প্রয়োজন আছে,—এক কথায় যাহাদের স্বার্থবুদ্ধি আছে, তাহারা এইরূপে যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা ক্রমে চিত্তশুদ্ধি লাভ করে। শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ জন্য সকামভাবে যজ্ঞার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে গিয়া ও নিজের স্বার্থ সঙ্কুচিত করিয়া ক্রমে পরার্থ কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত হয়। এজন্য তাহাদের পক্ষে এইরূপ কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে যজ্ঞার্থ কর্ম্ম করা প্রয়োজন, ইহা বুঝিতে পারা যায়।

কিন্তু যাঁহাদের চিত্ত শুদ্ধ, নির্ম্মল, যাঁহারা কাম ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা কি যজ্ঞাদি বিহিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবেন না? যাঁহারা "অকাম, নিষ্কাম, আপ্তকাম, আত্মকাম" (বৃহদারণ্যক, ৪।৪।৬), যাঁহারা আত্মরত, আত্মতৃপ্ত, আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তাঁহাদের ইহপরকালের সুখের জন্য, বা শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ জন্য কোনরূপ কর্ম্মের প্রয়োজন থাকে না, তাঁহাদের নিজের জন্য—স্বার্থের জন্য কোন কর্ম্ম করিতে হয় না। তাঁহাদের কর্ম্ম দ্বারা বা কর্ম্ম ত্যাগ দ্বারা কোন অর্থ বা নিজের প্রয়োজন সিদ্ধি হয় না; অর্থাৎ দেব মনুষ্যাদির মধ্যে স্বার্থ

জন্য তাঁহাদের কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। তাঁহারা নির্যোগক্ষেম,—অর্থাৎ শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ জন্যও কোন বস্তুর সংগ্রহ বা রক্ষা তাঁহাদের প্রয়োজন বোধ হয় না। তাঁহারা সে সম্বন্ধে উদাসীন থাকিলেও এবং কোন চিন্তা না করিলেও, ভগবান্ তাঁহাদের যোগক্ষেম বহন করেন, ইহা ভগবান্ পরে বলিয়াছেন।

তবে কি তাঁহারা যজ্ঞার্থ কর্ম্ম করিবেন না? যাঁহারা উক্তরূপ জ্ঞানী গৃহস্থ, তাঁহারা কি তবে দ্রব্য ত্যাগরূপ যজ্ঞ বা কোনরূপ যজ্ঞ করিবেন না? অথবা যাঁহারা গৃহাশ্রমবিহিত কর্ম্ম শেষ করিয়া বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাও কি তপযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবেন না? ইহার উত্তরে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, সেই সকল জ্ঞানী, আপ্তকাম, আত্মতৃপ্ত ব্যক্তির কোনরূপ স্বার্থ কর্ম্ম না থাকিলেও তাঁহারা অসক্ত হইয়া পরার্থ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সতত অনুষ্ঠান করিবেন, এবং তাহাতেই তাঁহারা পরম শ্রেয় লাভ করিবেন। জ্ঞানযোগীরও কর্ম্মযোগানুষ্ঠান কর্ত্তব্য, যজ্ঞার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান সকলেরই কর্ত্তব্য।

জ্ঞানী যে কেবল যজ্ঞার্থ কর্ম্ম করিবেন, তাহা নহে। যে কর্ম্ম 'কার্য্য' বা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিবেন, পরার্থ তাহাই তিনি আচরণ করিবেন। সেইরূপ 'কার্য্য' কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারাই সংসিদ্ধি লাভ হয়। রাজর্ষি জনকাদি ইহার দৃষ্টান্ত। তাঁহারা জ্ঞানী হইয়াও কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান করিতেন,—'কার্য্য' কর্ম্ম করিতেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদেবেন্দ্র বিজয় বসু।

শ্রীমৎ চৈতন্যদেবের উপদেশ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(৪) মথুরাধাম—পদ্মপুরাণেও মথুরামাহাত্ম্য দৃষ্ট হয়—

অন্যেষু পুণ্যতীর্থেষু মুক্তিরেব মহাফলং।
মুক্তৈঃ প্রার্থ্যাহ বিভক্তি মথুরায়াস্তু লভ্যতে॥

অন্যান্য তীর্থে মুক্তিলাভ হয়, কিন্তু মুক্তের প্রার্থনীয় ভগবদ্ভক্তি মথুরা মণ্ডলে ক্ষণকাল অবস্থিতি করিলেই লাভ হইয়া থাকে।

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই ভাব সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় না বলিয়া, স্থান বিশেষকে ভগবদ্বিভূতিরূপে চিন্তা করিলে, ক্রমে ক্রমে সেই মহাভাব হৃদয়ে উদিত হইতে পারে বলিয়া, ঋষিরা তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন। গীতাতেও ভগবান্ বলিয়াছেন—

যদ্‌যদ্‌বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবং॥

ঐশ্বর্য্যযুক্ত, শ্রীযুক্ত, উৎসাহযুক্ত যাহা কিছু, তাহাই ভগবানের বিভূতি, তাহাই তাঁহার অংশসম্ভূত। তবে সেই কালিন্দীতট-শোভিত, নব-বিকশিত, কদম্ব-কুসুমে অলিকুলগুঞ্জরিত, নিত্য মাধুরীতে অলঙ্কৃত, কানন শোভা নিরীক্ষণ করিলে অভূতপূর্ব্ব প্রেমের উৎস হৃদয়ক্ষেত্রে কেন দেখা যাইবে না? প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যময়ী, পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি কেন জাগ্রত হইবে না?

তাই ভক্ত—"কৃষ্ণলীলা স্থানে করে সর্ব্বদা বসতি"।

(৫) শ্রীমূর্ত্তিশ্রদ্ধায়ে সেবন—শ্রীমূর্ত্তির সেবা ভাগবতেরও অভিমত,—

অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েৎ তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ।
যাবন্ন বেদ স্বহৃদি স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্বস্থিতং॥ ৩।২৯।২৫।

"আমিত সর্ব্বভূতেই অবস্থিত, কিন্তু যে পর্য্যন্ত আমাকে আপনার হৃদয়ে জানিতে না পার, ততদিন স্বকর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া প্রতিমাদিতে আমার অর্চ্চনা কর। মূর্ত্তি উপাসনার উদ্দেশ্য একই। মূর্ত্তির নির্ম্মাণ বৈচিত্র্য এরূপ সুললিত ও এরূপ সুকৌশল, যে তাহার ভিতর দিয়া ঐশী অপ্রকট ভাবে প্রকট হয়।

শ্রীমূর্ত্তি অর্থে অবশ্য বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ত "বহু মূর্ত্যেকমূর্ত্তিকং", সুতরাং যে, যে মূর্ত্তিতে তাঁহাকে ভাবনা করিবে, তিনি তাহার নিকট সেই ভাবেই প্রকট হয়েন। তিনি শ্রীরাধিকার মানরক্ষার্থ কালী মূর্ত্তিতে প্রকট হইয়া এই মূল ভাবটীর আভাষ দিয়াছেন। ভগবান্‌ও গীতায় বলিয়াছেন—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।

অনেকে এইরূপ বিগ্রহে শ্রদ্ধা করিতে পারেন না। তাঁহাদের কর্ত্তব্য ভগবানের দেহ স্বরূপ প্রকৃতির পানে একবার দৃষ্টিপাত করা। অনন্ত মহাসাগরের

বীচি-বিক্ষুব্ধ তরঙ্গায়িত গম্ভীর লহরী মালা দেখিতে দেখিতে কাহার চিত্ত বিরাট ভাবে অনুপ্রাণিত না হয়? অত্যুন্নত আকাশ-চুম্বিত শৈলশ্রেণী দর্শন করিয়া, কাহার প্রাণ আনন্দে উল্লসিত হইয়া সেই বিশ্বাত্মার চরণে অবনত না হয়? সুবর্ণ কিরণ-রঞ্জিত অনন্তনীলিমাময় অপরূপ রূপদর্শনে কাহার হৃদয়তন্ত্রী কি এক "অজানাসুরে" বাজিয়া না উঠে? তাই ঋষিগণ বহু পূর্ব্বেই আকাশ বায়ু জল পৃথিবী নক্ষত্রাদি ভূতগণ, দিক্ সকল, সরিৎ সমুদ্র প্রভৃতি সমস্তই শ্রীমূর্ত্তিজ্ঞানে প্রণাম করিতে বলিয়াছেন।

খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীং চ, জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্।

সরিৎ সমুদ্রাশ্চ হরেঃ শরীরং যৎকিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ॥ ভাগবত ১১।

উপরোক্ত পাঁচটী অঙ্গের যে কোনটী যথোক্ত-ভাবে সাধন করিলে, তদ্দ্বারা প্রকৃত ভক্তি হৃদয়ে জাগ্রত হইতে পারে। তাই যতদিন সেই প্রেম জাগ্রত না হয়, ততদিন ভগবদ্ উদ্দেশ্যে ঐ সকল সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই আর ভয় নাই,—তিনি ত স্পষ্টই বলিয়াছেন—"ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি"। এই অভয় বাণীই ভরসা,—নতুবা আর কেন উপায়ান্তর নাই। আমাদের অবস্থা—

কাম ক্রোধ ছয় জনে   ল'য়ে ফিরে নানা স্থানে
বিষয় ভুঞ্জায় নানামতে।
(আমরাও) হইয়া মায়ার দাস   করি নানা অভিলাষ
তোমার স্মরণ গেল দূরে।
অর্থ লাভ এই আশে   কপট বৈষ্ণব বেশে
ভ্রমিয়া বেড়াই ঘরে ঘরে।
সংসার সাগর ঘোরে   পড়িয়াছি এইবারে
কৃপা ডোরে বান্ধি লহ মোরে।
অধম চণ্ডাল আমি,   দয়ার ঠাকুর তুমি
শুনিয়াছি বৈষ্ণবের মুখে।
এ বড় ভরসা মনে   ফেল ল'য়ে বৃন্দাবনে
বংশীবট যেন দেখি সুখে।
অনিত্য শরীর ধরি,   আপন আপন করি
পাছে আছে শমনের ভয়।

নরোত্তম দাসের মনে প্রাণ কাঁদে রাত্রি দিনে
পাছে ব্রজ প্রাপ্তি নাহি হয়।

তাই এখন হইতে উপায় চিন্তা করিয়া, সবে মিলিয়া বলি,--

হরের্নামৈব হরের্নামৈব হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

(ক্রমশঃ) শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস।

মহামায়া খেলা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসী আসিয়া হেমলতার সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া, তাঁহাকে এক মাসের সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন যে "এই সময়ের মধ্যে ভাবিয়া তোমার কর্ত্তব্য স্থির করিও। আমি মাসান্তে পুনরায় এখানে আসিব।—যদি এই নির্জ্জনে বৃক্ষরাজির স্নিগ্ধ ছায়ায় থাকিতে চাও, তবে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া ভৈরবীর নিকট ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ কর ও তৎসাধনে যত্নবান্ হও। আর যদি গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া বিষয়ের আপাতঃ মাধুরী উপভোগ করিতে চাও, আমি তাহারও ব্যবস্থা করিতে পারি। তোমাকে আমি সঙ্গে লইয়া তোমার শ্বশুরের নিকট লইয়া গিয়া, যথার্থ ঘটনা প্রকাশ করিতে পারি, এবং আশা করা যায়, যে আমার কথায় তিনি বিশ্বাস করিবেন। যাহা তোমার ইচ্ছা, তুমি তাহাই করিতে পার।"

হেমলতা তাই এখনও সেই নির্জ্জন বনে ভৈরবীর সহবাসে বাস করিতেছে। কয়েকদিন মধ্যেই হেমলতার মনে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বনের মধ্যে সে যেন বেশ শান্তির অস্তিত্ব অনুভব করিতেছে। প্রাতঃকালে সে একাকী এই বনমধ্যে পুষ্পচয়নে গমন করিয়া, বহুদূর বিস্তৃত প্রান্তরে চলিয়া যায়, পথশ্রান্তিও যেন অনুভব করে না। নিকটে একটী অত্যুন্নত পর্ব্বতের উপরে গিয়া অনেক দিন ভৈরবীর সঙ্গে, কখনও বা একাকী বসিয়া বসিয়া সে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে।

বাস্তবিক পাহাড়টী অতি মনোরম, নানাবিধ বনজাত দ্রব্য এবং পাদপ ও পুষ্পলতায় পরিপূর্ণ। পাহাড়ের নীচে একটী সুপ্রশস্ত জলাশয়, পর্ব্বতের ঝরণার সহিত যুক্ত থাকায় সর্ব্বদাই পূর্ণ থাকে। জলাশয়ে কমল কুমুদ কুবলয় কহ্লার ও নীলোৎপলের শোভা অপূর্ব্ব। এক একদিন হেমলতা এই জলাশয়ের তীরেও বসিয়া থাকে। জলাশয়ে জলচর পক্ষিকুলের কাকলী, বনস্থলের নীরবতা অনেক সময়ে ভাঙ্গিয়া দেয়। তটবর্ত্তী তরুরাজির শাখাপল্লব যখন সেই পবিত্র সমীরণ স্পর্শে বিচলিত হয়, নানাবিধ বন্যজন্তু সমূহ যখন পরস্পর হিংসা দ্বেষ ভুলিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে, হেমলতা তখন ভাবে যে এই স্থান যেন ভূস্বর্গ, এখানে যেন সুখ শান্তি মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজ করিতেছে।

পাহাড়ের চতুর্দ্দিকের নিম্নস্থ সেই নবজলধর শ্যামল রূপ, ও বহুদূরে চতুর্দ্দিকে ধান্যের হরিত ক্ষেত্র দেখিতে দেখিতে হেমলতা আপনাকেও বিস্মৃত হইয়া যায়, পর্ব্বতস্থ লতাযুক্ত বিটপী শাখা-নিচয়, পুষ্প ও ফলের স্তবকে এবং কোমল কিশলয়-ভরে অবনত হইয়া এরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে, যে চিত্ত ও ইন্দ্রিয়গণ আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠে।

দুই তিনটী ঝরণা সেই পাহাড়টী হইতে বহির্গত হইয়াছে। সেই ঝরণার জল ও পাহাড়ীয় ফলগুলি অতি উপাদেয়। প্রথম প্রথম দুই এক দিন এই নির্জ্জন অরণ্য মধ্যে হেমলতা কিরূপে থাকিবে এ চিন্তা যে মনে থাকিত না এরূপ নয়। মধ্যে মধ্যে কি একটা উদ্বেগও অনুভব করিত। সেই লোকালয়ের জনসমাজ, গৃহ, অট্টালিকা, আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব, পরিত্যাগ করিয়া এরূপ স্থানে কালযাপনের কল্পনা একটু কষ্টকর। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার মন পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। একে এই সৌন্দর্য্যময়ী প্রকৃতি, তাহাতে সেই ব্রহ্ম-চারিণী ভৈরবীর চিত্তবিমোদন প্রেম সম্ভাষণ, তাহাকে যেন তথায় বাস করিবার পক্ষপাতী করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভৈরবী হেমলতাকে ভগিনীর ন্যায় স্নেহ করে, কত সুন্দর সুন্দর পৌরাণিক উপাখ্যান শুনায় ও দুইজনে বনে বনে ফল মূলাদি আহরণ করে।

একদিন ঐ পাহাড়ের উপরে উভয়ে বসিয়া আছে। পশ্চিম গগনে দিনমণি অস্তাচল গমনোন্মুখ, ম্লান কিরণে কাঞ্চনাভা মিশ্রিত দ্রুমদলশোভিনী বনরাজির শোভা অতীব অপূর্ব্ব। স্পর্শ-শীতল নৈদাঘ সমীরণ বহিয়া বহিয়া তাহাদের

শ্রান্তি অপহরণ করিতেছে। প্রকৃতির এই শান্ত চিত্র দেখিতে দেখিতে উভয়েই যেন কতকটা আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছে। ক্ষণেক পরে হেমলতা ডাকিল—"দিদি"! হেমলতা ভৈরবীকে দিদি বলিযাই ডাকে, ভৈরবী বলিল কি বলিতেছ?

হেম। দিদি তোমার একলা এইবনে থাকৃতে কোন কষ্ট হয়না—ভয় হয়না?

ভৈরবী। না বোন্, আমার ভয় হয়না, আর কষ্টও হয়না। আমাকে বাবা কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। আমি এই বনেই ছেলে বেলা হ'তে এত বড় হয়েছি। তাহার পর তিনি এই পূজার ভার আমার উপর দিয়ে গিয়েছেন, এখন মধ্যে মধ্যে আসেন। ছেলে বেলা হ'তে এই বনের গাছগুলো আমার সহচর কিনা, তাই সেগুলোর সঙ্গে থাকি ভাল।

হেমলতা। তাহ'লে তোমার পিতা ছাড়া আর বেশী লোকজন তুমি দেখ নাই, কেমন?

ভৈরবী। তা'কেন হবে। বাবা আমাকে নিয়ে কত তীর্থ দেখিয়ে এনেছেন। বাবার কত ছেলে, কত যায়গায়, এইরূপ সেবায় ব্রতী আছে। বাবা মধ্যে মধ্যে এখানে আসেন। দেখ্লেনা সেদিন তোমার জন্য, একজন এসে কাপড় দিয়ে গেল। এ সব কথা জিজ্ঞেস কচ্ছ কেন?

হেমলতা। আমার ত প্রথমে একটু বাধ বাধ ঠেক্‌ছিল, যেন একা থাকৃতে পার্‌বনা, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আমি যেন বেশ আছি, আর আমার যাওয়ার জায়গাই বা কোথায়?

ভৈরবী। কেন, বাবা বলেছেন যে, তোমার শ্বশুর বাড়ী রেখে আস্‌বেন।

হেমলতা। সেখানেই বা সুখ কি? যার স্বামী নাই, তার জীবনের সুখ শান্তি কোথায়?

ভৈরবী। সে সব কথা জানিনা, তবে বাবা শিখিয়েছেন যে সুখ দুঃখের হিসাব নিকাশ কর্‌তে যেওনা। তাই ওসব কথা মনেও ভাবিনা। তিনি গান শিখিয়েছেন—

গাও শুধু সবে তাঁহারি জয়।
দুঃখের কান্না, সুখের উল্লাস, তাঁহারি মহিমা গায়
তবে আর কেন দৈন্য-ভাবনা, কেন আর মিছে ভয়।

হেমলতা। ও সব কথা আমরা বুঝব কি করে, আমরা অতিশয় হতভাগ্য।

ভৈরবী। যাক ও সব কথা। একমাস ত' হ'য়ে এল; কি ঠিক কর্‌লে?

হেমলতা। কি আর ঠিক করবো? আমার মন এই খানেই থাক্‌তে চায়। তোমার স্নেহ পেয়ে, আমি জীবনে একটা নূতন সুখের আস্বাদ পেয়েছি। আমরা ঘর সংসারে ভাই বোন ছাড়া আর কাহাকেও ভাল বাসিতে জানিনা। তোমার এই অকৃত্রিম স্নেহ, আমার কাছে নূতন জিনিষ। আর এই সৌন্দর্য্য দেখ্‌তে দেখ্‌তে মন বিবশ হয়ে যায়। দেখনা দিদি কেমন চাঁদ উঠেছে; ঐ চাঁদের আলো ঐ ঝরনার জলে প'ড়ে কেমন শোভা হয়েছে। ঐ পাহাড়গুলোর উপর জল কেমন উছলিয়ে উঠ্‌ছে।

ভৈরবী। আরও কত শোভা দেখ্‌তে পাবি! এ দেবস্থান; এর শোভা অতি অপূর্ব্ব। এমন শান্তিময় স্থানে থাক্‌তে, কা'র প্রাণ না চায়। চল আমাদের যাওয়ার সময় হয়েছে; তুমি থাক্‌লে আমিও বেশ থাকি; তোমার মত সঙ্গিনী পেলে আমি বড় সুখী হই।

হেমলতা। আমারও ইচ্ছা তোমার সঙ্গে থাকি; এখানে থাক্‌লে প্রাণের জ্বালা জুড়ায়।

এইরূপ নানাবিধ কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে তাঁহারা মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এদিকেও আরতির সময় হইল। (ক্রমশঃ)

ঔপনিষদিক দর্শন ও যোগমায়া।

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবং॥

একদিন উপনিষদ্ পড়িতে পড়িতে দেখিলাম—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যো শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো, আত্মনি খলু অরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে, সর্ব্বমিদং বিদিতম্ ভবতি" এই কথাটী পুনঃ পুনঃ ঘোষিত হইয়াছে। সনাতন ঋষিদিগের হোমশিখাপূত শ্রান্তপাদপ আশ্রমের ভিতর দিয়া যেন, বিশ্ব মানবের করুণ ক্রন্দনের সুর ছাপাইয়া, তরুপল্লব, অনল, অনিল, মর্ম্মরিত করিয়া গুরুগম্ভীর স্বরে ধ্বনি উঠিতেছে—"ওরে জীব। আজ তোমার সকল দুঃখের আত্যন্তিক "অবসান হইল;—আজ চিদানন্দময়ের অমৃত বাণীর সন্ধান আমরা পেয়েছি;—আজ

"তোমার "দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বরষ—মাসের" পর, প্রাণপতির দূত এসে
"তোমার দ্বারে উপস্থিত। তুমি যে তাঁ'র বঁধুয়া—তুমি যে তাঁ'রই; তাই আজ জান।
"আজি আপনার স্বরূপ চিনিয়া লও। তাহ'লে তোমার জান্‌তে শুন্‌তে কিছুই বাকী
"থাক্‌বেনা। তুমি আত্ম-স্বরূপ অবগত হইয়া, সেই চিদানন্দ সাগরে ভাসমান হও।
"তোমার হারানিধি, তোমারই 'আমি'-চৈতন্যের ভিতর রহিয়াছে; তোমারই জগতে
"আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তুমি একবার অপরূপকে নয়ন মেলে দেখে
"নাও, জেনে নাও, ভেবে নাও,—তুমি "সেই" কিনা, তুমি তাঁ'রি কিনা। তুমি
"জেনে নাও, তুমি যে তাঁ'রি সন্ধানে আজ কতকাল ধ'রে ঘুরিতেছ,—সে যে
"কোন সকালে" তোমায় ডাক দিয়েছে, —তুমি এতবেলা পর্য্যন্ত ঘরের দুয়ার রুদ্ধ
করিয়া, অর্গল আটিয়া কেন বসিয়া রহিয়াছ, কেন জাগিয়া ঘুমাইতেছ।" অমনি যেন
Light on the Path (মার্গ প্রকাশিনী)-গাহিয়া উঠিল, Seek out the way
(সর্ব্বভাবে, জগৎভাবে আত্মান্বেষণ কর), *Seek the way by* retreating
within (আমিরূপ প্রবণতার মধ্যে, হৃদয়ে মার্গ অন্বেষণ কর), Seek the
way by advancing boldly without (জীব ও জগৎভাবের অতিগ
পরাভাবে আসিয়া আত্মার পদচিহ্নের অনুসরণ কর)।"

"আজি যে বিশ্বের প্রাণের জীবন-প্রবাহের ভিতর দিয়া কি এক
অনির্ব্বচনীয় সুর বাজিয়া উঠিতেছে;—ও কি আজিকার সুর! ঐ সুরের,
ঐ ভাষার মর্ম্মবোধ করিবে, বলিয়া তুমি সৃষ্টির প্রথম উষায়, কি যেন
কি ভাবে প্রকট হইয়াছিলে। পরে ধাতু হইতে উদ্ভিজ্জে উঠিয়াছ;—তার পর
উদ্ভিজ্জ হইতে বিভিন্ন বিভিন্ন প্রাণী হইয়া জন্মিয়াছ; আর আজি মানুষ
হইয়াও সে সুরের প্রাণারাম আকর্ষণের বিশ্রাম নাই। ঐ বিশ্বাতিগ আদি
অন্তহীন সুর, অনন্ত কাল ধরিয়া তোমায় ডাকিতেছে "বিরহিণি! আয়রে আয়
তো'রে বুকে করিয়া প্রাণ জুড়াই"। তুমি ফুটিতে ফুটিতে, বিকশিত হইতে
হইতে অগ্রসর হইতেছ; কিন্তু তোমার ত দিক্ নির্ণয় হয় নাই। আজ তুমি আর
জড়াবরণে বদ্ধ নও বটে, আজ তোমার ভিতর দিয়া চৈতন্যের স্ফুর্ত্তি হইতেছে,
কিন্তু এখনও ঐ সুরের মর্ম্ম বুঝিতে পার নাই। এস জীব-চৈতন্য! আজ
বিশ্বপ্রাণের বুকে এস। কৈ তুমি যে তোমার অহঙ্কারের গণ্ডী এখনও ছাড়িয়া
আসিতে চাহিতেছনা;—কি চাহিয়া বনে বনে ভ্রমিতেছ?

"আমি নইরে দূরে, রয়েছি অন্তরে, বারেক চাহিয়া দেখনা।
তুমি, দূর বোধে সদা ভাবিছ আমাকে আমি যে ডাকি তা' শোননা॥"

"আমি যে তোমার ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সুখ, দুঃখ, পাপ, পুণ্য, সকল কাজের, সকল ভাবের ভিতর দিয়া তোমায় অহ্বান করিতেছি। তুমি কি ভাবিয়া আপনাকে বিশিষ্ট-ভাবে আট্‌কাইয়া ধরিয়া রহিয়াছ?

"তিল আধ দুঃখ, জনম ভরি সুখ,
ইথে কাহে ধনি, তুঁহু মোড়সি মুখ?"　(বিদ্যাপতি।)

হায়, মানব! কবে তোমার সে দিন হইবে, যে দিন তুমি প্রাণারামের প্রেমের আহ্বান বুঝিতে পারিবে।

করুণার-নিধি ঋষির প্রাণের ভিতর কাঁদিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "ওরে জীব! তুমি কি খুঁজ্‌ছ, কি জান্‌ছ, কি চাইছ, কি শুন্‌ছ! তোমার যে একটী বই আর চাওয়ার নাই, একটী বই শোনার নাই, একটী বই আর জানা'র নাই; যা' জান'লে তুমি সকল জ্ঞানকে জানবে, সকল চাওযার, সকল পাওয়ার সেরা, একটী পাইবে,—যা' চাইলে আর চাইতে হয়না, যাহা আস্বাদ করিলে, আর ক্ষুধায় জ্বালাতন হয় না, যা' দেখলে সব দেখা হয়ে যায়—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

"জীব! তাঁ'রি প্রাণে সকল প্রাণিত হয়েছে, তাঁ'রি আলোকে সকল উদ্ভাসিত, তিনিই উর্দ্ধে, অধে, পুরস্তাৎ, পশ্চাৎ, আবার তিনিই তোমার হৃদয়াকাশে সঞ্চরণ করিতেছেন, তুমি তা'ই দেখ, এই শুন তাঁ'রি কথা, ঐ ভাব ভাবিতে একতান প্রবাহে ভাবিয়া যাও।

যাও—চৈতন্যসাগরে চৈতন্যময়ের লীলা-কৈবল্যের সাথী হও॥

যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি যে সময় মৈত্রেয়ীকে উপদেশ কচ্ছেন, যে "তুমি আত্মাকেই জান্‌লে অমৃতের অধিকারী হ'বে" সে সময় ঐ কথাই নানা বিচিত্র ভাবে বলেছেন,—যে তাঁ'কে এমনি করে দেখেতে হয়, এমনি করে শুনতে হয়, এমনি করে ভাবতে হয়। সে কেমন করে? সর্ব্বাত্ম-ভাবে। সে কেমন?

"ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি আত্মনস্তু কামায় জায়া

প্রিয়া ভবতি, ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবতি আত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবতি, ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি আত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয় ভবতি.........ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি ॥"

এই যে পুত্রের ভিতর দিয়া, পতির ভিতর দিয়া, পত্নীর ভিতর দিয়া, বিষয়ের ভিতর দিয়া, কি এক মোহন সুর তোমায় টানিতেছে; যার টানে তুমি অনেক সময় আপন হারা হইয়া ভাসিয়া যাও,—তোমার গণ্ডী-দেওয়া ক্ষুদ্র 'আমিতে' তুমি আর নিজকে ধরিয়া রাখিতে পার না,—সেই মোহন মন্ত্র, সেই মধুর স্বর তোমার কাছে কেন মধুর তাহা জান কি? ঐ পত্নী, পুত্র, বিষয়ের ভিতর দিয়ে চির নূতন "আত্মা'র প্রকাশ বলে, তোমার আত্মার অন্তর্নিহিত স্বভাবের স্ফূর্ত্তি হয় বলে, তুমি জগৎ কোটির সহিত তোমার একাত্ম ভাব অনুভব কর বলে, ঐ খানে তুমি পরের "আমি"টাতেও নিজের "আমি" দেখতে পাও বলে, তাই তুমি তা'দের ভালবাস। তুমি তোমার আসল "আমি"কে, সর্ব্ব-"আমি"কে ভালবাস বলেই,—তা'কে ভাল না বেসে থাকতে পারনা বলেই,—তুমি প্রকৃত আত্মারাম বলেই, বিষয়কে ভালবাস, আত্মস্বরূপের যে যে আধার দিয়ে অভিব্যক্তি হয় তা সবকেই তুমি ভালবাস। এই আত্মার সাড়া পা'বে বলে, যখন তুমি তোমার ক্ষুদ্র 'আমি'টার মোহ ছাড়িতে শিখিবে, আমিকে পাইবার জন্য যখন তুমি "নেতি নেতি" করে তাঁ'র দিকে ছুটবে, দেখিবে একদিন "নহি এতস্মাৎ ব্রহ্মণঃ ব্যতিরিক্ত-মস্তি" (শঙ্করাচার্য্য,—ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য) "এই ব্রহ্ম থেকে, এই আত্মা থেকে, অতিরিক্ত কিছু নাই।" স্বতন্ত্র—যেথানেই দেখ সেই খানেই তোমার মায়া, সেই খানেই তোমার সুখদুঃখমোহ—স্বপ্ন মায়া—

"মৃত্যু, সে ধরে মৃত্যুর রূপ, দুঃখ, সে হয় দুঃখের কূপ
তোমা হ'তে যবে স্বতন্ত্র হ'য়ে আপনার পানে চাই। ('নৈবেদ্য'—রবীন্দ্র)

সেই আমি যাঁকে তুমি খুঁজছ,—তিনি নানাবেশে নানাভাবে, অরূপ হয়েও তোমার কাছে অপরূপ হয়ে দেখা দিচ্ছেন।

"আমি তোমার সর্ব্বস্ব ধন এ সংসারে।
স্বামী পুত্র, পিতা মাতা, ভিন্ন ভিন্ন আকারে॥"

স্ত্রী, পুত্র, পিতা, মাতা, বিষয়, সম্পদ্, সকলের ভিতর দিয়া, নানারসে অভিব্যক্ত

হয়ে, তোমার সহিত মধুর সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তোমার সহিত খেলা কর্‌বে বলে, সে যেন আড় নয়নে উঁকি মারছে,—তোমার পানে হাসি মুখে তাকাচ্ছে। ঐ যে বিষয়ের ভিতর হতে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ নানারূপে নানাভাবে তোমায় মুগ্ধ ক'চ্ছে, ঐ আকর্ষণও তাঁ'রই আকর্ষণ, ওই ছবি, তাঁ'রই অপরূপ ছবি। তুমি মূঢ়, নিজের অজ্ঞানানুযায়ী 'পছন্দ অপছন্দের' সৃষ্টি করিয়াছ ; তাই তুমি সেই আকর্ষণকে,—যে আকর্ষণের টানে "রবি হতে গ্রহে ছুটিছে প্রেম, গ্রহ হ'তে গ্রহে ছাইছে"—ভেদভাবে অনুবাদ করে, তঁ'াকে ছোট করে, বিশিষ্টরূপ, বিশিষ্ট-রস, বিশিষ্ট শব্দ রূপে গ্রহণ কব। এই যে বিশিষ্টরূপ, স্বতন্ত্র ভাবেব বস্তুজ্ঞান, ইহাই মায়া বিজৃম্ভিত, ইহাই মোহ। ইহাই আসিবাব পথে অর্গল হয়ে দাঁড়ায় ; ইহাই নানা দুঃখের আকর। পুত্র, পিতা, পত্নী, পতি, বিষয়, সম্পদ,—সকলের ভিতর দিয়ে, তিনি যে কি অপরূপ ভাবে প্রকাশিত হ'চ্ছেন,—তোমার অন্তরের অন্তরের আনন্দামৃতরস-চক্ষে দেখবার জন্য যে তিনি নানা ভাবে নানারূপ ধরে "আকুলি বিকুলি" করে, যেন তোমার অঙ্গে অঙ্গে জড়াইতেছেন, ইহাই দেখিতে হইবে, ইহাই বুঝিতে হইবে। তবেই সর্ব্বাত্ম ভাবের স্ফুরণ হইতে পারে। তবেই তুমি ভক্ত-প্রবর রামপ্রসাদেব সুরে বলিতে পাবিবে—

"শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কব মাকে ধ্যান
(ওবে) নগর ফির, মনে কর প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে॥
যত শুন কর্ণপুটে, সবই মায়েব মন্ত্র বটে
কালী পঞ্চাশদ্বর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে নাম ধবে॥
কৌতুকে বামপ্রসাদ রটে, ব্রহ্মময়ী "সর্ব্ব" ঘটে
(ওবে) আহাব কর, মনে কব আহুতি দিই শ্যামা মারে॥"

এই সর্ব্বাত্ম ভাবের "ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা"র কথা বলিতে গিয়া, ঋষি পুনরায় বলিয়াছেন "সর্ব্বং তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বং বেদ", যে "সর্ব্ব"কে, আত্মা"কে আত্মা হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া দেখে, "সর্ব্ব" তা'কেই পরাভূত করেন। সর্ব্ব শব্দে, যে বিশ্বাত্বিগ্‌ একত্ব না দেখিয়া, কেবল বিশিষ্টতার সংগ্রহ বা সমষ্টি দেখে, যে বস্তুতে ভগবদ্ভাবের ব্যঞ্জনা না দেখে' বিশিষ্ট রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ শব্দের মোহে মুগ্ধ হয়—সে সেই "অমৃত পরশ" হ'তে বঞ্চিত, বস্তু তা'কেই বাধা দেয়। সাধনার সময় "বাহ্য" জ্ঞান বা 'প্রকৃতি'রূপে, তা'কেই নানা প্রকারে বিক্ষিপ্ত করে। কারণ সে

বস্তুকে মিলাইতে, এক করিতে, শিখে নাই। যেখানে দ্বৈত, সেখানেই একটা অন্যটাকে বাধা দেয়···"যত্র তু সর্ব্বং আত্মৈবাভূত তৎ কেন কং পশ্যেৎ, কেন কং অভিবদেত" ইত্যাদি। এই যে একরস, একায়ন, সর্ব্বাশ্রয় বা সর্ব্বাধার রূপে বোধ,—সবই যে তাঁ'রি অস্তিত্বে গরীয়ান্, তাঁ'রি মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে, তাঁ'রি অধিষ্ঠানে প্রকাশিত হয়েছে—তাঁ'রই যেন এক প্রকাব ভাবসমষ্টি তত্ত্বরূপে ব্যক্ত হইতেছে—এই যে বোধ, ইহাই সর্ব্বাত্ম বোধ, ইহাই সর্ব্বাত্ম ভাব।

এই সর্ব্বাত্ম ভাবের সাধনা করিতে করিতে, জীব যখন বিভোর হইয়া যায়, তখন তা'র আর রূপ দেখিয়া বিশিষ্টরূপ জ্ঞান হয় না। তখন সে রূপের ভিতর এক-রস জীব-ঘন বিশ্বরূপকে দেখিতে পায়। রস আস্বাদ করিয়া আর সে মোহ প্রাপ্ত হয় না;—তাহার ক্ষুদ্র আমির "আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি" তখন চলিয়া যায়,—তখন রসের ভিতর সে সর্ব্ব বসকে আস্বাদন করে। তখন সে এমন একটী ভাবেতে মজিয়া থাকে, যে তটিনীব কল্লোলে, বাযুর হিল্লোলে, সাগরেব গর্জ্জনে, আকাশের খোলা বুকে, মেঘের নীলিমায়, প্রকৃতিব সর্ব্ববিধ বৈচিত্র্যে, মানুষের পাপে পুণ্যে, কর্ম্মে বিকর্ম্মে,—সর্ব্বত্র মহানেব একটী মহা ভাবেব অপরূপ বেশ,—বিচিত্র ভাবে অভিব্যক্তি, 'আকুলি বিকুলি', দেখিতে পায়। তখন সর্ব্বত্র তাহাব কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হয়; তখন শ্রীরাধা বা শ্রীগৌবাঙ্গের মত মেঘ দেখিয়া তার 'নব নীল-নীরদ-শ্যাম-কলেবর' মনে পড়ে, তখন শ্রীকৃষ্ণ ভাবিয়া যে বৃক্ষ লতা জীবজন্তু সকলকেই আলিঙ্গন করে। তখন,—

"কে যেন সেদিন আঁখি-তাবকায়, মোহন তুলিকা বুলাইয়া যায়, সুন্দর ভব, সুন্দর সব, সুন্দর পশু পাখী"

তখন,—"রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি",—তখন সে আর "নানা" দেখেনা—"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন",—তখন সে আব ক্ষুদ্র আমিত্বের সুখ দুঃখের ডোরে আবদ্ধ হয়না,—তখন বস্তু আব তা'কে বাধা দেয়না। তখন "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন", তখন তাব আর "কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ভয়।"

তাই সকল যে আনন্দময়ীর আগমনোল্লাসে, বিশ্বার সর্ব্বাত্মিকা স্রোতে বিশ্ব ছাইয়া গিয়াছে, এ সময় হৃদয়ের কপাট একবাব উন্মুক্ত করে, আনন্দ-আলোক সাগরে ভেসে যাও। মা যোগমায়ে! তুমি কাহার বারতা বহন

করিয়া আনিয়াছিলে। মা! তুমি বারে বারে ত' আইস। কি সুর, কি ঝঙ্কার, কি রব নিয়ে এস! একবার বলে দাও! মা! তুমি ত নিত্যই এই হৃদয়ের রুদ্ধ দুয়ারে আঘাত করিতেছ, আমরা ত' সাড়া পাই না। একবার জাগাও; আমাদের অন্তরের অন্তরে সে সুর নীরব হইয়া রহিয়াছে। তুমি তা'কে জাগাইয়া দাও, আমাদের চোখের ঠুলি খুলিয়া দাও;—যেন উন্মুক্ত আকাশে পক্ষীর মত উধাও হ'য়ে আমরা আনন্দ সাগরে ভাসিয়া যাই। এই বিশ্ব যে সুরের জন্য অবিরাম ছুটিতেছে,—বিশ্বনাথের সেই প্রাণোন্মাদিনী বিজন ধ্বনি আমাদের শুনাও। আনন্দময়ি ব্রহ্মবাদিনি! এস, মা—বেদমাতা গায়ত্রি! মা বিশ্বের 'সর্ব্ব'-নাশিনি! মহাকালি! সেই বেদের ধ্বনি শুনাও যাতে, আর এই ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর স্বরূপ বোধ হারাইয়া স্বখাদ সলিলে ডুবে না মরি। মা করুণাময়ি! তুমি নিত্যই আসিতেছ, তুমি ত নিত্যই এ দীনের কুটীর দ্বারে দাঁড়ায়ে হাতটী বাড়া'য়ে ডাকিছ! আমি যে ঘুমাইয়া আছি, আমি যে তোমার স্নেহভরা ভাবের মহিমা বুঝি নাই মা! আমার এ মোহ ঘুম ভাঙ্গাও—আমাকে 'আমি' ছেড়ে দিতে শিখাও,—জাগিয়ে নিয়ে অমৃত ক্ষীর ধারা খাইয়ে আমায় সঞ্জীবিত কর, মা!

শ্রীপ্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(ক্রমশঃ)

দাক্ষিণাত্যে তীর্থ দর্শন।

চিদম্বরম্ মন্দিরের কথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

চিদম্বরমের মন্দির দাক্ষিণাত্যের শৈব মন্দিরের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। দক্ষিণ ভারতের এবং সিংহলের হিন্দুগণ এখানে দলে দলে আসিয়া থাকেন। প্রাচীন তামিল ভাষায় মহিমা বর্ণনাসূচক অসংখ্য গীত ও কবিতা প্রচলিত আছে। দাক্ষিণাত্যের ভিক্ষুকগণ নানাস্থানে শিব-মাহাত্ম্য সূচক এই অপূর্ব্ব সঙ্গীত গুলি গাহিয়া বেড়ায়। পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত ভবানীশঙ্কর গণেশ মহোদয়ের নিকট শুনিয়াছি যে চিদম্বরমের মন্দির যোগশাস্ত্র প্রচারক মহর্ষি পাতঞ্জলি

কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। স্মরণাতীত কাল হইতে দাক্ষিণাত্যেও এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। ইহা এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত, যে যোগপন্থীগণ এই মন্দির ও মন্দিরের অঙ্কিত চিত্রাদির সাহায্যে সহজেই যোগশাস্ত্রের এবং যোগীর ধ্যানগম্য পরমার্থ তত্ত্বের অনেক সঙ্কেত ও রহস্য অবগত হইতে পারেন; এবং যোগশাস্ত্রের উপদেশ দিবার জন্যই এই মন্দির নির্ম্মিত। কেহ কেহ বলেন, 'ব্যাঘ্রপাদ' পতঞ্জলিরই নামান্তর। যাহা হউক এ বিষয়ে আমরা অনধিকারী। শুনিতে পাই কালে নাটকটি বণিক কর্ত্তৃক মেবামত সময়ে মন্দিরের নানারূপ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হইয়াছে; সুতবাং প্রাচীন মন্দির কিরূপ ছিল তাহা এখন স্থির করা সুকঠিন। যাহা হউক চিদম্বরমের প্রাচীন মন্দিরাবলী অতি বিশাল। ইংরাজ পবিব্রাজকগণও বলেন যে এই মন্দির অতি প্রাচীন ও ইহার শিল্পচাতুর্য্য অতি মনোবম। Hand-Book of Madrasএর গ্রন্থকর্ত্তা E. B. Eastwiese বলেন, The Pagodas of Chidambaram are the oldest in the South India and portions of them are gems of art. সমস্ত হাতাটী পরিদর্শন কবিতে ৩।৪ ঘণ্টা সময় লাগে। চিদম্বরমের মন্দিরের হাতা, দুর্গের ন্যায় প্রায় ত্রিশ ফিট উচ্চ তিনটী প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। বহিঃ প্রাকাবের চাবিদিকে চারটী বৃহৎ দ্বাব; দাক্ষিণাত্য রীত্যনুসারে প্রত্যেক দ্বারের উপর উচ্চ গোপুবম বা দ্বাব। Indian Architecture প্রণেতা Ferguson সাহেব বলেন, চিদম্বরমের মন্দির দাক্ষিণাত্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পূজিত এবং প্রাচীন। এই প্রস্তব বেষ্টিত বিশাল মন্দির প্রাঙ্গণ অধিকার করিয়া কর্ণাটিক যুদ্ধের সময় কখনও বা ইংরাজ, কখনও ফবাসিরা, কখনও বা হায়দার আলি, সৈন্য সমাবেশ করিতেন। দক্ষিণ দ্বাবের উভয় পার্শ্বে পূজোপকরণের অপান শ্রেণী, এবং দ্বার সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে বিঘ্নবিনাশন গণপতির বিশাল মূর্ত্তি। এরূপ বিশাল গণেশমূর্ত্তি আমরা কখনও দেখি নাই। বহিঃ প্রকোষ্ঠের দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া তিনটী চত্বর অতিক্রম করিয়া, নটরাজের মন্দির। বহিঃ প্রাকারের চতুস্পার্শে রথ চলার জন্য প্রায় ৬০ ফিট প্রশস্ত রাস্তা। মন্দিরের বহিঃ প্রাকারের বাহিরটা যেন বর্হি জগৎ বা ভূর্লোক; এই চত্বরেই হেম পুষ্করিণী তীর্থ। তৃতীয় চত্বর যেন সুষুপ্তি অবস্থা বা স্বর্লোক এবং মন্দিরাভ্যন্তর তুরীয়া অবস্থার ইঙ্গিত করিতেছে। আর আকাশরূপীর

মন্দিরটী যেন তুরীয়াতীতের বোধক। মূল মন্দিরটীর উপরিভাগ স্বুবর্ণ মণ্ডিত। ইহারই নাম 'কনক সভা'।

'হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলন্।' ঐ কনক খচিত মন্দির "হিরণ্ময় কোষ" ইঙ্গিত করিতেছে। হিরণ্ময় কোষে নিষ্কল নিরাকার ব্রহ্ম বিরাজমান। মন্দিরের বহিঃ প্রাচীর উত্তর দক্ষিণে ১৮০০ ফুট এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে ১৪৮০ ফুট লম্ব। আমরা যে ছত্রে অবস্থান করিয়াছিলাম, উত্তর দ্বার তাহার সন্নিকট এবং তীর্থ সরোবরে স্নান করিয়া দেবদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে আমরা উত্তর দ্বার দিয়া প্রবেশ করতঃ প্রথমে শিবগঙ্গা বা হেমতীর্থেব্রাহ্মণমুলে সংকল্প পাঠ করতঃ তীর্থ স্নান করিলাম, হেথায় শ্বেতবর্ণ 'ব্যাঘ্রপাদ' মহর্ষির আদেশে স্নান করিয়া কুষ্ঠব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। এই সরোবরটী ৩১৫ ফুট লম্বা এবং ১৮০ ফুট প্রস্থ। চারিদিকে উত্তমরূপে প্রস্তর দ্বারা ঘাট বাঁধান এবং কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির এবং মণ্ডপ, ঘাটের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। এই সরোবরের পূর্ব্বদিকে প্রসিদ্ধ সহস্রস্তম্ভ-মণ্ডপ এবং পশ্চিমদিকে পার্ব্বতী দেবীর অতি সুন্দর কারুকার্য্য খচিত মন্দির ; এবং তাহার উত্তরে সুব্রহ্মণ্য বা কার্ত্তিকেয় দেবের মন্দির। কার্ত্তিকের মন্দিরের সম্মুখে একটী বৃহৎ প্রস্তর বিনির্ম্মিত ময়ূর। এই হেমতীর্থে স্নানাদি করিয়া শরীর স্নিগ্ধ হইলে চারিদিকে নেত্র পরিচালন করিয়া সুচিত্রিত আকাশচুম্বি গোপুরম্ ও সহস্রস্তম্ভ মণ্ডপম্ ও বিশাল মন্দিরাবলীর চূড়া সমূহ দেখিয়া হৃদয় এক অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দে ও স্থৈর্য্যে পূর্ণ হইয়া গেল, সংসারের কোলাহল বহিঃ প্রাকারের বাহিরে।

নানা দেব দেবী দর্শন করিতে করিতে আমরা নটরাজ মহাদেবের মূল মন্দিরের বেষ্টনীতে (compound) পৌঁছিলাম। এই চত্বরটী ৩২০ ফুট লম্বা ও প্রস্থ। এই বেষ্টনী প্রাচীরের উপর এবং চত্বরে অনেকগুলি প্রস্তর নির্ম্মিত বৃষভ। এই চত্বরের মধ্যভাগেই নটরাজ ও গোবিন্দরাজ ভগবানের সুবর্ণ কলস শোভিত মন্দিরদ্বয়। উত্তর পশ্চিম কোণে আকাশলিঙ্গের মন্দির। আকাশলিঙ্গের মন্দিরটীকে 'চিৎসভা', নটরাজের মন্দিরকে 'কনকসভা' এবং যেখানে মন্দিরের কার্য্যাদি হয় তাহাকে 'দেবসভা' ও সহস্রস্তম্ভ মণ্ডপম্ "রাজ সভা" নামে কথিত হয়। নটরাজের মন্দির কাষ্ঠ বিনির্ম্মিত, বাঙ্গালা দেশের চালাঘরের ন্যায়, উপরে সুবর্ণ খচিত তাম্র চাদর দ্বারা আচ্ছাদিত। সর্ব্বোপরে

সাতটী কনক খচিত গম্বুজ রৌদ্রে চক্ চক্ করিতেছে। এই মন্দিরের দ্বার এবং সোপানাবলী রৌপ্য বিনির্ম্মিত। এই মন্দিরের পার্শ্বে আর একটী মন্দির আছে; তাহাতে প্রস্তরের চক্র এবং অশ্ব লাগান; মন্দিরটী যেন একটী রথ। প্রাচীন কালে দেব-মন্দিরগুলি রথাকারেই নির্ম্মিত হইত। দাক্ষিণাত্যের অনেক প্রাচীন মন্দির এবং কনারকের প্রসিদ্ধ সূর্য্য-মন্দির ইহার নিদর্শন। বঙ্গ-দেশেরও অনেক প্রাচীন মন্দিরের নীচে চাকা না থাকিলেও, আকার রথের ন্যায়;—তাই মন্দিরের নাম বিমান। অতি সুন্দর কারুকার্য্য-খচিতা নৃত্যপরায়ণা অপ্সরী এই মন্দিরের স্তম্ভরূপে কল্পিত। পাণ্ডার নিকট শ্রুত হইলাম, অদ্য চৈত্র শুক্লা অষ্টমী ও সোমবার; অদ্য মধ্যাহ্নকালে নটরাজের বিশেষ অভিষেক ও পূজা হইবে। আমরা যথা সময়ে প্রত্যেকে এক আনা হিসাবে দক্ষিণা দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিয়া, অভিষেকাদি দর্শনার্থ উৎসুক হইয়া রহিলাম; সত্বরেই অভিষেক আরম্ভ হইল। মন্দিরাভ্যন্তরস্থ নটরাজ মূর্ত্তির অভিষেক হইল না; দুইটি সুবর্ণ নির্ম্মিত পেটক আনীত হইল। প্রথম পেটক হইতে একটি স্ফটীক লিঙ্গ বাহির করিয়া, তাঁহার যথোপচারে অভিষেক আরম্ভ হইল। ধূপ-ধূনার গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইয়া উঠিল। চারিদিকে একাদশ জন সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি ভূষিত ত্রিপুণ্ড্রধারী শৈব 'দীক্ষিত' পুরোহিতগণ তাল লয় সহকারে বৈদিক রুদ্রাধ্যায় পাঠ করিতে লাগিলেন। প্রধান পুরোহিত মহাশয় সর্ব্বাঙ্গে সুবর্ণ রত্নালঙ্কারে ভূষিত হইযা সহকারীগণ সহ অভিষেক ও অর্চ্চনা করিলেন। প্রথমে জল, তারপর কুম্ভ-পরিপূর্ণ দুগ্ধ, নারিকেল জল প্রভৃতি বহুবিধ উপচারে অভিষেক হইল। অতঃপর যাত্রীগণকে কিছুক্ষণের জন্য অপসারিত করিয়া দ্বাররুদ্ধ করা হইল। শুনিলাম এইবার মহাভিষেক হইবে। মহাভিষেক কি তাহা ভাবিতেছি, এমন সময় দ্বার উন্মোচনে সাগ্রহে দেখিলাম যে গরম ভাত লিঙ্গের উপর ঢালিয়া দিয়া মহাভিষেক হইয়াছে। তাহার পর কুম্ভ পরিপূর্ণ জল দ্বারা পুনরায় অভিষেক সমাপনান্তে, গন্ধ পুষ্পাদি নানা উপচারে পূজা হইল। অতঃপর দ্বিতীয় পেটক হইতে অপূর্ব্ব প্রস্তারের মূর্ত্তি বাহির করিয়া, ইহারও অভিষেক সম্পন্ন হইল। শুনিলাম ইহা একটী বহুমূল্য প্রস্তরে বিনির্ম্মিত। আরত্রিক সময়ে আমাদিগকে পাণ্ডাজী দেখাইয়াছিলেন, একদিকে চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি; অপরদিকে যখন দীপালোক পড়িল, তখন দেখিলাম

জটাজূট সমন্বিত মহাদেব মূর্ত্তি ; জটা হইতে সুরধনী ধারা বহিতেছে। পাণ্ডারা বলিলেন একাধারে হরিহর মূর্ত্তি। শুনিলাম এই মূর্ত্তিদ্বয় যুগযুগান্তর হইতে এই মন্দিরের অধিকারে আছে। যখন চিদম্বরম্ মন্দির মুসলমান বা অন্য কোন বিধর্ম্মী বিজেতার অধিকারে আসিয়াছিল, তখনও পূজকগণ অতি সযত্নে গোপনে এই মূর্ত্তিদ্বয় রক্ষা করিয়াছিলেন। প্রতি সোমবারে ও বিশেষ পর্ব্বোপলক্ষে ইঁহাদের অভিষেক ও পূজা প্রকাশ্যভাবে হইয়া থাকে। অন্য দিন যাত্রীগণের এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তিদ্বয় দর্শনের সুযোগ ঘটে না। অভিষেক ও পূজান্তে আবত্রিক হইল ; তখন সকলে দাঁড়াইয়া বেদপাঠ করিতে লাগিলেন। প্রায় দুই ঘণ্টাকাল তন্ময় হইয়া এই অভিষেক দর্শন করিলাম, এক স্বর্গীয়ভাবে হৃদয় মন উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। বেলা অধিক হইলেও ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। যখন অর্চ্চকগণ মূর্ত্তিদ্বয়কে পেটকের মধ্যে স্থাপিত করিতে লাগিলেন, তখন আমাদের সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইল। অপরাহ্নে ও রাত্রে পুনরায় দেবদর্শন করিলাম। গোবিন্দরাজ ভগবান ও নটরাজ, পুষ্পমাল্যে পরিশোভিত রত্নালঙ্কার ভূষিত মূর্ত্তির, সান্ধ্য ও শৃঙ্গার বেশ মনোরম ও ভক্তি উদ্দীপক। বৈকালে মন্দিরে প্রবেশ করিতে যাইতেছি এমন সময়ে জনৈক ব্রাহ্মণ আমার গায়ে কোট ও কপাল তিলক শূন্য দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি হিন্দু ? তবে মাথায় তিলক নাই কেন ?" মান্দ্রাজ অঞ্চলে হিন্দু কখনই তিলকহীন অবস্থায় থাকেন না। গবর্ণরের কাউন্সিলের সদস্য হাইকোর্টের বিচারপতি ও ব্যবহারাজীবিগণ হইতে ক্ষুদ্র বেতনভোগী রেলের কেরাণী পর্য্যন্ত সকলেই স্বীয় সম্প্রদায়ানুরূপ তিলক ধারণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে গমন করেন। আমাদের বাঙ্গালা দেশে তিলক ধারণ অনেকস্থলে হাস্যাস্পদ হইয়া দাড়াইতেছে। সেলাই করা পিরাণাদি পরিয়াও মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ। আমাকে অগত্যা কোট খুলিয়া ও হিন্দু পরিচয় দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে হইল। এই বিশাল প্রাশরাভ্যন্তরে বহু মন্দির, মণ্ডপ, চত্বর, কূপ ও প্রাঙ্গনে পরিশোভিত।

সকল গুলিই প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্য্য শিল্পের ও গৃহনির্ম্মাণ বিদ্যার অপরূপ নিদর্শন। ভিত্তি গাত্রে কোথাও দেবলীলা, কোথাও বা মহাপুরুষ ভক্তগণের জীবনের নানা কাহিনী চিত্রিত। কোথাও বা প্রাচীন শিলা-লিপি ভিত্তি গাত্রে খোদিত। দেব মূর্ত্তিগণের বর্ণনা করা'ত দূরের কথা, সংখ্যা করাই

সুকঠিন। শিবগঙ্গা সরোবরের ধারে অবস্থিত সহস্রস্তম্ভ মণ্ডপটী সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখ যোগ্য।

দাক্ষিণাত্যের প্রত্যেক মন্দিরেই এইরূপ মণ্ডপ আছে, কিন্তু ইহার সহস্রস্তম্ভ মণ্ডপ নামটী সার্থক। ইহাতে ৯৮৪টী স্তম্ভ আছে। এত বড় মণ্ডপ ভারতবর্ষের আর কোন মন্দিরে নাই। ইহা দীর্ঘে ৩৩৮ এবং প্রস্থে ১৯৭ ফুট। স্তম্ভগুলি নানা কারুকার্য্য সম্পন্ন গ্রানাইট প্রস্তরে নির্ম্মিত। মণ্ডপের চারিদিকেই সোপানাবলী। সরোবরের দিকে জল পর্য্যন্ত সোপান শ্রেণী নামিয়াছে। এই মণ্ডপে এক সঙ্গে দশ সহস্র লোক বসিতে পারে। জনপ্রবাদ, এই মণ্ডপে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য দেব অনেকবার ভিন্ন মতাবলম্বী পণ্ডিতগণকে তর্কযুক্তে পরাস্ত করিয়াছিলেন। প্রাচীনকালে না জানি কত দার্শনিক বিচার ও ধর্ম্মসমাজ এই সহস্রস্তম্ভ মন্দিরে হইয়া গিয়াছে। দুঃখের বিষয় এক্ষণে ইহা বে-মেরামত এবং চর্ম্ম-চটিকার নিলয়।

নগরের ও পাণ্ডার কথা।

চিদম্বরম্ দক্ষিণ আর্কট জেলার একটী প্রসিদ্ধ নগর—সমুদ্র তট হইতে নয় মাইল পশ্চিম। ইহা এক সময়ে চোল রাজগণের রাজধানী ছিল। চিদম্বর রেলওয়ে ষ্টেশন; মান্দ্রাজ হইতে ১৫১ মাইল দক্ষিণে; সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে লাইনের উপর অবস্থিত। ষ্টেসন হইতে মন্দির এক মাইল দূর; এখানকার লোক সংখ্যা ২৯০০০ তন্মধ্যে এক চতুর্থাংশ ব্যক্তি রেসম ও সূত্র বস্ত্র বয়নে নিযুক্ত। এখানে অনেকগুলি ধর্ম্মশালা আছে। তাহাতে যাত্রীগণ বিনা ব্যয়ে অবস্থান করিতে পারেন। কোন কোন ধর্ম্মশালায় অতিথিগণকে বিনা ব্যয়ে আহার্য্য প্রদত্ত হইয়া থাকে।

আমরা একটী মাড়ওয়ারির ধর্ম্মশালায় অবস্থান করিয়াছিলাম। ধর্ম্মশালাটী খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও নব নির্ম্মিত। এখানে দুইটী মেলা হয় একটী জুলাই মাসে তাহার নাম "আপিতিরু মঞ্জনম্।" অন্যটী পৌষ মাসের শুক্ল পঞ্চমী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত হয়; তাহার নাম "অরুথির দর্শনম্"। উভয় মেলায় দশ দিন ব্যাপী উৎসবাদি হইয়া থাকে; এবং ৩০।৪০ হাজার যাত্রী ও দোকানদারগণ একত্র হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত দীক্ষিত ব্রাহ্মণগণের বংশধরেরাই এখানকার মন্দিরের

অধিকারী, অর্চ্চক এবং পাণ্ডা—ইঁহারা যাত্রীগণের সহিত খুব ভদ্র ব্যবহার করিয়া থাকেন। বর্ত্তমানে ইঁহারা প্রায় ৩০০ ঘর আছেন। দীক্ষিতেরা আপন আপন সভা করিয়া মন্দিবের কার্য্য করিয়া থাকেন। কোন বিশেষ কার্য্য উপস্থিত হইলে সকল দীক্ষিতেরা মন্দির প্রাঙ্গণে একত্রিত হইয়া সকলে আপন আপন মত দিলে ও তর্ক বিতর্কের দ্বারা সকলে এক মত হইলে, তবে তাহা কার্য্যে পরিণত হয়। তাহাদের মধ্যে যদি একনীরও মত বিরোধ হয়, তবে তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। বালকেবাও উপনয়নেব পর হইতেই উক্ত সভার সভ্য শ্রেণী ভুক্ত হয়। এই কারণেই পাঁচ বৎসব না হইতেই উপনয়ন কার্য্য সমাপ্ত হয়। প্রবাদ আছে, পূর্ব্বে এস্থলে তিন সহস্র দীক্ষিত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে চিদম্বব দেবের আজ্ঞায় হিবণ্যবর্ণ ইঁহাদিগকে কাশীধাম হইতে আনয়ন করেন। ইঁহারা বলেন সাক্ষাৎ ভগবান হইতে ইঁহারা উৎপন্ন ; এবং ইঁহাদের সমাজ অন্য দক্ষিণ দেশীয় ব্রাহ্মণ সমাজ হইতে পৃথক। ইঁহাদিগের উপজীবিকা চিদম্বরমের পাণ্ডাবৃত্তি অথবা ভিক্ষাবৃত্তি। কুড়ি জন করিয়া ব্রাহ্মণের কুড়ি দিনের জন্য পালা পড়ে ; এবং দেবোদ্দেশে ভক্তগণ কর্তৃক যাহা প্রদত্ত হয় তাহা ইঁহারা ভাগ কবিয়া লয়েন। বিবাহিত না হইলে ইঁহাদের পূজার অধিকার হয় না; সুতরাং ৫।৬ বৎসরেই তাঁহাদেব বিবাহ হয়। ইঁহাদের বেশের একটু বৈচিত্র আছে। ইঁহারা মালাবার দেশীয় ব্রাহ্মণগণেব ন্যায় মস্তকের সম্মুখ ভাগে কতকগুলি বড় বড় স্ত্রীলোকের মত চুল বাখেন, দীক্ষিতেরা আপনাদের মধ্যেই আদান প্রদান করিয়া থাকেন।

চিদম্বরম্ দর্শন শেষ হইল। চিদম্বরের যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, যিনি ভূমি নহেন, জল নহেন, অগ্নি নহেন, বায়ু নহেন, আকাশ নহেন এবং যাঁহার নিদ্রা, তন্দ্রা, গ্রীষ্ম, শীত, দেশ, বেশ ও মূর্ত্তি নাই ; যিনি অজ, সনাতন, কারণের কারণ, যিনি সর্ব্ব মঙ্গলময়, যিনি জগৎ প্রকাশক চন্দ্র সূর্য্যাদিরও প্রকাশ করেন, যিনি তুরীয় ব্রহ্ম ও মায়ার অতীত, যাঁহার আদি ও অন্ত নাই, যিনি পরব্রহ্মস্বরূপ, জগতের কারণ ও দ্বৈতবিহীন, সেই "শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্"কে প্রণাম করিয়া প্রবন্ধ শেষ করি—

> ন ভূমি ন চাপো ন বহ্নি ন বায়ু, ন চাকাশ মাস্তে ন তন্দ্রা ন নিদ্রা ॥
> ন গ্রীষ্মো ন শীতং ন দেশো ন বেশো, ন যস্যাস্তি মূর্ত্তিঃ ত্রিমূর্ত্তি তমীড়ে ॥

অজং শাশ্বতং কারণং কারণানাং, শিবং কেবলং ভাসকং ভাসকানাম্ ॥
তুরীয়ং তমঃ পারমাদ্যন্ত হীনং, প্রপদ্যে পরং পাবনং দ্বৈতহীনম্ ॥
নমস্তে নমস্তে বিভো বিশ্বমূর্ত্তে, নমস্তে নমস্তে চিদানন্দ মূর্ত্তে।
নমস্তে নমস্তে তপোযোগ গম্য, নমস্তে নমস্তে শ্রুতিজ্ঞান গম্য ॥

শ্রীপান্নালাল সিংহ।

তোমারি! তোমারি!

গুরুদেব। জাগে হৃদে এ জীবন কথা,—
বিষয়ে আকৃষ্ট চিত্ত, পূর্ব্ব স্মৃতি ভুলি,—
ভ্রমিনু বিষয়-রাজ্যে অতৃপ্ত কামনা
বশে। কিন্তু জান নাথ, কেমনে সতত
অবিদ্যার ঘুমঘোরে, বাহ্য বস্তু মোহে,—
মায়া-প্রহেলিকা সুখে, পিয়াসা না মিটে,—
ইন্দ্রিয়জ সুখ মাঝে,—যবে উষ্ণ সুরা
প্রধাবিত হয় চিত্তে,—কিরূপে জাগিত
কোথা হ'তে কা'র ধ্বনি,—অস্ফুট, অস্পষ্ট
কা'র সুমধুর বাণী—"মায়ার খেলায়
নাহি তৃপ্তি, নাহি মিলে পরম সে 'আমি',—
মায়া-পরামর্শ শূন্য, নিষ্ফল সে ভূমা।"
কিন্তু নারিনু বুঝিতে দেব কোথা পাব
সে পরম ধনে। তাই বাহ্য দৃষ্টি বশে
লভিতে সে পরতত্ত্বে, অপরা বিদ্যার
নাথ। লইনু আশ্রয়। কাব্য-শাস্ত্র মাঝে
প্রথমে ফুটিল ধ্বনি। মনে পড়ে, দেব!
নিশীথে নীরবে বসি, ইংরাজ ভাবুক
টেনিসন্ আদি পড়ি, অর্দ্ধ পরিস্ফুট
হ'ল হৃদয়ের বাণী; মানস দর্শনে—
প্রকাশিল সমরূপী এক সত্ত্বা, তবে,—
বিশ্ব বিরচিয়া, মাঝে রয়েছে তাহার
গূঢ় হয়ে,—থাকে মধু ইক্ষুতে যেমতি।

বল নাথ, কার বুদ্ধি করিল প্রকাশ
ভ্রান্ত চিত্তে এই ভাষা ?—তোমারি ! তোমারি !

(২)

মনে পড়ে যৌবনের প্রারম্ভ সহিত
ফুটে উঠে প্রেমভাষা। পুন বাহ্য মোহে,
বিশিষ্ট মানবে খুঁজি, সমাপ্তি তাহার।
বাল্যসখা বন্ধুগণে, না জানি কি দেখি,
হৃদয়ে তুলিতে গেনু। কিন্তু না পূরিল
প্রেম তৃষা ; ভাবি শুধু দুদিনের তরে
বুঝি পেয়েছি রতন। ভাঙ্গিল স্বপন ;
কামবদ্ধ জীবে না পূরে সে প্রেম আশা।
তবু নাহি গেল তৃষা। বল হৃদয়েশ !
কা'র শক্তি বশে অঙ্কুরিল প্রেমতরু,—
কা'র প্রেম আকর্ষণে ?—তোমারি ! তোমারি !

(৩)

মনে পড়ে সেই দিন, জ্ঞান পিপাসায়
জানিতে চাহিনু বিশ্ব-রঙ্গ-রস-খেলা,
দর্শনের পুষ্প-রাজি করিয়া চয়ন—
ধাইনু গাঁথিতে স্নিগ্ধ জ্ঞানরূপী মালা।
পুনঃ বাহ্য দৃষ্টি বশে, লভিনু কেবল
মহতী অবিদ্যা ;—হইল প্রত্যয় তবে
"সত্য মাত্র, জড় শক্তি" "তুমি আমি নাই,—
আছে শুধু জড়" ; "অন্ধ শক্তি বশে উঠে
জড় হতে জীবভান,— মিথ্যা আমি জ্ঞান।"
পরতত্ত্ব ভুলি, নিরাশ্রয়, সন্দিহান,
কঠোর সে দশা নাথ ? এবে দেখি
নিঠুর নির্ম্মম ভাবে, কাম আশা দলি,
'বিজ্ঞান সর্ব্বাত্মভাব' করিলে প্রকাশ
ভাঙ্গিবারে অহঙ্কার ;—যেই মিথ্যা জ্ঞানে
নিষ্ফল 'আমি'তে কোথা হতে উঠে জেগে

বিশিষ্ট 'আমির' ভান,—যাহার অশনা
চাহে যে গ্রাসিতে "সর্ব্ব,"—কবলিত করি
'পরমাত্মা লীলাক্ষেত্র' মোহন বিশ্বেরে।
প্রশমিত হ'ল কিছু ভেদভাবে-স্থিত
মহান্ 'আমির' তৃষা। বল প্রাণনাথ!
কা'র বিদ্যা বলে, জড় বিজ্ঞানের মাঝে,
হইল স্তম্ভিত ক্ষুদ্র অহং-জ্ঞান মায়া?
কা'র করুণায় ভেদচিত্তে হল, দেব!
অঙ্কুরিত সর্ব্বাত্মিকা একত্বের বীজ—
ভগবান-প্রতিবিম্ব?—তোমারি! তোমারি!

(৪)

মনে পড়ে শোকতাপে জর্জ্জরিত চিতে
যবে খুঁজি শান্তি তরে ধাইনু চৌদিক,
'অজ্ঞান তিমির সূর্য্য' গুরু পাইবারে।
কত সাধু, কত জ্ঞানী, কত ভক্ত-বীরে
হৃদয় করিতে দান, গেনু সব কাছে।
না মিটিল সাধ,—না মিলিল সেই নিধি;
না পারিনু বিনামূল্যে বিকাইতে হৃদি,
মন, দেহ, প্রাণ; তবে হইয়া নিরাশ
কত যে কাঁদিনু, নীরবে হৃদয় ক্ষরি।
তাই বুঝি করুণার-খনি, ভগবান
ক্ষুদ্র জীবে দয়া করি দেন দরশন
অদ্ভুত মুরতি ধরি,—প্রেম, জ্ঞান, দয়া,
করুণা প্রভৃতি সকল কল্যাণ গুণে
নিরমিত সেই তনু, শুদ্ধ সত্ত্ব-ময়,—
আত্মার প্রকাশ ক্ষেত্র। যাঁ'র আকর্ষণে
ফুটিল সরোজ হৃদে,—ভগবানে প্রেম
জীবে দয়া, শাস্ত্রে শ্রদ্ধা মহাত্ম সেবন,—
নিরমল কাচ মাঝে, যথা ফুটে সদা
দীপের আলোক রাজি। বল নাথ! এবে,
(ও) মোহন মুরতি ক'র? তোমারি! তোমারি॥

(ক্রমশঃ)

পন্থা ।

——অমিয় নিমাইচাঁদে ।

Re printed with the kind permission of the
AMRITA BAZAR PATRIKA OFFICE

মায়া—বিদ্যা ও অবিদ্যা।

(ভাদ্র সংখ্যার পর।)

মায়াতত্ত্ব বুঝিবার পূর্ব্বে আমাদের চিত্তগত কতকগুলি দোষ (limitations) নির্ণয় করিয়া, বৃত্তিগুলির মধ্য হইতে ঐ দোষের নিরসণ করা আবশ্যক। বিশিষ্ট অহং তত্ত্বকে আমাদের সত্য বলিয়া মনে হয়; এমন কি তাহার বিপরীত চিন্তা করাও অসম্ভব। সেই জন্য ঐ প্রবৃত্তির দ্বারা বঞ্চিত করিয়া, বুদ্ধিকে শাস্ত্রের দ্বারা লক্ষিত 'একমেবাদ্বিতীয়ং' আত্মতত্ত্বে প্রয়োগ করিলেও, শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারি না। এই বিশিষ্টতার মোহে দার্শনিকগণও পতিত আছেন। সেই জন্য 'পুরুষ' শব্দে ভেদ-ভাবেস্থিত জীবাত্মা ও তা'র প্রকাশ ভিন্ন অন্য অর্থ সাধারণতঃ বোধগম্য হয় না। ঐ প্রবৃত্তির বশেই বিদ্বান্‌গণ পর্য্যন্ত প্রকৃতিকে চৈতন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী জড় বা Matter বলিয়া অভিহিত করেন। ঐ প্রকৃতির বশে, পাশ্চাত্য দার্শনিক হেগেল (Hegel) সাহেব পর্য্যন্তও ব্রহ্ম হইতে তৎপ্রতিদ্বন্দ্বী জগৎ ভাব নির্গত হইয়াছে মনে করেন। বিশিষ্টতার মোহে, পৃথক বুদ্ধি-মূলক অবিদ্যার বশে, আমরা বিজ্ঞানৈকরসঘন এক ও অদ্বিতীয় সত্তায় সর্ব্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও, সর্ব্বদা বিভিন্ন ভাবে দেখিতে ও বুঝিতে চেষ্টা করি। জ্ঞান বা বোধ নিত্য এক, তাহাতে বহুত্ব নাই, ভেদ নাই; কারণ যতক্ষণ মনে বহুত্ব বা ভেদ থাকে, ততক্ষণ কোন বস্তুর জ্ঞান হইতে পারে না। এই বিষয়টী আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। সেই জন্য গম্ভীর ভাবে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতে গিয়া, জ্ঞানের মধ্যেও ত্রিপুটী বা 'জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়' এই তিনটীর স্থাপনা করি; এবং ঐ ছাঁচে নিষ্কল প্রজ্ঞাকেও ফেলিবার চেষ্টা করি। শাস্ত্র লক্ষ লক্ষ স্তরে জ্ঞানের একত্ব

ইঙ্গিত করিলেও আমরা তাহা বুঝিব না। গল্পচ্ছলে—মহাভারতে কুরুপাণ্ডব বালকগণের অস্ত্রবিদ্যা পরীক্ষা উপাখ্যানেও এই তত্ত্ব নিহিত আছে। সকলেই জানেন যে, দ্রোণাচার্য্যের নিকট রাজবালকেরা কিরূপভাবে অস্ত্রশিক্ষা করিয়াছে তাহা জানিবার জন্য, ধৃতরাষ্ট্ররাজা সভার আহ্বান করেন ও ঐ সভায় প্রত্যেককে পরীক্ষা করিবার জন্য একটী বৃক্ষের শাখাপল্লবে লুক্কায়িতপ্রায় পক্ষীকে লক্ষ্যরূপে রাখা হয়। একে একে রাজবালকদের আহ্বান করা হইল ও ঐ পক্ষীকে লক্ষ্যভেদ করিবার আদেশ দেওয়া হইল; কিন্তু বাণ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই প্রত্যেককে একই প্রশ্ন করা হইল। প্রশ্নটী এই:—'তুমি কি দেখিতেছ'! সকলেই বলিল 'রাজা,পার্শ্বদ,আচার্য্য,বৃক্ষ, বৃক্ষস্থ পক্ষী, সর্ব্বই দেখিতে পাইতেছি'; কর্ণ বলিলেন 'আমি রাজা প্রভৃতি দেখিতে পাইতেছি না, কেবল বৃক্ষ ও বৃক্ষস্থ পক্ষীই দেখিতে পাইতেছি।' কেবল অর্জ্জুন উত্তর দিলেন 'আমি কিছুই দেখিতে পাইতেছি না; কেবল একটী চক্ষু (পক্ষীর চক্ষু) দেখিতে পাইতেছি।' তাঁহার ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিতে 'সর্ব্ব' ভাবের ছায়া পড়িল না। আমি, তুমি, আচার্য্য, ধনুর্ব্বাণ, বৃক্ষ প্রভৃতি সকলই কোথায় মিশিয়া গেল; রহিল কেবল লক্ষ্যের বোধমাত্র।

জ্ঞানেও তদ্রূপ। যে মুহূর্ত্তে (moment) জ্ঞানের একত্ব হৃদয়ে ফুটিয়া উঠে, সেই মুহূর্ত্তে দ্রষ্টা দৃশ্য প্রভৃতি এক অদ্ভুত এক-রস বোধে নিমজ্জিত হইয়া যায়। যিনি ইহা বুঝিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন (যঃ বেদ সঃ বেদ।) সুখেও তদ্রূপ; সুখের সময় 'আমি থাকে না', বস্তু থাকে না; কেবল আনন্দ প্রবাহমাত্র থাকে। যেমন অঙ্ক কষিতে কষিতে প্রকৃত উত্তরে উপনীত হইবার মুহূর্ত্তে, চিত্ত হইতে বিহিত পর্য্যায় বা steps, ক্লেশ, অনুসন্ধানের ইচ্ছা, প্রভৃতি সর্ব্বভাব ও চেষ্টা অপসৃত হয়, তদ্রূপ প্রকৃত বোধ স্ফুরণের সময় জ্ঞান-স্ফূর্ত্তির উপায় ও তৎসাধনাসম্ভূত ভেদ বুদ্ধি মুহূর্ত্তের জন্যও অন্তর্হিত হইয়া যায়। সমস্ত প্রবৃত্তির এই একরূপ পরিসমাপ্তি প্রতিদিনই ঘটিতেছে। অথচ আমরা তাহা ধারণা করিতে পারি না, এবং ধারণা না করিতে পারাতে বৃত্তি, বন্ধ ও বিশিষ্ট আমি—এই তিনটীর সংস্কার অতিক্রম করিতে না পারাতে, তর্ক বিচার প্রভৃতি দ্বারা এই তিনের আংশিক সমন্বয়ের চেষ্টা করি। ইহাই আমাদের জ্ঞান; ইহাই আমাদের দর্শন ও বিজ্ঞান। এই তিনের কার্য্য-কারণ-

সম্বন্ধ বোধক প্রকৃতি নামে অভিহিত হয়। কার্য্যকারণকর্তৃত্বে প্রকৃতিঃ হেতুরুচ্যতে। 'গীতা'।

মানবের সুখ জ্ঞান প্রভৃতি একত্ব বোধ ক্ষণিকভাবে চিত্তে প্রস্ফুটিত হইলেও, তাহার প্রভাব ও প্রতাপ সর্ব্বদাই বিদ্যমান রহিয়াছে। এই একত্বের প্রভাবে, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বহিঃ বস্তু সকলকে এক পর্য্যায় বা ভাবে পরিণত করিবার ইচ্ছা বিজ্ঞান বা Scienceএর মধ্যে নিত্য অনুস্যূত রহিয়াছে। লাল, নীল, পীত, প্রভৃতি বিভিন্ন ছিন্ন জ্ঞানগুলির মূলে যে কোন প্রকার একজাতীয় প্রবৃত্তি আছে, তাহা বুঝিতে গিয়া আমরা বর্ণ বিজ্ঞানে (Optics) উপনীত হইয়াছি। বাহিবেব ছিন্ন জ্ঞানগুলি এক আলোকের স্পন্দন ও নিয়মে পর্য্যবসিত কবিয়াছি। বস্তুর বহুত্বের পরিবর্ত্তে আলোকের সর্ব্বপ্রকাশিকা অপরিণামী গতি,শক্তি প্রভৃতির আপেক্ষিক relative একত্বজ্ঞানে উপস্থিত হইয়াছি। এইরূপে বিভিন্নভাবে শব্দায়মান বস্তুগুলি, শব্দ বিজ্ঞান (Accoustics) ও তাহার নিয়মাদিব পরিজ্ঞানে মিশিয়া গিয়াছে। ভুক্ত বিভিন্নজাতীয় আহার্য্য পদার্থগুলি, Metabolism নামক সংক্কেতের সাহায্যে জীবনীশক্তিতে মিশিয়া যাইতেছে। বিভিন্ন মানবের বিভিন্ন মনোবৃত্তিগুলিকে মনোবিজ্ঞানের (Psychology) সাহায্যে এক করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। এই প্রকারে, সমস্ত বিজ্ঞানেব প্রয়াসগুলিব অনুশীলন করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, 'জগৎ' শব্দে এখন আব ছিন্ন বিশিষ্ট বস্তু, শক্তি বা ব্যক্তি বুঝায় না। তৎপরিবর্ত্তে ঐ সকল ছিন্নভাবের অতিগ আপেক্ষিক (relatively) অবিশেষ (abstract) শক্তি, গতি ও প্রবৃত্তিগুলি চিন্তাশীল মনুষ্যগণের হৃদয়ে স্থূল বস্তু প্রভৃতির অপেক্ষা অধিকতর সত্য বলিয়া স্থাপিত হইতেছে। এই উর্দ্ধগ একত্বাভিমুখী গতি যে বিজ্ঞানের তথ্যগুলিতেই পরিসমাপ্ত হইয়াছে, তাহা ভাবিবার কারণ নাই। মানব আরও উচ্চ ও উচ্চতর একত্বে উপনীত হইবার প্রয়াস ত্যাগ করিতে পারিতেছে না। এইরূপে বস্তুর বহুত্ব, শক্তির বহুত্বে ও শক্তির বহুত্ব প্রবণতায় পরিসমাপ্ত হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। শাস্ত্রে এই গতিকে প্রকৃতির 'আরোহী গতি' বলে। আর যে ভাবে এক শক্তি হইতে পুনবায় বহু ছিন্নভাবের প্রকাশ হয় তাহাকে 'অবরোহী গতি' বলে। অবরোহী ক্রমে মানব জন্মিয়া বহুকর্ম্ম করিয়া আরোহী ক্রমে মৃত্যুর মধ্য দিয়া কোথায় চলিয়া যায়। তাই

"বিশেষাবিশেষ লিঙ্গমাত্রালিঙ্গানি গুণপর্ব্বাণি।" পাতঞ্জল। পাদ সূত্র ১৯।

বস্তু, শক্তি বা প্রবৃত্তি এই তিনটী জানিলেও মানবের শান্তি হয় না। এই তিনটীকে বাহিরের বলিয়া 'ভাসা ভাসাভাবে' পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের মত গবেষণা করিলেও তৃপ্তি হয় না। অপরিজ্ঞাতভাবে কোথা হইতে স্বতঃই প্রশ্ন উদিত হয় "এই সকলের সঙ্গে 'আমির' সম্বন্ধ কি।" "এই খেলার প্রকৃত মর্ম্মই বা কি!" এই মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিতে যাইয়া আমরা দেখি যে, একই বস্তু সর্ব্বলোকের নিকট একইভাবে মূলতঃ দেখা দেয়! আম্র বৃক্ষটী সকলের নিকটই আম্র বৃক্ষ। অগ্নির তেজ সকলের নিকটই তেজ বলিয়া অনুভূত। খাদ্য দ্রব্য সকলেরই পরিপুষ্টি করিতে পারে। এই সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধির অঙ্কুর বিজ্ঞানের দ্বিতীয় স্তর। ইহাকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে Universality of nature বলে। এই সর্ব্বাত্মিক ভাব আছে বলিয়াই, সর্ব্ব জীবের ব্যবহার সিদ্ধ হয়। যিনি বস্তু বা শক্তিতে এই সার্ব্বজনীন একত্ব দেখিতে পান, তিনিই বৈজ্ঞানিক। একটী এপেল ফল পড়া হইতে, বৈজ্ঞানিক প্রবর সর্ব্বাত্মিকা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অস্তিত্ব বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

শুধু সার্ব্বজনীনভাবে তৃপ্তি হয় না কেন? বাহিরের সর্ব্বভাবে হৃদয়ের ক্ষুধা মিটে না কেন? এই প্রশ্ন যতদিন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সমাধান না করিতে পারিবে, ততদিন মানবের প্রকৃত উপকার তাহার দ্বারা সাধিত হইবে না।* পাশ্চাত্য দর্শনে সর্ব্বাত্মিকাভাবে মনোবৃত্তির বিজ্ঞানশাস্ত্র গঠিত হইতেছে। কিন্তু ঐ বিজ্ঞানও জড় বিজ্ঞানের মত মানবের মঙ্গলপ্রদ হইতে পারে না; কারণ উহাতে 'আমি' নাই। 'আমির' সহিত যোগ না থাকিলে সর্ব্বাত্মিকা ভাবের অনুশীলনে মানবের ইষ্টাপত্তি নাই। বালকেরা যেরূপ অভিসন্ধান শূন্য হইয়া খেলা করে, পাশ্চাত্য জড় ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যে অধিকাংশই মনোময় ক্ষেত্রে মানবশিশুর ক্রীড়ার ন্যায় নিরর্থক। বুদ্ধি আছে একটী নূতন কিছু করা চাই; চিন্তা আছে একটী নূতন 'চিন্তাপদার্থ' লইয়া খেলা করা চাই। সেই জন্য পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অধিকাংশই বৃথা পাণ্ডিত্যের ভার বহন করিতেছেন। এইখানে আমরা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও প্রাচ্যবিজ্ঞানের গতির

---

* সর্ব্বাত্মিকা বোধই বস্তুর সত্যতার মান (measure)।

প্রভেদ অর্থাৎ শুধু সার্ব্বজনীন নিয়মের স্থাপন এবং প্রকৃতির সমস্ত কার্য্যের পরার্থতা বা আত্মানুগতি (Subservience towards the Consciousness) সম্বন্ধে, লোক-গুরু জনৈক মহাপুরুষের উক্তি সন্নিবেশিত করিলাম।

You do not seem to realise the tremendous difficulties in the way of imparting the rudiments of *our Science* to those who have been trained in the familiar methods of yours.— In conformity with 'exact science', you define but one cosmic energy and see no difference between the energy expended by the traveller who pushes aside the bush, that obstructs his path and the scientific experimentor who expends an equal amount of energy in setting the pendulum in motion. *We do*; for we know there is a world of difference between the two. The one uselessly dissipates and scatters force; the other concentrates and stores it. And here please understand that I do not refer to the relative utility of the two, as one might imagine, but only to the fact that in the one case there is but brute force flung out without any transmutation of that brute energy into the higher potential form of spiritual dynamics, in the other there is just that. Please do not consider me vaguely metaphysical. * * * * Will you permit me to sketch for you still more clearly the difference between the modes of physical (called *exact* often out of complement) and metaphysical sciences * * * The realistic science of facts on the other hand is utterly prosaic. Now, for us, poor unknown philanthropists, *no fact of either of these sciences is interesting except in the degree of its potentiality of moral* results and in ratio of its usefulness to mankind. * * * * * May I ask then .....what have the laws of Faraday, Tyndall or others to do with philanthropy in their abstract relations with humanity, viewed as an intelligent whole? *What care they for* man as an isolated atom of this great and harmonious whole, even though they may sometimes be of practical use

to him ? * * * * * And yet even these scientific facts never suggested any proof to the world of experimenters that Nature consciously prefers that matter should be indestructible under organic rather than in inorganic forms, and that she works slowly but incessantly towards the realization of this object—*the evolution of conscious life out of inert materials* * * * * "Exact experimental science *has nothing to do with morality, virtue, philanthropy*,—therefore, can make no claim upon our help until it blends itself with metaphysics. Being but a cold classification of facts out-side *man*, and existing before and after him, her domain of usefulness ceases for us at the outer boundary of these facts . and whatever the inferences and results for humanity from the materials acquired by her method, she little cares. Therefore, as our sphere lies entirely out-side hers,—as far as the path of *Uranus* is outside the Earth's ,—we distinctly refuse to be broken on any wheel of her construction. * * * Were the sun, the great nourishing father of our planetary system, to hatch granite chickens out of a boulder 'under test conditions' to-morrow, they (the men of science) would accept it as a scientific fact without wasting a regret that the fouls were not alive so as to feed the hungry and the starving. But let a *shaberon* cross the Himalayas in a time of famine and multiply sacks of rice for the perishing multitudes—as he could,--and your magistrates and collectors would probably lodge him in jail to make him confess what granary he had robbed. This is exact science and your realistic world"

Occult World নামক গ্রন্থে সন্নিবেশিত মহাপুরুষ দেবাপীর পত্রের মর্ম্মাংশ এইরূপ বলিয়া বোধ হয় ;——"পাশ্চাত্যবিজ্ঞান ও প্রাচ্য অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মধ্যে প্রণালীগত কতকগুলি বিশেষ পার্থক্য আছে ; এবং সেই পার্থক্যবশতঃ অধ্যাত্ম বিজ্ঞান আধুনিক বৈজ্ঞানিকের চিত্তে স্ফুরণ করা বড় দুরূহ। পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের সব শক্তি এক পর্য্যায়ভুক্ত। সুতরাং আপনার পথ হইতে একটী বৃক্ষের শাখা

সরাইয়া দিতে, পথিক যে জাতীয় শক্তি নির্ব্বিয় করেন, তাহা ও ঘড়ির পেণ্ডুলামটী চালাইয়া দিলে যে শক্তির ব্যয় হয়, সে শক্তি এক। জড়বিজ্ঞান এই একত্ব দেখিয়াই সন্তুষ্ট। কিন্তু মহাপুরুষেরা জানেন যে এই দুইব মধ্যে পার্থক্য আছে, কারণ পূর্ব্বোক্ত ভাবে শক্তি বৃথা ব্যয়িত হয়, এবং শেষোক্ত ভাবে শক্তির সঞ্চয় হয়। এই ভেদ শুধু সাধারণ মানবের উপকার সাধন ও সাধারণ মানবের উপকার সাধকতার জন্য নহে। পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়াতে জড় বা পাশবিক শক্তি ব্যয় হয়, এবং তাহাতে কোনরূপ আধ্যাত্মিক প্রবণতা নাই। * * * * পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান এবং প্রাচ্য-বিজ্ঞানের পার্থক্য, আব এক প্রকারে দেখা যায়। জড় বিজ্ঞানে সার্ব্বজনীন ভাব থাকিলেও উহা অকিঞ্চিৎকর। কারণ উহাতে নৈতিক এবং সমগ্র মানবজাতীব উৎকর্ষ সাধনের বীজ ও পবামর্শ নাই। মহাপুরুষগণের নিকট কোন বিজ্ঞানই আদবণীয় নহে—যদি ঐ বিজ্ঞানের ফলে মানবের আধ্যাত্মিক মঙ্গল সাধিত না হয়। ফ্যারাডে, টিণ্ডেল প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণের গবেষণা মানবের মঙ্গলের সহিত অপরামৃষ্ট বা সম্বন্ধশূন্য। যে সর্ব্বাত্মিকা জ্ঞান মানবে পৌছে না, যে সর্ব্বাত্মিকাপ্রবৃত্তি অহং অভিমুখী নহে, তাহা অনার্য্য ও ঋষিগণেব দ্বারা সেবিত নহে। পাশ্চাত্য-বৈজ্ঞানিকেরা বুঝেন না, যে প্রকৃতি সর্ব্বদা পরার্থ-ভাবে খেলিতেছেন, যে—প্রকৃতির বিশ্বজনীন (universal) নিয়মাদি কেবল চৈতন্যের পবাভাব সংস্থাপনের জন্য বহিয়াছে। এই পরাভাব জীবের অহংরূপে প্রথমে দেখা দেয়, এবং তৎপরে পবিশুদ্ধ চিত্তে শ্রীভগবানে পৌছিয়া দেয়। ইহাই উপনিষদের অর্থ ?—

> ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পবা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পবং মনঃ।
> মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ ॥
> মহতঃ পবমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
> পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥ কঠ ১৷৩।

ইন্দ্রিয়রূপ প্রবণতা, অর্থে পরিসমাপ্ত। অর্থরূপ প্রতীতির প্রবণতা মনে পরিসমাপ্ত। এইরূপ মন বুদ্ধিতে, এবং বুদ্ধিমহত্তত্ত্বে ও তাহার অধিষ্ঠাতা দেবে পরিসমাপ্ত। মহৎ অব্যক্ত মূল প্রকৃতিতে, এবং মূলপ্রকৃতি সর্ব্বদাই পুরুষাভি-

মুখী এবং পুরুষে পরিসমাপ্ত। সেই এক পুরুষ বা পুরুষোত্তমই, সকল প্রকার জ্ঞান ও বিজ্ঞানের, সকল প্রকার গতির বা প্রবণতার পরিসমাপ্তি।

চৈতন্যের এই গতিকেই 'অগ্র' বা একাগ্র গতি বলে। পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান মানব বা আত্মা সম্বন্ধে শূন্য ও নিরর্থক গবেষণা দ্বারা মানবের হিত সাধন করিতে পারে না। সেই জন্যই মহাপুরুষগণ পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের গতির ভিতর আসিয়া খেলিতে চাহেন না। Professor Lodge সাহেবও এই জন্য জড়বিজ্ঞান ছাড়িয়া, বিজ্ঞানের এই পরাগতি দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের এমনই মোহ যে, আজ যদি সূর্য্যকিরণে জড় প্রস্তর খণ্ড হইতে প্রস্তরে নির্ম্মিত পক্ষীশাবক প্রস্তুত হয়, তাহা হইলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট হইবেন। তাঁহারা ভাবিবেন না যে ঐ পক্ষীগুলি জীবিত হইলে বিপদের সময় মানবের ভক্ষে পরিণত হইতে পারিত। জড় বিজ্ঞানে পরিতুষ্ট মানবের মোহ এতদূর যে, আজ যদি কোন মহাপুরুষগণের শিষ্য ভারতে আসিয়া দুর্ভিক্ষের সময় যোগবলে শস্যাদি উৎপন্ন করিয়া প্রজার প্রাণ রক্ষা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে কল্যই শ্রীঘরে যাইতে হইবে; এবং নানা উপায়ে তিনি 'কোন্ বা কাহার সঞ্চিত শস্য অপহরণ করিয়াছেন' তাহা কবুল করাইবার জন্য হয়তঃ "ঠাণ্ডা ঘরে" প্রেরিত হইবেন। কারণ প্রবৃত্তির পাশ্চাত্য শিক্ষিত দেশী বিচারকও, জীবের সহিত প্রকৃতি নামধেয় সর্ব্বাত্মিকা ভাবের যে নিত্য সম্বন্ধ আছে—জীবও পরে যে শিবই, এবং প্রকৃতির সমস্ত খেলার অভিমন্তা প্রভু ও সাক্ষী; —তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারেন না।

সেই জন্যই শুধু বিশ্বজনীন ভাব লইলেই চলে না। ঐ ভাব যদি পুরুষোত্তমের অভিমুখী হয়, তবেই উহা প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্যা। যাঁহারা সার্ব্বজনীন ভাব লইয়া খেলা করিতেছেন, তাঁহারা কি বুঝিবেন যে "সর্ব্বের" এই প্রবৃত্তি কেবল"জ্ঞ"এর জন্য? বুঝিলে কি "সর্ব্বজ্ঞ" শব্দে "সবজান্তা" অর্থ করিতেন? ব্রহ্মবিদ্যার প্রবর্ত্তক শ্রীমৎ আচার্য্য, 'সর্ব্বজ্ঞ' শব্দে"সর্ব্বশ্চাসৌ জ্ঞশ্চেতি" অর্থাৎ"সর্ব্বের 'জ্ঞ'তে পরিণতি বা সংমিশ্রণ রূপ পরাভাবই বুঝিয়াছেন। সেই জন্যই মহাপ্রভু বেদের ভগবদর্থতা সিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

এক্ষণে বিবেচ্য যে কি ভাবে দেখিলে 'সর্ব্ব' শব্দ, প্রকৃতিজাত অসৎ বস্তু সমন্বয় করিয়া শ্রীভগবানে পরিসমাপ্ত হয়। ইহাই পরপ্রবন্ধে বলিবার সাধ রহিল। (ক্রমশঃ) সম্পাদকয়োঃ।

ভাবলহরী।

——(*)——

২। বাঁশরী।

বাঁশী কে বাজায়? কোথায় বাজে এবং কেন বাজে ব'ল্‌তে পার? আমার বোধ হয়, বাঁশী বাজা টাজা ও সব কিছুই নয়। শোঁ শোঁ করে কলের গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, মটব গাড়ী, - টাকার ঝমঝমানি,—যোষিৎবর্গের অলঙ্কার শিঞ্জিত মধুর চরণধ্বনি,—এই সবই আসল বাঁশী। আর পাষাণস্তূপের ন্যায় দণ্ডায়মান আকাশভেদী অট্টালিকা শ্রেণীও বংশী-ধ্বনির কাজ কবে। অট্টালিকা-শ্রেণী শব্দহীন হ'ক,—তবু তা'ব মধ্য হইতে একটা সুব বাহির হয়। সাপুড়ে যেমন বাঁশী বাজা'য়ে সাপকে খেলায়, আমাদেব মন ভুজঙ্গকে বাহিরের এই বিষয়গুলো ঠিক সেইরূপ খেলাইতেছে। সুতরাং এগুলিকে বাঁশী না বলিয়া আর কি বলিব? আর তোমরা পাঁচজন যে কৃষ্ণ ঠাকুরের বাঁশীর কথা বল, ও সব আমি মানিনে, তাব শব্দও নেই, বসও নেই। ও তোমাদের লোক-ভুলানো কথা মাত্র,—আসলে সবই মিথ্যা কথা।

না ভাই, আরও একটা প্রাণ কাড়া সুর আছে, মন মাতানো সঙ্গীত আছে। সকলে তা' শোনেনা বটে; কিন্তু যে শোনে সে আর চোখে দেখতে পায় না,—কানে শুনতে পায় না, হাতে আর কোন কিছুর সে পরশ পায় না। তখন তা'র অবস্থা ঠিক কি রকম দাঁড়ায় জানো! "আপনার নাম মোর নাহি পড়ে মনে। পরাণ হরিল রাঙ্গা নয়ন নাচনে॥ কিবা সে নয়ন বাণ হিয়ায় হানিল গো গরল ভরিয়া রৈল বুকে! কিবা দিন কিবা রাতি কিছুই না জানি। জাগিয়ে স্বপন দেখি কালরূপ খানি"। বাঁশী শুনিলে ঠিক এই রকম হয়! একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ এই বাঁশী শুনেছিলেন, আর সংসাব পাতানো তাঁ'র মাথায় উঠিল। একদিন নিশীথ রাত্রে স্নেহময়ী জননী, প্রেমময়ী পত্নী, বড় সাধের ঘর, বাড়ী, টাকাকড়ি ছেড়ে ছুড়ে বোঁ করে দৌড়।—কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে একবারে কাটোয়ায় গিয়ে হাজির;—সে কান্না জীবনে আর তাঁ'র থামে নাই! জীবনে

আর কখনও কিছু তিনি বুঝ্‌তেও পার্‌লেন না। তাঁ'র ঠিক ওই "পরাণ হরিল বাঙ্গা নয়ন নাচনে।"

আসল প্রশ্নের এখনও কোন উত্তর দেওয়া হয়নি; শুধু বাঁশী শুনিলে কি ফল হয়, তারই একটু আভাস দেওয়া হ'লো! বাঁশরী কোথায় বাজে, কেন বাজে, এবং কে তা' শোনে, এইবার বল্‌চি। 'ভাগ্যবান্ জনে কেহ শুনিবারে পাবে"। বাঁশরী অবিশ্রান্ত ধারে ভাগীরথীর পূত শুভ্র ধারার মত, চন্দ্রালোকদীপ্ত জ্যোৎস্না প্লাবনের মত, প্রভাত-সূর্য্যের সোনার কিরণ প্রপাতের মত, সমস্ত বিশ্বকে, সমস্ত নরনারীর হৃদয় ক্ষেত্রকে আর্দ্র ও মধুরতায় সিক্ত করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের হৃদয়ের অন্তরতম ক্ষেত্র হইতে এবং এই বিশ্বের হৃদয়কেন্দ্র হইতে যে একটি মধুর শব্দ প্রতিনিয়ত শব্দিত হইতেছে, তা'র অপূর্ব্ব ছন্দে অবনীতলে এই বহির্বিচরণশীল-চিত্ত মৌন ও স্তব্ধ হইয়া যায়। আমরা সেই সঙ্গীতের অমৃত সলিলে আপাদমস্তক নিমজ্জিত হইতে পারিলেই, শীতল হইতে পারিব! তখন বাসনার সব ক্ষোভ মিটিয়া যাইবে, অভাবের কষাঘাত আর জর্জ্জরিত করিবে না। তখন যা' কিছু দেখিব, যা' কিছু শুনিব বা স্পর্শ করিব, সমস্তই অমৃতোপম বলিয়া বোধ হইবে! কিন্তু ডোবা চাই; একবার চোখ কান বুজে দেহের মমতা ত্যাগ করে, সেই অতল জলে ডুবে যাওয়া চাই। একবার আপনাকে হারিয়ে ফেলা চাই! যে 'তুপ্ তুপ্ করে' কেবল আপনাকে বাঁচাতে যায়,—সে আপনাকে আপনি ফাঁকি দেয়, সে বাঁচেনা, বাঁচিতে পারে না,—সে এই বাসনা সমুদ্রের কূলও দেখিতে পায় না। কবি বলেছেন—

"যো ডুবা সো পায়া হায় গভীরা পানি পৈঠ
হাম বাউরা ভুবন ডরে, রহে তীরপর বৈঠ"॥

ডুব্‌তে ভয়পেলে চল্‌বে না, গভীর জলের মধ্যে তলিয়ে যেতে হবে। যদি ভয় কর, তবে চির জন্মই এই জলের ধারে বসে থাকতে হবে; তৃষ্ণাও দূর হবে না, গাত্রও শীতল হবে না। কেঁদে কেঁদে এই মর্ম্মবেদনাই পুনঃ পুনঃ প্রকাশ কর্‌তে হবে—

অপার মধ্যেতস্থি বাসং তৃষ্ণাবিদজ্জয়িতারম্ মৃচা সুক্ষত্র মৃড়য়।
'আমি জলের মাঝারে বাস করি, তবু তৃষ্ণায় শুকায়ে মরি'।
আমায় সুখী কর, আমায় দয়া কর, আমার পিপাসা ঘুচাও হরি"।

ডুব্‌বার প্রধান অন্তরায় কি জান? সুখের একটা মিথ্যা ভুল ধারণা আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে আছে। ওটা মুছে ফেল্‌তে হবে; একেবারে 'ধুয়ে পুঁছে' ফেল্‌তে হবে। ভয় পেওনা; এটা খুবহ যে একটা শক্ত বা অসম্ভব ব্যাপার, তা' মনে করো না। কেবল একটু মগ্ন হবার যা' অপেক্ষা। সুখ সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা থাকায় এই ফল হয়েছে, যে আমরা সারাজীবন সেই মিথ্যা সুখের পিছনে পিছনে ছুটে বেড়াই, অথচ মরুভূমে মরীচিকার মত তা' কখনও আমাদের করতলগত হয় না। এই ক'রে সব জীবনটা ফুরিয়ে যায়! স্বপ্নেতে রেলগাড়ী চড়ে মনে হয়, কত দেশ—কত দূর পার হয়ে এসেছি; মনে খুব আমোদ হয়। তার পর জেগে উঠে দেখি, যেখানে শুয়েছিলাম সেই খানেই শুয়ে আছি; একটি পাও অগ্রসর হতে পারিনি! আমাদের জাগ্রত অবস্থাতেও ঠিক এই রকম দশা হয়। খুব ধুমধাম করে, কাজকর্ম্ম করে, ছুটোছুটি করে ভাবি,—ঢের কাজ হয়ে গেল। কিন্তু আসলে সব ফক্কিকার, আমাদের সমস্ত পরিশ্রমই পণ্ড হয়। কেবল ব্যর্থ চেষ্টার পরিশ্রমে মন প্রাণ ক্লান্ত হয়ে উঠে! তা'ই বল্‌ছি আসল সুখ কি জান? টাকা-কড়ি, ঘর-বাড়ী, গাড়ী-জুড়ি, মান, প্রতিপত্তি, বিদ্যা, প্রতিভা, এ সবগুলো সুখ নয়। তবে এ সব থাক্‌লে যদি কেউ বিগড়ে না যায়, তবে এদেরই সাহায্যে সুখ অন্বেষণ কর্‌তে পার। যদি এগুলো নাই থাকে—আর কেউ সুখ অন্বেষণ কর্‌তে চায়, তবে কি সে সুখের মুখ দেখ্‌তে পাবে না? পাবে বৈকি! সুখ ত' আর তোমার টাকা-কড়ি, মান-প্রতিষ্ঠার মধ্যে জুড়ে বসে নেই।

আসল সুখ যা', তা' ঠিক গগনোপম! গগনের পানে চেয়ে দেখ, তার কোথাও সীমা নাই। কোথাও শেষ নাই। আমরা তার সবখানি দেখ্‌তে পাই না বটে, কিন্তু যে টুকু দেখি তা'তেই মন ভরে যায়, প্রাণ তাকে অসীম বলে চিনে ফেলে। প্রাণ তার মধ্যে আপনাকে ছেড়ে দিয়ে বাঁচে। এই যে ভূমার মধ্যে আত্মবিসর্জ্জন, এই হল পরমানন্দ। কারণ 'নাল্পে সুখমস্তি'—অল্পের মধ্যে, সীমার মধ্যে, সুখ নাই। সেই জন্য জগতের যাবতীয় ব্রীহি, গো, ধন, স্ত্রী, কিছুতেই মানুষকে সুখী করিতে পারে না। সে ব্যাকুল হইয়া অনন্ত সুখের জন্য ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়। এই যে আমাদের ব্যাকুলতা, তা' সমস্তই সেই অসীমের নাগাল পাবার জন্য! যেই নাগাল পায়, সেই 'সে' আর সে থাকেনা। সেও

ঐ আকাশ হয়ে যায়। আকাশ হয়ে যায় বটে—কিন্তু বরাবর আকাশ হয়ে থাকে না; বোঁ করে তা' থেকে বেরিয়ে আসে। ঠিক যেমন জলের মধ্যে ডুব দিলে হয়; খানিকক্ষণ ডুবে আবার ভেসে উঠে! এই রকম ডোবা আর ভাসা, কর্‌তে কর্‌তে মানুষ সেই যথার্থ সুখের আস্বাদন বুঝ্‌তে পারে। তা' বড় মধুর, বড় স্নিগ্ধ, বড় শীতল, একবারে প্রাণ জুড়িয়ে দেয়! তখন আর তার অজানা, অবোঝা বলে আর কোন কিছু থাকে না—মানুষের এই রকম অবস্থাটি ঘটলেই, সে যেন শুন্‌তে পায়, কে যেন বাঁশী বাজিয়ে তা'কে ডাক্‌চে। সে তখন সেই বাঁশীর সুরে আপনার হৃদয়ের সুর বেঁধে ফেলে। তখন বাঁশী যে বাজায়, তাকেও সে ধরে ফেলে! তার পর, আর কি? তার পর এই সারা জীবন ধরে কান্নাকাটি, মাতামাতি চল্‌তে থাকে। কেবা জানে মৃত্যু, কেবা জানে জন্ম; কেবা জানে পর, কেবা জানে আপনার; কেবা জানে সুখ, কেবা জানে দুঃখ; কেবা জানে ভোগ, কেবা জানে ত্যাগ; কেবা বোঝে হেয়, কেবা চায় উপাদেয়—সবই এক অদ্ভুত গোচের অবস্থা হয়ে উঠে। সংসারের লোকে তাকে পাগল বলে, কেন না তা'দের সঙ্গে তা'র সুর মেলে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

(পদ্যানুবাদ।)

দ্বিতীয় অধ্যায়—সাংখ্যযোগ।

সঞ্জয় কহিলেন ;—

কৃপাবিষ্ট, বিষাদিত, অশ্রুপূরিত লোচন।
তাঁরে তবে হেন মতে কহিলা মধুসূদন॥ ১

শ্রীভগবান্ কহিলেন ;—

সঙ্কটে অর্জ্জুন! তব কোথা হ'তে উপস্থিত,
স্বর্গনাশী, কীর্ত্তিঘাতী এ মোহ অনার্য্যোচিত? ২
—তোমারে সাজেনা, পার্থ! ছাড় দশা ক্লীব সম।
হৃদয় দৌর্ব্বল্য তুচ্ছ ত্যজি উঠ অরিন্দম॥ ৩

অর্জ্জুন কহিলেন ;—

পূজ্য ভীষ্ম দ্রোণে রণে, হে মধুসূদন !
যুঝি বাণে বাণে কেমনে ? শত্রুমর্দ্দন ! ৪
মহাত্মা গুরুজনে না বধি বরং
ইহলোকে শ্রেয়ঃ ভিক্ষান্ন ভোজন ॥
গুরুনাশি' হবে ভবেই ভুঞ্জিতে
অর্থ কাম ভোগ শোণিত রঞ্জিতে ॥ ৫
বিজিত হই বা লভি মোরা জয়,
না বুঝি শ্রেয়ঃ কি মাঝেতে উভয় ॥
বধিয়া—যা'দিগে, না চাহি জীবন
হেরি অগ্রে সেই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ ॥ ৬
কার্পণ্য দোষেতে* স্বভাবাবসন্ন,
সুধি আমি চিত্ত ধর্ম্ম-মোহাচ্ছন্ন
—কিবা শ্রেয়ঃ মোরে কহ তা' নিশ্চিতে,
শিষ্য আমি তব, শিখাও আশ্রিতে । ৭
সমর্থ না কিছু হেরি দূর করে
শোক মম ইন্দ্রিয় শোষণ করে ।
যাহা ভবে নির্ব্বৈর সমৃদ্ধ রাজ্য
না দেবের প্রভুত্ব লাভে নিবাচ্চ ॥ ৮

সঞ্জয় কহিলেন—

এত বলি হৃষীকেশে, গুড়াকেশ পরন্তপ, †
"করিব না যুদ্ধ" বলি, গোবিন্দে, হন নীরব ॥৯
উভসেনা মধ্যস্থলে, তবে বিলাপ নিরতে ।
তাঁরে, হৃষীকেশ হাসি কহে, ভারত ! এমতে ॥১০

---

* ভিন্ন ভিন্ন টীকাকার এই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন ; সে জন্ম মূলের ব্যবহৃত শব্দটাই যথাযথ রাখা হইল। এই অনুবাদে অন্যান্য স্থলেও এই নীতির অনুসরণ করা হইয়াছে।

† পাঠান্তরে—এতবলি গুড়াকেশ হৃষীকেশে, পরন্তপ।

শ্রীভগবান্ কহিলেন—

বিলাপিছ তুমি, যারা অশোচ্য তা'দের তরে;
জ্ঞানী মত পুনঃ কহিছ বচন।
অথচ জীবিত কিম্বা মৃত, কাহারো কারণ
বিলাপ করে না, কভু বিজ্ঞ জন॥ ১১

আমি না ছিলাম কভু, তুমি কিম্বা রাজগণ,
জন্মিব না পরে মোরা সবে, নহে তো এমন॥ ১২

কৌমার যৌবন জরা এ দেহে যথা, দেহীর
দেহান্তর প্রাপ্তি তথা, তাহে নহে মুগ্ধ ধীর॥ ১৩

কৌন্তেয়! ইন্দ্রিয়, আর বিষয় সংসর্গে তাব
শীত উষ্ণ, সুখ দুঃখ সম্ভবে।
উদয় বিলয় গ্রস্ত অনিত্য সেই সমস্ত
সে হেতু, ভারত! সহ সে সবে॥ ১৪

সুখে-দুঃখে সমভাব, যে তাহে না পায় কষ্ট,
অমৃতত্ব কল্প হয় সে বীর, পুরুষ শ্রেষ্ঠ! ১৫
অনিত্য রহে না চির, নিত্যের নাহি বিলয়।
তত্ত্বদর্শী দৃষ্ট হেন অন্ত তাদের উভয়॥ ১৬
অবিনাশী জেনো তাহে ব্যাপ্ত এসব যাহে।
নাশিতে অব্যয়ে সেই, কেহই সমর্থ নহে॥ ১৭
নিত্য, অপ্রমেয়, অনাশী দেহীর—দেহ যত
উক্ত অন্তযুক্ত; কর সেহেতু যুদ্ধ, ভারত! ১৮
যে বুঝে ইহারে হন্তা, বা যে ভাবে ইহা হত,
অজ্ঞ উভয়ে; ইহা না হানে, না হয় হত॥ ১৯
সেই—ইহা, না জন্মে, না মরে যে কখন,
অথবা হইয়া, না হয় আবার।
অজ, চিরসম, শাশ্বত যে পুরাতন;—
দেহ নাশে হয় না নাশ তাহার॥ ২০

অনন্ত, অজন্ম, নিত্য, অক্ষয় বলি' ইহারে—
জানে যে জন পার্থ! সে কারে, বা কে তারে, মারে ? ২১
যথা নর জীর্ণ বস্ত্র করিয়া বর্জ্জন অপর নূতন বস্ত্র লয়।
দেহী তথা জীর্ণ দেহ করি বিসর্জ্জন নব দেহ করেন আশ্রয় ॥ ২২
ছেদন করে না অস্ত্র তারে, অনল দাহন।
বারি নাহি দ্রবে তাহে, কিম্বা শুকায় পবন ॥ ২৩
অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অদ্রাব্য, অশোষণ-প্রবণ,
নিত্য, সর্ব্বব্যাপ্ত, স্থির, অচল সে সনাতন ॥ ২৪
অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অবিকার্য্য, কথিত এমন।
হেন জানি' তাহে, তব যুক্ত নহে তো শোচন ॥ ২৫
নিত্য জাত, নিত্য মৃত, যদি তাহে মনে কর।
শোক, মহাভুজ! তুমি তবু না করিতে পার ॥ ২৬
জন্মিলে মরিতে হয়, মরিলে জন্ম নিশ্চয়।
অনিবার্য্য হেতু, তাহে বিলাপ উচিত নয় ॥ ২৭
আদিতে অব্যক্ত জীব, মধ্যে মাত্র ব্যক্ত হয়।
নিধনে অব্যক্ত পুনঃ, তবে কিবা দুঃখ তায় ॥ ২৮

আশ্চর্য্যপ্রায় তাহে কেহ নেহারে,
আশ্চর্য্যপ্রায় কহে পরে তাহারে,
আশ্চর্য্যপ্রায় অন্যে শুনে তাহারে,
শুনেও জানিতে তারে কেহ নারে ॥ ২৯

ভারত! অব্যয় সদা দেহী, সর্ব্বদেহ স্থিত।
সর্ব্বজীব তরে তাই, শোক তব অনুচিত ॥ ৩০
স্বধর্ম্ম করিয়া লক্ষ্য, সঙ্কোচ নহে বিধেয়।
ধর্ম্ম হেতু যুদ্ধ চেয়ে ক্ষত্রিয়ের নাহি শ্রেয়ঃ ॥ ৩১
স্বতঃ উপনীত যুদ্ধ, যেন মুক্ত স্বর্গদ্বার!
হেন লভে সে ক্ষত্রিয়, সুখী যে, পৃথাকুমার! ৩২
হেন ধর্ম্মযুদ্ধ তুমি না করিলে, (ধনঞ্জয়)!
স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তি ত্যজি' করিবে পাপ সঞ্চয় ॥ ৩৩

পরন্তু ঘোষিবে তব চিরনিন্দা সর্ব্বজনে।
মরণ অধিক হয় কুযশ সমর্থ-জনে ॥ ৩৪
ভয়ে ক্ষান্ত রণে তুমি, ভাবিবেন যোধ সব,
ছিলে বহুমান্য যেথা, লভিবে সেথা লাঘব ॥ ৩৫
শত্রুগণ তোমা বহু অকথ্য ভাষিবে, আর
নিন্দিবে তোমার বীর্য্যে ;—কি দুঃখ অধিক তা'র ॥ ৩৬
হ'ত যদি, স্বর্গ লাভ ; হবে পৃথ্বীভোগ, জয়ে।
এহেতু কৌন্তেয় ! উঠ, সমরে কৃত নিশ্চয়ে ॥৩৭
সুখ দুঃখ, লাভ হানি, তুল্য ভাবি' জয়াজয়,
রণেতে উদ্যুক্ত হও, হইবে না পাপাশ্রয় ॥ ৩৮

সাংখ্য তত্ত্বে ইহা তোমা হইল কথিত, শুন এবে বুদ্ধিযোগ মতে।
যেবা বুদ্ধিযুক্ত হলে তুমি, পৃথা-সুত। পাবে মুক্তি কর্ম্মবন্ধ হ'তে ॥৩৯ *

প্রারম্ভের নাহি নাশ, এতে নাই প্রত্যবায়।
স্বল্প লাভেও এ ধর্ম্ম ; মহা ভয়েতে তরায় ॥৪০
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি এক, হে কুরুনন্দন !
অসীম অব্যবসায়ী বুদ্ধি, শাখা অগণন ॥ ৪১
ভোগৈশ্বর্য্য লক্ষ্যভূত-জন্মকর্ম্ম অনুবন্ধী
—ক্রিয়া বিশেষ বহুল—[যাগ যজ্ঞাদি সম্বন্ধী]
পুষ্পিত বচন যত, কহে বেদ-বাদরত,
"(উহা ভিন্ন) নাহি অন্য" ইতি বাদী মূঢ় যত ;
কামনার্থী, যারা তাহে অপহৃতচিত, পার্থ।
অথবা যাহারা ভাবে স্বর্গমাত্র পরমার্থ ;
ভোগৈশ্বর্য্যে রত আর, তাহাদের (কদাচিত)
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি নাহি হয় সমাহিত ॥৪২—৪৪

ত্রৈগুণ্য বিষয় হয় বেদ সমুদয় ;
ত্রৈগুণ্য অতীত তুমি হও, ধনঞ্জয় !†

---

* অথবা মতান্তরে—সাংখ্যতত্ত্বে এই বুদ্ধি হইল কথিত, শুন এবে ইহা যোগ মতে।

† মূলে সম্বোধনে "অর্জ্জুন" নাম আছে।

(শীতোষ্ণাদি) দ্বন্দ্ব শূন্য, হও অপ্রমত্ত,
বিরত রক্ষণার্জ্জনে, নিত্য সত্ত্বাবস্থ ॥৪৫
সর্ব্বত্র প্লাবিত হলে ক্ষুদ্র জলাশয়ে
(মানবের) কার্য্য যতক্ষণ।
(ব্রহ্মেরে) জানিলে পরে, ব্রহ্মনিষ্ঠের রহে
প্রয়োজন বেদে ততক্ষণ ॥৪৬
কর্ম্মেতে কেবল তব, হয় যেন অধিকার,
কদাচ না হয় ফলে অধিকার।
ফলের প্রত্যাশে তুমি, কর্ম্মে না হও প্রবৃত্ত
অকর্ম্মত্বে রতি না হৌক তোমার ॥৪৭
যোগস্থ হইয়া, আর ত্যজিয়া আসক্তি
কর কর্ম্ম তুমি, ওহে ধনঞ্জয়।
সম ভাব হয়ে উভে—সিদ্ধি বা অসিদ্ধি,
সমত্বই "যোগ" বলি উক্ত হয় ॥৪৮
বুদ্ধি-যোগ চেয়ে কর্ম্ম অতিহীন, ধনঞ্জয়।
বুদ্ধির শরণ লহ, কৃপণ যে ফলাশয় ॥ ৪৯
বুদ্ধি-যোগাশ্রিত নরে ইহকালে পরিহরে
সুকৃত দুষ্কৃত উভ কর্ম্মফল।
অতএব কর বরণ, তুমি যোগের কারণ।
সেই "যোগ"—যাহা কর্ম্মেতে কৌশল* ॥ ৫০
কর্ম্ম-জাত ফল ত্যজি' বিজ্ঞজন বুদ্ধিযুক্ত,
অনাময় ধামে যায়, জন্মবন্ধে হ'য়ে মুক্ত ॥৫১
যখন তোমার বুদ্ধি উত্তরিবে মোহ-বন,
লভিবে বৈরাগ্য তুমি শ্রুতি শ্রোতব্যে তখন ॥৫২
শ্রুতিতে বিক্ষিপ্ত তব বুদ্ধি অচঞ্চলে যবে,†
সমাধিতে রবে দৃঢ়, হবে লাভ যোগ তবে ॥৫৩

* অথবা পাঠান্তরে—[সেই যোগ,—যাহা কর্ম্ম সুকৌশল।]

† অথবা পাঠান্তরে—অশ্রুতি বিক্ষিপ্ত তব অর্থাৎ—[বেদার্থ সংসিদ্ধি তব]

অর্জ্জুন কহিলেন—

সমাধিস্থ, স্থিতপ্রজ্ঞ যিনি, কি তাঁর লক্ষণ ?

বাক্যাসন কেমন, কেশব! কিবা আচরণ ? ৫৪

শ্রীভগবান্ কহিলেন—

মনোগত সর্ব্বকাম পার্থ! ত্যাগ করে যবে

আত্মাতেই আত্মতুষ্ট, স্থিতপ্রজ্ঞ কহে তবে॥ ৫৫

দুঃখে মন অনুদ্বিগ্ন, সুখে যেবা স্পৃহা-শূন্য,

রাগ, ভয়, ক্রোধ হীন, মুনি স্থিতপ্রজ্ঞগণ্য॥ ৫৬

সর্ব্বত্র যে স্নেহশূন্য, লভি যেবা হিতাহিত,

না করে আনন্দ দ্বেষ, প্রজ্ঞা তার প্রতিষ্ঠিত॥ ৫৭

কূর্ম্মের অঙ্গের মত ইন্দ্রিয়েরে প্রত্যাহৃত

যে করে বিষয় হতে, প্রজ্ঞা তার প্রতিষ্ঠিত॥ ৫৮

ভোগে ক্ষান্ত দেহী হ'লে, ভোগ্য তার যায় চলে

ছাড়ি লালসা পশ্চাতে।

লালসা নিবৃত্ত হয়, (স্থিত প্রজ্ঞ যেবা হয়)

পরাৎপরের সাক্ষাতে॥ ৫৯

বিবেকী জনও যদি কৌন্তেয়! যতন করে,

দুরন্ত ইন্দ্রিয়গণে সবলে মনেরে হরে॥ ৬০

সংযমি' সে সব যোগী হয় মৎপরস্থিত।

—স্ববশে ইন্দ্রিয় যার, প্রজ্ঞা তার প্রতিষ্ঠিত॥ ৬১

বিষয় ধ্যায়িলে লোক, তাহে আসক্তি জন্ময়ে।

আসক্তিতে কাম, কাম হতে ক্রোধ উপজয়ে॥ ৬২

ক্রোধেতে উদ্ভবে মোহ, মোহে হয় স্মৃতিভ্রংশ।

স্মৃতিভ্রষ্টে বুদ্ধি নষ্ট, তাহে হয় জীব ধ্বংস॥ ৬৩

আসক্তি বিরক্তি হীন, স্বাধীন ইন্দ্রিয়ে ভোগি'

বিষয়, প্রসাদ লভে বশীকৃত-চিত (যোগী)॥ ৬৪

প্রসাদ লভিলে হয়, সর্ব্বদুঃখ তিরোহিত।

প্রসন্ন চেতার হয় শীঘ্র বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত॥ ৬৫

অযোগীর নাহি বুদ্ধি, না বহে তা'র ভাবনা।
(তত্ত্ব) চিন্তা বিনা শান্তি কোথা ; সুখ কোথা শান্তি বিনা ? ৬৬
চঞ্চল ইন্দ্রিয় মাঝে যেটী মন অনুসরে,
সে হরে প্রজ্ঞায় তার, বায়ু নৌকা যে সাগরে ॥ ৬৭
তাই মহাভুজ! যার সর্ব্বমতে নিগৃহীত
ইন্দ্রিয় বিষয় হতে, প্রজ্ঞা তার প্রতিষ্ঠিত ॥ ৬৮
সর্ব্বজীবে নিশা যবে, সংযমী জাগিয়া রহে।
জাগে যথা ভূতগণ, দ্রষ্টা মুনি নিশা কহে ॥ ৬৯
যথা ভরন্ত তবু অচল স্থির
সাগরেতে মিশে নদ নদীগণ।
তেমতি কামনা মিলয়ে যে নরে,
সে পায় শান্তি, নহে কামার্থী জন ॥৭০
যে জন কামনা ত্যজি' সব, নিস্পৃহ বিচরে
নির্ম্মল, নিরহঙ্কার, সেই শান্তি লাভ করে ॥৭১
ব্রহ্মে নিষ্ঠা এই, পার্থ! নহে মুগ্ধ তা'হে জ্ঞান,
অন্তিমে মাত্র রৈলে ইথে, লভে ব্রহ্ম নির্ব্বাণ ॥

(ক্রমশঃ) শ্রীভবেন্দ্র নাথ দে।

ভিক্ষু গীতা।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

(১)

একদা ব্রহ্মাদি দেবগণ দ্বারকায় আগমন করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বহু স্তব করিয়া স্বধামে যাইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়া কহিলেন;—"হে অখিলাধার! এক্ষণে আপনার দেবকার্য সম্পন্ন হইয়াছে এবং যদুকুলও ব্রহ্মশাপে নষ্টপ্রায় হইয়াছে; অতএব যদি ইচ্ছা হয় তবে স্বীয় পরমধাম বৈকুণ্ঠে আগমন করুন এবং লোক ও লোকপাল সহিত বৈকুণ্ঠ-কিঙ্কর আমাদিগকে রক্ষা করুন।" তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,

"হে বিবুধেশ্বর! তুমি যাহা কহিলে, তাহা পূর্ব্বেই আমি স্থির করিয়াছি। আমি তোমাদিগের সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছি, এবং ভূমির ভারও অবতারিত করিয়াছি। বলিবে কি, বীর্য্য-শৌর্য্যযুক্ত সম্পদ্ দ্বারা উদ্ধত, অন্যের দ্বারা অবধ্য সর্ব্বলোকজয়েচ্ছু, এই যাদবকুলকে আমি বেলাদ্বারা মহাসাগরের ন্যায় রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। যদি আমি এই বলদৃপ্ত বিপুল যদুকুলকে ধ্বংস করিয়া না যাই, তাহা হইলে ইহারা ব্যবহার-সীমা লঙ্ঘন করিয়া সমুদায় লোক বিনষ্ট করিবে। হে ব্রহ্মন্! এক্ষণে ব্রহ্মশাপ দ্বারা এই কুল নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। অতএব এ কার্য্য শেষ করিয়া, তোমার ভবন হইয়া, আমি বৈকুণ্ঠ গমন করিব।" তখন ব্রহ্মা লোকনাথ হরি কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক, দেবগণের সহিত স্বধামে গমন করিলেন। ইহার পরেই দ্বারকাপুরীতে নানা উৎপাত সকল উপস্থিত হইতে লাগিল, তদবলোকনে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, দ্বারকাবাসী যদুবৃদ্ধগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "হে আর্য্যগণ। চতুর্দ্দিকে সুমহৎ উৎপাত উপস্থিত হইতেছে এবং আমাদিগের কুলে দুরত্যয় ব্রহ্মশাপও হইয়াছে, অতএব যদি জীবনধারণ করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে আমাদিগের আর এখানে বাস করা উচিত হয় না। চল অদ্যই আমরা সুমহৎ পুণ্যজনক প্রভাসতীর্থে গমন করি, আর অপেক্ষা করিব না।" তখন যদুবৃদ্ধগণ শ্রীকৃষ্ণের এবম্প্রকার বাক্য শুনিয়া সকলেই প্রভাস যাত্রার আযোজন করিতে লাগিলেন। এ দিকে ভক্তচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম সখা মহাত্মা উদ্ধব, (যিনি বৃহস্পতির সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন) ইহা দেখিয়া ও ভগবদুক্তি শ্রবণ করিয়া এবং দ্বারকায় মহা মহা উৎপাত দর্শন করিয়া, বিজন প্রদেশে গমন পূর্ব্বক, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম ও পদদ্বয় ধারণ করত কহিতে লাগিলেন, "হে দেবদেবেশ, হে যোগেশ, হে পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তন, আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, আপনি এই বিপুল যদুকুল সংহার করিয়া মর্ত্ত্যলোক ত্যাগ করিবেন। যেহেতু আপনি সমর্থ হইয়াও এই বিপ্রশাপের প্রতিবিধান করিতেছেন না। সেই জন্য ক্ষণকালের নিমিত্তও আপনার পাদপদ্ম পরিত্যাগ করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না; অতএব আমাকে আপনার পরমধামে লইয়া চলুন।" ভগবান্ কহিলেন, "হে মহাভাগ। তুমি যাহা অনুমান করিয়াছ তাহা সত্য, আমি তাহাই করিতে ইচ্ছা

করিয়াছি। হে উদ্ধব, আর সপ্তম দিবসের পর এই যদুকুল পরস্পর বিবাদ করিয়া, ব্রহ্মশাপরূপ অগ্নিতে ভস্ম হইয়া যাইবে, এবং সমুদ্রও আমার এই দ্বারকাপুরীকে গ্রাস করিবে। হে সাধো, আমি যখন এই লোক পরিত্যাগ করিব, তখন এই লোকে আর মঙ্গল থাকিবে না, এবং অচিরাৎ কলি আসিয়া ইহাকে পরাজয় করিবে। সখে, আমি মর্ত্ত্যলোক ত্যাগ করিলে, তুমি আর ক্ষণকালের নিমিত্তও এখানে বাস করিও না, কেন না, কলির লোক সকল অত্যন্ত অধার্ম্মিক হইবে। অতএব তুমি স্বজন বন্ধু সকলের মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া, স্নেহশূন্য হইয়া, সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক, আমাতে মনো-নিবিষ্ট করিয়া, সমদৃষ্টি হইয়া পৃথিবী বিচরণ করিবে। হে সাধো, তুমি যে আমাকে বলিলে, 'আপনার ধামে আমাকে লইয়া চলুন', দেখ সখে, লোক আপনার শক্তিতেই আমার লোক ও অপরাপর লোকে গমন করিয়া থাকে। হে মহাত্মন্! তুমিও তোমার আত্মশক্তি প্রভাবে আমার লোকে যাইতে সমর্থ হইবে, তবে যাইবার পন্থা আমি তোমাকে বলিয়া দিতেছি, তুমি সেই পথ ধরিয়া অনায়াসে আমার লোকে যাইতে পারিবে।" এই বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, প্রিয় ভক্ত উদ্ধবকে তদ্ধামে গমনের সুগম পথ সকল বলিতে আরম্ভ করিলেন।

এই কথোপকথনে নানা যোগবিষয়িণী কথা উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে মহাত্মা উদ্ধবের প্রশ্নানুসারে ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কি করিয়া পরের দুর্ব্বাক্য ও নিন্দাবাদ প্রভৃতি সহ্য করা যায়, সেই বিষয় বলিতে আরম্ভ করি-লেন। অদ্য সেই বিষয় আমি পাঠকগণকে উপহার দিবার ইচ্ছা করিয়াছি; আপনারা মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলেই আমি সফল মনোরথ হইব। মহাত্মা উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে বিশ্বাত্মন্, যেহেতু প্রকৃতির বল অনতিক্রমণীয়, অতএব নিয়ত আপনার চরণাশ্রিত শান্তব্যক্তি ব্যতীত অসৎলোককৃত অনিষ্ট ও দুর্ব্বাক্যাদি অতিক্রম করা, পণ্ডিতদিগের পক্ষেও দুঃসহ বিবেচনা করি।" ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, প্রিয় ভক্ত উদ্ধবের এই বাক্য অভিনন্দন করিয়া কহিতে লাগিলেন, যথা—

শ্রীভগবান্ উবাচ,

"বার্হস্পত্য সনাহস্ত্যত্র সাধুর্বৈদুর্জ্জনেরিতৈঃ।
দুরুক্তৈর্ভিন্নমাত্মানং যঃ সমাধাতুমীশ্বরঃ॥ ১১২৩।২।

ন তথা তপ্যতে বিদ্ধঃ পুমান্ বাণৈস্তু মর্ম্মগৈঃ।
যথা তুদন্তি মর্ম্মস্থাহ্যসতাং পুরুষর্ষবঃ॥ ১১।২৩।৩।

ভগবান্ কহিলেন—হে বৃহস্পতির শিষ্য, দুর্জ্জন কথিত দুর্ব্বাক্য দ্বারা ক্ষুভিত মনকে সমাধান করিতে সমর্থ হয়, এমৎ সাধু ব্যক্তি ইহলোকে প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর। মর্ম্মবেদনাদায়ক অসৎ লোকের নিষ্ঠুর বাক্যরূপ বাণদ্বারা যেমন হৃদয়ে ব্যথা জন্মায়, মর্ম্মভেদী বাণদ্বারা বিদ্ধ হইলেও তদ্রূপ ব্যথা জন্মায় না। হে উদ্ধব! এ বিষয়ে এক মহৎ পুণ্যজনক ইতিহাস কথা লোকে কহিয়া থাকে; আমি তোমার নিকট বলিতেছি তুমি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। দুর্জ্জন কর্ত্তৃক পরিভূত ধৈর্য্যশালী অথচ নিজ কর্ম্ম বিপাক স্মরণশীল কোন এক ভিক্ষু দ্বারা গীত হইয়াছে।

পূর্ব্বকালে অবন্তিনগরে (মালব) শ্রীসম্পন্ন ধনাঢ্য এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তিনি অত্যন্ত কামী, লুব্ধ ও অতি কোপন স্বভাব ছিলেন। কিন্তু তিনি স্মৃত্যুক্ত কদর্য্য (অর্থাৎ শাস্ত্রে যাহাকে নিন্দা করিয়াছে) কৃষিবাণিজ্যবৃত্তি দ্বারা বহু ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তিনি জীবনে কখন অতিথি বা জ্ঞাতিদিগকে ভোজন দান ত' দূরের কথা কখন মিষ্ট বাক্যেও সন্তুষ্ট করেন নাই। সুতরাং তাঁহার গৃহে কখন কেহ যাতায়াত করিত না, তিনি একাকী আপনার গৃহে অবস্থান করিতেন। এমন কি মনে যদি কখন কোন বস্তুর কামনা হইত, অর্থ ব্যয় ভয়ে আপনার আত্মাকে পর্য্যন্ত বঞ্চনা করিতে তিনি পরাঙ্মুখ হইতেন না। সেই দুঃশীল ব্রাহ্মণ নিজপুত্র ও বন্ধুগণের সহিত সর্ব্বদাই কলহ করিতেন; এ কারণে স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রভৃতি কেহই তাঁহার কথা শুনিত না। সেই যক্ষ-বিত্ত-কুশল, উভয় লোকভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ, সকলেরই বিরক্তিভাজন হইয়াছিলেন। হে উদ্ধব! আত্মীয় পোষ্যবর্গের ও কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনাদর জন্য পুণ্য পথ হইতে বিচ্যুত, সেই ব্রাহ্মণের বহু কষ্টের অর্জ্জিত অর্থ কালে নষ্ট হইয়া গেল। কিছু তাঁহার জ্ঞাতিরা গ্রহণ করিল; কিছু দস্যুগণ, কিছু অন্য লোকে গ্রহণ করিল। কিছু গৃহদাহাদিরূপ দৈববিপাকে নষ্ট হইয়া গেল। (কারণ যাহারা উপার্জ্জিত অর্থ যথোচিত বিভাগ করিয়া দেন না, দৈববশতঃ তাহা ঐরূপে বিভক্ত হইয়া যায়।) এইরূপে ধন সম্পত্তি নষ্ট হইলে, আত্মীয় জনগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ব্রাহ্মণ দুরত্যয় চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইলেন। তখন সেই দীর্ঘ চিন্তায় মগ্ন, ধননাশ

সন্তপ্ত, বাষ্পকণ্ঠ, খেদান্বিত, ব্রাহ্মণের মহান্ বৈরাগ্য আসিয়া উপস্থিত হইল। পরে ব্রাহ্মণ কহিতে লাগিলেন, "অহো কি কষ্ট, বৃথা আমার আত্মা অনুতাপিত হইতেছে। আমার আত্মা না ধর্ম্মের নিমিত্ত না কামনার নিমিত্ত হইল। এতদিন আমি কেবল বৃথা অর্থের নিমিত্তই এত কষ্ট পাইলাম। কদর্য্য লোকের ধনসম্পত্তি প্রায় সুখের নিমিত্ত হয় না। তাহাদিগের ইহলোকে প্রায় অনুতাপ, এবং পরলোকে নরক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। চৌর্য্য, হিংসা, মিথ্যা, দম্ভ, কাম, ক্রোধ, বিস্ময়, মত্ততা, ভেদ, বৈর, অবিশ্বাস, স্পর্দ্ধা, স্ত্রী, দ্যূত ও মদ্য এই পঞ্চদশ প্রকার মনুষ্যদিগের অর্থ ঘটিত অনর্থ; অতএব শ্রেয়ার্থী ব্যক্তি অর্থরূপ অনর্থকে দূর হইতে পরিত্যাগ করিবেন।

"স্তেয়ং হিসানৃতং দম্ভঃ কাম ক্রোধঃ স্ময়োমদঃ।
ভেদো বৈরমবিশ্বাষঃ সংস্পর্দ্ধা ব্যসনানিচ।
এতে পঞ্চদশানর্থা হ্যর্থমূলং মতা নৃণাং।
তস্মাদানর্থ মর্থাখ্যং শ্রেয়োহর্থী দুরতস্তজেৎ ॥১১।২৩।১৮—১৯

ধনের নিমিত্ত ভ্রাতৃভেদ হয়, স্ত্রী, পিতা, বান্ধব প্রভৃতির সহিত অপ্রীতি ঘটে। এমন কি ধন হইতে অতীব প্রিয়লোকও সদ্য শত্রু হইয়া উঠে।

দেব-দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া, বিশেষতঃ তন্মধ্যে আবার ব্রাহ্মণ-জন্ম প্রাপ্ত হইয়া, সামান্য স্বার্থের নিমিত্ত যে তাহাকে অনাদর করে, সেই নরাধমই অশুভাগতি প্রাপ্ত হয়। স্বর্গাপবর্গের দ্বার-স্বরূপ এই লোক প্রাপ্ত হইয়া, অনর্থমূল অর্থে কোন্ ব্যক্তি আসক্ত হয়? যে ব্যক্তি দেবতা, ঋষি, পিতৃ, ভূত, জ্ঞাতি, বন্ধু, ও আত্মাকে ধনবিভাগ করিয়া না দিয়া, যক্ষবিত্ত অবলম্বন করে,— সেই দুরাত্মাই অধঃপতিত হয়। এতকাল ব্যর্থ অর্থচিন্তায় প্রমত্ত হইয়া, আমার অর্থ, বয়স, বল সকলি গেল। অতএব যে অর্থ দ্বারা সমর্থ লোকেরা সিদ্ধ হয়, আমি এখন বৃদ্ধ হইয়া, তাহা দ্বারা কি সাধন করিব? ভাল, আমি না হয় মূর্খ; কিন্তু দেখিতে পাই বিদ্বান্ ব্যক্তিও বৃথা অর্থচিন্তা দ্বারা পুনঃ পুনঃ ক্লেশ পায়। অতএব আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, কোন এক ব্যক্তির মায়া দ্বারা লোক সকল বিমোহিত হইতেছে। এক্ষণে দেখিতেছি মৃত্যু কর্ত্তৃক গ্রাস্যমান ব্যক্তির ধনাদি কি করিবে? ধনেতেই বা তাহার কি প্রয়োজন? অতএব আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ভগবান্ সর্ব্বদেবময় হরি, আমার

প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, আমাকে এই আত্মার ভেলা-স্বরূপ বৈরাগ্য-দশা প্রদান করিয়াছেন। আর আমি ধনাদির জন্য দুঃখ করিব না; ধনের অবস্থা ভগবান্ সর্ব্বদেবময় হরি আমাকে কৃপা করিয়া উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। আর আমি বিষয় বলিয়া রোদন করিব না; আহা! আমি কি কষ্ট না পাইতেছিলাম। অদ্য হইতে আমি তপস্যা দ্বারা স্বীয় অঙ্গ শোধন করিব; এবং যদি তাহাতে সিদ্ধ হইতে পারি, তাহা হইলে আত্মাতে সন্তুষ্ট হইয়া অপ্রমত্ত-ভাবে নিখিল ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হইব। ত্রিভুবনেশ্বর দেবতারা আমার প্রতি তদ্বিষয়ে অনুগ্রহ করুন। যেহেতু তাঁহাদিগের কৃপাতে নির্জ্জীব পদার্থও মুহূর্ত্তকাল মধ্যে ব্রহ্মলোক সাধনে সমর্থ হয়।' হে উদ্ধব। মনে মনে এইরূপ অভিপ্রায় করিয়া সেই অবন্তীদেশীয় ব্রাহ্মণ, হৃদয় হইতে অহঙ্কারাদি উন্মোচন করত মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক শান্তভাবে ভিক্ষুকাশ্রম অবলম্বন করিলেন, এবং সংযতচিত্তে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন ও ভিক্ষার জন্য সঙ্গরহিত হইয়া অতীব দীনভাবে গ্রামে নগরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। হে উদ্ধব! তখন অসৎ লোকেরা সেই বৃদ্ধ মলিন ভিক্ষুককে দেখিয়া নানা প্রকার কটুবাক্য দ্বারা অপমান করিতে লাগিল। আবার কেহ তাহার ত্রিদণ্ড, কেহ কমণ্ডলু, কেহ আসন, কেহ অক্ষমালা, কেহ তাহার কন্থা, ও কেহ চির বস্ত্র, পরিহাসার্থ তাহাকে দেখাইয়া গ্রহণ করিতে লাগিল। সখে উদ্ধব! সে সমস্ত দিন ভিক্ষা করিয়া যাহা কিছু প্রাপ্ত হইয়া, কোন নদীতটে যাইয়া ভোজন করিবার জন্য উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে যত সব পাপ-বুদ্ধি লোকেরা, তাহার মস্তকে থু থু, ও প্রস্রাব করিয়া দিতে লাগিল। যখন দেখিল কিছুতেই তিনি কথা কহিলেন না, তখন ঐ সকল দুর্জ্জন ব্যক্তিরা তাহাকে কথা কওয়াইবার জন্য নানা প্রকার তাড়না আরম্ভ করিল, কেহ চোর বলিয়া প্রহার করিতে উদ্যত, কেহ কেহ মার মার শব্দ করিয়া রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ শঠ ধর্ম্মধ্বজী ইত্যাদি শ্লেষ বাক্যে তিরস্কার করিতে লাগিল। কোন জন অপর কাহাকে সম্বোধন করিয়া বলি-তেছে, "ওহে। এটা মৌনী, যেন সাক্ষাৎ বক ধার্ম্মিক বসিয়া আছে, ধৈর্য্য দেখিতেছ যেন গিরিবৎ অচল অটল, মুখে কথাটি নাই; আহা তোমার এ মুখে কি কথা নাই?" এই বলিয়া কোন দুরাত্মা তাঁহার মুখে আপন

বায়ু পরিত্যাগ করিয়া উচ্চ হাস্য করিতে লাগিল। তখন সেই ধৈর্য্যশালী মলিন ভিক্ষুক এই সকল উপদ্রব সহ্য করিয়া আপনা আপনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, 'এই যে দৈবাগত ভৌতিক দৈবিক দুঃখ, ইহা আমার ভোক্তব্য রূপে বিবেচনা করা উচিত।' হে উদ্ধব! পরে সেই মহাত্মা ক্ষমাশীল ভিক্ষু, ধর্ম্মধ্বংসকারী নরাধমগণ কর্ত্তৃক পরিভূত হইয়াও সাত্ত্বিক ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক স্বধর্ম্মে থাকিয়া এই গাথা গান করিতে লাগিলেন, যথা—

"নায়ং জনো মে সুখদুঃখহেতু র্ন দেবতাত্মা গ্রহকর্ম্মকালাঃ।
মনঃ পরং কারণমামনন্তি সংসারচক্রং পরিবর্ত্তয়েদ্ যৎ॥ ভা ১১।২৩।৪২
দানং স্বধর্ম্মো নিয়মো যমশ্চ, শ্রুতঞ্চ কর্ম্মাণি চ সদ্‌ব্রতানি।
সর্ব্বে মনোনিগ্রহলক্ষণান্তাঃ, পরো হি যোগো মনসঃ সমাধিঃ। ১১।২৩।৪৫
সমাহিতং যস্য মনঃ প্রশান্তং, দানাদিভিঃ কিংবদ তস্য কৃত্যম্।
অসংযতং যস্য মনোবিনশ্যদ্দানাদিভিশ্চেদপরং কিমেভিঃ॥ ১১।২৩।৪৬
মনোবশেঽন্যে হ্যভবন্ স্মদেবা, মনশ্চ নান্যস্য বশং সমেতি।
ভীষ্মো হি দেবঃ সহসঃ সহীয়ান্ যুঞ্জ্যাদ্বশেতং স হি দেবদেবঃ। ১১।২৩।৪৭
তং দুর্জ্জয়ং শত্রুমসহ্যবেগম্ অরুন্তুদং তন্ন বিজিত্য কেচিৎ।
কুর্ব্বন্ত্যসদ্‌বিগ্রহমত্র মর্ত্ত্যৈর্মিত্রাণ্যুদাসীনরিপূন্ বিমূঢ়াঃ। ১১।২৩।৪৮
জনস্তু হেতুঃ সুখদুঃখয়োশ্চেৎ, কিমাত্মনশ্চাত্র হি ভৌময়োস্তৎ।
জিহ্বাং ক্বচিৎ সন্দশতি স্বদদ্ভিস্তদ্বেদনায়াং কতমায় কুপ্যেৎ॥ ১১।২৩।৫০
দুঃখস্য হেতুর্যদি দেবতাস্তু, কিমাত্মনস্তত্র বিকারয়োস্তৎ।
যদঙ্গমঙ্গেন নিহন্যতে ক্বচিৎ ক্রুধ্যেত কস্মৈ পুরুষঃ স্বদেহে॥ ১১।২৩।৫১

অর্থাৎ "এই সকল দুষ্ট লোক বা দেবতাগণ, কিম্বা গ্রহ কিম্বা কাল, ইহারা কেহই আমার সুখ দুঃখের হেতু নহে; কেবল একমাত্র মনকে তাহার কারণ বলা যায়, যে মন সংসার চক্রে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। অতএব মনকে নিগ্রহ করিতে পারিলেই সকল নিগ্রহ হয়, তদ্ভিন্ন সমুদায় ব্যর্থ। দেখ, দান, নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম, যম, নিয়ম, শ্রৌতকর্ম্ম, ও ব্রতাচরণ, এ সমুদায় মনের নিগ্রহের উপায় মাত্র। কিন্তু মনের যে সমাধি তাহাই পরম যোগ। যাহার মন প্রশান্তভাবে সমাহিত হয়, তাহার আর দানাদি কর্ম্মের প্রয়োজন কি? আর যাহার মন আলস্যাদি দ্বারা অসংযত হয়, তাহার আর দানাদি

কার্য্য দ্বারাই বা কি হইতে পারে? যদি এ কথা বল, অন্যান্য ইন্দ্রিয় সকল জয় করিতে হইবে, কেবল মন জয় করিয়া কি হইবে; ইহার উত্তর এই যে, ইন্দ্রিয় সকল মনের বশবর্ত্তী, কিন্তু মন কাহারও বশতাপন্ন নহে; যেহেতু যোগীদিগেরও ভয়ঙ্কর মনোরূপ দেবতা বলিষ্ঠ হইতেও বলিষ্ঠ। যে ব্যক্তি তাহাকে বশতাপন্ন করিতে পারেন, তিনিই সর্ব্বেন্দ্রিয়জেতা। সেই মর্ম্মবেদনা-কারী, অসহ্যবেগ, দুর্জ্জয় শত্রু, মনকে জয় না করিয়া যে কোন ব্যক্তি মনুষ্য-দিগের সহিত অসৎ বিগ্রহ করে ও তাহাদিগকে শত্রু মিত্র বা উদাসীন বোধ করে তাহারা অতীব মূঢ়।"

"যদি মানুষকেই সুখ দুঃখের হেতু বল, তাহা হইলে তাহাতে আত্মার কর্তৃত্ব কর্ম্মত্ব নাই, কেবল ভৌতিক দেহেরই তাহাতে কর্তৃত্ব সম্ভব। তাহা হইলে সুখ দুঃখ উপলক্ষে, কাহারও প্রতি অনুরাগ বা কোপ অবিধেয়; যেহেতু স্বীয় দন্ত দ্বারা জিহ্বা দংশিত হইলে, সেই বেদনায় আর কাহার প্রতি কোপ করা যাইতে পারে? যদি দেবতাগণকে দুঃখের হেতু বল, তাহা হইলেও তাহাতে আত্মার কিছুই নহে। কেননা দেহাধিষ্ঠাত্রী দেবতারই তাহা সম্ভব্য, যেমন এক অঙ্গ দ্বারা অন্য অঙ্গ আহত হইলে, কোন ব্যক্তি তত্তদধিষ্ঠাত্রী দেবতার প্রতি কুপিত হইয়া থাকে। "হে উদ্ধব! পূর্ব্বতন মহর্ষিগণ কর্তৃক উপদিষ্ট এইরূপ পরম আত্মনিষ্ঠা অবলম্বন করত, সেই ব্রাহ্মণ এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় করিলেন যে, "মুকুন্দ-চরণাম্বুজ-সেবা দ্বারা আমি ঘোরতম হইতে উত্তীর্ণ হইব। আমি দেখিয়াছি, এই যে লোক সকল আসিয়া আমাকে বিরক্ত করিতেছে, ইহারা মানুষ নহে, নিশ্চয়ই দেবতা। এইরূপে আমাকে ছলনার দ্বারা পরীক্ষা করিতেছেন, দেখি-তেছেন আমাতে ক্রোধ, হিংসা, অভিমান আছে কি না, আমিও হরিপাদ-পদ্ম হৃদয়ে ধ্যান করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, 'ইহারা দেবতাই হউক, আর মানুষই হউক, আমি কাহারও প্রতি ক্রোধ করিব না, বা বিরক্ত হইব না।' হে সখে উদ্ধব, এইরূপ স্থির করিয়া সেই নষ্টধন, বৈরাগ্যযুক্ত, বৃদ্ধ ভিক্ষুক মুনি অসৎ লোক কর্তৃক এইরূপ পুনঃ পুনঃ লাঞ্ছিত অপমানিত হইয়াও স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইলেন না। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বাক্য সকল উচ্চারণ করিতে করিতে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন।

(ক্রমশঃ) শ্রীক্ষেত্রনাথ শিরোমণি।

দীন-উপহার।

এত গোলযোগে তুমি—
এত লোকেব মাঝে ;
কেমনে মোবে চিনিয়া ল'বে হায় !
তোমাব মন্দির দ্বাবে
অগণ্য যাত্রীব ভিড় ;
সেথা —দীন আমি, পাব কি তোমায় ?
সুসজ্জিত সুবৃহৎ—
প্রাসাদ প্রাঙ্গণ ;
কত ধনী, কত মানী, কত জ্ঞানিজন ;
জানিনা তাদেব মাঝে—
হীনবেশ দীন একজন ;
কিরূপে পাইবে সেথা তব দবশন ?
ভীরু আমি অসহায়—
অশ্রুমাত্র কবিয়া সম্বল
কেমনে পাইতে পাবি—
তব ওই চবণ কমল ?
ভক্তি নাই, প্রেম নাই,—
জ্ঞান লেশ নাহি কিছু মোব,
নিজেব দীনতা মাত্র—
আছে প্রভু, দেখ বড জোব।
তবু এক কোণে নাথ—
তব আশে রয়েছি পড়িয়া,
ভিড় ঠেলে কোন দিন,
সুমঙ্গল শঙ্খ বাজাইয়া—
আস যদি এই পথে ;
যেথা আমি তব পথ চেয়ে,
বসে আছি দীর্ঘ দিন—
শুধু এই আশা টুকু লয়ে !
তোমাব অবনী মাঝে—
কত ফুল বহিয়াছে ফুটি ;
সৌন্দর্য্যে সুগন্ধে তার
মধুকব কত আসে ছুটি !
কবপুটে অর্ঘ্য বহি—
(তাবা) চেয়ে আছে ওই পদ পানে ;
কবে তুমি ডেকে ল'বে
পদপ্রান্তে নিজ ভক্তগণে !
কিন্তু এ অপরাজিতা—
মধুহীন শোভাগন্ধহীন ;
কাননেব ফুল মাঝে,
একা সেই ঐশ্বর্য্য বিহীন।
হ'ক সে সামান্য ফুল,
(তবুও প্রভাতেব ববির কিবণ ;
বঞ্চিত করে না তাবে,
দিতে কভু প্রেম আলিঙ্গন।
ঠিক এই ফুলটিব মত,—
আমাব (ও) হৃদয়, প্রভু !
প্রেম-ভক্তিহীন,
তুমি কি রবির মত,—
লইবে তাহাবে আজি,
হীনেব এ উপহার দীন ?

পূজা।

পুরোহিত পূজা সমাপন করিলেন সম্মুখে ৺দুর্গা-ভগবতীর দশভুজা মূর্ত্তিখানি যেন হাসিতেছে। কি এক অপূর্ব্ব ভাব সেই মূর্ত্তি হইতে স্ফুরিত হইয়া, দর্শকবৃন্দের হৃদয়ে তরঙ্গ তুলিয়া খেলিয়া যাইতেছে। মায়ের সেই রণমূর্ত্তি, যে মূর্ত্তি দেখিয়া অসুরগণ ভীত ও ত্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সেইমূর্ত্তি—মায়ের সেই ভয়ঙ্করী সময়োচিত অসুরনাশিনী মূর্ত্তি আজ কেন এত সৌম্য—এত শান্ত এতই মধুর বলিয়া মনে হইতেছে? সেই নিখিলশরণ চরণসরোজে চাহিয়া চাহিয়া, সংসার তাপিত হৃদয় কি জানি কোথায় আপন হারা হইয়া বসিয়া আছে। যোগী, তাঁহার সমগ্র জীবনের যোগের অক্ষয় ফল স্বরূপ, ত্রিদিব-পূজিত ওই চরণ-সরোজে আত্মহারা ও তন্ময়। সমাগত যজমানবর্গ ও দর্শক-বৃন্দ কেমন 'এক-আহা-মরি'-ভাবে বিভোর—সেই আত্ম-প্রীতি-বিবর্জ্জিত— কি জানি কেমন মধুরভাবে আত্মবিস্মৃত—নির্ব্বাক্ ও নিস্পন্দ। ইন্দ্রিয়গণ একাগ্র; সুতরাং স্থির মনও একাগ্র, সুতরাং নিরুদ্ধবৃত্তি ও প্রশান্ত। প্রাণ কেবল সেই প্রশান্ত ভাবরাশির মধ্যে, সেই রাতুল চরণে অবিশ্রান্ত মস্তকের সহিত দেহ বিলুণ্ঠিত করিবার জন্য, মাঝে মাঝে চেষ্টা সম্পন্ন হইয়াই, আবার যেন ইন্দ্রিয়ের সহিত কোন্ 'অজানা' জগতে নিদ্রিত হইয়া পড়িতেছে। সেই আনন্দ-মধুর অসীমত্বার উপলব্ধির মধ্যে, নিদ্রার ন্যায়, মুহূর্ত্তের সেই আত্ম-বিস্মৃতিটুকু—সেই মহাপূজার স্বার্থকতা, নীরবে—নিভৃতে প্রাণের সেই নিভৃত গুহায়, ঘোষণা করিতেছে। তখন পুরোহিত সেই অন্তর্নিহিত যজমানবর্গের অন্তর্মুখী ও স্বর্গীয় সুন্দর ভাবটীকে বাহিরের আপাততঃ প্রতীয়মান বহির্ম্মুখী ভাবের সহিত, একই সুরে—একই বন্ধনে বদ্ধ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন,—দেবীর চরণে কুসুমাঞ্জলি দিবার জন্য আহ্বান করিলেন। তখন সেই বিভিন্ন হৃদয়গুলি একই রসাস্বাদনে,—একই আক-র্ষণে, —একই ভাবে বিভোর হইয়া, আত্মনিবেদনের আনন্দে যেন সংজ্ঞাশূন্য—জ্ঞানশূন্য—স্মৃতিশূন্য। সংযত দেহ, সংযত প্রাণ, সংযত বাক্, সংযত ইন্দ্রিয়, সংযত মন—হৃদয়গুলি, প্রাণের চির বিভিন্ন সুর আজিকার এই শুভ মুহূর্ত্তে একটী সুরে মিলাইবার জন্য, মুক্ত করে, উন্মুক্ত অন্তঃকরণে, দেবীর চরণে কি এক মহান্ হৃদয়বৃত্তি লইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। পরম প্রসন্নতাপূর্ণ, হৃদয়

নিহিত গাম্ভীর্য্য ভেদ করিয়া পুরোহিতের অন্তঃকরণে সংযুক্ত ভাবার্থসম্পন্ন দেবীর প্রীতিপ্রদ ও যজমানবর্গের কল্যাণপ্রদ মন্ত্র, মধুর ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় হৃদয়ে ধ্বনিত হইল।

সেই আত্মবিস্মৃতির তন্ময়তা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, দেবীরই অনুগ্রহে নিষ্পন্ন-ভাবান্তর একটী "বৃদ্ধ-বালক" দেবীর চরণ-রাগ-সদৃশ অরুণ প্রস্ফুটিত পদ্ম হস্তে ধারণ করিয়াই, সেই স্বর্গীয় অন্তর্মুখী ভাব হইতে বিচ্যুত হইল। মহিষাসুর-তাড়িত শ্রীভ্রষ্ট দেবতার ন্যায় তাহার সেই দিব্য ভাব, শ্রীভ্রষ্ট হইয়া হস্তস্থিত পুষ্পের সৌগন্ধে ও সৌন্দর্য্যে আকৃষ্টচিত্ত হইয়া, অপর বালককে কহিল "এ ফুলগুলি আমা.." পুরোহিত বালকের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যেন তাহার সেই বিলাস-বাসনা গৃহীত কুসুম যেন পূর্ব্বেই দেবীর চরণ স্পৃষ্ট হইয়া অলক্ত রাগ রঞ্জিত হইয়াছে। পুরোহিত বলিলেন 'বৎস ওই কুসুম উচ্ছিষ্ট—"উচ্ছিষ্ট কুসুম" পরিত্যাগ কর।' "যাহাকে ইন্দ্রিয় বৃত্তির দ্বারায় গ্রহণ করিয়া তোমারই বলিয়া কল্পনা করিয়াছ, তাহা তোমারই উপভুক্ত, তাহা আর পবিত্র দেবীর চরণে অর্পণ করিও না" বালক অতীব দুঃখিত চিত্তে তাহার সেই প্রিয় কুসুম গুলি পরিত্যাগ করিয়া দর বিগলিত ধারে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল।

পুরোহিত সুললিত স্বরে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক দেবীর চরণোদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন সেই যজমানবর্গের অন্তর্নিহিত অন্তর্মুখী আত্মনিবেদনের ভাব বহির্বস্তুর সহিত সম্মিলিত হইয়াও বিচ্ছিন্ন হইল না, অন্তরের ও বাহিরের ভাব এক অখণ্ড আকার ধারণ করিল। আবার দেবীর চরণে মনের দ্বারায় পূর্ব্বার্পিত সেই কুসুমগুলি হস্তের দ্বারায় অর্পিত হইয়া অন্তঃকরণে অন্তর্মুখীবৃত্তির দ্বিগুণ উৎসাহ লইয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল। সেই অন্তর্মুখী ভাব যেন বহির্জগৎ হইতে, সেই একই "অখণ্ড" ভাব লইয়া পুনরায় হৃদয়মধ্যে "মণ্ডলাকার" হইয়া অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎকে একই সূত্রে গ্রথিত করিয়া দিল। তাহা সেই গভীর বিষাদে বিষণ্ণ বালক, তখন উপকরণ শূন্য হইয়া মনে গুরুর শরণাপন্ন হইলেন, মনে মনে বলিল,—"অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং। তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।"

কি অপার করুণা! তখনই তাহার হৃদয়ে এক পতিতোদ্ধারিণী জ্ঞানময়ী শক্তি আসিয়া দেখা দিল। বালক বিগত-বিষাদ ও হর্ষপুলকিত

হইয়া ভাবিল "ধন, যশ, ও বিদ্যা প্রভৃতি সকলই তোমার—তোমার নিকট কামনা করিয়া—তোমার ভিক্ষায় ভিক্ষা-পাত্র পূর্ণ করিয়া আবার 'আমার' বলি কেন? আজ ভিক্ষা-লব্ধ এই ধন লইয়া, কালই কৃতজ্ঞতা বিস্মৃত হইয়া, আমার পুত্র, আমার ভার্য্যা" বলিয়া এত দর্প কেন? আহা! মানব জাতি এত নীচ! এত অকৃতজ্ঞ! মা! ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, বলিয়া দর-বিগলিত ধারে আনন্দে অশ্রুপাত করিতে করিতে ধূলায় লুণ্ঠিত হইল। সেই মহান্ ভাব বাশির সহিত এক সুরে সুর মিলাইয়া বালক কেবল দেবীর অনুগ্রহলব্ধ অশ্রুজলে পুষ্পাঞ্জলি সমাপ্ত করিয়া সেই যজমানবর্গের সহিত কৃতার্থ হইল। ক্রমশঃ

মানুষ।

ভগবান্ ত দূরের কথা,—মানুষকেই চিনতে পারলাম না।

অনেক চেষ্টাতেও চিনি চিনি করি, চিনিতে না পারি, কি যেন মোহের মায়ায় ঘুরি। মানুষ ভগবানের চিড়িয়াখানার আজব জীব; ধরা পড়ে কিন্তু ধরা দেয় না।

এমন দোষেগুণে, ভাবে দৈন্যে, ভাল মন্দে, উল্টা ভাবের একত্র সমন্বয়, দ্বন্দ্ব বৈষম্য মাখা—বিপরীত গুণসম্পন্ন, এমন বর্ণচোরা, ভিতর বাহির দুরকম, আলো আঁধারের বিচিত্র সংমিশ্রণ, এমনটী বড একটা নজরে ঠেকে না।

এমন খাঁটী সোণায়, বেমালুম খাদ ও পান দিয়ে, এ ডায়মনকাটা যিনি গড়িয়াছেন, তাঁহাকে বহুৎ তারিফ; তিনিই জহুরী। সেই সৃষ্টি স্থিতি লয় কারণত্রয়-হেতুকে উদ্দেশে প্রণাম।

মায়ার শিকে হীরের পাখী, রূপের খাঁচায় বিষয়ের ঘেরাটোপে ঢাকা। পাখীকে দেখাও যায় না; তার বিহগকূজন শুনাও যায় না।

যা' দেখা যায়, তা' প্রতিবিম্ব; যা' শুনা যায়, তা' প্রতিধ্বনি।

যা' বিকাশ, তা' আভাষ।

চিত্তক্ষেত্রে মানসকুঞ্জে বাসা বাঁধে, মনে জাগে মনে ডুবে। মনের মানুষ পাওয়া গেল না।

মানুষ এক মহা সমস্যা, বিষম প্রহেলিকা। যাঁহার দ্বারা এ সমস্যার পাদ পূরণ হয়, সেই ত্রিপাদ-প্রকাশক পরমপদকে বার বার নমস্কার।

মানুষ, জানে এক, শুনে এক, দেখে এক, ভাবে এক, বুঝে এক, বলে এক, দেখে এক, দেখায় এক ' কিন্তু মোটের মাথায় আগাগোড়া এক, যেমন গঙ্গা পূজা গঙ্গা জলে।

ভিতর বাহির একেবারে উল্টা; কিন্তু হুবহু মিশে আছে, বেমালুম মিলে গেছে। ওতঃপ্রোত-ভাবে যিনি সকলে মিশিয়া আছেন, কালে যাঁহাতে সকলি মিশিবে, সেই সর্ব্বেশ্বরায় নমঃ।

একাধারে, আয়ুষ্মান, চক্ষুষ্মান্, বুদ্ধিমান্, আবার অন্ধ, ভ্রান্ত, নিত্যমরণ-যাত্রী। চিন্তায় আকুল ও 'চিন্তামণির' জন্য ব্যাকুল।

অন্তরে নিত্য, সত্ব, মুক্ত, অনন্ত, অব্যক্ত, উদার। বাহিরে বদ্ধ, ক্ষুব্ধ, মলিন, চঞ্চল, নশ্বর, কাতর।

বহির্মুখে প্রকাশমান, অন্তর্মুখে প্রবহমান। একাধারে কঠোর সত্য ও দারুণ মিথ্যা, অমৃত ও অনৃত।

অন্তরের অন্তরে চিরমধুময় ও সদানন্দ, ফুল্ল, বিকসিত, জাগ্রত। বাহ্যতঃ সুপ্ত, স্বপ্নতন্দ্রাঘোরমত্ত, নিরানন্দ, বিকারগ্রস্ত। কি যেন নেশার ঘোর, আঁখি খুলে খুলে, তবু খুলে না।

মূলে শ্রুতি, মধ্যে স্মৃতি, বাহিরে বিস্মৃতি।

অন্তরে কূটস্থ, মধ্যে তটস্থ, বাহিরে বিপর্য্যস্ত। তাই কখন সুস্থ, কখন দুঃস্থ; কখন স্বরূপ, কখন বিরূপ। কখন রূপের ব্যঞ্জনায় তৃষিত, বিভ্রান্ত; আবার কখন মহান্, অরূপে তৃপ্ত, প্রশান্ত; 'ঊর্দ্ধশূন্যম্ অধঃশূন্যম্ মহাশূন্যম্ যদাত্মকম্।' বাহিরে প্রবল প্রারব্ধে অষ্টাবক্র, অন্তরে সুঠাম ত্রিভঙ্গ, সৎ, চিৎ, আনন্দ—

কভু পাশবদ্ধ ভবেৎ জীব,
কভু পাশযুক্ত সদাশিব
সচ্চিদানন্দরূপোঽহম্ শিবোঽহম্ শিবোঽহম্।

যিনি এ রহস্যের মূলে, তিনি চিররহস্যময়। যে পেয়েছে সে নেচেছে; যে বুঝেছে, সে মজেছে।

যখন বক্তা, তখন বেসুরো, বেতালা বিলাপ বা প্রলাপ। যখন নীরব, তখন নাদ অনাহত, গায়ত্রী ছন্দঃ, প্রণব বা আপ্তবাক্য। কখন যা' চায় তা' পায় ন, যা' চায় না তাই পায়। আবার কখন যা' যায় তা' পায়, যা' পায় তা' চায় না।

জরামরণ চক্রে আবর্ত্তিত, ত্রিতাপপীড়িত, অতৃপ্ত, কাতর ও নশ্বর ;—আবার অক্ষয় অজর মুক্ত ও পূর্ণ, সত্যং শিবং সুন্দরম্।

বহুবিলাসী. সঙ্গলিপ্সু, কর্ম্মফলের দাস, প্রতিমুহূর্ত্তে মরিতেছে ও জন্মাইতেছে! আশ্চর্য্য! তবু একত্বাভিমুখী, নিঃসঙ্গ, নিস্ত্রৈগুণ্য, মরেও না, জন্মায়ও না। ন জায়তে ম্রিয়তে বা। মরে জন্মিতে, জন্মায় মরিতে, তবু সে অজ ও অমর।

কিছুতে মরিতে চাহে না ; মরিবার কথা মনেও ভাবে না, মরণের হাত এড়াইতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু কাল, তাহাকে ঠিক সেই সময়েই বলাদপি নিয়োজেন, মরণের পথে টানিতেছে।

'তবু মরিয়া না মরে, রাম।' যখন মরিতে চায় তখন মরে না। যখন মরিতে পারে, তখন মরণ হয় না। বিষধর মস্তকে ক্রীড়া করে, কালকূট নীলকণ্ঠ করিয়া তুলে।

বিরূপে দ্বন্দ্ব বৈষম্য ও বিভিন্নতায় পরিচ্ছিন্ন, স্বরূপে শাশ্বত, দ্বন্দ্বাতীত নিরঞ্জন। মানবরহস্য এমনি জটিল, কুহেলিকায়, এমনি আচ্ছন্ন।

একাধারে ও একই কালে, ভিন্ন ও যুক্ত, জীবিত ও মৃত, বুদ্ধিহীন ও বুদ্ধিমান্, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান্, আলো ও আঁধার, এক ও বহু, উপাস্য ও উপাসক, ব্যক্ত ও অব্যক্ত, মৌনী ও বক্তা, সুপ্ত ও জাগ্রত।

একই কালে সুপ্ত ও সুপ্তোত্থিত, আবার কভু সুপ্ত, কভু জাগ্রত, কখনো বা ক্রমসুপ্ত, ক্রমজাগ্রত। ঘুমায় জাগিবার জন্য ; বুঝি বা কখন জাগে ঘুমাইবারই জন্য। কখন জাগিয়া ঘুমায়, সে অবস্থায় কিছুতেই সাড়া দেয় না ; তখন জ্ঞান-পাপী।

কিন্তু কি জানি কে যেন বলে দেয় যে, "এত সত্ত্বেও, তবু যেন একই রূপের বিকাশ, একই ভাবের খেলা, একই স্বরের ব্যঞ্জনা, একই সুরের মূর্চ্ছনা ; সেই ভোলানাথের নৃত্য, লীলাময়ীর লীলা, রসময়ের রস, রঙ্গরাজের রঙ্গ।"

অস্পষ্ট, অতি অস্পষ্ট, দূরাগত সঙ্গীতের মত, কে যেন বলছে যে "এ একেরই

খেলা ; একেই দেখ্‌ছে ও একই দেখাচ্ছে।" ইহার—"আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে।"

দ্বারে অহং—কক্ষে সঃ। মহাবাক্য—তত্ত্বমসি, পাঠক, শ্বেতকেতু। যখন মিলিয়া যায়, তখন সোঽহং! জানাইয়া দেয় 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো?'.

অশুভ তত্ত্ব।

যখন নববৎসরের শুভ প্রথম দিবসে, যখন বঙ্গবাসীর ঘরে ঘরে আনন্দ উৎসবের উৎস স্বতঃই উচ্ছ্বাসিত হইতেছে, যখন আমরা সকলে আনন্দউন্মুক্ত-হৃদয়ে, নবীন উৎসাহে, নবীন উদ্যমে, আগত বর্ষকে সাদর অভ্যর্থনা করিতেছি। সে দিন সে সময়ে অশুভ প্রসঙ্গ উত্থাপিত করা বোধ হয় অনেকেই অসময়োচিত ও অপ্রাসঙ্গিক মনে করিতে পারেন। বিবাহের মঙ্গল বাদ্যের মধ্যে, গৃধ্রের চীৎকারের ন্যায় অনেকেরই নিকট আমার এই অশুভ তত্ত্বের অবতারণা হয়ত' অসন্তোষ ও আপত্তির কারণ হইবে। সেই নিমিত্তই ভূমিকায় এই সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া লওয়া আবশ্যক। জগতে আমরা অবিমিশ্র সুখ বা শুভ দেখিতে পাইনা। দেহের সহিত ছায়ার ন্যায়, অশুভ সর্ব্বদাই শুভের অনুবর্ত্তী। নিরবচ্ছিন্ন সুখ কাহারও ভাগ্যে ঘটে না, সে জন্যই ক্ষণিক সুখে মুগ্ধ থাকিয়া সুখের চিরসহচর দুঃখকে ভুলিয়া যাওয়া আমাদের কর্ত্তব্য নয়। মানবজীবন বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র; প্রতি মুহূর্ত্তেই আমাদের দুঃখের সহিত, অশুভের সহিত সংযোগ ও সংগ্রাম এবং সেই সংগ্রামের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকাই আমাদের কর্ত্তব্য। কথিত আছে পুরাকালে মিসর দেশবাসীরা যখন কোনও উৎসব আনন্দ করিতেন, তাঁহাদের উৎসবগৃহের চতুর্দ্দিকে নরকঙ্কাল সজ্জিত থাকিত। তাহার উদ্দেশ্য মানবকে সতর্ক করা—মানবকে বলিয়া দেওয়া, 'ক্ষণিক সুখের আমন্ত্রণে ভুলিও না ; সুখের পশ্চাতে দুঃখের বিভীষিকা রহিয়াছে জানিয়া দুঃখের জন্য প্রস্তুত হও।' আমরাও তাই বলি অশুভের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাক, সেই জন্য অশুভপ্রকৃতি আলোচনা কর এবং পরিশেষে সেইজন্য অশুভপ্রকৃতি আলোচনা কর এবং পরিশেষে সেই অবশ্যম্ভাবী ও আগত প্রায় অশুভকে সম্পূর্ণ জয়ের উপায় নির্দ্ধারণ কর।

অশুভ কাহাকে বলে, তাহার প্রকৃতিইবা কি ? এবং তাহার উৎপত্তিরই বা কারণ কি ? কবি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন "অশুভ সৃজন কার ?" এই প্রশ্ন অনন্তকাল হইতে যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া স্বতঃই মানবের মনে উত্থিত হইয়াছে এবং সকলেই নিজ নিজ সাধ্যানুসারে ইহার সমাধান করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন।

দার্শনিকদিগের মধ্যে অনেকে শশবিষাণের ন্যায় অশুভের অলীকত্ব সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং ইহার সত্বার অস্বীকার করিয়াছেন। এই সকল অল্পদর্শী শুভবাদী দার্শনিকদিগের মতে এই জগত সর্ব্বমঙ্গলময় পরমেশ্বরের সৃষ্ট; সুতরাং এখানে অমঙ্গল বা অশুভ থাকিতে পারে না। কারণাভাবে কার্য্যের অস্তিত্ব অসম্ভব। কিন্তু হায়! মানব এই ক্ষুদ্র অন্তঃসারশূন্য সান্ত্বনা বাক্যে আশ্বাস পাইতে পারে কৈ ? অশুভের ভীষণ করালছায়া যাহা জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তেই আমাদের অনুগমন করিতেছে, যাহার ভীষণ আঘাত আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে সর্ব্বদাই অনুভব করিতেছি, তাহাকে এত সহজ বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি কৈ ? একটা সরল ও অন্ধবিশ্বাস কি মনোময় মানবের ভাগ্যে ঘটা সম্ভব ? * কে বলে এ জগতে অশুভ নাই ? এই যে ভীষণ মহামারির উৎসাদন—দারুণ ভূকম্পনে শতসহস্র নিরীহ নরনারীর জীবন নাশ—কঠোর দুর্ভিক্ষের নিদারুণ যন্ত্রণায় মানবের অকাল মৃত্যু, এসকল কি অশুভ নয় ? সন্তানহারা জননীর মর্ম্মভেদী বিলাপ, উন্মাদিনী বালবিধবার হৃদয়বিদারী মর্ম্মোচ্ছ্বাস, অনশনে বুভুক্ষিত কঙ্কাল সার শিশুর কাতর ক্রন্দন, এসকল শুনিয়াও কি করিয়া স্বীকার করিবে যে মঙ্গলময় পরমেশ্বরের জগতে সবই মঙ্গল ? না তাহা নয়; রোগ শোক দুঃখের মূলীভূত কারণ অশুভ অবশ্যই আছে, এ বিষয়ে সন্দেহ করিতে হইলে মানবের বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তির উপর সন্দেহ করিতে হয়।

এই জগৎ নানা বৈচিত্র্যময় ঘটনা পরিপূর্ণ। এই ঘটনা সকলের ঘাতপ্রতিঘাতে মানবজীবন পরিপুষ্ট। কতকগুলি ঘটনা আমাদের জীবনের উন্নতি সাধন করে, আর কতকগুলি আমাদের পরিপুষ্টির অন্তরায় হয়। এই শেষোক্ত ঘটনাপুঞ্জ যাহা আমাদের জীবন ধারণের ও উন্নতির বিঘ্ন স্বরূপ—যাহারা

---

* লেখক মহাশয় ঠিকই বলিয়াছেন। যতদিন মন যতদিন ভাবনা :—স্রোত (series) মূর্ত্তি ততদিন শুভ ও অশুভ আছে বেদান্ত মনের উপরে বুদ্ধির উপরে ভাষা—পং সং।

মানব ব্যষ্টি বা সমষ্টির দুঃখ ও পীড়া উৎপাদক—তাহাদিগকেই আমরা অশুভ বলিয়া নির্দ্দেশ করি।

এখন আমরা অশুভের উৎপত্তির কারণ ও তাহার নাশের উপায় আলোচনা করিব।

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের মতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটা অতি প্রকাণ্ড কলের সদৃশ। একটা বৃহৎ কলের ভিতর যেমন আরও অনেক ছোট ছোট কল কব্জা থাকে, এজগতেও তাহাই আছে। এই সকল ক্ষুদ্র কল ভাল করিয়া চালাইতে হইলে অপরাপর ক্ষুদ্র কলের সহিত ও ক্ষুদ্র কলের সমষ্টি বৃহৎ কলের সহিত ইহাদের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রাখিতে হইবে। যে কোনও প্রকারেই হৌক, যদি এই সামঞ্জস্যের একটু মাত্রও ব্যাঘাত জন্মে তাহা হইলে সে ক্ষুদ্র কল আর পূর্ব্ববৎ সুন্দররূপে চলিতে পারে না। মানবজীবনে এইরূপ পারিপার্শ্বিক বস্তুর ও অপরাপর মানবের সহিত সামঞ্জস্য * স্থাপন করিবার চেষ্টা অনন্তকাল ব্যাপিয়া চলিয়া আসিতেছে। এই অবিরাম ও চিরন্তন দ্বন্দ্ব ও সংঘাত হইতেই অশুভের উৎপত্তি। এই প্রকার অশুভকে আমরা প্রাকৃতিক বা বাহ্য অশুভ নামে অভিহিত করিব।

কিন্তু মানবের জীবন কেবল মাত্র বাহ্য জগতের সহিত সম্বন্ধেই পর্য্যবসিত নয়। তাহার ভিতরে তাহার নিজস্ব এমন একটা কিছু আছে, যেখানে বহির্জগতের শক্তি প্রবেশ করিতে পারে না এবং যে বস্তুর সুখ ও দুঃখ বহির্জগতের সহিত সংশ্লিষ্ট নয়। মানবের এই প্রকার দুঃখকে আমরা মানসিক বা আভ্যন্তরিক অশুভ নামে অভিহিত করিব।

জগতে অশুভের সংখ্যা হ্রাস করাই বিজ্ঞানের চরম উদ্দেশ্য। এই যে প্রতি দিন নব নব যন্ত্র আবিষ্কৃত হইতেছে—কত প্রকার নূতন ঔষধ, নূতন চিকিৎসা পন্থা উদ্ভাবিত হইতেছে, ইহার মূলে একটা উদ্দেশ্য নিহিত—মানব জীবনের কষ্ট ও দুঃখের লাঘব করা। কিন্তু বিজ্ঞান আমাদের কতটুকু অশুভ দূর করিতে পারে! যে অশুভটুকু আমরা বাহির হইতে প্রাপ্ত হই—সেই অশুভের উপরেই বিজ্ঞানের প্রভাব। বৈজ্ঞানিক উপায়ে চলিলে আমরা আধি-

---

* এই সমতা প্রবৃত্তির অস্তিত্বই এক আনন্দময় নরতত্ত্বের নিদর্শন দিতেছে। পং সং

ব্যাধির পীড়ন হইতে মুক্ত হইতে পারি বৈজ্ঞানিক উপায়ে আমাদের বজ্রাঘাতে মৃত্যুরোধ করিতে পারি—বৈজ্ঞানিক উপায়ে আমরা ভূকম্পনের গ্রাস হইতে হয়ত রক্ষা পাইতে পারি—কিন্তু বিজ্ঞান তাহার অধিক আর কি করিতে পারে ? শত শত Franklin, Faraday·Galen বা Lister একত্রিত হইলেও কি সন্তান হারা জননীর ক্রোড়ে আর তাঁহারা শিশুকে সজীব করিয়া দিতে পারেন ? না Macbeth এর কথার উত্তরে ভীষক্ যথার্থই বলিয়াছেন "Thee in the patient must minister to himself" অর্থাৎ এখানে প্রত্যেক জীবকে আপনার চিকিৎসক হইতে হইবে। এবং আমরাও অনেক সময়ে তাই ভগ্নহৃদয়ে দুর্দ্দমনীয় নিরাশায় চীৎকার করিয়া উঠি "Throw physic to the Dogs" বিজ্ঞানের যত টুকু ক্ষমতা সে তাহা করিয়াছে ও করিতেছে। কিন্তু যেখানে মানব নিজের অন্তরানলে আপনি দগ্ধ হইতেছে—যে হৃদয়ে দারুণ নিরাশার মর্ম্মন্তুদধ্বনি স্বতঃই উত্থিত হইতেছে—যে আশক্তিহীন, উদ্দেশ্যহীন, হৃদয়ে অসীমশূন্যতা তাহার ভীষণ ছায়া বিস্তার করিয়াছে—সেখানে বিজ্ঞান তাহার স্থূলযন্ত্রে ও ঔষধের সাহায্যে শান্তি-প্রলেপ দান করিতে পারে কৈ ?

সুতরাং বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা তাঁহাদের জগৎ-কল্যাণকামনায় প্রাণপণ উদ্যমের জন্য আমাদের নমস্য হইলেও, আমাদের বলিতে হইবে যে তাঁহারা আমাদের মানসিক বা আধ্যাত্মিক অশুভ দূরীকরণে সমর্থ নহেন। সেই জন্যই শোক-সন্তাপ-ক্লিষ্ট মানব, বিজ্ঞানের কঠোর সীমারেখা অতিক্রম করিয়া, ধর্ম্মের শীতল ছায়ার অন্বেষণ করে। আধিব্যাধি প্রপীড়িত মানব নিজের জীর্ণ হৃদয়কে ধর্ম্মের অমিয় ধারায় ধৌত করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে। তাই আমরা দেখি, যাঁহারা যৌবনে ধর্ম্মের নামে কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিতেন—ধর্ম্মের অবিশ্বাসই যাঁহাদের জীবনের ব্রত ছিল—তাঁহারাও বার্দ্ধক্যে শান্তি-লাভের আশায়, ধর্ম্মের আগ্রহ গ্রহণ করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠেন। এখন স্বভাবতঃই—প্রশ্ন হইবে ধর্ম্ম কি, এবং ধর্ম্ম কিরূপে আমাদিগকে অশুভের পীড়ন হইতে নিস্তার লাভ করিতে সাহায্য করে ?

সকল প্রচলিত ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভবপর নয়, এবং সম্ভবপর হইলেও প্রবন্ধকারের সাধ্যায়ত্ত নয়। সুতরাং ধর্ম্মের সম্বন্ধে আমরা আমাদের উদ্দেশ্যসাধনানুযায়ী মোটামুটি দুই চারিটি কথা বলিব। আমরা

দেখিতে পাই যে সকল ধর্ম্মের মূলেই—একটা বিষয় নিহিত আছে—সে বিষয় বিশ্বাস। আমাদের হিন্দু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইলে—অধিকারীকে প্রথমতঃ শ্রদ্ধাবান্ হইতে হইবে। বেদান্ত শ্রদ্ধার অর্থ করিয়াছেন, "গুরুবেদান্তবাক্যেষু বিশ্বাসঃ"। খৃষ্টান ধর্ম্মেও "মূলমন্ত্র বিশ্বাস।" "Have Faith and ye will be saiod"—বিশ্বাস কর, মুক্তি পাইবে—ইহাই বাইবেলের মন্ত্র সূত্র। প্রত্যেক ধর্ম্মই—প্রধানতঃ দুইটি—মূল বিশ্বাসের উপর স্থাপিত। প্রথম এক অনন্ত শক্তিমান্ সর্ব্বমঙ্গলময় জগৎস্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস, দ্বিতীয়, মৃত্যুর পরেও আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস। অবশ্য ধর্ম্মভেদে এই দুইটা বিশ্বাসের অল্পাধিক প্রকার ভেদ হইয়াছে বটে, কিন্তু মূলতঃ প্রায় সকল প্রচলিত ধর্ম্মেই আমরা এই দুইটি বিশ্বাসের অস্তিত্ব সম্যক্‌রূপে অনুভব করিতে পারি।

এখন ধর্ম্ম অশুভের অস্তিত্বের কি ব্যাখ্যা করে, তাহাই আমরা আলোচনা করিব। আমরা পূর্ব্বেই সর্ব্বশুভবাদীদিগের মতের উল্লেখ করিয়াছি এবং তাঁহাদের ব্যাখ্যা যে সম্পূর্ণ অপ্রামাণিক তাহাও বলিয়াছি। ধর্ম্মগ্রন্থ লেখকেরা অশুভের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া, বড়ই বিপদে পড়েন। তাঁহাদিগের প্রথম বিশ্বাস-মতে জগতের আদি ও একমাত্র কারণ সর্ব্বশুভময়—সুতরাং সেই সর্ব্বমঙ্গলময়ের জগতে, সেই সর্ব্বশুভময়ের জগতে, অমঙ্গলের উৎপত্তি কিরূপে সম্ভব? হিন্দুদিগের মতে—এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি, ঈশ্বরের লীলা মাত্র। সুতরাং শুভ ও অশুভ তাঁহারই লীলা; অশুভ অস্তিত্ব ব্যতিরেকে আমরা শুভ বুঝিতে পারিব না বলিয়াই অশুভের অস্তিত্ব। আরও ঈশ্বরের—দয়াগুণ ও ক্ষমাগুণ সম্যক্ পরিস্ফুট—করিবার নিমিত্তই অশুভের অস্তিত্বের প্রয়োজন। জুরুষ্ট্রিয়ান ও খৃষ্টিয়ান মতে অশুভের স্রষ্টা স্বতন্ত্র। আহ্‌রিমান ও সয়তানই অশুভের অধিনায়ক। ঈশ্বর যখন প্রথমে জগৎ ও মানব সৃষ্টি করেন, তখন ইহা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও পবিত্র ছিল। কিন্তু সয়তান মানবকে প্রলোভিত করিয়া তাহাকে প্রথমে পাপ পথে চালিত করে,—সেই সময় হইতে জগতে পাপের ও অমঙ্গলের আবির্ভাব। ইহা ব্যতিত খৃষ্টানের মতে মানবের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অশুভের জন্য দায়ী। কারণ তাহার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আছে বলিয়াই সে মন্দকার্য্য করিতে পারে এবং মন্দকার্য্য করিলেই অশুভের উৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী। আমাদের নিকট পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তগুলি সমীচীন বলিয়া মনে

হয় না। ঈশ্বর যদি অনন্ত শক্তিমান্ ও সর্ব্বমঙ্গলময় হয়েন, তাহাহইলে তিনি কেন সয়তানকে ধ্বংস করিতে পারিলেন না? আর তিনি যদি ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র কর্ত্তা হয়েন, তাহাহইলে সয়তানের অস্তিত্ব সম্ভব বা কি প্রকারে? স্বীকার করি, মানবের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আছে; কিন্তু ঈশ্বর নিশ্চই জানিতেন যে আমরা এই অমূল্য উপহারের এরূপ অসদ্ব্যবহার করিব, তাহাহইলে ইহা জানিয়াও কেন তিনি আমাদিগকে এই মহা প্রলোভনময় জগতে এত দুর্ব্বল করিয়া প্রেরণ করিলেন? ক্ষুদ্র শিশুকে কে কোথায় অনলের সঙ্গে খেলা করিতে দেয়? এ জগতে কি অশুভ-হীন-ভাবে সৃষ্ট হইতে পারিত না? যথার্থই কি ইহা "best of all possible worlds"? অনন্ত শক্তিময়ের নিকট "possibility' অর্থ কি? "সম্ভব" ও "অসম্ভব" বাক্যদ্বয় ক্ষুদ্রশক্তি মানবের কার্য্যেই প্রযোজ্য অনন্ত শক্তির নিকট সকল কর্ম্মই "সিদ্ধ"। জগতে যদি অবিরত মঙ্গল ও অমঙ্গলের সংঘর্ষ চলিতে থাকে, তাহা হইলে কে সাহস করিয়া বলিতে পারে যে পরিশেষে মঙ্গলের জয় অবশ্যম্ভাবী?

উল্লিখিত আপত্তি সকল খণ্ডন করিবার নিমিত্ত, অপর একটা বিশ্বাসের আশ্রয় লইতে হইয়াছে। সে বিশ্বাস, আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি—মৃত্যুর পর অপর এক জীবনে বিশ্বাস। মতভেদে, ধর্ম্মভেদে এ বিশ্বাসটীরও প্রকার-ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুধর্ম্ম পুনর্জন্মে বিশ্বাসবান্। গীতায় আছে—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

আমরা যেরূপ জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড পরিত্যাগ করিয়া নববস্ত্র গ্রহণ করি,—আত্মাও সেইরূপ জরাজীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া নবদেহ পরিগ্রহ করেন। এই জন্মের পাপ পুণ্যের ফলভোগ, আমরা পর জন্মে করিয়া থাকি। এইরূপ আত্মা যত দিন পর্য্যন্ত না সম্পূর্ণ নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক হয়, ততদিন পর্য্যন্ত সে সংসারের ঘূর্ণায়মান আবর্ত্তে আবর্ত্তিত হইতে থাকে। তারপর একদিন শুভ মুহূর্ত্তে জগতের পাপতাপ, জ্বালা যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অনন্তে মিলিত হয়। খৃষ্টানেরা পূর্ব্বজন্মে বিশ্বাস করেন না। তাঁহাদের মতে আত্মা দেহ হইতে মুক্ত

হইয়া এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে অপর জগতে বাস করে। তার পর শেষ বিচারের দিনে ভগবান্ পুণ্য আত্মাকে পাপ আত্মা হইতে পৃথক্ করিয়া, একজনকে পুরস্কৃত করেন ও অপরকে শাস্তি দেন। এ জগতের ভালমন্দের বিচারকার্য্য অপর জগতে সম্পন্ন হয়। এখানে আপাততঃ অনেক সময় মনে হয় যে শুভের জয় না হইয়া অশুভেরই জয় হইতেছে,—অনেক সময় মনে হয় পাপ পুণ্যের রক্ত শোষণ করিয়া পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। কিন্তু যথার্থ হয় না। ঈশ্বরের ন্যায় দণ্ডের নিকট একদিন পাপকে মস্তক অবনত করিতে হইবে—অশুভকে পরাভব স্বীকার করিতে হইবে। তাই কবি বলিয়াছেন, "In this world broken arches in the other a perfect round"— এ জগতে আমরা দৃষ্টি শক্তির ক্ষুদ্রতানিবন্ধন কোনও বিষয় সম্পূর্ণভাবে দেখিতে পারি না। অপর জগতে দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া সম্পূর্ণতা উপলব্ধি করিতে পারিব। এ জীবনের অশুভের মীমাংসা, অপর জীবনে। সাধারণতঃ সমালোচনা ব্যাপারে বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কিছু বলা বড় কঠিন। বিশ্বাস যেখানে নিজের অভ্রভেদী শির উন্নত করিয়া সদর্পে দণ্ডায়মান, তর্কযুক্তি সেখান হইতে মস্তক অবনত করিয়া ফিরিয়া আইসে। কাহাকেও আমার নিজের মতে আনয়ন করা আমার এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়—আমার ক্ষুদ্র চিন্তার ফলে যে সত্যে উপনীত হইয়াছি, সেই সত্যের উপর নির্ভর করিয়াই উল্লিখিত ধর্ম্মবিশ্বাস সমালোচনা করিতে সাহসী হইতেছি ক্রমশঃ

শ্রীসীতারাম বন্দ্যোপাধ্যায়।

সমালোচনা।

'প্রজ্ঞা পারমিতাসূত্র' নামক পুস্তক খানি আমি, পন্থার সম্পাদক ভগবদ্ প্রাণ পরম ধার্ম্মিক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় হইতে পড়িবার জন্য পাইয়াছি। প্রজ্ঞা পারমিতা সূত্রগুলি, শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিপুলগবেষণাপূর্ব্বক হিন্দুর সনাতন শাস্ত্রসাগর মন্থন করিয়া যেখানে তত্ত্বরত্ন যাহা পাইয়াছেন সে সকল সেবধি উক্ত সূত্রাবলীতে গাঁথিয়া প্রজ্ঞা-প্রসূন মালা প্রস্তুত করিয়াছেন। আশা করি, ইহার সৌরভে ভাবুক, ভক্ত,

বিবেকী, বিজ্ঞজনগণের মন মুগ্ধ করিবে। আমাদের সনাতন শাস্ত্রে চিদ্ঘনানন্দ-স্বরূপিণী ৺জগদম্বার যে সকল স্তোত্র আছে; বাস্তবিক বলিতেগেলে সেই স্তোত্র সমূহ প্রজ্ঞা পারমিতা স্তোত্র হইতে সম্বন্ধ হীননয়। এই প্রজ্ঞা পারমিতা সূত্রের সুপ্রসিদ্ধ "অষ্টসাহস্রিকা" টীকা আমি দুই বৎসর পূর্ব্বে সম্পূর্ণ পড়িয়াছিলাম; উল্লিখিত টীকাতে যে সকল সুগভীর দার্শনিক তত্ত্ব নিহিত আছে, সে সকলের উদ্ধার করাও সুকঠিন বলিয়া বোধ হয়।

এই গ্রন্থ মহাযান সম্প্রদায়ের পরম সমাদরের বস্তু, ইহার অপর সুবৃহৎ ব্যাখ্যা "শত সাহস্রিকায়" ও অনন্তধর্ম্মতত্ত্বোপদেশ আহিত রহিয়াছে। প্রকৃত চিন্তাশীল ও যোগিগণেরই সে সকল তত্ত্ব আশুবোধ্য অন্য কাহারও নয়। এই সূত্রে সর্ব্বপ্রকার সাধন, যোগ, ধ্যান, প্রভৃতি দুর্লভ্য তত্ত্ব রহস্য ভাবে বিদ্যমান আছে যে, তাহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বৌদ্ধ তন্ত্রের মধ্যে মহামায়ূরী তন্ত্র, মায়ূরী তন্ত্র, ও সাধনমালা তন্ত্রে নানা আরাধনা প্রণালী, ধ্যান, আসন, যন্ত্র প্রভৃতির উপদেশ আছে। তন্মধ্যে সাধনমালা তন্ত্রে অজ্ঞেয় বহু মুদ্রা ও যোগ তত্ত্বের কথা বর্ণিত আছি। ইহার অনুরূপ বহুসূত্র ও সাধন মালায় বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সূত্রগুলি যে কেবল সাধনের প্রধান উপায় তাহা নয়, ইহাতে বিপুল ধর্ম্মতত্ত্বও দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ "তারাস্তোত্র" গ্রন্থখানিও অতি উপাদেয়। সম্পাদক কিশোরী বাবু, এই ২১টী সূত্রে আমাদের শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস, তন্ত্রাদির সহিত ঐক্য সংবিধান যে ভাবে দেখাইয়াছেন তাহাতে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও শ্রমের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। কিন্তু অনুবাদ এবং ব্যাখ্যায় কোন কোন স্থানে ভ্রম দেখিতে পাওয়া যায়, সম্ভবতঃ তাহা পুনঃসংস্করণে সম্যক্ রূপে সংশোধিত হইবে। যেরূপ অতি ক্ষুদ্র একটী বীজ বৃহত্তম বৃক্ষ শক্তিরূপে নিহিত থাকে, যেরূপ অতি ক্ষুদ্র বহ্নিস্ফুলিঙ্গে—লেলীহান শিখ মহাবল বিদ্যমান থাকে; সেইরূপ এই প্রজ্ঞা পারমিতা লঘুসূত্রেতে নিগূঢ় ধর্ম্মতত্ত্ব ও দার্শনিক তত্ত্ব অব্যক্ত আছে। মহাশয় সম্প্রদায়ের এই লঘু মূল গ্রন্থের সহিত সনাতন হিন্দুশাস্ত্রের তত্ত্ব সকলের আন্তরিক সম্বন্ধ আছে। ইতি

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র সাঙ্খ্য-বেদান্ততীর্থ।

গৈবীনাথ-মন্দির।

১ম খণ্ড]　　　　ফাল্গুন ১৩১৯।　　　　[১১শ সংখ্যা।

সরস্বতী স্তোত্র।

ভাবতি ! করুণা কর অধম সন্তান প্রতি।
জননি ! তোমাব ঠাঁই,　　এই ভিক্ষা আমি চাই,
তব-পদে নিবন্তব থাকে যেন মম মতি।
জ্ঞানাভাবে সমুদয়,　　হেরি ঘোব তমোময়,
উন্মীলিত কব মোব বিবেক নয়ন !
মনোভাব বর্ণিবাবে,　　কণ্ঠে বাণী নাহি সবে,
বিষম জড়তা, জাল এ দাসেব হব, সতি !
কন্দেন্দু-তুষাব জিনি,　　সিত বর্ণ-সুশোভিনী,
শ্বেতপদ্ম বিবচিত তোমাব আসন।
বীণামঞ্জু-নিনাদিনী　　পুস্তক সহ লেখনী—
সৌদামিনী-নিভ কান্তি করে তব শোভে অতি।
তোমাবে কোবিদবৃন্দ,　　পূজিতে পবমানন্দ,
প্রাপ্ত হ'ন পুণ্যশীল, কলুষনাশিনি !
সুবাসুর মুনিগণ,　　যক্ষ বক্ষ অগণন,
ভক্তিভাবে অনুক্ষণ কবিছেন তব স্তুতি।
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতলে,　　সারদে ! প্রাণী সকলে,
তোমার প্রসাদে লভে হিতাহিত জ্ঞান।
ভক্তকে বিচিত্র ধন,　　কর তুমি বিতরণ,
তস্করে হরিতে নারে, দানে বৃদ্ধি হয় অতি।

অসীম জ্ঞানের নিধি, তুমি শাস্ত্র-বেদ-বিধি,
বর্ণরূপা সুললিত শব্দের নিদান।
কমলা সদা চঞ্চলা, কিন্তু মা তুমি অচলা,
অনুগত জনে কভু নাহি ত্যজ কৃপাবতি!
ব্রহ্মা বিষ্ণু শূলপাণি, মহিমা, তব জননি!
অক্ষম সমগ্ররূপে করিতে বর্ণন।
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপবান্, ধনে—ধনেশ সমান,
ত্বৎ-প্রদত্ত নিধি বিনা, দীনবৎ অবনীপতি।
বাগ্দেবি! তব কৃপায়, কবিব প্রফুল্ল হয়,
মানস-সরসী-নীবে কল্পনা পদ্মিনী।
বহে যায় অনশ্বর, পরিমল মনোহব,
নিত্যকাল সমভাবে ব্যাপিয়া নিখিল ক্ষিতি।
মা! তোমাব পূজাকালে, বসন্ত মহীমণ্ডলে—
আসি শ্রীপদ পঙ্কজে করে শির অবনতি।
যতনে মরিচি-মালী, বিমল কিবণ ঢালি,
নব কিসলয় কান্তি করেন বর্দ্ধন।
পিকাদি বিহঙ্গগণ, মোহিয়া মানব মন,
মধুর নিস্বনে গায় তোমাব মহিমা-গীতি।
নম্র ভাবে ক্রমবাজি, বিচিত্র ভুষণে সাজি,
সুরভি কুসুমাঞ্জলি কবে সমর্পণ।
মলয়েব সমীবণ, সুস্নিগ্ধ ঘ্রাণ তর্পণ,
ব্যজন নিমিত্ত তব, বহে অতি মৃদুগতি।
স্থাবর জঙ্গমচয়, লভিতে সতত হয়,
কৃপা তব ব্যগ্র, অতি জ্ঞানপ্রদায়িনি!
বিলম্বিতে তব গলে, লম্বমান মুক্তাফলে,
শোভাঞ্জন বিকসিত করে, কলিকা সংহতি।
অভিনব চুতাঙ্কুর, গন্ধে স্নিগ্ধ সুমধুর,
সেবে মাগো! আপনারে পরম যতনে।

লোহিত কুসুমগণ,　　　　মন্দারের বিধুনন,
　আপনার তুষ্টি হেতু করে ধীরে সদাগতি।
মা ! তোমায় অলিকুলে,　　　　গুঞ্জরি কুসুমদলে,
　সমন্ত্রে সুমিষ্ট মধু করে নিবেদন।
সুনীল নভোমণ্ডল,　　　　সচন্দ্র তারকা দল
　প্রকাশে তব আগমে পরম সুন্দরাকৃতি।
পূজা দিনে শিশুগণ,　　　　অনধ্যায় হৃষ্ট মন,
　পুষ্পাঞ্জলি দান করে তব শ্রীচরণে।
দীন কৃত অর্চ্চনার,　　　　ভক্তি মাত্র উপচার,
　আদর কর, অপেক্ষা, রত্নসার-গজমতি !
তব প্রতিমা বরণ　　　　করিতে ;রতীগণ
　সাজিয়া বিচিত্র রম্য বসন ভূষণে।
বরণ সামগ্রী করে　　　　হাঁসি মৃদু লাজ ভরে
　সনূপুর রুণু-ধ্বনি সঞ্চারে গজেন্দ্র-গতি।
ভূত ভাবি বর্ত্তমান,　　　　ত্রিকাল তোমার জ্ঞান,
　কিবা তব অবিদিত ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে।
রত্নাকর মহামুনি,　　　　হ'লো কবি-চূড়ামণি,
　লভিয়া তব প্রসাদে দিব্যজ্ঞান ধর্ম্মনীতি।
দুসাধ্য অতি জটিল,　　　　গণিত প্রশ্নের ফল,
　স্বতঃসিদ্ধ সম হয় তব সন্নিধানে।
যে জন শৈশবকালে,　　　　তোমারে সেবে বিমলে !
　পরিণামে হয় তার মহাসুখ সমুন্নতি।
জননি ! তুমি অকূল,　　　　অসীম শাস্ত্রসঙ্কুল,
　বিদ্যারূপে মহার্ণবে কাণ্ডারী-রূপিনী।
তোমা হতে যতিগণ,　　　　পেয়ে তত্ত্বজ্ঞান-ধন,
　জন্ম কর্ম্ম মুক্ত হ'য়ে অন্তিমে লভে নিবৃত্তি।
নমি পদ কোকনদে,　　　　মিনতি যে জ্ঞানদে !
　জন্মে জন্মে মম প্রতি রহে মাগো তব স্মৃতি।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম, এ,।

অশুভ তত্ত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আমাদের পুনর্জন্মবাদ অশুভ সমস্যার যথার্থ মীমাংসা করিতে না পারিয়া, তাহাকে কয়েক যুগ পিছাইয়া দেয় মাত্র।* এই জীবনে আমিই বা কষ্ট পাইতেছি কেন, আর আপনিই বা সুখে আছেন কেন, 'এই প্রশ্নের উত্তরে পুনর্জন্মবাদী বলিবে আমি পূর্ব্ব জন্মে পাপ করিয়াছিলাম আর আপনি পুণ্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন।' কিন্তু ইহাতে যথার্থ সমস্যার মীমাংসা হইল কৈ? এমন একটা জীবন আমাদের ছিল যখন আপনি ও আমি দুইজনে একই ভাবে সংসারক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম †— তবে এ প্রভেদ আসিল কোথা হইতে? এই অশুভের বীজ কোথায় কি প্রকারে আমার জীবনক্ষেত্রে উপ্ত হইল? এইখানেই মানবের স্বাধীন ইচ্ছা শক্তির সমস্যা উত্থিত হইবে। আমাদের ধর্ম্ম শাস্ত্রে এ প্রশ্নের ঠিক মীমাংসা কোথাও আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। গীতায় ভগবান অর্জ্জুনকে বলিতেছেন "নিমিত্তমাত্রো ভব সব্যসাচীন্"। ইহাতে স্বাধীন কার্য্যশক্তির অস্বীকার করা হইয়াছে। আমরা যন্ত্রমাত্র, ভগবানই একমাত্র যন্ত্রী, তিনি যন্ত্র চালাইতেছেন তাই চলিতেছে—ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে আমার দুঃখের জন্য ঈশ্বর দায়ী। আরও এক কথা মনে করুন,—এ জন্মে আমি পাপ করিতেছি সেই জন্য আগামী জন্মে আমি নীচকুলে জন্মগ্রহণ করিব, কিন্তু সেখানে নিশ্চয়ই পাপের প্রলোভন আরও অধিক; সুতরাং সে জন্মে আমার পাপ করিবার সম্ভাবনাও অধিক। এইরূপে অবিরত জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া আমি যদি পাপকার্য্য করিয়াই চলিলাম, তাহা হইলে আমার শেষ গতি কোথায়? কেহ কি কোথাও কোনও সময়ে আমার পাপ-মরুতে পুণ্যের নন্দন-কানন সৃজন করিয়া দিবেন? এই সকল সমস্যার উত্তরে হিন্দু

---

* পুনর্জ্জন্ম শব্দে আজকাল বিশিষ্ট ঘটনাময় জীবন ব্যাপারের পারম্পর্য্য ভাবই দেখা যায়। যথা থিয়সফিষ্ট মত। কিন্তু পুনর্জ্জন্মবাদ প্রকৃতপক্ষে বহু জন্ম রূপ বিশিষ্ট ভাবের বিলোপপূর্ব্বক তদতীত জন্মহীন শুদ্ধ আত্মসত্বার ইঙ্গিত করে। এভাবে দেখিলে জন্ম-রহস্য একত্রে উপনীত হয়।—পং সং।

† কে বলিল?—পং সং।

ধর্ম্ম বলেন যে, এই সৃষ্টিব্যাপার ঈশ্বরের লীলামাত্র। তিনি নিজের ইচ্ছায় কাহাকেও পাপী করিতেছেন আর কাহাকেও পুণ্যাত্মা করিতেছেন। কাহাকেও সুখ দিতেছেন, আবার কাহাকেও বা দুঃখ দিতেছেন। কিন্তু ইহাতে কি প্রশ্নের যথার্থ সমাধান হইল ?* যতদিন আমি এ জগতে আছি, ততদিন আমি সুখ দুঃখের অধিকারী,—এরূপ অবস্থায় যদি কেহ আমাকে সুখ না দিয়া দুঃখ দেয়, আমি কেন তাহা অবনত মস্তকে বহন করিতে বাধ্য হইব, আর যদি দুঃখ-দায়ীর শক্তি-আধিক্য হেতু আমি বহন করিতে বাধ্যও হই, তাহা হইলেও আমি তাহার অন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে আপত্তি করিতে পারি। যে অন্যায় কার্য্যের জন্য আমি আমার নিজের ভ্রাতাকে ধর্ম্মাধিকরণের সমক্ষে উপস্থিত করি—সেইরূপ কোটী কোটী অন্যায় কার্য্যকারী ঈশ্বরকে আমি কি করিয়া ন্যায়ের ও সত্যের আধার বলিয়া পূজা করিব ? আরও এক কথা আমি পূর্ব্বজন্ম কৃত কোন্ পাপের জন্য এ জন্মে কি শাস্তি ভোগ করিতেছি, তাহা আমাকে কে বলিয়া দিবে ? আর তাহাই যদি না জানিলাম—তাহা হইলে এ শাস্তি ভোগে আমার কি উপকার হইল ? ন্যায় কর্ত্তা ঈশ্বরের শাস্তি কি পুরাতন হিন্দুদিগের শাস্তির মত শুধুই দণ্ডমূলক ("retributive"), সভ্য জগতে আজকাল এরূপ আইনের সমাদর নাই।

এ বিষয়ে খৃষ্টানধর্ম্ম মত আমাদের নিকট আরও অসন্তোষজনক বলিয়া বোধ হয়। এক পিতা তাঁহার দুইটী অল্পশক্তি শিশু সন্তানকে এক অন্ধকার বন মধ্যে ছাড়িয়া দিলেন। একটী শিশু কোনও ক্রমে তাহার সৌভাগ্য বশতঃ সুপথ দিয়া বন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল, আর অপরটী কুপথে যাইয়া বন কণ্টকে ক্ষত বিক্ষত দেহে, বন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। তাই বলিয়া কি প্রথম শিশুটী চিরকাল তাহারপিতার স্নেহ পাইবে আর অপরটী অনন্তকালের জন্য তাহার পিতৃপ্রেম হইতে বঞ্চিত হইয়া শাস্তিভোগ করিবে ? ইহাই কি ঈশ্বরের ন্যায় ধর্ম্ম ও দয়া ধর্ম্ম ? একজন পুণ্যাত্মা এ জগতে দুঃখ পাইতেছেন ;—'তিনি পর জগতে সুখ পাইবেন' ইহা বলিলেই কি তাঁহাকে যথেষ্ট সান্ত্বনা দেওয়া হইল ? কয়জন মহাত্মা এরূপ ভিত্তিহীন বিশ্বাসে আস্থা স্থাপন করিতে পারেন ? ঈশ্বর-

* লেখক হিন্দুধর্ম্মের কোন্ শাস্ত্রপাঠে এই সকল ভাবে উপনীত হইয়াছেন তাহা জানিতে পারিলে ভাল হয়।—পং সং।

কল্প যীশুও একদিন ক্রস হইতে বলিয়াছিলেন, "Elai Elai Lama Sabak-them"—'হে ঈশ্বব তুমিও অবশেষে আমায় পবিত্যাগ করিলে ?' * আমাদের কবিও সন্দিগ্ধচিত্তে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন——

হেথায় যে অসম্পূর্ণ সহস্র আঘাতে চূর্ণ বিদীর্ণ বিকৃত
কোথাও কি একবাব সম্পূর্ণতা আছে তাব জীবিত কি মৃত ?
জীবনে যা প্রতিদিন ছিল মিথ্যা অর্থহীন ছিন্ন ছড়াছড়ি
মৃত্যু কি ভবিয়া 'সাজি' তাবে গাঁথিয়াছে আজি অর্থপূর্ণ করি ?

তাবপর তিনি যথার্থ বলিয়াছেন "চিবকাল এই সব রহস্য আছে নীবব রুদ্ধ ওষ্ঠাধব।"

এই মতেব বিরুদ্ধে আমাদেব আবও একটী আপত্তি এই যে, ইহাতে আমাদের সুখ দুঃখেব শুভাশুভের আধাবেব সহিত আমাদেব আত্মাকে পৃথক করিয়া দেয়। একটা বাহ্য বিচাবক ও বিচার্য্যেব সম্বন্ধ স্থাপন কবে মাত্র। খৃষ্টানেবা বহুল পবিমাণে ঈশ্ববেব ক্ষমাগুণেব উপব নির্ভব করেন; কিন্তু একই কার্য্যেব সম্বন্ধে বিচার ও ক্ষমা উভয়ই কিরূপে সম্পাদিত হইতে পারে ? তাব পব পাপ পুণ্যেব বিচাব-কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে, ইহা স্বীকাব কবিয়া লইলেও আমবা কি কবিয়া বলিব যে, সেই বিচার-কার্য্য নিবন্ধন জগতে অশুভেব সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে ? ঈশ্বরেব বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কি কেবল মাত্র একটা চিরন্তন বিচারাগাব ?

উল্লিখিত সমালোচনা হইতে আমবা বুঝিতে পারি যে, প্রচলিত ধর্ম্ম-মত কৃত অশুভ সমস্যাব মীমাংসা সন্তোষজনক নহে। ইহাব প্রধান কারণ আমাদের মনে হয়, শুভাশুভ ও সুখ দুঃখকে মানব জীবন ও মানব আত্মা হইতে পৃথক কবা। শুভাশুভ যেন দুইটী বাহিক শক্তি বিশেষ; অন্য কোনও মহাশক্তির আজ্ঞায় যেন আমাদের জীবনের সহিত সংযুক্ত হইতেছে। বাহির হইতে আলোক বেখা যেরূপ আমাদেব চক্ষুর স্নায়ুব উপব পতিত হইয়া বর্ণ-জ্ঞানেব উৎপত্তি সংঘটন করে—সেইরূপ যেন বাহ্য কোনও শক্তি আমাদের

* আধুনিক অনুসন্ধানে প্রমাণিত হইয়াছে যে ভগবান যীশু এ কথা বলেন নাই। তিনি বলেন "Oh God how Thou glorifiest me" "ভগবান আপনি কেন আমাকে এত মহিমায় মহিমান্বিত করিতেছেন?" হিব্রুভাষা হইতে অনুবাদের সময় এই ভুল হইয়াছে। পং সং

মনের উপর আঘাত করিয়া শুভাশুভ উৎপন্ন করিতেছে। আমাদের মন যেন একটা জড় পদার্থ নির্ম্মিত বাদ্যযন্ত্র বিশেষ, সেই যন্ত্র হইতেই বাদক নিজের ইচ্ছামত অঙ্গুলি সঞ্চালনে কখনও করুণ ভৈরবী-রাগিণী বাজাইতেছেন; আর কখনও বা সুখাবেগপূর্ণ সাহানার তানে প্রাণ মাতাইতেছেন। কিন্তু মনো-বিজ্ঞানের দিক্ হইতে দেখিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, শুভাশুভ ও সুখ দুঃখ সম্পূর্ণ ভাবে আমাদের নিজস্ব সামগ্রী। তাহারা সম্পূর্ণরূপে আমাদের মনের উপর নির্ভর করে। একটা সহজ কথা আমরা বুঝি যে, আমার যাহাতে সুখ আপনার হয়ত তাহাতে দুঃখ। আপনার আজ গৃহ উৎসবময়; হয়ত আজ আপনার পুত্রের বিবাহ-বাঁশরীর আনন্দময় স্বর-লহরীতে চারিদিক্ মুখরিত হইতেছে; কিন্তু আমার হৃদয়ে, হয়ত সেই বাঁশরীর এক একটী সুরলহরী গভীর বিষাদের কালিমার সূচনা করিতেছে—কেন? কারণ আমি হয়ত সেদিন আমার প্রিয়পুত্রকে শ্মশানে বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছি। আমার আজ হয়ত একমাত্র প্রিয়তম সন্তানের মৃত্যু হইল; কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই পৃথিবীতে ত আরও লক্ষ লক্ষ লোকের সন্তানের মৃত্যু হইয়াছে; তবে আমি আমার সন্তানের মৃত্যুতে বা কাঁদি কেন, আর অপর শিশুর মৃত্যুতে কাঁদিনা কেন?—তাহার কারণ—বিবাহ বা মৃত্যু কিছুই আপনা আপনি সুখ দুঃখের কারণ নহে, আমাদেরই মনের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া সুখ দুঃখ উৎপাদন করে মাত্র। সূর্য্যালোক একই বস্তু—কেবল বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করিতেছে মাত্র। অতএব যদি নির্ম্মল স্বচ্ছ আলোক চান, তাহা হইলে আপনার মনকে নির্ম্মল ও পবিত্র রাখিতে হইবে। মনের উপর স্বার্থের ও ক্ষুদ্রতার কালিমা পড়িয়াই জাগতিক ঘটনাবলীকে বিষাদ-বর্ণে মলিন করিয়া দেয়। যথার্থই আমরা বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাইব যে, জগতে যত কিছু অশুভ আছে, তাহাদের কারণ আমাদের স্বার্থপরতা ও ক্ষুদ্রতা। স্বার্থপরতা ও ক্ষুদ্রতা উভয়েই অজ্ঞানের রূপান্তর হইলেও—এ দুইটীর কার্য্যকারিত্ব সম্বন্ধে প্রকৃতি-ভেদ দেখা যায়।

স্বার্থপরতায় অন্ধ হইয়া মানব নিজেকে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র-স্থানীয় মনে করে। এ স্বার্থপরতা বেদান্তের "সোঽহমত্ব" নয়। এই স্বার্থপরতার বশে মানব মনে করে যেন জগতের মধ্যে যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু

সুখকর—সবই যেন তাহারই ভোগ বিলাসের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে; তাই যদি তাহার সুখের মাত্রার এতটুকু হ্রাস হয়, অমনি সে চীৎকার করিয়া উঠে "ভগবান্ এ তোমার কি অবিচার—কেন আমাকে এই কষ্ট দিলে?" অথচ সে নিজেই হয়ত আপনার নিজের ক্ষণিক বাসনার তৃপ্তির জন্য, সেই কষ্ট অন্য জীবকে দিতে কিছু মাত্র সঙ্কুচিত হইবে না! অনেক সময় সে নিজের কর্ম্মেরই নিজে ফলভোগ করে—কিন্তু তথাপি ঈশ্বরের বিচারে দোষারোপ না করিয়া থাকিতে পারে না। বেদান্তে লিখিত আছে "ঈশ্বরস্তু পর্য্যন্যবৎ দ্রষ্টব্য" ঈশ্বর মেঘের ন্যায়—তিনি সমভাবেই সকল বীজের উপর বৃষ্টিপাত করিতেছেন। বীজের গুণ-বৈষম্য হেতুই শস্যের পরিমাণ অল্পাধিক হয়,—কিন্তু মেঘের দোষ কি? মানবজীবনেও সর্ব্বদা ইহাই ঘটিতেছে। কিন্তু স্বার্থান্ধ মানব নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার করিতেছে ও ঈশ্বরের ন্যায়-বিচারে সন্দিহান্ হইতেছে। যথার্থই আমরা স্বার্থসিদ্ধির জন্য জগতে কত অনর্থ কত অশুভ সংঘটিত করিতেছি, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই যে একটা জাতির সহিত আর একটা জাতির যুদ্ধে সহস্র মাতা সন্তান হারাইতেছেন—পত্নী স্বামী হারাইতেছেন – ইহার মূলে কি?—স্বার্থ। এই যে ভ্রাতা ভ্রাতার বুকে ছুরী বসাইতে'ছ, বন্ধু বন্ধুর প্রাণনাশ করিতেছে, ইহার কারণ কি?—স্বার্থ। এই স্বার্থের আবরণ চক্ষে দিয়াই আমরা আমাদিগকে অস্বাভাবিক বৃহৎ মনে করি। জগৎকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র মনে করি; সেই জন্যই আমাদের মনে হয় যে, সমস্ত জগৎ আমার সেবাদাস। তাই যদি সে সেবার কিছুমাত্র ব্যত্যয় ঘটে, তখনি আমরা জগতের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করি। কিন্তু মূর্খ আমরা, সে অস্ত্রাঘাতে যে আপনাদের অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইতেছে তাহা মুহূর্ত্তের জন্যও বুঝিতে পারি না। *

অশুভের অপর কারণ, আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি—আমাদের ক্ষুদ্রতা। প্রায় সব ধর্ম্মেই শিক্ষা দেয়,—মানব ক্ষুদ্র অতি ক্ষুদ্র – ঈশ্বর ও ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত, সুতরাং এরূপ ব্রহ্মাণ্ডে বাস করিয়া, ঈশ্বরের নিকট নতজানু হইয়া তাঁহার দয়া ভিক্ষা ব্যতীত আমাদের আর কি উপায় আছে? মানব এরূপ চিন্তা

---

* লেখক মহাশয় স্বার্থ কথাটি অশুভের পরিবর্ত্তে প্রয়োগ করিলেন। এ স্বার্থ প্রবৃত্তি কেন আসিল ও তাহার জন্য কে দায়ী?

করিতে করিতে যথার্থই ক্ষুদ্র হইয়া যায় এবং কালক্রমে তাহার হৃদয়ে যে উচ্চ মনুষ্যত্বের বীজ নিহিত থাকে, তাহাও শুষ্ক হইয়া যায়। তখন তাহার উপর একটা উঁকি ঝুঁকি ভাব (ইংরাজীতে Slinking and slouching manner) আসিয়া পড়ে। সে যেন জগতের মধ্যে বড় হেয়- বড় ক্ষুদ্র, পথপার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে—অপরের কৃপাদৃষ্টিতে জীবন ধারণ করিতেছে। এইরূপ লোকই অত্যন্ত প্রতিহিংসা-পরায়ণ হয়; তাহারা হয়ত আততায়ীর সম্মুখে একটী বাক্যও উচ্চারণ করিবে না, কিন্তু বন্ধু ফিরিয়া দাঁড়াইলে তাহার পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাত করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইবে না। Julius Cæsarএ Cassius এরূপ লোক ছিলেন, এবং Cæsar তাহার সম্বন্ধে ঠিকই বলিয়াছেন "your Cassius with a lean and hungry look. Such men are dangerous"

অপর দিক্ হইতে দেখিলেও ক্ষুদ্রতা মহা অশুভের কারণ বলিয়া প্রতীত হইবে। মূলধন যাহার অল্প, তাহার সেই মূলধন হইতে কিছুমাত্র ক্ষয় হইলেই বিশেষ কষ্টের সম্ভাবনা। ক্ষয়শীল অল্প মূলধন লইয়া ব্যবসা করা বাস্তবিকই মূর্খের কার্য্য। কবি রবীন্দ্র নাথ এই ভাবটী এত সুন্দর রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, তাঁহার কবিতাটী উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না। "আমরা অল্প লইয়া থাকি, তাই যায়।" মোর যাহা যায় তাহা যায়।"—

অল্প লইয়া থাকি, তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়
কণাটুকু যদি হারায় তা ল'য়ে প্রাণ করে হায় হায়!
নদীতট সম কেবলই বৃথাই প্রবাহ আঁকড়ি রাখিবারে চাই
একে একে বুকে আঘাত করিয়া ঢেউগুলি কোথা ধায়!
অল্প লইয়া থাকি, তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়!

যথার্থই একবার ভাবিয়া দেখুন যে, আমাদের সঙ্কীর্ণতা ও সহানুভূতির অভাব, আমাদের কতকটা দুঃখের কারণ। সন্তানহারা জননী যদি অপরের সন্তানকে নিজের সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিতে পারেন, তাহা হইলে কি তাঁহার কষ্টের অনেকটা লাঘব হয় না? পূর্ণানন্দময়ের জগতে কত সুখের আধার—কত স্নেহের বস্তু—কত প্রীতির পাত্র রহিয়াছে, তাহা আপনি দেখিবেন না, আপনি

আপনার ক্ষুদ্র হৃদয় লইয়া ওই অনন্ত অসীমত্বের একপাশে দাঁড়াইয়া থাকিবেন ; ইহাতে আপনি কষ্ট না পাইবেন কেন ?

আমবা এতক্ষণ অশুভেব মূল কাবণ আলোচনা কবিয়াছি। এইবাব অশুভেব পীডন হইতে নিস্তাব পাইবাব উপায় নির্দ্ধাবণ কবিয়া প্রবন্ধের উপসংহার কবিব। আমবা পূর্ব্বেই উল্লেখ কবিয়াছি যে, স্বার্থপবতা ও ক্ষুদ্রতার মূলীভূত কাবণ অজ্ঞান। এই অজ্ঞানই বেদান্তে মায়া নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মায়া ব্রহ্মেবই শক্তি। মায়াব যথার্থ প্রকৃতি নির্দ্দেশ কবা বড় কঠিন, সেই জন্য বৈদান্তিকেবা ইহাকে ''সদসদ্ভ্যাম্ অনির্ব্বচনীয় জ্ঞানবিবোধিভাবরূপঃ'' – ইত্যাদি বিশেষণ দিয়াছেন। এই সকল কঠিন দার্শনিকতত্বেব আলোচনা আমাদের প্রবন্ধেব বিষয়ীভূত নহে। আমবা শুধু এই অজ্ঞান নিবাবণেব উপায় নির্দ্ধাবণ করিয়াই ক্ষান্ত বহিব।

এই অজ্ঞান দূবীকবণেব প্রধান এবং একমাত্র উপায় 'জ্ঞান' এবং অপর ও সাহায্যকাবী উপায় 'কর্ম্ম'। কর্ম্মেব নিজেব কোনও নৈতিক বা আধ্যাত্মিক মূল্য নাই—কর্ম্ম মানবদেহেব ক্রিয়ামাত্র। * এই ক্রিয়াব মধ্যে কতকগুলি আমাদের জ্ঞানলাভে সাহায্য কবে ; সেই সকল কর্ম্মই আমাদেব কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং এই সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন কবিলে জ্ঞানেব বিকাশ হয়। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

> "নহি জ্ঞানেনসদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
> তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধং কালেনাত্মনি বিন্দতি।"

অর্থাৎ কর্ম্মযোগেব দ্বাবা কালক্রমে আত্মজ্ঞান লাভ কবা যায়। কর্ম্ম যথার্থই অশুভ নাশক। কর্ম্ম আমাদেব সঙ্কীর্ণ হৃদয়কে প্রশস্ত কবে—অবসন্ন চেতনাকে উদ্‌বুদ্ধ কবিয়া, তাহাকে স্বার্থেব ক্ষুদ্র গণ্ডীব সীমা হইতে মুক্তিদান কবে।

কিন্তু আমবা পূর্ব্বেই বলিয়াছি কর্ম্মই মানব জীবনেব চবম উদ্দেশ্য নহে—কর্ম্মেব বিলয়ই আমাদেব জীবনেব শ্রেষ্ঠ পবিণতি। কাবণ কর্ম্মের সহিত আমরা যতক্ষণ সংশ্লিষ্ট থাকিব, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা সম্পূর্ণরূপে অশুভের পীড়ন হইতে নিস্তার পাইতে পারিব না। একটা কথা এখানে বলা কর্ত্তব্য, এ কর্ম্মের বিলয় বলিতে দুর্ব্বলতা বুঝায় না ;—এ কর্ম্মের বিলয়ের অর্থ নয়, যে কেহ

* কর্ম্ম বিনা নৈষ্কর্ম্ম আসিতে পারে না। কর্ম্মই ভাবের স্থিতির সাধন।—পং সং

তোমার দক্ষিণ গণ্ডে চপেটাঘাত করিলে তুমি বাম গণ্ড ফিরাইয়া দিবে। এ বিলয়ের অর্থ ভোগের নিবৃত্তি, দুর্দ্দমনীয় কামনাব সংযম সাধন ও সকল কর্ম্ম ব্রহ্মে সমর্পণ। এই কর্ম্মেব বিলয়ই কবিব কর্ম্ম প্রার্থনায় সূচিত হইয়াছে ;—

"যত ইচ্ছা নাথ, কাজ দিও মোবে, সংসাব মাঝে সতত।
বাঁধিয়া বাখিও ভব-মায়া-ডোবে, স্নেহেব বাঁধনে শত।
এক ভিক্ষা শুধু মাগি তব কাছে, সকল ভিক্ষার সাব।
তুমি লবে মম যাহা কিছু আছে, পূর্ণ অসীমে তোমাব।"

গীতায় ইহাকেই নিষ্কাম কর্ম্ম বলা হইয়াছে এবং এই কর্ম্মেই ভগবান বলিয়াছেন, --"কর্ম্মণ্যেবাধিকাবস্তে মা ফলেষু কদাচন।" সুতবাং মানব যতই কর্ম্মশীল হউক না কেন, সে যতদিন পর্য্যন্ত না আদর্শেব অনুযায়ী কবিয়া, নিজেব কর্ম্ম সকলেব মধ্যে একটা যথার্থ সামঞ্জস্য স্থাপন কবিতে পাবে, ততদিন পর্য্যন্ত কর্ম্ম নিষ্কাম প্রাপ্ত হয় না ও মানব অশুভেব পীডন হইতে নিষ্কৃতি পায় না। ইউবোপীয় দার্শনিকেবা কর্ম্মেব আদর্শানুযায়ী গঠন বলিলে যাহা বুঝেন, আমাদেব বেদান্ত ও গীতা তাহাকেই "ব্রহ্মে কর্ম্ম সমর্পণ বলেন।" গীতায় একটী শ্লোকে এই ভাবটী সুন্দবরূপে বিবৃত হইয়াছে ;—

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ।"

এখন কর্ম্মেব নিষ্কামত্ব সাধন বা কর্ম্মেব বিলয় সাধনেব উপায় কি? ইহাব একমাত্র উপায় তত্ত্বজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ। এই তত্ত্বজ্ঞান কি, তাহা বৈদান্তিক পণ্ডিত যথার্থই শ্লোকার্দ্ধে বিবৃত কবিযাছেন—"ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব না পবঃ।" এই জ্ঞানাভিলাষী নচিকেতা সেই জন্যই সমস্ত পার্থিব ও স্বর্গসুখ তুচ্ছ কবিয়া দেবতাব নিকট তত্ত্বজ্ঞান প্রার্থনা কবিয়াছিলেন ;—

যস্মিন্নিদং বিচিকিৎসন্তি মৃত্যো যৎসাম্পরায়ে মহতি ব্রূহিনস্তৎ।
যোঽয়ং বচবা গূঢমনুপ্রবিষ্টো নান্যং তস্মান্নচিকেতা বৃণীতে॥

এই তত্ত্বজ্ঞানকে সুবিধাব জন্য দুই ভাগে বিভক্ত কবা যাইতে পারে—(১) আমাদের আত্মাকে বহিঃপ্রকৃতি ও ইন্দ্রিয়াদি হইতে পৃথগ্‌দর্শন এবং পরিশেষে (২) জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব উপলব্ধি।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অশুভ সকল আমাদের আত্মাকে অভিভূত

করিয়া আমাদিগকে দুঃখ দেয়। কিন্তু আত্মা বহিঃপ্রকৃতিব অংশ হইতে পারে না; কারণ আত্মা না থাকিলে আমাদের বহিঃপ্রকৃতির অনুভূতিই হইতে পাবিত না; সুতরাং আত্মা প্রকৃতি হইতে পৃথক্। তবে তাহারা যদি দুইটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তুই হয়, তাহা হইলে একটী অপবেব উপব কি কবিয়া কার্য্য কবিতে পারে? সুতবাং আমবা যে মনে কবি যে, প্রকৃতিব আঘাতে আত্মা অভিভূত হইতেছে, সেটা মায়া বা অজ্ঞানেব কার্য্য; বস্তুতঃ আত্মা ও প্রকৃতি কখনও মিলিত হইতে পাবে না। উপনিষদে লিখিত হইয়াছে,—

ইন্দ্রিয়ানাং পৃথগ্‌ভাবমুদয়াস্তময়ৌ চ যৎ।
পৃথগুৎপদ্যমানানাম্ মত্বা ধীবো ন শোচতি।

অর্থাৎ ধীব ব্যক্তি শুদ্ধ আত্মাব সহিত ইন্দ্রিয়গণেব পার্থক্য অনুভব কবিয়া আব শোকে অভিভূত হয়েন না। মানব জীবনেও এরূপ দৃষ্টান্ত বড বিবল নহে। যীশুখৃষ্ট ক্রুশে শায়িত হইয়া তাঁহাব শত্রুদেব জন্য ভগবানেব কৃপাভিক্ষা কবিয়াছিলেন। নিত্যানন্দদেব দুইজন দুর্ব্বৃত্ত কর্ত্তৃক আহত ও লাঞ্ছিত হইয়া, তাহাদিগকেই প্রেমদান কবিয়াছিলেন। এই সকল মহাত্মাই যথার্থ জীবনে আত্মোপলব্ধি কবিয়াছিলেন। সেই জন্যই তাঁহাদেব জীবন শত সহস্র বৎসবেব কুহেলিকাময় অতীত ভেদ করিয়া, আজও আমাদেব সম্মুখে মহান্ আদর্শরূপে প্রতিভাত হইতেছে।

আমরা দেখিয়াছি যে, আত্মা প্রকৃতিব অংশ নহে। তবে আত্মাব যথার্থ স্বরূপ কি? আত্মা এক অদ্বিতীয় এবং অনন্ত। "নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তসত্যস্বভাবং প্রত্যক্ চৈতন্যম্।" আরুণি তাঁহাব পুত্র শতক্রতুকে আত্মা সম্বন্ধে শিক্ষা দিতেছেন "এতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যম্ স আত্মা তত্ত্বমসি" অর্থাৎ সেই এক আত্মা যাহা একমাত্র নিত্য ও সত্য এবং যাহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেব আত্মা। এই অদ্বিতীয় ও অনন্ত আত্মাকে আমরা মায়ার ভিতব দিয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখি; কিন্তু যেদিন এই মায়াব বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিব, সেদিন বুঝিব আমবাই অনন্ত— আমরাই অমৃত। শ্রুতিতে আছে "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি"—জীবে ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে জীবের ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়। এই বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে, মানব সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণার পীড়ন হইতে নিষ্কৃতি লাভ কবিয়া ব্রহ্মানন্দের অধিকারী হয়। তাই দার্শনিক বলিয়াছেন "তরতিশোকমাত্মবিৎ।" আমরা পর্ব্বতের স্মত্যুচ্চ-

শৃঙ্গে আরোহণ করিলে দেখিতে পাই যে, আমাদের নিম্নে—বহু নিম্নে কত ধারাপাত হইতেছে, কত ঝঞ্ঝাবায়ু বহিতেছে কিন্তু আমাদের সহিত তাহাদের কোনও সম্পর্ক নাই; আমরা যেন অপর জগতের জীব—আমাদের কর্ত্তৃত্বও নাই ভোক্তৃত্বও নাই; সেইরূপ জ্ঞানের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিলে, আমরা দেখিব যে সেখানে দারিদ্র্যের পীড়ন নাই—মৃত্যুর ভয় নাই শোকের জ্বালা নাই, সেখানে আছে শুধু পবিত্র, স্বর্গীয় জ্ঞানের আলোক! আজ যে হৃদয়ের দুর্ব্বলতা লইয়া জগতের প্রত্যেক অশুভের নিকট মস্তক নত করিতেছি, তখন সেই হৃদয়ের অসীম শক্তির নিকট সকল অমঙ্গল—সকল অশুভ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। তখন বুঝিতে পারিব যে, এতদিন আমরা আপনাদিগকে দুর্ব্বল মেষশাবক বলিয়া মনে করিতেছিলাম, সেটা মহাভ্রম—আমরা যথার্থই সিংহশিশু। আমরা কিজন্য ক্ষুদ্র কুক্কুর শৃগালের আক্রমণে ভীত হইব? আমাদের ক্ষুদ্রতা সেদিন তরুণ অরুণালোকে উদ্ভাসিত হইয়া সুবর্ণ বর্ণে রঞ্জিত মেঘমালার ন্যায় শোভা পাইবে। আর স্বার্থপরতা!—এ জ্ঞানের নিকট স্বার্থপরতার স্থান কোথায়? তখন আমিও যাহা আপনিও তাহাই—আপনার ও আমার স্বার্থঘর্ষ হইবে কিরূপ? সেদিন ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা ব্রহ্মের অনন্ত পরার্থপরতায় মিলিয়া চির বিশ্রাম লাভ করিবে। আমরা আমাদের যথার্থ সত্ত্বা ব্রহ্ম হইতে যতই দূরে যাইতেছি, ততই আমরা অশুভের পীড়নে অভিভূত হইতেছি। আবার যেদিন আমরা আমাদিগের আপাততঃ ক্ষুদ্র সত্ত্বাকে অনন্তের অসীমত্বে মিলাইয়া অসীম করিতে পারিব, সেই দিন শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত হইয়া অতুল ব্রহ্মানন্দের অধিকারী হইব। সেদিন কবির কথার সার্থকতা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিব,—

তোমার অসীমে প্রাণ মন লয়ে যতদূরে আমি যাই।
কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু কোথাও বিচ্ছেদ নাই।
মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ, দুঃখ সে হয় দুঃখের কূপ;
তোমা হতে যবে দূরে যাই সরে, আপনার পানে চাই।

শ্রীসীতারাম বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ, বি, এল।

মহামায়ার খেলা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

—০—

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

কামের কি অসীম ক্ষমতা!—রূপের কি মহীয়সী শক্তি!—আসক্তির কি ভয়াবহ পরিণাম! যখন মানবের অন্তরে কামানল-গিরির অনন্ত মুখ একেবারে উন্মুক্ত হয়, যখন তাহার লহলহ রসনা কাম্য পদার্থকে গ্রাস করিবার জন্য লালায়িত হয়, তখন মানবের বুদ্ধিবৃত্তি একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। মানুষ তখন পশুবৎ হইয়া দাঁড়ায়। যে সকল মহাত্মারা কাম জয় করিয়াছেন, তাঁহারা ভূলোকে থাকিয়াও দেবলোকে বাসের উপযুক্ত; আবার এই মনুষ্য কাম প্রভাবে নরকের অধস্তন লোকেও স্থান পায় না। এই কামনা-বহ্নি একদিন সোণার লঙ্কা ভস্মীভূত করিয়াছিল,—এই কাম প্রবলতাই ট্রয়নগর ধ্বংস করিয়াছিল, এই রূপ-লালসাই সম্রাট্ আলাউদ্দিনকে দিল্লীর সিংহাসন হইতে আকর্ষণ করিয়া চিতোরের পর্ব্বতরাজি মধ্যে লইয়া গিয়াছিল। তাই এই দুরাশক্ত কামকে জয় করিবার উপদেশ শাস্ত্রকারেরা বহু স্থলেই দিয়াছেন।

এই কামের প্রবল তাড়নায়—রূপের আসক্তিতে মত্ত হইয়া, নবকুমার আপনার প্রাণে আপনি দগ্ধ হইতে লাগিল। এই রূপের মোহে ছুটিয়া হাহা-কার করিতে করিতে দেশে দেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কামের তুষানলে পুড়িয়া ছাই হইতে লাগিল;—আপনার হৃদয়কে জর্জ্জরিত করিল। নবকুমার কি চক্ষে হেম-লতাকে দেখিয়াছে বলিতে পারি না। তবে সে ভাবিত যে তেমন সৌন্দর্য্য—তেমন মাধুর্য্য—তেমন লাবণ্য আর কোথাও দেখে নাই। কত দেশে খুঁজিল, কত গ্রাম গ্রামান্তর পর্য্যটন করিল, কিছুতেই হেমলতার অনুসন্ধান হইল না। গভীর নৈরাশ্য, দগ্ধ স্মৃতি, তীব্র অনুতাপ আর অবিরল অশ্রু তাহার জীবনের সার হইল। একদিন নবকুমার প্রদোষকালে পুণ্যসলিলা ভাগীরথীতটে বসিয়া মনে মনে ভাবিতেছে। বর্ষার নব বারি আগমনে ভাগীরথী যৌবনের উদ্দাম

কামনা লইয়া যেন প্রবাহিত হইতেছে। ক্রীড়াচ্ছলে তরণীকুলকে ঈষৎ দোলাইয়া, পবনতাড়িত তরঙ্গমালা দ্বারা উভয় কূল প্রতিঘাত করিয়া বহিয়া যাইতেছে। নবকুমার বসিয়া বসিয়া উন্মত্তের ন্যায় হতাশদৃষ্টিতে আকাশের পানে চাহিতেছে। ক্রমে চন্দ্রোদয় হইল, চন্দ্রের কিরণ তরঙ্গমালার উপর পতিত হইয়া ঝিকিমিকি জ্বলিতে লাগিল। আকাশ মেঘশূন্য কিন্তু জ্যোৎস্না অনুজ্জ্বল, কারণ এ পূর্ণিমার রাত্রি নহে। নবকুমার ভাবিতেছে ‘এখন করি কি? সেই পাষাণী এরূপ নৃশংসা তাহা আগে বুঝি নাই কেন?—সে এরূপ বিভীষিকাময়ী তাহা আগে জানি নাই কেন? আমি কি অন্ধ, কেবল তাহার রূপ দেখিয়াই মত্ত হইয়াছিলাম,—হৃদয়ের দিকে লক্ষ্য করি নাই কেন? আমি আজ দেশত্যাগী, চিরপ্রবাসী, ভিক্ষান্নজীবী ও পরপ্রত্যাশী; কিন্তু আমার কিসের অভাব? সেই সর্ব্বনাশীই ত আমার এই দশা করিয়াছে। না—না, সে কিছুই করে নাই, সম্পূর্ণ দোষ আমার আমি তাহাকে চিনিতে পারি নাই। অমৃত ভাবিয়া গরল আস্বাদন করিয়াছি, সোহাগের কুসুম কণ্ঠে পরিতে গিয়া লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছি। আধখানা দেখিয়াই উন্মত্ত হইয়াছিলাম, বাকী আধখানা দেখি নাই কেন? সুখের লালসাতেই তাহার পদে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম,—সুখের আশাতেই আত্মহারা হইয়াছিলাম, কৈ সুখ ত পাইলাম না; দুঃখই সার হইয়াছে! এখন করি কি?—খুঁজিব—আমি আবার খুঁজিব!—এই দুঃখের প্রতিকার করিব—তাহাকে এইরূপ করিয়া কাঁদাইব তবে হৃদয়ের জ্বালা মিটিবে—যে যাতনা আমাকে দিয়াছে উহাকে ঐরূপ যাতনা দিব। আমার মতন কাঁদাইব—ভিখারিণী করিব। না—না, তাহার কি দোষ—আমার দোষেই ত এইরূপ হইল!—আমার হৃদয় তরণীকে প্রেমসাগরে ভাসাইয়া কূল পাইবার পূর্ব্বেই সহসা হাবুডুবু খাইতেছি এ ঝড় —বিষম ঝড়! কূল পাইবার সম্ভব নাই—ফিরিবারও উপায় নাই। প্রেম-মদিরায় উন্মত্ত হইয়া কেন মজিলাম?—মজিলাম ত পাগল হইলাম না কেন?—নতুবা মরিলাম না কেন? একটানা অবিরল দুঃখপ্রবাহ আর সহ্য করিতে পারিনা! নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার মধ্যে আর চলিতে পারি না! অবিশ্রান্ত দুর্দ্দমনীয় অঙ্কুশ আঘাত আর সহ্য হয় না—মরণই মঙ্গল! আমার হৃদয় এ বিষম আঘাতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে,—প্রাণ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে,—সর্ব্বাঙ্গ দংশন জ্বালায়

ছটফট্ করিতেছে, পদতল ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, অনাহারে অনিদ্রায় দেহপাত হইবার উপক্রম!—আব পাবি না—উঃ কি ভ্রমই করিয়াছি! হেমলতা—তুমি আমাব কে? তোমাব সহিত আমার কিসেব সম্বন্ধ? না আব তোমায় চাহিনা,—তোমাব স্মৃতিকে মানসপটে অঙ্কিত কবিয়া, তাহাব যথেষ্ট প্রতিফল পাইলাম। তোমাব জন্য কি না কবিয়াছি—আব পাবিনা। হেমলতা, জানিনা তুমি অনন্তেব কোন্ তমোময় নিভৃত কক্ষে বিবাজ করিতেছ,—কাহাব হৃদয়েব অঙ্কশায়িনী হইয়া তাহাব সহিত বিবাজ করিতেছ;—কাহাব প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া তোমাব বিলাস-কিঙ্কব নবকুমাবকে ছাড়িয়াছ? একবাব পশ্চাৎ ফিবিয়া দেখিলে না, আমি কি অবস্থায় আছি। এখনও যদি বুঝিতে পাবি তুমি আমার হইবে, তাহা হইলে আবাব নব উদ্যমে কোটী কোটী যোজন অতিক্রম করিতে প্রস্তুত আছি, লক্ষ লক্ষ যুগ অতীত কবিতে স্বীকৃত আছি। না—না, আব চাহি না—তুমি রাক্ষসী, তুমি পিশাচী—তুমি নবহন্ত্রী, তোমায় আব চাহি না। নির্দ্দয়ে!—বড় উৎসাহে তোমাব মোহিনী মূর্ত্তিতে অনুবক্ত হইয়া, উন্মত্তবৎ অতীত ভবিষ্যৎ অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া তোমাব রূপ-বন্যায় গা ভাসাইয়া দিয়াছিলাম,—কে জানিত যে সেই দিন হইতে আমার দুঃখেব আবম্ভ, কে জানিত যে অভাগাব এই শোচনীয় পবিণাম। আজ আমার চরণদ্বয় অবসন্ন, মর্ম্মগ্রন্থি কুহেলিকাচ্ছন্ন, অন্তরাত্মা অন্তর্নিহিত গভীব অব্যক্ত যন্ত্রণায় পর্য্যাকুল। পিশাচী! আব কি বাকী বাখিয়াছ?—একে একে সব গিয়াছে, কেবল প্রাণবিহঙ্গ শ্বাস-প্রশ্বাসেব উপব ভব দিয়া যাইবাব সুযোগ খুঁজিতেছে। আত্ম-সুখোন্মাদিনি! তোমাকে চাহিনা। তোমার বা দোষ কি, দোষ আমাব—এখন জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাণ হইলেই বাঁচি। হায়—হায়! প্রেমেব কি ভয়াবহ পবিণাম!"

নবকুমাব উন্মত্তবৎ গঙ্গাব তটে বসিয়া বসিয়া কেবল ঐরূপ ভাবিতেছে। তখন বাত্রি প্রায় এক প্রহর; ঘাটে জনমানব নাই। একখানি নৌকা বাহিয়া চলিয়া আসিতেছে। সেই নৌকাতে একজন নাবিক আপন মনে গান গাহিতেছে।

পীবিতি পীবিতি, কি বীতি মুরতি হৃদয়ে লাগিল সে।
পরাণ ছাড়িলে, পীবিতি না ছাড়ে, পীবিতি গড়ল কে॥

সহসা গানটী নবকুমাবেব কর্ণে প্রবেশ করিল। নবকুমার তখন কামের

জ্বলন্ত বহ্নিতে দগ্ধ হইয়া মৃত্যুর অপেক্ষা করিলেও, গানটীর সুর তাল ও গায়কের হৃদয়স্থ ভাবরসে অভিসিঞ্চিত করিয়া, তাহাকেও যেন আকর্ষণ করিল। সেও যেন ক্ষণেকের জন্য সে সকল কথা ভুলিয়া গানটীতেই মন প্রাণ সমর্পণ করিল। গায়ক গাহিতেছেন,—

পীরিতি বলিয়া এ তিন আঁখর, না জানি আছিল কোথা।
পীরিতি কণ্টক হিয়ায় ফুটল, পরাণ পুতলি যথা।
যাহার অন্তরে প্রবেশ করিল, এ তিন আঁখর সার।
করম ধরম ভরম সরম. সে কিছু না জানে আর।

নবকুমার গান শুনিয়া নিজের কথা ভাবিতে লাগিল। হেমলতার জন্যই আজ নবকুমার তাহার সকল বন্ধন ছিঁড়িয়াছে। আজ সে ধর্ম্মহীন, কর্ম্মহীন, পিশাচবৎ উন্মত্ত। বাস্তবিক কামে ও প্রেমে একটু সাদৃশ্য আছে। দু'এরই সাধারণ ধর্ম্ম, অপরের জন্য আপনার আদরের স্বার্থগুলি জলাঞ্জলি দেওয়া। কামে উন্মত্ত হইলেও মানুষ আপনার কর্ত্তব্য ভুলিয়া যায়, আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব কাহারও কথা মনে থাকে না; কেবল চিন্তা সেই—যাহাকে সে ভালবাসে, যাহাকে সে চায়; তাহার জন্য সে আপনাকে বিপদাপন্ন করিতেও ভ্রুক্ষেপ করেনা। কিন্তু কামে ও প্রেমে পার্থক্য অনেক। কামে আত্মচিন্তা, আত্মসুখ ভিতরে থাকে। প্রেমে, আত্ম-সমর্পণ ও পরের সুখ অন্তর্নিহিত। আত্ম চরিতার্থতাই কামের মূল। হেমলতার প্রতি নবকুমারের যে আকর্ষণ ইহা প্রেম নহে—কাম। বৈষ্ণব কবি সুন্দরভাবে লিখিয়াছেন ,—

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম!

যদিও নবকুমার কামের পূতিগন্ধময় নরকে হাবুডুবু খাইতেছে, তবুও মনে ভাবিল যে, এই গানটী যেন তাহার হৃদয়ের কথা প্রকাশ করিতেছে; তাই সে বিশেষ মনোযোগের সহিত গানটী শুনিতে লাগিল।

পীরিতি সুখের সাগর দেখিয়া, নাহিতে নামিনু তায়।
নাহিয়া উঠিতে ফিরিয়া চাহিতে, লাগিল দুঃখের বায়॥
কেবা নিরমিল প্রেম সরোবর, নিরমল তা'র জল।
দুঃখের মকর ফিরে নিরন্তর, প্রাণ করে টলমল॥

নবকুমার ভাবিল আমার ত অদৃষ্টে "নাহিয়া উঠা" হয় নাই ; কেবল দুঃখের বাতাস অনুভব করিতেছি। দুঃখই সাব হইয়াছে। গায়ক গাহিলেন,—

কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনী, সুখ দুঃখ দুটী ভাই
সুখের লাগিয়া যে করে পীবিতি দুঃখ যায় তারই ঠাঁই॥

নবকুমার ভাবিল "একি! যদি সুখের আশায় প্রেম হয় না, তবে কি প্রেম নিষ্কাম, তবে কেন আমি ভালবাসিতে যাইব। সুখেব জন্যই ত ভালবাসা।"

নবকুমার! তুমি ভুল বুঝিয়াছ। প্রেমে সুখলালসা নাই, আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিব ছায়া পর্য্যন্ত নাই। ইন্দ্রিয় পবিতৃপ্তিব কণিকামাত্র ইহাতে নাই ; প্রেমে আপনাকে আপনি বিস্মবণ কবিতে হয়। নবকুমাব! তুমি কামে উন্মত্ত,—কামে আপাতঃ-মনোরম সুখেব ছবি দেখা যায় বটে, কিন্তু সে সুখ বড পঙ্কিল, উহা বিষকুম্ভ পয়োমুখ। তুমি আত্ম-সুখেব আশাতেই সতীব সতীত্ব নষ্ট কবিতে গিয়াছিলে ; এখন সেই মহাপাপেব প্রায়শ্চিত্ত কব।

নবকুমাব দেখিল নৌকাখানি আসিয়া ক্রমে তীরে লাগিল ; আবোহী অবতরণ করিয়া দেখিলেন, একটী লোক বসিয়া আছে। তিনি আপন পথে চলিলেন। নবকুমাব আপন মনে বসিয়া বহিল। চণ্ডীদাসেব মধুব বসাত্মক এই পদটী, গায়কের মধুব ঝঙ্কাবের সহিত তখনও তাহাব কর্ণে যেন প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। সহসা এই গানেব ভিতব তাহাব মর্ম্মস্পর্শী ভাব বাহিব হইয়া পড়িল। নবকুমাব ভাবিল যে, বাস্তবিকই সে এতদিন বৃথা কাল কাটাইয়াছে,—দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তিব বশে কি ভয়ানক অন্যায় কার্য্য কবিয়াছে। হেমলতা ত বাস্তবিকই সতী, সে তাহার পাপ-প্রবৃত্তিতে আহুতি দেয় নাই, এই ত তাহাব অপরাধ। সে ভাবিল "আমি প্রায়শ্চিত্ত করিব,—গঙ্গায় আত্মবিসর্জ্জন দিব। গঙ্গায় আত্মবিসর্জ্জনে এই পাপদেহের পর্য্যবসান হইবে।" ভাবিতে ভাবিতে নবকুমাব অজ্ঞান হইয়া সেই সোপানের উপর পড়িয়া রহিল। একে নীরব যামিনী, তাহাতে গঙ্গার শীতল নিশীথ সমীবণে. তাহাব সেই অজ্ঞানতার সহিত নিদ্রাব মিলন ক্রমে ঘন হইতে ঘনতব হইতে লাগিল। স্বপ্নে সে মধ্যে মধ্যে চমকিয়া উঠিতে লাগিল। দেখিল সে যেন এক অন্ধকারময় পূতিগন্ধ স্থানে আনীত হইয়াছে।—উঃ কি ভয়ানক যন্ত্রণা! কে যেন দণ্ড তাড়নায় দেহ ব্যথিত করিতেছে। কিন্তু কাহাকেও দেখা যাইতেছে না। নবকুমার

যেন সেই অবস্থায় নিদ্রার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু নিদ্রা কৈ? শত চেষ্টাতেও নিদ্রা আসিল না। কি ভয়ানক স্থান! এত কষ্ট এত যন্ত্রণা সে কখনও অনুভব করে নাই। সহসা সে হেমলতাকে দেখিতে পাইয়া প্রাণের আবেগে ধরিতে গেল। উঃ—কি যন্ত্রণা! সমস্ত দেহ যেন দগ্ধ হইয়া গেল; এ যে অগ্নি অপেক্ষাও তেজস্কর! এ ত' হেমলতা নহে, এ অগ্নিময় লৌহপ্রতিমা। সে যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতেছে। পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত; প্রাণেব ব্যাকুলতায় চীৎকার করিতে লাগিল, কিন্তু সেই চীৎকাবেব প্রতিধ্বনি ব্যতীত আব কোনও প্রত্যুত্তর পাইল না। সে সেই অন্ধকাবেব ভিতব অনেকদূব অগ্রসব হইল, কিন্তু কেবল অন্ধকাব;—উর্দ্ধে, নিম্নে, সকল দিকেই অন্ধকার। সে প্রাণপণে বলিল—"হে ভগবান, আর সহ্য হয় না, দয়া কব, নতুবা তববাবি আঘাতে বধ কর; কিম্বা বিষ দাও—আমি স্বহস্তে ভক্ষণ করি"। কিন্তু প্রতিধ্বনি যেন সেই প্রেত-পুবী কম্পিত করিয়া তাহার ভয় উৎপাদন কবিতে লাগিল। সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারে শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ-প্রায়, জীবন বাহিব হইতেও চায় না; কি উপায়!. শুইযাছিল—উঠিয়া বসিল—দাঁড়াইল, কিন্তু যন্ত্রণাব নিবৃত্তি নাই। এই কষ্ট দেখিয়া যেন ভগবানের বিবাট হৃদয়ে দয়াব সঞ্চাব হইল। প্রেমময় যেন আর থাকিতে পাবিলেন না, নিদ্রারূপে তাহাব সেই দুঃখেব অবসান কবিলেন। সেই অবস্থায় আবার সে স্বপ্ন দেখিল—স্বপ্নটী অতীব অদ্ভুত—অতীব অলৌকিক। সেটা আলোব বাজ্য, আলো তীব্র নয়, যেন উজ্জ্বলে মধুবে মেশামেশি। বাতাস কেমন নির্ম্মল, কেমন সুগন্ধ, যেন প্রাণ-মন-মোহন; সে দেশের যেন—সবই মিষ্ট, সবই মধুব। হেমলতা বাগানে পুষ্পচয়ন করিতেছে; কত সুন্দর পক্ষীকুল কলতানে চারিদিক্ আমোদিত করিতেছে। হেমলতা প্রস্ফুটিত শুভ্র পুষ্প-রাজি তুলিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ কবিতেছে। তাহা দেখিয়া নবকুমার ভাবিল "একি! একি স্বর্গরাজ্য, না দেবতাব পুণ্যময় সাধনাব স্থান? কি পার্থক্য! কোথায় এই প্রাণ-মাতোয়ারা স্বর্গ, আব কোথায় সেই পূতিগন্ধময় নরক!" সে নিজের অবস্থা বুঝিতে পারিল, অজানিত স্বপ্নময় রাজ্যে বিচরণ করিয়া হৃদয়ে একটু শান্তি আসিল। এমন সময়ে সহসা নবকুমার চাহিয়া দেখিল উষার আলোক দেখা দিয়াছে—নৈশ নিস্তব্ধতা দূরে গিয়াছে—পাপিয়া জাগিয়াছে—কোকিল ডাকিতেছে—জগৎ সুষুপ্তি ছাড়িয়া আবার জাগ্রতে নামিয়া

আসিতেছে,—গঙ্গার মৃদু উচ্ছ্বসিত বারিপ্রবাহ সোপানে লাগিয়া শব্দিত হইতেছে। নবকুমার ভাবিতে লাগিল—স্বপ্নের সকল কথাই মানসপটে উদিত হইল,—ভাবিল "আর কেন!—সর্পের মস্তকস্থিত মণি আহরণ করিতে গিয়াছিলাম, দংশনের জ্বালায় অস্থির,—মণি ত দূরের কথা। হেমলতা! তুমি আমার মত দুঃখে নাই, ইহা স্বপ্নে দেখিয়া আশ্বস্ত হইলাম। হেমলতা! তুমি কি এখনও জীবিত আছ?—আমার জন্য তুমি না জানি কত কষ্টই পাইয়াছ। এখন গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া পাপদেহ বিসর্জ্জন করি, শুনিয়াছি গঙ্গাবারি স্পর্শে জীব বৈকুণ্ঠে গমন করে, দেখি আমার মত পাপীর অদৃষ্টে কি আছে।

এই বলিতে বলিতে উন্মত্ত নবকুমার কূলে কূলে পরিপূর্ণ ঈষৎ তরঙ্গায়িত গঙ্গাগর্ভে ঝম্প প্রদান করিয়া মায়ের শীতল কোলে স্থান লইল। জানিনা তাহার পাপজ্বালার অবসান হইল কি না?

ক্রমশঃ

প্রস্থানভেদ।

(পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীমদ্ মধুসূদন সরস্বতী কৃত।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আমরা পূর্ব্বপ্রবন্ধে ঋগ্‌বেদের বিবরণ এবং সাম ও যজুর্ব্বেদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছি; সংপ্রতি সামবেদ এবং অবশিষ্ট যজুর্ব্বেদের বিষয় অতি সংক্ষেপে লিখিতেছি।

সামবেদ*,—এই সামবেদের এক সহস্র শাখার মধ্যে (১) কৌথুমী শাখা, (২) রাণায়ণী; কৌথুমী শাখা মুদ্রিত ও প্রসিদ্ধ; রাণায়ণী শাখা অপ্রকাশিত।

---

* যজুর্ব্বেদ পূর্ব্বে, কি সামবেদ পূর্ব্বে, ইহা একরূপ নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন, কেননা— 'ঋচঃ সামানি যজ্ঞিরে' এই যজুর্ব্বেদোক্ত পুরুষ-সূক্ত-দ্বারা সামই যজুর পূর্ব্বে বলিয়া প্রতীতি হয়;

ব্রাহ্মণ,—(১) ষড়্‌বিংশব্রাহ্মণ, তাণ্ডব ও প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ, এই তিন নামে অভিহিত। (২) তবলকার ব্রাহ্মণ, পঞ্চষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণ, (৩) ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ, (৪) সামবিধান ব্রাহ্মণ, (৫) দেবতাধ্যায় ব্রাহ্মণ। এই সকল সামবেদীয় ব্রাহ্মণ ভাগ জানিবে।

উপনিষদ্‌ ;—(১) ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌ (২) তবলকাব বা কেনোপনিষদ্‌।

কল্পসূত্র,—(১) মাসক শ্রৌতসূত্র, ইহাকে কেহ কেহ আর্ষেয় কল্প বলেন। (২) নাট্যায়ণ শ্রৌতসূত্র, (৩) দ্রাহ্যায়ণ শ্রৌতসূত্র। শ্রৌতসূত্র ও গৃহ্যসূত্রের বিস্তৃত বিবরণ কল্পপ্রসঙ্গে বর্ণিত হইবে।

গৃহ্যসূত্র,—(১) গোভিল গৃহ্যসূত্র, (২) খাদির গৃহ্যসূত্র। শ্রীমৎ কুমারিল ভট্টমতে সামগের গৌতম ধর্ম্মসূত্র।

যজুর্ব্বেদেব শাখা,—(বাজসনেয় সংহিতা) (১) মাধ্যন্দিন শাখা। (২) কাণ্ব শাখা। কৃষ্ণ যজুর শাখা চারিটী,—(১) কঠশাখা, (২) কপিষ্ঠল শাখা, (৩) মৈত্রায়ণী শাখা, (৪) তৈত্তিরী শাখা।

ব্রাহ্মণ দুই,—(১) শুক্ল যজুব শতপতব্রাহ্মণ, (২) কৃষ্ণযজুব তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ। যজুর্ব্বেদের উপনিষদ্‌—(১) বৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌, (শতপথ ব্রাহ্মণের শেষভাগীয়,) (২) ঈশোপনিষদ্‌। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদেব—(১) তৈত্তিরীয় উপনিষদ্‌, (২) কঠোপনিষদ্‌, (৩) মৈত্রায়ণী উপনিষদ্‌, (৪) শ্বেতাশ্বতব উপনিষদ্‌ প্রভৃতি। ঋগ্‌বেদের ও যজুর্ব্বেদের বহু উপনিষদ্‌ বর্ত্তমান আছে; অনাবশ্যক বোধে সেগুলি উল্লিখিত হইল না।

কল্পসূত্র,—শুক্লযজুর্ব্বেদের (১) কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের (১) আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র, (২) হিরণ্যকেশি শ্রৌতসূত্র, (৩) বৌধায়ণ শ্রৌতসূত্র, (৪) ভারদ্বাজ শ্রৌতসূত্র, (৫) মানব শ্রৌতসূত্র। এইসকল মৈত্রায়ণী শাখাব।

শুক্ল যজুর্ব্বেদেব,—গৃহ্যসূত্র,—(১) পারস্কর গৃহ্যসূত্র। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের (১) আপস্তম্ব গৃহ্যসূত্র, (২) হিরণ্যকেশি গৃহ্যসূত্র, (৩) বৌধায়ণ গৃহ্যসূত্র,

---

সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষদেব সনৎকুমার নারদ্‌ সংবাদে 'ঋগ্‌বেদং যজুর্ব্বেদং সামবেদং' এইরূপ স্পষ্ট উল্লিখিত হওয়ায় যজুর্ব্বেদই সামবেদের পূর্ব্ব কালীনত্ব বোধ হয়। কিন্তু "বেদানাং সামবেদোঽস্মি" এই ভগবদ্‌বাক্য-দ্বাবা সামবেদেব গান মাধুর্য্যও অতি রমনীয় বলিয়া প্রাধান্য সূচিত হইয়াছে। লেখক

(৪) মানব গৃহ্যসূত্র, (৫) ভাবদ্বাজ গৃহ্যসূত্র, (৬) কাঠক গৃহ্যসূত্র, (৭) বৈখানস গৃহ্যসূত্র ॥

ধর্ম্মসূত্র,—(১) আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্র, (২) বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্র, (৩) হিরণ্যকেশি ধর্ম্ম-সূত্র, (৪) বৈখানস ধর্ম্মসূত্র।

শুক্ল যজুর্ব্বেদেব,—আপস্তম্ব শুল্ব্য-সূত্র,—(১) কাহাবও কাহারও মতে শুল্ব্য-সূত্র গণিত শাস্ত্রেব আদি আকর। (২) কাত্যায়নের শুল্ব্য সূত্রেবও অস্তিত্বের কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

ঋগ্‌ ও যজুর্ব্বেদে যে ইহাব অধিক উপনিষদ্‌ এবং কল্পসূত্র ছিল, তাহাতে সন্দেহেব কোন কারণ নাই; শাস্ত্রীয় নানা গ্রন্থে সে সকল উপনিষদের ও কল্পসূত্রেব কোন কোন স্থলে নামও দেখিতে পাওয়া যায়; ব্যাখ্যাব বিস্তৃত ভয়ে এখানে উল্লেখ করিতে পাবিলাম না। প্রত্যেক সংহিতা, উপনিষদ্‌ ও কল্প সূত্রাদির বিভিন্ন নামেব এবং সে সকলেব প্রতিপাদিত বিষয়েব তাৎপর্য্য বর্ণনা আমরা স্বতন্ত্র বৈদিক প্রবন্ধে বিস্পষ্টরূপে বাহিব কবিব।

অথর্ব্ব-বেদ। শাখা,—(প্রকাশিত) (১) পিপ্পলাদ (২) শৌনক,।

ব্রাহ্মণ,—(১) গোপথ। উপনিষদ্‌,—(১) প্রশ্নোপনিষদ্‌ (২) মুণ্ডকোপনিষদ্‌, (৩) মাণ্ডুক্যোপনিষদ্‌ (৪) জাবলোপনিষদ্‌। অথর্ব্ববেদেবও অন্যান্য উপনিষদ্‌ বিদ্যমান আছে।

শ্রৌতসূত্র,—(১) বৈতান সূত্র। গৃহ্যসূত্র,—(১) কৌশিকসূত্র। এই অথর্ব্ব, বেদেব আবও অনেক শাখা পাওয়া যায় বলিয়া অভিজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন। চারি বেদেব শাখাদিব বিষয়ে প্রাজ্ঞগণেরও নানারূপ বিপ্রতিপত্তি বা নানা অভিপ্রায় দেখা যায়। কেবল যথাশ্রুত ও গ্রন্থ দৃষ্টে যেরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে ঋগ্‌বেদেব একবিংশতি শাখা, এবং শুক্ল যজুর্ব্বেদের পঞ্চদশ শাখা।

অপরাপব শাখাব সহিত মিলিত হইয়া মহাভাষ্যানুসারে এক শত শাখা হয়। গীতোপনিষদ্‌ অনুসারে একশত নয়টী শাখা।

সামবেদের শাখা সম্বন্ধে সংখ্যাদির কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। কাহারও মতে ঋগ্‌বেদের শাকলশাখা ঋগ্‌বেদীগণের পাঠ্য; কাহারও মতে বাস্কল শাখাই পাঠ্য। শাস্ত্রে অথর্ব্বের নয়টী মাত্র শাখা দৃষ্ট হয়। শাখা পাঠ্য সম্বন্ধে

বিশেষ কোন প্রমাণ না পাইলেও সম্প্রদায়-পরম্পরায় উক্তরূপ প্রসিদ্ধি আছে।

অথর্ব্ববেদের দুইটী বিভাগ আছে, (১) মন্ত্র বিভাগ. (২) ভৈষজ্য-বিভাগ। এক সম্প্রদায়ের অভিমত—মন্ত্র ভাগ মহর্ষি অঙ্গিরা কর্ত্তৃক, অথবা ঘোর ঋষি কর্ত্তৃক সমাবিষ্কৃত। ভৈষজ্য-বিভাগ মহর্ষি অথর্ব্বন্ কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত। অন্য এক শ্রেণীর অভিমত,—উভয়ে মিলিত হইয়াই অঙ্গিরস নাম হইয়াছে। অথর্ব্ববেদের অপর কোন একটী শাখা কাশ্মীর হইতে প্রতীচ্য দেশে গিয়া তথায় মুদ্রিত হইয়াছে। তাহার মাতৃকা পুস্তক ভূর্জ্জ পত্রেই অঙ্কিত ছিল। অথর্ব্ব বেদেও শ্রীমৎ সায়নের ভাষ্য আছে।

শ্রীমৎ উব্বটাচার্য্য হইতে প্রাচীন ভাষ্যকার, স্কন্দ স্বামী, ভবস্বামী, রাহুদেব, শ্রীনিবাস প্রভৃতি আচার্য্যগণ ছিলেন। শ্রীমৎ সায়নাচার্য্যের "চমক" * ব্যাখ্যা হইতে জানা যায় যে, "অহোবল" ভাষ্যও ছিল। পতঞ্জলিকৃত মহাভাষ্য অনুসারে ঋগ্, যজু, সাম, ভেদই বেদস্থানীয়। অথর্ব্ববেদ, মূলবেদ-স্থানীয় নয়, তাহা উপনিষদ্ স্থানীয়. এবং মীমাংসা দর্শনের স্মৃতিপাদে, শাস্ত্রদীপিকাকারের মতেও ত্রয়ীই (ঋগ্, যজু, সাম) বেদ নামে অভিহিত ; অথর্ব্ববেদ মূলবেদ স্থানীয় নয়।

মীমাংসা দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে 'বেদ' পদে, ঋগ্, যজু, সাম, এই তিনেরই গ্রহণ করা হইয়াছে। "ঋগের উচ্চারণ উচ্চস্বরে করিবে, সামের উচ্চারণও উচ্চস্বরে করিবে, উপাংশু (পাঠকর্ত্তাই শুনিতে পায় এরূপ) ভাবে উচ্চারণ যজুর হইবে"। (ক) 'প্রজাপতি বেদত্রয়ের (স্বীয় তপস্যা দ্বারা) প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই বেদত্রয়ের সৃষ্টির পূর্ব্বে "দেবতাত্রয়কে সৃষ্টি করিয়াছিলেন" সেই দেবতাত্রয় অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য,—পুনঃ কল্পান্তরে উক্ত দেবতাত্রয়ের তপস্যায় "অগ্নিদেব হইতে ঋগ্বেদ" "বায়ুদেব হইতে যজুর্ব্বেদ"

---

* "চমক"—বিকৃতি বল্লী অনুসারে পদ-ক্রমাদি পাঠের অন্তর্গত, পাঠের নিয়ম বিশেষ। তদ্ ভাষ্যে শ্রীমৎ সায়নাচার্য্য লিখিয়াছেন—

"চমকং নমকং চৈব পৌরুষং সূক্তমেবচ।
নিত্যং জপং প্রকুর্ব্বাণো ব্রহ্মহাপি বিমুচ্যতে"॥

"সূর্য্যদেব হইতে সামবেদ" আবির্ভূত হইয়াছিল। সকল ঋগ্ উচ্চস্বরে পাঠ করিবে, কিন্তু যজুর্ব্বেদস্থ ঋগ্ও উচ্চস্বরে পড়িবে।*

উক্ত শ্রুতি সমূহ দ্বারাও প্রতীতি হয় যে, মূল বেদ তিন, অথর্ব্ববেদ এই তিনের শাখা স্থানীয়। কিন্তু ছান্দোগ্যের সপ্তম প্রপাঠকের (১—৩) শ্রুতিবাক্য দ্বারা জানা যায় যে, ঋগ্, যজু, সাম, অথর্ব্ব,—এই চারিটীই মূলবেদ স্থানীয়। এই বিষয়ে আমরা পরে বৈদিক প্রবন্ধে স্বতন্ত্র ভাবে স্বমত ব্যক্ত করিব। বেদ বিভাগ কর্ত্তা মহর্ষি ব্যাস এক কি অনেক, তাহাও উক্ত প্রবন্ধে বলিব।

উপবেদ,—ঋগ্বেদের উপবেদ আয়ুর্ব্বেদ; যজুর্ব্বেদের ধনুর্ব্বেদ; সামবেদের উপবেদ গান্ধর্ব্ব শাস্ত্র, অথর্ব্ববেদের উপবেদ—শস্ত্র শাস্ত্র।

বেদের ষড়াঙ্গের মধ্যে শিক্ষা প্রথম অঙ্গ, পূর্ব্ব প্রবন্ধে শিক্ষার সামান্য ভাব উল্লেখ করিয়াছি।। শিক্ষা গ্রন্থসমূহের মধ্যে বত্রিশখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থসমূহের মধ্যে পাণিনীর শিক্ষাই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এই শাস্ত্রেরও মূল উপদেষ্টা শ্রীদেবাদিদেব মহেশ্বর, শ্রোতা শ্রীচিণ্ময়ী জগদম্বা। "অনন্তর শিক্ষা ব্যাখ্যা করিব"—এই হইতে আরম্ভ করিয়া—বাইটটী শ্লোকে শেষ করিয়াছেন। ‡ এই শাস্ত্রে—(১) বর্ণ (২) স্বর (৩) বলাবল (৪) সামসন্তান প্রভৃতির কথাও উক্ত আছে। যাঁহারা শিক্ষাশাস্ত্রে বিশেষ নৈপুণ্য লাভ করেন নাই, তাঁহারা বেদাদি শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ পাঠক নহেন। "যাহারা গানস্বরে এবং অতি দ্রুত পাঠী, ও শিরঃকম্পন পূর্ব্বক পাঠী, লিখিত (পুস্তক) পাঠী, অর্থজ্ঞান রহিত, অতি মৃদুকণ্ঠ, তাঁহারা নিকৃষ্ট পাঠক বলিয়া খ্যাত"। (শিক্ষা ৩২ শ্লোক।)

যাঁহাদের পাঠকালে (১) "স্বরমাধুর্য্য, (২) অক্ষর (উচ্চারণের) স্পষ্টতা, (৩) পদবিচ্ছেদ, (৪) কোমল স্বর (অর্থাৎ সঙ্গীতশাস্ত্রে সাধিত স্বর,)

(*) মীমাংসা দর্শন ভাষ্যে "ত্রয়োদেবা অসৃজ্যন্ত' ত্রযোদেবা অসৃজ্যন্ত" (ক) "উচ্চৈ ঋচা ক্রিয়তে" "উচ্চৈঃ সাম্না" 'উপাংশু যজুষা" ইতি। "অগ্নে ঋগবেদঃ" "বায়োর্যজুর্ব্বেদঃ" 'আদিত্যাৎ সামবেদঃ"। "ত্রয়ীবিদ্যা খ্যাচতস্বিদি" (মীঃ মাং দং সূং) ৩।৩।৫। এবং শ্রীমদ্ভাগবত টীকা ও ররণবুহ টীকা দ্রষ্টব্য।

† "শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণঃ নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষং ইতি বেদাঙ্গানি ষট"। (১) শিক্ষা, (২) কল্প, (৩) ব্যাকরণ, (৪) নিরুক্ত, (৫) ছন্দ, (৬) জ্যোতিষ—এই ছয়টী বেদের অঙ্গ বলিয়া খ্যাত।

‡ 'অথ শিক্ষাং প্রবক্ষ্যামি পাণিনীয়ং মতং যথা—ইত্যাদি যথা গীতায়োস্পৃষ্টোদাত্তং চাসন্তশঙ্কর একাদশী ইত্যন্তং।

(৫) ধীরতা, (৬) স্বরলয়ে সামর্থ্য (অর্থাৎ স্বরের আরোহ, অবরোহ, মূর্চ্ছনাদিতে অভিজ্ঞতা) আছে, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ পাঠক জানিবে"। (শিক্ষা, ৩৩ শ্লোক।)

শিক্ষা শাস্ত্রোক্ত রীতি অনুসারে অর্থজ্ঞান পূর্ব্বক উচ্চারণ, প্রকৃত অর্থের বোধক ও সুফলদায়ক। বিশুদ্ধভাবে শব্দের উচ্চারণ ভিন্ন প্রকৃত (দোষশূন্য) অর্থজ্ঞান হওয়া অসম্ভব। বর্ণাবলীর উচ্চারণে যে "সংবৃত" প্রভৃতি আঠারটী দোষ হইয়া থাকে সেগুলিও শিক্ষাশাস্ত্রে স্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে,—(১) সম্বৃত, একার প্রভৃতির (উচ্চারণে) সম্বৃতত্ব দোষ হয়। (২) হ্রস্ব-বর্ণোচ্চারণে প্রযত্নবিশেষকে "সংবৃত" বলে। তাহা অকারের হয় না। (৩) কল, স্থানে অনিষ্পন্নকে 'কল' বলে। (৪) ধ্মাত—যদ্দ্বারা শ্বাসের আধিক্য নিবন্ধন হ্রস্ববর্ণও দীর্ঘের ন্যায় প্রকাশ পায়, তাহাকে "ধ্মাত বলে"। (৫) এনীকৃত,—(অবশিষ্ট)—এইটী ওকার অথবা ঔ-কার এইরূপ সন্দেহ যাহাতে হয়, তাহাকে "এনীকৃত" বলে। (৬) অম্বুকৃত,— যে স্বর ব্যক্ত হইয়াও অন্তর্মুখরূপে প্রকাশ পায়। (৭) অর্দ্ধক, —যে স্বর সুদীর্ঘ হইয়াও হ্রস্বের ন্যায় প্রকাশিত হয়। (৮) গ্রস্ত—যাহা জিহ্বামূলেতে নিগৃহীত (আহত) হয়। (৯) পিরস্ত—নিষ্ঠুর (প্রকাশ বা অভিব্যক্তি কালে কর্কশতা)। (১০) প্রগীত,—যাহা সামগানের ন্যায় উচ্চারিত হয়। (১১) উপগীত,—যে নিকটে বর্ণান্তর গীত দ্বারা অনুরক্ত হয়। (১২) রোমশ,—গভীর। (১৩) অবিলম্বিত,—বর্ণান্তরের সঙ্গে অসংযুক্ত। (১৪) নির্হত,—অতিশয় রূক্ষ (কর্কশ) (১৫) বিকম্পিত,—সুস্পষ্ট বা বিশদ্ অর্থ। (১৬) সন্দষ্ট,—বর্দ্ধিত প্রায়। (১৭) দ্রুত,– সুস্পষ্টার্থ বা অব্যবধানে উচ্চারিত। (১৮) বিকীর্ণ বর্ণান্তর দ্বারা সংপ্রসারিত, এক ও অনেক তুল্য। এইরূপ ১৮টী স্বরের ও ১৮টী ব্যঞ্জনের দোষ মহাভাষ্যাদিতে উক্ত আছে। উষ্মবর্ণ—শ, ষ, স, হ, এই চারিটী উষ্মবর্ণ। *

সকল স্বরের মধ্যে "সবন" নামক স্বরই শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। সবন শব্দের অর্থ প্রক্রম—মূল উৎপত্তি স্থান হইতে গন্তব্য স্থানের সংসর্গ পর্য্যন্ত, এবং মধ্যস্থানে সম্যক্‌রূপে বিভক্ত হইয়া পর্য্যবস্থানে যাহার সংযোগ হয়, তাহা সবন স্বর। নাভি প্রদেশ হইতে (উদানবায়ু প্রেরিত) উত্থিত হইয়া

* উষ্ম শব্দের অর্থ বায়ু, কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় বহু স্থানে গরম ও বর্ণবিশেষে প্রয়োগ হয়।

উরুদেশে প্রথম প্রক্রম (স্পর্শ বা অবঘাত) হয়। অনন্তর কণ্ঠদেশে দ্বিতীয়, এবং মস্তকে তৃতীয় প্রক্রম হয়। প্রতি উচ্চারণে তিন ভাগে বিভক্ত হয়। কোন কোন উচ্চারণ উরঃ (বক্ষ) স্থান দ্বারাই আরব্ধ হয়; কণ্ঠ হইতে ও শিরোদেশ হইতে নয়। অপর কণ্ঠদেশ হইতেই প্রক্রম হয়; উরঃস্থান ও শীর্ষস্থান হইতে নয়। অন্যটী শীর্ষস্থান হইতেই প্রক্রম হয়। বক্ষস্থান বা কণ্ঠদেশ হইতে নয়। এইরূপে তিন ভাগে বিভক্ত স্বরই মন্দ্র (১) মধ্য (২) তার রূপে অভিহিত হয়। (৩) শাস্ত্রে বর্ণিত আছে,—হৃদয়ে মন্দ্র, গলদেশে মধ্য, মস্তকে তার। *

প্রাতঃকালের সবন-উচ্চারণ গভীর স্বর হইয়া থাকে, তাহাকে মন্দ্র বলা হয়। সেই মন্দ্র স্বরই পুনঃ বক্ষদেশ, কণ্ঠদেশ, মস্তক প্রভৃতির উত্তর আধার ক্রমে সন্নিবিষ্ট হইয়া, নিম্ন স্থান হইতে (নাভিদেশ) প্রকাশ পাইলে তাহাকে 'অনুদাত্ত' বলে। মাধ্যন্দিন সবনের উচ্চারণে মধ্যস্বরের যে প্রাদুর্ভাব হয়, তাহাকে 'স্বরিত' বলে; ইহাতে মন্দ্র ও তার এই উভয়ের ধর্ম্ম বিদ্যমান রহিয়াছে। সায়ংকালীন সবন উচ্চারণে অতি উচ্চ স্বরের বিকাশ হয়, সেই স্বর তার—ইহাকেই 'উদাত্ত' বলে। উচ্চ বা উর্দ্ধদেশ হইতে গৃহীত হয় বলিয়া উদাত্ত সংজ্ঞা হইয়াছে।

মানবের বক্ষযন্ত্রের মধ্য হইতে বাইশ রকমের ধ্বনির বিকাশ হয়।† সেই ধ্বনি বিশেষ কণ্ঠদেশে বিকশিত হইলে তাহা 'মন্দ্র'; এবং মস্তক পর্য্যন্ত যাইয়া প্রকাশিত হইলে তাহা "তার" স্বর নামে অভিহিত হয়।

প্রাতঃকালে বক্ষস্থল হইতে শার্দ্দূলের রোদনের ন্যায় স্বর বিকাশ করিয়া পাঠ করিবে। মধ্যাহ্নকালে চক্রবাক্ পক্ষীর রবের অনুরূপ স্বরে কণ্ঠস্থ স্বর দ্বারা পাঠ করিবে। মস্তক স্থান-গত সবন নামক তৃতীয় স্বরকে সকল সময়ে প্রয়োগ করণে যোগ্য "তার" বা উদাত্ত বলিয়া জানিবে"।‡ স্বরিত বা সমাহার, কর্ণমূলদেশ হইতে সকল মুখে ব্যাপ্ত হইয়া প্রকাশ পায়।

"যে সময়ে সূর্য্য ও এই স্বর (প্রাতে) উদয় হয়, তখন তাহাই মন্দ্র ভাবে

---

* "হৃদি মন্দ্রো গলে মধ্যো মূর্দ্ধ্নি তার ইতি ক্রমাৎ"।

† অভিধানং দ্বৈতবেয শ্রুতিঃ; অথবা ইশীত শ্রুতিঃ।

‡ পাণিনীয় শিক্ষাযাং।

প্রকাশিত হয়। সেই হেতু প্রাতঃ-সবনে মন্দ্রস্বরে স্তবাদি করিবে। যে সময় সূর্য্যের (মধ্যাহ্ন সময়ে) উদয় হয়, তখন মধ্য বেগস্বরে স্তবাদি করিবে, সেই সময়ের প্রযোজ্য স্বরকে "মধ্য" বলিয়া জানিবে। যখন সূর্য্য সমস্ত দিক্ গত হন, তখন বলবান্ তৃতীয় স্বরের বিকাশ হয়। তৃতীয় সবনে সেই স্বর (উদাত্ত) দ্বারা স্তবাদি পঠিত হইবে।"

"বেদে উক্ত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি শাস্ত্রোক্ত নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছায় উচ্চারণে প্রবৃত্ত হয়, তাহার বাক্যে দৌর্ব্বল্য ও নানাপ্রকার দোষের আবির্ভাব হয়। *

শিক্ষাশাস্ত্রে বর্ণোৎপত্তির আটটি স্থানের উল্লেখ আছে † যথা— (১) হৃদয়, (২) কণ্ঠ, (৩) মস্তক, (৪) জিহ্বার মূল দেশ, (৫) দন্তসমূহ, (৬) নাসিকা, (৭), ওষ্ঠ (৮) তালু। এই সম্বন্ধে ঋক্ প্রাতিশাখ্যে ও যজুঃ প্রাতিশাখ্যে বর্ণাবলীর সংস্থান এবং উৎপত্তির কথা বর্ণিত আছে।

পূর্ব্বোক্ত আটটি স্থানে যে যে বর্ণের সম্পূর্ণ বিকাশ হয়, তাহাদিগকে যথা-ক্রমে—ঔরস্য, কণ্ঠ্য, তালব্য, জিহ্বামূলীয়, দন্ত্য, নাসিক্য, ওষ্ঠ্য প্রভৃতি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা হইয়াছে। সঙ্গীতশাস্ত্রের সঙ্গে এই শিক্ষাশাস্ত্রের বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। তাহা আমরা সঙ্গীতশাস্ত্র প্রসঙ্গে বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিব।

"উচ্চভাষণ (চণ্ডরব বা তারস্বরে উচ্চারণ) উদাত্তে হয়। নীচভাষণ (অস্পষ্ট উচ্চারণ বা অতি মৃদু উচ্চারণ) অনুদাত্তে হয়। মিশ্রিত কথন (অর্থাৎ মাধ্যমিক ভাষণ) স্বরিত বা সমাহারে হইয়া থাকে ‡।

এই উদাত্ত প্রভৃতি স্বরবিভাগ, কতকটা উচ্চারণ কর্ত্তার উচ্চারণ শক্তি দ্বারা ও কতকটা শ্রবণের প্রকর্ষ ও অপ্রকর্ষ দ্বারা নির্ণীত হয়। যথানিয়মে স্বর দ্বারা উচ্চারিত হইলে, বর্ণগুলি অধিক মাত্রায় শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয়; এবং অত্যধিক দেশ পরিব্যাপ্ত হইয়া তাহা বহুদূরস্থ ব্যক্তিও শুনিতে পায়। ইহাই উদাত্তের লক্ষণ।

বেদের দ্বিতীয় অঙ্গ কল্প বা কল্পসূত্র নিচয়। এই শাস্ত্র প্রণেতা মহর্ষি

---

* ঐতরেয় শ্রুতিঃ।

† পাণিনীয় শিক্ষায়াং;

‡ পাণিনিসূত্রাণি,—যথা,—"উচ্চৈরুদাত্তঃ" "নীচৈরনুদাত্তঃ" সমাহারঃ স্বরিতঃ"।

আপস্তম্ব বৌধায়ন, কাত্যায়ন পারস্কর প্রভৃতি। একশাখাতে বিভিন্ন প্রকরণোক্ত মন্ত্র নিকরের যথা ন্যায্য ও অন্য শাখায় পঠিত মন্ত্রের উপসংহারাদি পূর্ব্বক যজ্ঞ ও সংস্কারাদির প্রয়োগকল্পক যে গ্রন্থ, তাহাকে "কল্প শাস্ত্র" কিম্বা 'ধর্ম্মশাস্ত্র' বলা যায়।

এই কল্পসূত্র সমূহের মধ্যে মানবের ঐহিক পারলৌকিক বহু বিষয় বর্ণিত আছে। কেহ বলেন ধর্ম্মসূত্র ও ষড়্‌দর্শনের সূত্রাবলীর রচনা একই সময়ে হইয়াছে, এই বিষয়ে বিশেষ কোন প্রমাণ না থাকাতে আমরা তাহা অঙ্গীকার করিতে পারি না। উক্ত কল্পসূত্র পূর্ব্ব ও উত্তর সূত্ররূপে দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম নয় সূত্র, দ্বিতীয় নয় সূত্র।

১ম, নয়সূত্র,—(১) অগ্নিবেশ্য সূত্র, (২) বৌধায়ন সূত্র, (৩) আপস্তম্ব সূত্র, (৪) সত্যাষাঢ়, (৫) দ্রাহ্যায়ন সূত্র, (৬) অগস্ত্য সূত্র, (৭) শাকল্য সূত্র, (৮) শ্বলায়ন সূত্র, (৯) শাম্ববীয় সূত্র।

পরসূত্র,—(১) বৈখানশ সূত্র, (২) শৌনকীয় সূত্র, (৩) ভারদ্বাজ সূত্র, (৪) পারস্কর বা অগিবেশ্য সূত্র, (৫) জৈমিনীয় সূত্র, (৬) অমাথুস্ত্য সূত্র, (৭) মাধ্যন্দিন সূত্র, (৮) কৌণ্ডিল্য সূত্র, (৯) কৌষিতকী সূত্র। কল্পসূত্রের এইরূপ বিভাগকারী শ্রীমৎ বৈদ্যনাথ দীক্ষিত। ইঁহার "স্মৃতিমুক্তাফল" নামক-সন্দর্ভের আচারকাণ্ডে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতৃগণের নামপ্রসঙ্গে যেরূপ কল্পসূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, আমরাও তাঁহার মতে সেইরূপই লিখিলাম। কিন্তু ইহা সর্ব্ববাদী-সম্মত নয়।

এই ভিন্ন শ্রৌতধর্ম্ম ও স্মার্ত্তধর্ম্ম প্রতিপাদক কাত্যায়নাদির কল্পসূত্র, মহর্ষি মনু প্রভৃতি প্রণীত বহু সংহিতা বর্ত্তমান রহিয়াছে। এইগুলিও কল্প বা ধর্ম্ম-শাস্ত্রের মধ্যে গণ্য হইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ,

সাধকের নিবেদন।

হৃদয়ের উপকণ্ঠে বাঁশরী বাজা'ল কে রে!
উৎকট উৎকণ্ঠা একি সে অজ্ঞাতে নাহি হেরে।
কত বন উপবনে, কত সে সৈকত তীরে,
খুঁজিলাম দিবা-যামি কত যমুনার নীরে,—
কত গিরি-চূড়া পানে রহিলাম চেয়ে চেয়ে;
অম্বরে অম্বুদে কত দেখিলাম শূন্যে চেয়ে;
তবু না মিলিল দেখা, সে ধ্বনির অনুরূপ—
অজ্ঞাত স্বরূপ সেই আকাঙ্ক্ষিত দিব্য রূপ।
নয়ন দেখিছে যত, হৃদয় বলিছে তত,—
'এ নহে ত আমার সে মানসের অভিমত;'
জানি না কেমন সে যে, জানি সে এমন নয়,
বিনা কোন নিদর্শন, কেমনে সন্ধান হয়?
শুধু কি ডাকিতে জানে, দেখা দিতে নাহি জানে,
অদৃশ্যে অন্বেষি কত অনর্থক অনুমানে।
বুঝিতে যে শক্তি নাই, জ্ঞান-ভক্তি হীন হিয়া।
আপনি দর্শন দেও, আপনারে বুঝাইয়া।'

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র।

ঈশ্বরের স্বরূপ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ব্রহ্মের এই সকল মূর্ত্তি যে সত্য, সে বিষয়ে অনেকেই সন্দিহান হইয়া থাকেন। এখন আর দ্বিধাশূন্য হইয়া কেহ বিশ্বাস করিতে চাহেন না। ঈশ্বরের যে সকল রূপ-পরিগ্রহের কথা বলা হইয়াছে, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে

কোন প্রমাণ আছে কিনা, সে বিষয় অনুসন্ধান করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। সে বিষয়ের প্রমাণ—(১) শাস্ত্র (২) সাধক সম্প্রদায়ের সাক্ষ্য। আর্য্য শাস্ত্রে সর্ব্বত্রই এই সকল রূপের কথা বর্ণিত আছে। ঋষিগণের দিব্য দৃষ্টিতে যাহা প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহা তাঁহারা শাস্ত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। ঋষ্ ধাতুর অর্থ দর্শন ; যাঁহারা জ্ঞানবলে অন্তর-রাজ্যের সত্য সকল প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই ঋষি।

বেদ, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেই এই সকল রূপের কথা আছে। অনেকের বিশ্বাস আজ কাল যে সকল দেব দেবীর মূর্ত্তি প্রচলিত আছে তাহা বেদে নাই। নিম্নে যে কয়েকটী মন্ত্র উদ্ধৃত করা গেল, তদ্দ্বারা এই মতের অসারতা প্রতিপাদিত হইবে।

"তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্ম্মফলেষু জুষ্টাং দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি তরসে নমঃ। কালরাত্রিং ব্রহ্মস্তুতাং বৈষ্ণবীং স্কন্দমাতরং সরস্বতীমদিতীং দক্ষদুহিতরং নমামঃ পাবনাং শিবাং।" ঋক সং। যাঁহার অঙ্গের বর্ণ অগ্নির ন্যায় সুগাঢ় পীত, যিনি সর্ব্বজ্ঞতা প্রতিভায় সর্ব্বদা প্রদ্যোতিতা, যিনি যথাযথ ফল লাভের জন্য দানবগণ কর্ত্তৃক উপাসিতা, আমি এই দুস্তর ভবসাগর সন্তরণের নিমিত্ত, সেই দুর্গা দেবীর শরণ লইলাম। যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করিতেছেন, যিনি সমস্ত বেদের প্রতিপাদ্যা অথবা ব্রহ্মার আরাধ্যা, যিনি বৈষ্ণবীরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, যিনি ষড়াননের জননী-রূপে মহেশ-গেহিনী, যিনি সরস্বতী রূপে ব্রহ্মার পত্নী হইয়া,—অদিতিরূপে কশ্যপের পত্নী হইয়া, বিষ্ণু প্রভৃতি দ্বাদশ আদিত্য ও অন্যান্য ইন্দ্রাদি দেববৃন্দের জননী, সেই পাবনা দক্ষদুহিতা দুর্গা দেবীকে নমস্কার। (পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের অনুবাদ।)

"অথ হৈনাং পরব্রহ্মরূপিণীং ব্রহ্মরন্ধ্রে ধ্যাত্বা ব্রহ্মময়ো ভবতি। অব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ভবতি। অশ্রোত্রিয়ো শ্রোত্রিয়ো ভবতি। সর্ব্বস্মাৎ পাপ্মনা বিমুক্তো ভবতি, বিমুচ্যতে এতদ্বৈতৎ।" অথর্ব্ববেদ সং।

যিনি বহু জন্মের উপার্জ্জিত ভাগ্যবলে এই পরম ব্রহ্মরূপিণী দক্ষিণাকে ব্রহ্মরন্ধ্রে অনুভব করিতে পারেন, তিনি ব্রহ্মময় হইয়া থাকেন। সুতরাং তিনি অব্রাহ্মণ হইলেও তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়েন ; অশ্রোত্রিয় হইলেও

তিনি সমস্ত বেদার্থের পারদর্শী এবং নিখিল পাপরাশি হইতে বিমুক্ত হয়েন। কেবল ইহাই নহে, তিনি ভববন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া নির্ব্বাণ-পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। (পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচুড়ামণি কৃত অনুবাদ।)

"উমা সহায়ং পরমেশ্বরং বিভুং ত্রিলোচনং লোক সাক্ষীপ্সরস্তাৎ। ধ্যাত্বা মুনির্গচ্ছতি ভূতযোনিং যদব্যয়ং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ" (যজুঃ—কৈবল্যোপনিষৎ)।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রাজ্যের পরমেশ্বর সর্ব্বব্যাপী, সমস্ত লোকের সাক্ষী স্বরূপ জড়াতীত, সর্ব্বভূতের নিদান, সনাতন ত্রিলোচন দেবকে উমার সহিত ধ্যান করিয়া, মুনিগণ ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কারণ ধীরগণ তাঁহাকেই সেই অব্যয় পুরুষ বলিয়া জানেন। (উক্ত অনুবাদ।)

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব
বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা॥ মুণ্ডক ১।১।

দেবগণের মধ্যে ব্রহ্মা প্রথম আবির্ভূত হইয়াছিলেন; তিনি বিশ্বের কর্ত্তা ভুবনের রক্ষাকর্ত্তা।

হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্ব্বং (শ্বেত ৩।৪।) তিনি হিরণ্যগর্ভ (ব্রহ্মা) রূপে প্রথমতঃ প্রকাশিত হ'ন। জনয়ামাস শব্দে উৎপন্ন করান অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম-পদার্থ ব্রহ্মা রূপে প্রতিভাত হন।

যে উপনিষদের দোহাই দিয়া নিরাকার উপাসনা প্রবর্ত্তিত হইতেছে, সেখানেও তাঁহার রূপের কথা আছে। উপরে যে কয়েকটী মন্ত্র উদ্ধৃত করা গেল, তদ্দ্বারা এ কথা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইবে। বাহুল্য বোধে আর উদ্ধৃত করিলাম না। পুরাণ ও তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রে আকারবান্ ও সগুণ ব্রহ্মের কথা যে বহুল ভাবে বিবৃত আছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন।

এখন সাধক সম্প্রদায়ের সাক্ষ্যে আমরা কি জানিতে পারি, তাহা দেখা যাক্। আজ বেশী দিনের কথা নহে, প্রায় চারিশত বৎসর অতীত হইল, মেহারে ৺সর্ব্বানন্দ ঠাকুর এক রাত্রে দশ মহাবিদ্যা রূপ দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি নিরক্ষর, মূর্খ ছিলেন, রূপ দর্শন মাত্র তাঁহার মুখ হইতে সংস্কৃত স্তোত্র উচ্চারিত হইতে লাগিল। সেই স্তোত্র আজিও সাধক সমাজে প্রচলিত আছে; তাহার জীবনীতে এইরূপ লিখিত আছে:—

অথ তন্নিশীথ কালে স্বকীয় হৃদয়াম্বুজাৎ।
নিঃসৃত্য তেজঃ পরমং চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিভিঃ প্লুতং॥
ব্যাপিতং তদ্বনং সর্ব্বময়ঃপিণ্ডাগ্নিবত্তদা।
অপশ্যৎ তেজসো গাঢাৎ স্বেষ্ট বিম্বং সুনির্ম্মলং॥
শনৈরালোকনাত্তত্র প্রাপশ্যদ্ দৃষ্টিগোচরে।
গুরূপদিষ্টং যদ্ধ্যানং চিন্তিতং চেতসা মুদা॥
তন্মূর্ত্তিঃ পরমারূপা মহতী ভক্তবৎসলা।
ঈষদ্ধাসাম্বুজমুখী নীলেন্দীবরলোচনা॥
সদা দয়ার্দ্র-হৃদয়া সাধকাভীষ্টসিদ্ধিদা।
ভক্তানাং কুশলাকাঙ্ক্ষী শান্তানাং শান্তিদায়িনী।
জবাকুসুমসঙ্কাশা চন্দ্রকোটিসুশীতলা।
পদ্মাননা পদ্মহস্তা চন্দ্রসূর্য্যাগ্নলোচনা॥
ত্রৈলোক্যজননী নিত্যা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষদা।
সর্ব্বানন্দকরী সা তু সর্ব্বানন্দ মুবাচ হ॥

"অনন্তর সেই নিশীথ সময়ে সহসা তাঁহার হৃদয় পদ্ম হইতে চন্দ্র ও সূর্য্য সদৃশ নির্ম্মল ও তেজোময় এক অগ্নিপিণ্ডাকৃতি পদার্থ নিঃসৃত হইয়া সমুদয় বন ব্যাপিত হইল। ঐ তেজোময় অগ্নিপিণ্ডাকৃতি পদার্থ ক্রমশঃ গাঢ় হইয়া আসিলে, তাহাতে সুনির্ম্মল ইষ্ট দেবীর প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইলেন। অনন্তর পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে অবলোকন করিতে করিতে, স্বীয় ইষ্ট দেবীর প্রকৃত অবয়ব সমুদয় তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইলে, তিনি আনন্দচিত্তে তাঁহার ধ্যান চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই মূর্ত্তিমতী দেবী বর্ণনাতীত মনোহর রূপ-বিশিষ্টা, ভক্তবৎসলা, ঈষৎ হাস্যানন-যুক্তা, পদ্ম-সদৃশ সুন্দর নেত্র-যুক্তা, সতত দয়ার্দ্র হৃদয়-বিশিষ্টা, সাধকগণের অভীষ্ট-বর-প্রদায়িনী, ভক্তদিগের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, শান্তদিগের শান্তিদায়িনী, জবা পুষ্পের ন্যায় সুন্দর আভাযুক্তা, কোটি চন্দ্র কিরণের ন্যায় শীতল জ্যোতিপূর্ণা, পদ্ম সদৃশ মুখযুক্তা, পদ্ম-সদৃশ কোমল হস্ত বিশিষ্টা, চন্দ্রসূর্য্যসদৃশ উজ্জ্বল চক্ষুঃজ্যোতিসম্পন্না ত্রিলোকজননী, নিত্যা, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রদায়িনী এবং সদা আনন্দ-প্রদায়িনী; সেই দেবী সর্ব্বানন্দকে বলিলেন। এই সর্ব্বানন্দ ঠাকুর সিদ্ধাবস্থায় সর্ব্ব-বিদ্যা

নামে খ্যাত ছিলেন। আজিও তাঁহার বংশধরগণ মেহার (ত্রিপুরা জেলা) ও যশোহর জেলার বেন্দা প্রভৃতি স্থানে বর্ত্তমান আছেন।

সাধক প্রবর রামপ্রসাদের নাম বঙ্গদেশে অল্প বিস্তর সকলেই অবগত আছেন। তিনি কালীরূপের সাধক ছিলেন। সময় সময় যে তিনি তাঁহার উপাস্য দেবতার রূপ প্রত্যক্ষ করিতেন, তাহা তাঁহার সঙ্গীতে প্রকাশ। দক্ষিণেশ্বরের মহাপুরুষ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন, "যিনি ব্রহ্ম তিনিই কালী। যখন নিষ্ক্রিয়, তখন তাঁ'কে ব্রহ্ম বলে কই। যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এই সব কাজ করেন, তখন তাঁ'কে শক্তি বলে কই।"

'কালীই ব্রহ্ম' 'ব্রহ্মই কালী' ,—একই বস্তু। যখন তিনি নিষ্ক্রিয়, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কোন কাজ করছেন না, এই কথা যখন ভাবি, তখন তাঁ'কে ব্রহ্ম বলি কই। যখন তিনি এই সব কার্য্য করেন, তখন তাঁ'কে কালী বলি, শক্তি বলি। একই ব্যক্তি নাম রূপ ভেদ মাত্র। "তিনি শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় মানুষের মত দেহ ধারণ করে আসেন এও সত্য: নানা রূপ ধরে ভক্তকে দেখা দেন, এও সত্য। আবার তিনি নিরাকার অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, এও সত্য। বেদে তাঁকে সাকার ও নিরাকার দুই বলেছে, সগুণও বলেছে—নির্গুণও বলেছে।" "তাই যতক্ষণ 'আমি' আছে, যতক্ষণ ভেদবুদ্ধি আছে, ততক্ষণ নির্গুণ বলবার যো নাই। ততক্ষণ সগুণ ব্রহ্ম মান্‌তে হবে। এই সগুণ ব্রহ্মকে বেদ পুরাণ তন্ত্রে আদ্যাশক্তি বা কালী বলে গেছে।" "যারা নিরাকার নিরাকার করে কিছু পায় না, তা'দের না আছে বাহিরে, না আছে ভিতরে।"

মহাত্মা ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর জীবনচরিত পাঠে জানা যায় যে, উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তিকে তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে ঈশ্বরের রূপ দেখাইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাস মহাশয়ের রচিত জীবনীতে এইরূপ লিখা আছে ;— "স্বামীজীর উপদেশের পর উমাচরণ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, সত্য সত্যই কি ঈশ্বরকে দর্শন পাওয়া যায়? স্বামীজী বলিলেন 'সাধনা করিলে ও গুরুর কৃপা হইলেই পাওয়া যায়। তুমি কি ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতে চাও?' উমাচরণ বাবু অত্যন্ত আগ্রহপূর্ণ হৃদয়ে বলিলেন, 'প্রভো! তাহা হইলে কৃতার্থ হই।' স্বামীজী বলিলেন, আমার আসনের নিকট যে কালী মূর্ত্তি আছে, তাঁহাকে দেখিয়া আইস। উমাচরণ বাবু দেখিলেন যে পাষাণময়ী মা অচলা বিরাজমানা। আসিয়া বলিলেন.

দর্শন করিলাম। স্বামীজী বলিলেন, 'তাঁহাকে কি এইখানে দেখিতে চাও?' উমাচরণ বাবু বলিলেন, তাহা হইলে কৃতার্থ হই। স্বামীজী ধ্যানস্থ হইয়া মাকে ডাকিলেন। উমাচরণ বাবু প্রত্যক্ষ দেখিলেন যে, একটী কুমারী বালিকার ন্যায় সেই পাষাণময়ী মা ধীর পাদবিক্ষেপে স্বামীজীর নিকট উপস্থিত হইলেন। অস্পষ্ট দীপালোকে চৈতন্যময়ীর গতি দর্শনে উমাচরণ বাবু অতিশয় ভীত ও চমৎকৃত হইলেন। স্বামীজী উমাচরণ বাবুকে বলিলেন, "যাও পুনর্ব্বার দেখিয়া এস, মার মূর্ত্তি সেখানে আছে কিনা।" উমাচরণ বাবু কম্পিত-পদে ভয়বিহ্বল-চিত্তে গেলেন বটে; কিন্তু মায়ের মূর্ত্তি আর সেখানে দেখিতে পাইলেন না। তাহার আরও ভয় হইল, দৌড়িয়া স্বামীজীর নিকট আসিলেন। স্বামীজী ঈষৎ হাস্য করিয়া তাহাকে বসিতে বলিলেন ও মাকে নিজের আসনে যাইতে সঙ্কেত করিলেন। ছোট মেয়েটীর মত মা আবার ধীর পদসঞ্চারে নিজ আসনে পাষাণময়ী হইয়া বিরাজমানা রহিলেন।" ত্রৈলিঙ্গ স্বামী মৌনী ছিলেন, উমাচরণ বাবু ভিন্ন আর কাহারও সহিত কথা বলা বলিতেন না। উমাচরণ বাবুর প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া ঈশ্বরের রূপ ও পুনর্জন্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ দেব তাঁহার নিজের লীলায় ব্রহ্মের সাকার রূপের কথা নানা ভাবে দেখাইয়া গিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ দেবকে সম্প্রদায় বিশেষ অবতার রূপে স্বীকার করেন না, কিন্তু তিনি যে পরম ভগবদ্ভক্ত ছিলেন সে বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। ভক্ত ও ভগবানে কোন প্রভেদ নাই; কারণ ভক্তের যখন সোঽহং জ্ঞান পূর্ণমাত্রায় উপস্থিত হয়, তখন তিনি ঈশ্বর পদবাচ্য; সে অবস্থায় ঈশ্বরে ও তাঁহাতে কোন পার্থক্য থাকে না, তিনি অনন্ত সত্ত্বায় মিলিত হইয়া যান। এ ভাবে দেখিলেও শ্রীচৈতন্যদেব যে ঈশ্বর, কি ঈশ্বর-তুল্য মহাপুরুষ ছিলেন, তৎপ্রতি সন্দেহ করার কোন কারণ দেখা যায় না। তিনি প্রেম ভক্তি প্রচার করিয়া, রাধাকৃষ্ণের গুহ্য সাধন রহস্যগুলি নিজ জীবনে প্রত্যক্ষভাবে দেখাইয়া গিয়াছেন।

এই সকল জীবন্মুক্ত পুরুষের সাক্ষ্য অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। ভারতে এরূপ সাধক এখনও খুব বেশী না থাকিলেও, একেবারে অভাব হয় নাই। যাঁহার অন্তরে প্রকৃত পিপাসা জন্মিয়াছে, তিনি এখনও মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পান। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী জীবনের প্রথম ভাগে

অন্য মতাবলম্বী হইয়াও, শেষভাগে ঐ মত পরিহার পূর্ব্বক ৺পুরীধামে সাকার ঈশ্বরের (শ্রীকৃষ্ণ রূপের) সাধনায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

রূপ পরিগ্রহ সম্বন্ধে আর একটী আপত্তি শুনা যায়। দ্বিতীয় কারণে অর্থাৎ জগতের সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য, তাঁহার রূপ-পরিগ্রহের কথা যে উপরে বর্ণিত হইয়াছে, সে বিষয়ে অনেকে এরূপ বলেন যে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর যখন ইচ্ছা মাত্রই সকল কার্য্য সংসাধিত করিতে পারেন, তখন কোন অসুর কি দৈত্য, দানব, রাক্ষস বধের জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিয়া, পৃথিবীতে রামকৃষ্ণাদিরূপে জন্ম গ্রহণ করার কারণ কি ছিল? এই সকল অবতার অবিশ্বাস করিবার পক্ষে, তাঁহারা ইহা একটি অকাট্য যুক্তি মনে করেন। মহিষাসুর বধের জন্য দুর্গাদেবীর আবির্ভাব ও শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধে আদ্যাশক্তি কালীর আবির্ভাবও তাহারা উল্লিখিত কারণে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন। যাঁহারা এই তর্ক উপস্থিত করেন, তাহাদের গোড়ায় একটু ভুল আছে।

তাঁহারা মুখে বলেন সর্ব্বশক্তিমান্; কিন্তু এদিকে মনে করেন, ঈশ্বরের দুঃখ কষ্ট ঠিক আমাদের মত। আমাদের যাহাতে কষ্ট হয় তাঁহারও তাহাতে কষ্ট হইবে কি হইতে পারে, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ঐরূপ আপত্তি উত্থাপন করেন। যিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ওতঃপ্রোত ভাবে থাকিয়া সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার করিতেছেন, তাঁহার দুঃখ কষ্ট আমাদের দৃষ্টান্তে বুঝিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। যিনি কালের কাল, তোমার আমার লক্ষ বৎসর যাঁহার এক নিমিষ মাত্র, তিনি লীলার জন্য মর্ত্ত্যধামে কিছুকাল থাকিলে তাঁহার কষ্ট হইবে ইহা মনে করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। তবে একথা অবশ্য বলা যাইতে পারে, যে রাম, কৃষ্ণ, কালী, দুর্গারূপে অবতীর্ণ না হইয়া, অন্য উপায়ে এই সকল কার্য্যসিদ্ধি করিতে পারিতেন। সংসারে কি উদ্দেশ্যে কি করিতেছেন, কেন মানুষকে মানুষ করিলেন, গাছকে গাছ করিলেন, এ সকল কথার উত্তর কে দিবে। আমরা ত কোনি "কেনরই" উত্তর দিতে পারি না, তবে এই সকল রূপ পরিগ্রহ করিয়া "কেন" মর্ত্ত্যধামে অবতীর্ণ হইলেন? তাহার কারণ খুঁজিতে যাই কেন! কি উদ্দেশ্যে কোন্ কাজ করিতেছেন, তাহা তিনি ভিন্ন কে বলিবে। এই প্রতিকূল যুক্তি অতি অসার ও অগ্রাহ্য। আমাদের নিজের ওজনে তাঁহাকে বুঝিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। আমার সীমাবদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা তাঁহার কোন্ কার্য্য বুঝিতেছি? তুমি

আমি তাঁহার অনন্ত লীলাখেলা কি বুঝিব? তিনি জগতকে লইয়া অনাদিকাল হইতে ধূলা খেলা করিতেছেন।

মন্বন্তরাণ্যসঙ্খ্যানি সর্গঃ সংহার এবচ।

ক্রীড়ন্নিবৈতৎ কুরুতে পরমেষ্টিঃ পুনঃ পুনঃ॥

তিনি অসংখ্য মন্বন্তর ও বার বার জগতের সৃষ্টি সংহার খেলার ন্যায় করিতেছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীকালীচরণ সেন।

ভাবলহরী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

তুমি কে ?

সকলেই ঘুমিয়েছে, সবাই নিস্তব্ধ, জগত সুপ্ত—মৌন, এ সময়ে কে তুমি জেগে রয়েছ? তাড়াতাড়ি হাতের কাজগুলি সেরে নিচ্চ—কে তুমি? পাছে সূর্য্য উঠে পড়ে, তাই আগে ভাগে এসে কলি গুলিকে ফোটাচ্চ? প্রাতঃকালে মধুমক্ষিকা পাছে ফিরে যায়—তাই তাড়াতাড়ি ফুলের পাপ্‌ড়িতে পাপ্‌ড়িতে তার জন্য মধু সাজিয়ে রাখ্‌ছ? আমগাছের মুকুলে মুকুলে রসে গন্ধে ভরে দিচ্চ,—পাছে উষাকালে কোকিল এসে তা'র স্বাদ না পায়! মা যেমন ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে গৃহস্থালীর কাজগুলি সেরে লেন, কে তুমি এই জগত শিশুকে অন্ধকারের অঞ্চলে ঢাকিয়া, তা'র চেতনা লোপ করিয়া—তাড়াতাড়ি সব কাজগুলি ক্ষিপ্রহস্তে সেরে নিচ্চ? যেখানে যা, ফুরিয়ে গেছে, সেখানে তা, যোগাইয়া সবই সরস—সবই নবীন করে রাখ্‌ছ?

হায়! হায়! এ জগতে তা'ই কোন জিনিষটাই পুরাণো হয় না। তোমার সব সৃষ্টির মাঝেই এমনি ধারা চালিয়েছ,—যে কিছুই পুরাণো হবে না! মার স্নেহ কত দিন থেকে পাচ্চি, তবু সে পুরাণো হলো না;—পুত্র কন্যাকে কত দিন কত আদর করেছি—কত স্পর্শ করচি, তবু তা'র আনন্দ ফুরাল না। প্রতিদিনই মনে হয়, পতি-পত্নীর সমস্ত প্রেম অভিনয় আজ নিঃশেষ হয়ে গেল; কিন্তু প্রভাতে

উঠে দেখি, আবার নবীনতর আকর্ষণে, অভিন্ন মাধুর্য্যে উভয়ে উভয়কে মুগ্ধ করিতেছে !

হ্যাঁগো কেমন করে এমনতর সাজাও ? ফুলের গন্ধ কত যুগ হয়ে গেল, তবু তার গন্ধ পুরাণো হলো না ! 'ভাল লাগ্‌চে না' হৃদয় একথা কোনদিন তো বল্লে না ! শ্যামল তৃণগুচ্ছ গুলি—নবীন কিশলয়গুলি—অগণন তারকামণ্ডিত সুনীল নভোমণ্ডল—বালারুণ কিরণ—চন্দ্রের সুনির্ম্মল জ্যোৎস্না—অমাবস্যার ঘন কৃষ্ণ অন্ধকার—তরুবীথিকা—মৃদু সমীরণ—জীবনের সুখ দুঃখ—সবাই রোজই আসে, অথচ কেউ পুরাণো হয় না ! প্রভাত হবার আগেই, কে তা'দের সাজিয়ে গুজিয়ে সৌন্দর্য্য মাখায়ে নূতন করে আবার পাঠিয়ে দেয় ? তা'রা ঠিক গত দিবসের মতই দর্শকের প্রাণ হরণ করে—ভাবুকের প্রাণে কত ভাব জাগায় ! এমন পারিপাট্য, এমন ব্যবস্থা যা'র, একবার তা'র নিরাবরণ রূপখানি দেখ্‌তে ইচ্ছা করে। তা'ই আবার জিজ্ঞাসা করি—"তুমি কে" ?

গীতায় কর্ম্মযোগ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ষষ্ঠ কারণ।—জ্ঞানীর পক্ষে—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে—সমাজের শীর্ষস্থানীয় লোকের পক্ষে—লোক-সংগ্রহের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান কর্ত্তব্য। ইহা কর্ম্মযোগানুষ্ঠানের ষষ্ঠ কারণ। লোক-সংগ্রহ কাহাকে বলে, তাহা আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এক কথায়, লোক-সংগ্রহের অর্থ মনুষ্য-সমাজ। সেই সমাজের রক্ষার্থ, সকলের—বিশেষতঃ যাঁহারা জ্ঞানী, যাঁহারা সমাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও শীর্ষস্থানীয়, তাঁহাদের কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। সমাজে সাধারণ লোক সকলেই অজ্ঞান—কর্ম্মসঙ্গী। প্রকৃতি অর্থাৎ প্রকৃতিজ গুণ তাহাদিগকে যেরূপ কর্ম্মে পরিচালিত করে, তাহারা সেইরূপ কর্ম্ম করে। তাহারা প্রায় সকলেই তামসিক বা রাজসিক প্রকৃতি-যুক্ত। এই প্রকৃতির বশে তাহারা কাম, ক্রোধ,

রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি দ্বারা পরিচালিত হইয়া কর্ম্ম করে। বাস্তবিক তাহাদের প্রকৃতিই সর্ব্বরূপে সর্ব্ব কর্ম্ম করে, কিন্তু তাহারা অহঙ্কার বশে—আসক্তিবশে মুগ্ধচিত্ত হইয়া, আপনাকে সেই প্রকৃতির গুণজ কর্ম্মে কর্ত্তা মনে করে।

কিন্তু এই সকল লোকের বিশেষত্ব এই যে, ইহাদের মধ্যে যাহারা তামস-প্রকৃতি, তাহারা স্থিতিশীল প্রায়ই অকর্ম্ম বা নিষ্কর্ম্মা! আর যাহারা রাজস-প্রকৃতি, তাহারা কর্ম্মী। সমাজের অধিকাংশ লোক এই শ্রেণীর। ইহারা কর্ম্মে প্রবৃত্ত, কিন্তু নিজে বুদ্ধিপূর্ব্বক বিচার করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিতে পারে না,—কোন্ কর্ম্ম শুভ, কোন্ কর্ম্ম অশুভ, তাহা তাহারা নিজ বুদ্ধিতে বুঝিতে পারে না। তাহারা শাস্ত্রবিধি বড় জানেনা ও মানেনা; কিন্তু তাহারা অনুকরণপ্রিয় হয়। তাহারা যাহাকে মান্য করে, তাহারই অনুবর্ত্তন করে। তাহারা যাহাকে আদর্শ মনে করে, তাহাকেই অনুকরণ করে। ইহা তাহাদের স্বভাব। এই সাধারণ লোক সমাজের মধ্যে যাহাদিগকে অনুসরণ করে, তাহাদিগকে এক অর্থে শ্রেষ্ঠ বলা যায়। এই শ্রেষ্ঠ লোক দুই শ্রেণীর। এক শ্রেণী কর্ম্মী, আর এক শ্রেণী জ্ঞানী। যাঁহারা কর্ম্মী বা কর্ম্মযোগী, তাঁহারা যেরূপ কর্ম্ম করেন, সাধারণ লোক তাহারই অনুকরণ করিয়া কর্ম্ম করে। আর যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহারা যাহা কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য বলিয়া প্রমাণ করেন বা উপদেশ দেন, সাধারণ লোক তাহাই আপ্ত বাক্যের ন্যায় প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করে।

ইংরাজীতে এক প্রবাদ আছে যে, উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত অধিক ফলপ্রদ। এইজন্য শ্রেষ্ঠ লোক যেরূপ আচরণ করেন, সাধারণ লোক তাহা দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রহণ করে। তাঁহাদের আচার ব্যবহার দ্বারাই সমাজের সাধারণ লোক পরিচালিত হয়। বাস্তবিক সাধুগণের সদাচার ধর্ম্মের এক লক্ষণ ও ধর্ম্মের মূল। মনু বলিয়াছেন,—

"বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্‌বিদাম্।
আচারশ্চৈব সাধুনামাত্মনস্তুষ্টিরেব চ ॥

* * *

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণম্ ॥" মনু—২য় অঃ ৬।১২।

এইজন্য ভগবান্ বলিয়াছেন যে, শ্রেষ্ঠগণের মধ্যে যাঁহারা জ্ঞানী—বিদ্বান্, তাঁহারা লোক-সংগ্রহ অভিপ্রায়ে, অর্থাৎ সমাজের সাধারণ লোককে স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য, অসক্তভাবে স্ব স্ব কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন। তাঁহারা কোন-রূপে অজ্ঞান কর্ম্মসঙ্গী লোকদের 'বুদ্ধিভেদ' করিবেন না, এবং নিজে কর্ম্ম করিয়া দৃষ্টান্ত দিয়া ও উপদেশ দ্বারা তাহাদিগকে সর্ব্বকর্ম্মে যোজনা করিবেন। যাঁহারা গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ তত্ত্বজ্ঞ, এবং প্রকৃতির গুণই গুণে প্রবর্ত্তিত হয়—ইহা জানেন, অর্থাৎ প্রকৃতিজ গুণ দ্বারাই সর্ব্বরূপে সর্ব্ব কর্ম্ম কৃত হয়—ইহা জানেন, তাঁহারা কোন্ শ্রেণীর লোক—কোন্ গুণ প্রধান এবং সেই গুণানুসারে তাহাদের কোন্ কর্ম্ম স্বাভাবিক, তাহা জানিয়া লোকদের সেই স্বাভাবিক কর্ম্ম নিয়মিত করেন, এবং নিজেও আত্মরত হইয়া, আপনার অকর্ত্তৃত্ব ও প্রকৃতির গুণের কর্ত্তৃত্ব জানিয়াও নিজে বিহিত কর্ম্ম করেন, অর্থাৎ স্ব প্রকৃতিকে সেই কর্ম্মে নিয়মিত করিয়া সাধারণ লোকের নিয়ন্তা হন। ইহাতেই সমাজ বিধৃত হয়। অতএব লোক-সংগ্রহের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, যাঁহারা সাংখ্য-জ্ঞানী, তাঁহাদেরও বিহিত কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য।

সপ্তম কারণ।—ভগবানের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াও জ্ঞানীর কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। লোক-সংগ্রহার্থ অর্থাৎ মনুষ্য সমাজের রক্ষার্থ কর্ম্ম যে কর্ত্তব্য, তাহা ভগবান্ নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়াছেন। ভগবান্ পূর্ণ আপ্তকাম ত্রিলোকে তাঁহার কোন কর্ত্তব্য নাই, কেন না তাঁহার নিজের কিছুই অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য নাই; অথচ তিনি সমাজ-ধর্ম্ম রক্ষার্থ কর্ম্মনিরত। তিনিই সমাজাত্মা, সমাজ তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত। তিনি সেই মানব সমাজ রক্ষার্থ নিয়ত কর্ম্মে নিরত। মানুষ সর্ব্বরূপে তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট পথ অনুসরণ করে। তিনি অন্তর্যামিরূপে সর্ব্বহৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া, সকলকে সেই নির্দ্দিষ্ট পথ দেখাইয়া দিয়া, সেই পথে পরিচালিত করেন। যখন সে পথ লোকে দেখিতে পায় না, অন্তর্যামী ভগবানের নিয়ন্তৃত্ব বুঝিতে পারে না, যখন লোকে উন্মার্গগামী হয়, সমাজের বিশৃঙ্খলা হয়, ধর্ম্মের গ্লানি হয়, তখন তিনি স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া মানুষকে সেই কর্ম্মপথ দেখাইয়া দেন।

ভগবান্ যদি আপ্তকাম বলিয়া, এবং তাঁহার নিজের কোন কর্ত্তব্য নাই বলিয়া, লোক-সংগ্রহার্থ কর্ম্ম না করিতেন, এবং স্বীয় কর্ম্মশক্তি সংবরণ করিতেন,

তবে লোকেরাও কর্ম্মশক্তিহীন হইয়া কর্ম্মপথ হইতে বিচ্যুত হইত। ভগবান্ যদি ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান কালে ধর্ম্ম সংস্থাপন জন্য অবতীর্ণ না হইতেন, অথবা অবতীর্ণ হইয়াও যদি কর্ম্মপথ না দেখাইতেন, তবে আরও উন্মার্গগামী হইত, অথবা তাঁহারাই কর্ম্ম-সন্ন্যাসের পথ অনুবর্ত্তন করিত কিম্বা স্বধর্ম্মাচরণ না করিয়া যথেচ্ছাচরণ করিত। তাহার ফলে কর্ম্ম-সাংকর্য্য হেতু এই লোক-সমাজ উৎসন্ন যাইত ও ধ্বংসের পথে নীত হইত। তাই ভগবান্ প্রয়োজন মত অবতীর্ণ হইয়া নিজে বর্ণ ও আশ্রমোচিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া, লোককে দৃষ্টান্ত ও উপদেশ দিয়া, তাহাদের স্বধর্ম্মাচরণ-প্রবৃত্তি রক্ষা করিয়া আবার ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন। ভগবান্ এইজন্য অর্জ্জুনকে তাঁহার নিজের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, লোক-সংগ্রহার্থ কর্ম্ম করিতে উপদেশ দিয়াছেন। এ দৃষ্টান্ত আমাদের সকলেরই অনুসরণীয়। যিনি জ্ঞানী বা সাংখ্যযোগী, যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ, আত্মসংস্থ, তাঁহার কোন কর্ম্ম না থাকিলেও, ভগবানের এই দৃষ্টান্ত ও উপদেশ অনুসারে তাঁহারও লোক-হিতার্থ কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। তিনি নিষ্কামভাবে অনাসক্ত হইয়া পরার্থ কর্ম্ম করিবেন। তাঁহার কোন স্বার্থ, কোন কামনা, কোনরূপ নিজের প্রয়োজন না থাকিলেও, তিনি কর্ম্মত্যাগ না করিয়া সমাজের হিতের জন্য এবং পারেন ত জগতের হিতের জন্য ভগবানের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া, অবশ্য কর্ম্ম করিবেন, ভগবানের কর্ম্মে সহায় হইবেন,—ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম করিবেন।

পরে ভগবান্ তাঁহার স্বরূপ ও ভক্তি যোগের কথা বুঝাইয়াছেন। যিনি ভগবদ্ভক্ত—ঈশ্বরানুরক্ত, তিনি অবশ্য ভগবানের এই দৃষ্টান্ত ও উপদেশ গ্রহণ করেন। তিনি অবশ্য এই লোক-সংগ্রহার্থ কর্ম্মে ভগবানের যন্ত্র স্বরূপে, নিমিত্ত স্বরূপে বা সহায় স্বরূপে ব্রতী হন। তিনি স্বধর্ম্মাচরণ করিয়া সাধারণ লোককে স্বধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত করেন। যাঁহা হইতে ভূতগণের প্রবৃত্তি, সেই ভগবান্‌কে স্বকর্ম্ম দ্বারাই তিনি অর্চ্চনা করেন। (১৮।৪৬)। সেই অর্চ্চনাই ভগবানের প্রকৃত অর্চ্চনা। তাহার দ্বারাই মানব পরিণামে সিদ্ধি লাভ করে। (ক্রমশঃ)

শ্রীদেবেন্দ্র বিজয় বসু।

---

২৬৫ হইতে ২৮০ পৃষ্ঠার স্থলে ভ্রমবশতঃ ২৫৭ হইতে ২৭২ হইয়াছে। পাঠক মহোদয়গণ [illegible]হ করিয়া এ ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। প্রিণ্টার—

বাঁশবেড়িয়া নিবাসী দেব-রায় বাবুদিগের স্থাপিত
হংসেশ্বরীর মন্দির।

তোমারি! তোমারি!

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

প্রথম মিলনে, নাথ! ক্ষুদ্র-বুদ্ধি জানি,
"গুরু"ভাবে পাছে চিত্তে হয় বিপর্য্যয়,—
পাছে হৃদয়ের প্রেম স্তব্ধ হয়ে যায়,
কত মতে, কত ছলে, প্রেম সঙ্গ দিয়া
সখারূপে, বন্ধুভাবে, বাঁধিলে দাসেরে
অহৈতুকী প্রেমডোরে! দেখিনু তখন,
'আমাদেরি মত তুমি,' অতি নিজ জন।
স্নিগ্ধ প্রেম টানে, নাথ! হরে নিলে, প্রাণ,
মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিগুলি সব,—
সবিতার রশ্মি যথা ফোটায় কমলে।*
ভেসে গেল দেহ বুদ্ধি, ক্ষুদ্র অহঙ্কার;
পড়িল আভাস চিত্তে, প্রকৃত 'আমির'
শুদ্ধ আত্মতত্ত্ব,—অখণ্ড আনন্দ-সত্ত্বা
"সর্ব্বেরে" ব্যাপিয়া ঘনরূপে আছে তাহে।
মনে পড়ে তব আশ্চর্য্য নীরব শিক্ষা! +
চিত্তে চিত্ত, প্রাণে প্রাণ, আত্মাতে আত্মায়
মধুভাবে আকর্ষিলে,—যাহে প্রকাশিলে
মর্ত্ত মাঝে অমৃতের পদ,—ভগবান-
অধিষ্ঠান। ‡ সেই আকর্ষণে বদ্ধ মাঝে
ইন্দ্রিয়ের রঙ্গরসে, কায়ের খেলায়,
সঙ্কল্পে বিকল্পে মনে, বুদ্ধি-তত্ত্ব মাঝে,
সবারি ভিতরে নাথ, নিপুণ কৌশলে,
দেখাইলে আভাসেতে পরম সে পদ।
মনে পড়ে বন্ধুগণ সাথে, বাহ্য কথা
মাঝে, ভেদ দৃষ্টি নাশি, কি অঞ্জন § দিয়া
চর্ম্ম চক্ষে দেখাইলে সূক্ষ্মতর লোকে,
দেবতা ঋষির খেলা। "বিশ্বের" মাঝারে
জাগাইলে বিশ্বাতীত প্রেমময় তান—
'বিশ্বে' 'নরে' এক সূত্রে গাঁথি দিয়া নাথ,
প্রকাশিলে ভগবানে বৈশ্বানর ¶ ভাবে।
কোন্ শক্তিবলে, বুঝিনু তখন, দেব,
সম-রূপী, জীবঘন, সামবেদ ভাষা • ?
কার প্রেমে, নাথ! "সম" সকল ভূতেতে, **
অবিনাশী মর্ত্ত ভাবে, স্থির চঞ্চলেতে,
ফুটিল সে সমতত্ত্ব?—তোমারি! তোমারি!

(ক্রমশঃ)

---

* Grow as the flower grows unconsciously but eagerly anxious to open its bosom to the Sun—Light on the Path.

\+ গুরুস্তু মৌনব্যাখ্যাতম্ শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ। ‡ তৎপদম্ দর্শিতম্ যেন।

§ জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া। ¶ বিশ্বশ্চাসৌ নরশ্চেতি—শঙ্কর (মাণ্ডুক্যভাষ্য)।

• স সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকং স এতস্মাৎ জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে। প্রশ্নোপনিষৎ॥

** সমম্ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তম্ পরমেশ্বরম্
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তম্ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি

দীক্ষা।

১।—ধর্ম্ম।

তখন যুবা—পরিপূর্ণ যৌবন; কিন্তু বিধির বিপাকে, নানা বিপৎপাতে, সাংসারিক বহু ঘাত-প্রতিঘাতে, রোগে, দারিদ্র্যে ও আশাভঙ্গে, যৌবন ফুটিয়াও ফুটিল না। যখন জীবনে সমস্ত সরস, মধুময় ও আশাপ্রদ হয়, কল্পনায় প্রণয়িনীর চিত্র, প্রাণে সুরের ঝঙ্কার, ও মগজে নাটকীয় 'প্লট্' গজাইয়া উঠে, দুর্ভাগ্য ক্রমে সেই জীবন-মধ্যাহ্নে,—পূর্ণ যৌবনে, আমার অনেক দিবস-রজনী, নৈরাশ্যে, নির্জ্জনে ও অশ্রুজলে কাটিত। ভাবিতাম অদৃষ্ট; দেখিতাম ভবিষ্য-গগন মেঘাচ্ছন্ন, শুনিতাম ঝিল্লিতানবৎ একঘেয়ে অতৃপ্ত অবসাদ গান, বুঝিতাম বিড়ম্বনার পাকচক্র,—রহিতাম নির্ব্বাক্।

বুঝিলাম এ জীবনে সুখ শান্তির আশা চিরতরে নিভিয়া গে'ছে, বাঁচিয়া থাকা নিরর্থক। ভাবিলাম মরণ হয় না কেন? বার বার মনে হইত, স্বেচ্ছায় সকল যাতনা হইতে মুক্ত হই, রুগ্ন দেহের অকাল বিসর্জ্জনই শ্রেয়স্কর। শাস্ত্রে বলে;—

অধঃশূন্যম্ ঊর্দ্ধশূন্যম্, মহাশূন্যম্ যদাত্মকম্
সর্ব্বশূন্যম্ য আত্মেতি, সমাধিস্থস্য লক্ষণম্।

সর্ব্বশূন্যতাই যদি সমাধির চরম লক্ষণ, তবে আমার জীবনে ত' সবই শূন্যময়; তবে চির সমাধির বিলম্ব কেন? মধ্যাহ্নে আহারাদি করিয়া বাহির হইলাম। হৃদয়ে গুরুভার, মাথার উপর প্রখর রৌদ্রতাপ। উদ্দেশ্য বিহীন ভ্রমণ। বাজার, গলি, ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট্ ছাড়াইয়া, চিন্তিত ও অবসন্ন মনে কখন যে নগর প্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছি, ঠিক স্মরণ নাই, তবে বেলা শেষ হইয়া আসিতেছিল। স্থানটি নির্জ্জন ও যেন বিষাদ-যুক্ত, বুঝিবা আমারই উপযুক্ত। লক্ষ্যশূন্য ভাবে বসিয়া রহিলাম। সম্মুখে যমুনা; স্থির, কালো ঘন জলরাশি। কত কালের যমুনা, সুন্দর তটশালিনী যমুনা; কত লোক, কত পাপী তাপী, ভগ্ন হৃদয়, অনন্ত কাল হইতে ইহার ক্রোড়ে অনন্ত বিশ্রাম লাভ করিয়াছে। তবে আমিই বা কেন বঞ্চিত থাকি! তোমরা বলিবে, কাল পূর্ণ হয় নাই। কিন্তু

কালও অনন্ত ; কাল কবে কথন পূর্ণ হইয়াছে ? কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইলাম। আশা কুহকিনী কত ছলনায় বুঝাইল ' ছিঃ মরিবে কেন ? অপূর্ণ যৌবন, অতৃপ্ত লালসা, কেন ঘুচাইবে ; মানুষের চিরদিন সমান যায় না, ধৈর্য্য ও সাহসে বুক বাঁধ, অবসাদের কুয়াসা কাটিয়া যাইবে।" সুযোগ দেখিয়া নিরাশা কাণে কাণে বলিল, "পাগল তুমি, ব্যভিচারিণীর ছলনায় ভুলে যা'চ্ছ ? আমি তোমার মঙ্গলেচ্ছু, চিরদিন তোমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছি ; কোথায় সুখ,—কোথায় ভবিষ্যৎ ? এই স্থান,—এই সময়,—এই সুযোগ,—এমনটি আর পাবে না,—নেমে পড়।"

কোথা হইতে প্রাণ আসিয়া বলিল, "বিশ্বাসঘাতক ! গর্ভাবস্থা হইতে শ্বাস-প্রশ্বাস যোগাইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে বাঁচাইয়া রাখিয়াছি, আর তুমি কি না নির্ম্মম ভাবে আমাকে একাকী ফেলিয়া যাইবে, একটুও মমতা হয় না ?" প্রাণের 'মমতা' জাগিয়া উঠিল। 'আমি', 'আমার' ও 'আপনার' যে যেখানে যত ছিল, এক সঙ্গে কল্পনা মুখর হইয়া প্রাণের সহিত সুর মিলাইল। অবসাদ, নৈরাশ্য ও উত্তেজনা, একযোগে আমাকে অভিভূত করিয়া বলিল "ভাবিও না ? পাটোয়ারী বুদ্ধিতে, চুল চিরে হিসাব নিকাশ করে, ভেবে চিন্তে, তুনিয়ার কখনও কোন মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই। যদি তোমার মহত্ব, বীরত্ব ও সংসাহস থাকে, তবে অগ্র-পশ্চাৎ করিও না, চলিয়া আইস।' মৌন, মুগ্ধ, মন্ত্রাবৃষ্ট, আমি ধীরে ধীরে বেত ও হোগ্‌লা বনের মধ্য দিয়া অনুসরণ করিলাম। কতবার পায়ে বাধিয়াছে, থমকিয়া দাঁড়াইয়াছি ও পশ্চাতে চাহিয়াছি, কতবার আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে মুগ্ধ হইয়াছি। কিন্তু যখন হুঁস হইল, তখন দেখি গভীর জলে—জীবন-মরণের সন্ধি-ক্ষণে। হঠাৎ উপর হইতে কে ডাকিল "গুরুদাস," চমকিয়া উঠিলাম। জন মানব শূন্য নির্জ্জন স্থানে কে আসিল, কেহ ত' ছিল না ! বুঝিবা কল্পনা ; স্থির হইলাম। পুনরায় বজ্র গম্ভীর স্বরে ডাক আসিল ' গুরুদাস, উঠিয়া আইস।" স্পষ্ট বাঙ্গালা ভাষা, স্বরে কঠোর-কোমলের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। জড়তা আসিল, ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম, যেন উচ্চ পা'ড়ের উপর অন্ধকারে অস্পষ্ট মানব মূর্ত্তি ! পাপী আমি, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ; আমি আকর্ষণময় আদেশসূচক আহ্বানে জড়বৎ উপরে উঠিলাম। অন্ধকারে ঠিক স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম না ; তবে বোধ হইল, কৌপীনধারী, প্রশস্ত বক্ষ, আজানু বাহু, দীর্ঘ মূর্ত্তি, প্রহেলিকার মত সম্মুখে দণ্ডায়মান। পুনরায় সে বলিল, "গুরুদাস, ছিঃ ! তুমি না

বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, ও চরিত্রবান্? তুমি না পিতা মাতার নয়নের মণি,—ভবিষ্যতের আশা ভরসা? তোমার এ মতি গতি কেন,—কি দুঃখে আত্মহত্যা করিবে,—কি পাপে অপঘাত হইবে? কেন ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিবে—কেন নরকে ডুবিবে? তোমাপেক্ষা কত প্রকারে শত গুণ দীন দুঃখী রহিয়াছে, তা'রা ত' বাঁচিয়া আছে,—আশায় বুক বাঁধিয়াছে। যুবা তুমি, অনন্ত কর্ম্মক্ষেত্র তোমার সম্মুখে, সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। তোমার জীবনে মহত্ত্ব আছে, জগতে মহত্ত্বের বিকাশ কর। কর্ম্মী হও, দেশের, ধর্ম্মের, ও সমাজের কল্যাণ কর; সংসারী হও, ফিরিয়া যাও। সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিও 'সর্ব্ব পাপস্য অকরণম্ কুশলস্য উপসম্পদা'। চলিয়া যাও, সোজাপথ,—সম্মুখে কেনারী বাজার; দশ মিনিটের মধ্যে বাসায় পঁহুছিয়া যাইবে।"

আদেশে এরূপ একটা গাম্ভীর্য্য ও আকর্ষণ ছিল, যাহাতে ইতস্ততঃ দ্বিধা বা অবহেলা করিতে সাহস বা প্রবৃত্তি হইল না। বোধ হয়, ভাল করিয়া মুখ তুলিয়া চাহিতেও পারি নাই। মন্ত্রাবিষ্ট পন্নগ যেমন রোজার ইঙ্গিতে নিঃশব্দে আবাসে প্রস্থান করে, তেমনি ঠিক সোজা চলিয়া অল্পক্ষণেই বাসায় পৌছিলাম। অত ঘুর-ফের পথ, বাঁকা-চোরা রাস্তা, কত মোড়, প্রায় এক ঘণ্টার পথ, কিন্তু কি করিয়া অতি অল্প সময়ে, ঠিক সোজা আসিয়া উপস্থিত হইলাম! এ রহস্যের আজিও সমাধান করিতে পারি নাই।

২।—অর্থ বোধ।

জীবন স্রোতে আর একটু ভাসিয়াছি। এমন একদিন গিয়াছে, যে টাকাকে টাকা মনে করিতাম না,—বুঝিতাম অর্থই অনর্থের মূল। জীবনে স্ফূর্ত্তি ও আনন্দ, এবং দিনান্তে স্বাস্থ্যব্যঞ্জক গভীর সুপ্তি,—ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তর ছিল।

দড়ির উপর বাজি দেখাইতে দেখাইতে, বেদিয়া গাহিল "তা'র মরণ ভাল, যা'র হাতে ভাই পয়সা নাই।" ঘটনাচক্রে মর্ম্মাহত হইয়া বুঝিলাম, 'দারিদ্র্য দোষঃ গুণরাশিনাশী।' বিষয়ের চাপে বুদ্ধিমান হইলাম, অর্থাৎ বিষয় বুদ্ধি বাড়িল। বেশ ধারণা হইল, এ সংসারে সার হ'চ্চে অর্থ,—টাকা, গোলাকার মধুর শব্দায়মান কাঞ্চন রজত খণ্ড, যাহার প্রভাবে সুখ, শান্তি, মান, সম্ভ্রম ও পশার-প্রতিপত্তি; যাহার অভাবে সমাজে ও সংসারে কোনই স্থান নাই তা' তুমি যতই জ্ঞানী, গুণী ও চরিত্রবান্ হওনা কেন!

বেহালার নাকি সুরে সুর মিলাইয়া কীর্ত্তনওয়ালী কোমলকণ্ঠে গাহিল, "আমি মরিব—মরিব, নিশ্চয় মরিব সখি" বুঝিলাম একদিন মরণ নিশ্চয়। 'জাতস্য হি ধ্রুবম্ মৃত্যুঃ'। "জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে?" ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত যে, এমন এক দিন আসিবেই আসিবে, যে দিন স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা, ত্বক্ ও বায়ু পিত্ত কফযুক্ত দেহবাস ছাড়িতে হইবেই হইবে। আলুথাল্লা পরিয়া, একতারা বাজাইয়া, বাউল নিজ সুরে গাহিল,—

"ও মন তোরে যখন যেতে হবে,
তখন তোর ধন দৌলত বাগান বাড়ী,—
ও তোর গাড়ি জুড়ি কোথায় রবে।"

আর এক সমস্যা—মহা জটিল সমস্যা; এ সমস্যার পাদপূরণ জীবন মরণের খেলা লইয়া। সংসারের চোখে ত' মহা অর্থশালী, কিন্তু ইহার সার্থকতা কি? পার্থিব চক্ষে ত' দেখি যে চিতাধূমের সহিত ধন দৌলৎ সঙ্গে যায় না। সঙ্গে যে যাইবেনা, ইহা স্থির; কিন্তু এ সঞ্চয়, ব্যয় বা সদ্ব্যয়ের কোন ফল কি বৈতরণীর পরপারে পাওয়া যায় না,—না, তাহা গুরুভারবৎ ক্লেশদায়ক হইয়া উঠে? এ রহস্য কে বুঝাইবে?

সত্য কি মরণের পর সব শূন্য, নির্ব্বাণ; এইখানেই উৎপত্তি ও নিবৃত্তি। তা' যদি হয়, তবে 'ঋণম্ কৃত্বা ঘৃতম্ পিবেৎ' এই চার্ব্বাক্-নীতির অনুসরণ করিয়া, খাওয়া, দাওয়া, নাচা, কোঁদা, বগল বাজাইয়া, যাই না কেন? পরে যা' হয় তাই হবে? না, সত্যই জীবন-নাট্যশালার যবনিকার অন্তরালে আরো কিছু আছে? সত্যই কি 'অন্ধেন তমসাবৃতা' রৌরব, কুম্ভীপাক প্রভৃতির যথার্থ অস্তিত্ব আছে, না শুধু কল্পনা; সত্যই কি চন্দ্রলোক বিমণ্ডিত, কিন্নর-কণ্ঠ-স্পন্দিত গন্ধর্ব্ব-অপ্সরা-লাঞ্ছিত, পারিজাত মন্দাকিনী সুশোভিত মন্দার-কুসুম-বাসিত নন্দন-কানন, একটা জীবন্ত কিছু, না সেকালের শূন্যগর্ভ প্রলোভন! থাকে ত' কোথায়? হিমালয়ের উত্তরে—কৈলাস-ভূধর মূলে, না, ঐ নক্ষত্রখচিত নীলাম্বরের আড়ালে ঢাকা?

* * * * *

স্বপ্ন বটে; বটে কেন নিশ্চয়ই স্বপ্ন। কিন্তু তবু যেন সত্য—জলন্ত কঠোর

সত্য ; এখনও চোখের সম্মুখে দেদীপ্যমান, প্রাণের ভিতর প্রবাহমান। এখনও যেন দৈনিক জীবনের ঘটনাবলীর একাংশ বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে।

শ্বাস রুদ্ধ হইল, ঘাড় লটকাইয়া পড়িল—মরিলাম। মরিলাম কি? হাঁ মরিলাম বৈ কি, ঐত' আমার দেহ চিরনিদ্রার শবের মত পড়িয়া; হায় হায় অবশেষে বে-টক্করে মরিলাম! একবার বিষয় পত্র গুছাইয়া, সকলকে বলিয়া, সকলের সহিত দেখা করিয়া মরিতে পারিলাম না!

মরিয়াছি? তবে এ আমি কে। এও ত 'আমি! দিব্য, সুন্দর, সুস্থ আমি! এ কে? মরিয়াছি ত' বাঁচিয়া রহিয়াছি কেন? তবে কে মরিল,—আমি না আমার দেহ? মরিয়া গেলাম, ত' শিঙ্গা ফুঁকিলাম না কেন?

সন্দেহ ও ভয়, দুঃখ ও আনন্দ হইল। বাহবা কি মজা, এই ত' আমি, সেই আমি, সবই আমার রহিয়াছে, তবে এটা হ'লো কি?

পরীক্ষা করা উচিত। দেহের ভিতর প্রবেশ করিতে গিয়া দেখি অসম্ভব, সে যন্ত্র এমনি বিকল হইয়া গিয়াছে, যে তাহাতে যাওয়া বা থাকা দুঃসাধ্য। যেন চক্ষু ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল।

তবে কি ইহারই নাম মৃত্যু? তবে কি জীবন্ত পৃথিবীর সহিত সকল সম্বন্ধ ঘুচিয়া গেল? কিন্তু আমি ত' রহিয়াছি,—দিব্য সুস্পষ্ট জাগ্রত রহিয়াছি, কোনই বিকার নাই।

ভাবনা ঘুচিয়া যেন আনন্দ হইল। দেখি অনেক বিষয়ে সুবিধা হইয়াছে, অনেক বিষয়ে মুক্তি ও স্বাধিকার বাড়িতেছে। বুঝিতে পারিলাম না এ মরণ না নূতন জীবন,—লঘু, ক্ষিপ্র, বায়ুগামী, কল্পনাময়ী, মায়াবী জীবন; রোগ নাই, ক্ষুধা নাই, ক্লান্তি নাই। মনের আনন্দে বুঝিবা খানিকটা নাচিয়া লইলাম। জীবনে যাহা স্বপ্নে বা কল্পনায়ও আসিত না, এখন দেখি তাহা ইচ্ছামাত্র মুহূর্ত্ত মধ্যে সংঘটিত হ'চ্চে।

একটা বিষয়ে বেশ দিব্যদৃষ্টি ও দিব্যজ্ঞান হইল। পূর্ব্বে ধারণা ছিল, মানুষেরাই জাগ্রত, জীবিত ও ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন, আর মৃতেরা 'ভূত'। এখন দেখি ঠিক উল্টা, তারাই মৃতবৎ, জড়বৎ, পরদাস ও পরবশ। চক্ষু থাকিতেও অন্ধ—কর্ণ থাকিতেও বধির; লোকেরা কাছে দাঁড়াইলে বা কথা কহিলে, দেখিতেও পায় না,—শুনিতেও পায় না। তাহারা অধিকাংশ সময়েই নিদ্রিত; আর আমরা!—সংযমীর ন্যায় জাগ্রত।

ধন দৌলতের কোন অভাব বোধ হইল না। যেখানে পলকের মধ্যে ইচ্ছা মাত্র অঘটন-ঘটন ঘটিয়া যায়, তখন অভাব কিসের ?

আনন্দ ধোপে টিকিল না। অবসাদ আসিতে লাগিল। পূর্ব্বে যতটা স্বাধীন ও স্বেচ্ছাময় ভাবিয়াছিলাম, এখন দেখি 'রামচন্দ্র ব্যাপারটাকে উল্টা বুঝিয়াছিলেন।'

চঞ্চল, অস্থির স্বপ্নরাজ্য, নীলাকাশে অবিশ্রান্ত বহুরূপী মেঘরাজীর মত, ঘূর্ণায়মান চক্রনেমির মত, বাত্যাক্ষুব্ধ সমুদ্রবক্ষের মত, এক অজানার প্রবল বেগে ক্রমাগতই স্থান ও রূপ পরিবর্ত্তন করিতেছে; ও তাহার মধ্যে দিয়া আমাদের, ঝটীকাভঙ্গ তরণীর ন্যায় উত্থান পতনের মধ্য দিয়া, একটানা একঘেয়ে অতৃপ্ত, অবসাদময় অরুচিকারক জীবনকে চোখ ঢাকা বলদের মত টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

নূতনত্বের মাদকতা কাটিয়া গেলেই এই দুর্দ্দশা। প্রতি মুহূর্ত্তেই ভয় হয়, বুঝি "কূল ছেড়ে যাই অকূলে"। জীবের ভাষায় মনে হয়, 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি'; কবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়, "আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী, বল কোন পারে ভিড়িবে তোমার সোণার তরী।"

ইহ জীবনে আমরা চারি বন্ধুতে প্রতিশ্রুত ছিলাম যে, যে আগে মরিবে, সেই অপর বন্ধুদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রেতলোকের বার্ত্তা জানাইবে। এখানকার সুখ দুঃখের, হর্ষ বিষাদের বিবরণ দিবার জন্য, কালীচরণের সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিয়া ডাকিলাম "কালীচরণ"।

"কে গুরুদাস" ? সৌভাগ্যক্রমে সে আমাকে দেখিতে পাইল। কিন্তু আর কথা হইল না; গোঁ গোঁ করিয়াই মূর্চ্ছিত হইল। গতিক দেখিয়া সরিয়া পড়িলাম। উমেশের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। লোকটা খুব চতুর। কিন্তু আমাকে দেখিয়াই, সে 'রাম রাম' বলিয়া ছুটিয়া পলাইল। শেষ বিপিনের সঙ্গে দেখা; সে সাহসী, দাঁড়াইয়া কথা কহিতে লাগিল; তবু মনে হইল তা'র আপাদ-মস্তক কাঁপিতেছে।

"কে গুরুদাস ? তুমি, তুমি এখানে। এখানে কেন ? তুমি ত' মরিয়া গিয়াছ না ?"

"হাঁ, তাই প্রতিশ্রুত মত দেখা করিতে এসেছি।"

"বেশ কথা, তবে এখন আমার সময় নেই।"

"সে কি হে, আগে কত কথা কহিতে।"

"তা বটে, তা বটে ; তবে কিনা সময় নেই, তা—তা তুমি কেমন আছ? প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়েছ দেখ্‌ছি ; তা' গয়ায় পিণ্ড দিতে হবে কি ?"

"সে কথা পরে। এখন অনেক কথা বল্‌বার আছে।"

"আমার সময় নেই। গয়ায় পিণ্ড দিতে হবে কি না, বল।"—বলিয়াই সরিয়া পড়িল।

ক্রমাগত পরিবর্ত্তনশীল ও চঞ্চল বহুরূপী, স্বপ্নরাজ্যের বা মায়াপুরীর বাহ্য চটকে মন বসিল না। অত্যন্ত ক্লান্তি ও শ্রান্তি অনুভব করিতে করিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম।

কতক্ষণ বা কতদিন সে অবস্থায় ছিলাম জানি না। নিদ্রাভঙ্গে দেখি রঙ্গমঞ্চের পটপরিবর্ত্তনের ন্যায় নূতন দৃশ্য। কি সুন্দর, কি শান্তিভরা নির্জ্জন স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য। সুন্দর জ্যোৎস্না-পুলকিত ফুল্লরজনী ; জল স্থল আকাশ প্রান্তর কৌমুদী-বিধৌত সৌম্য হাসির লহরীতে ভুবন—গগন ভরিয়া গিয়াছে। আকাশে চন্দ্র নাই ; কিন্তু ফুল্ল চাঁদিমা, আলোক সামান্য হরিত-রঞ্জিত, সতেজ ফুল ফল মুকুলিত সুন্দর দ্রুমরাজি। সেই কমনীয় দৃশ্য, অতৃপ্ত সৌন্দর্য্য, বিরাট শান্তিময় গাম্ভীর্য্য, ভাষায় প্রকাশ করিতে অক্ষম—যেন জীবন্ত প্রকৃতি। নির্জ্জন—কিন্তু সে নির্জ্জনতায় বিষণ্ণভাব নাই ! অতৃপ্ত নয়নে প্রাণ ভরিয়া চাহিয়া রহিলাম। ভিতরে বাহিরে এক মহাপ্রীতি অনুভূত হইল।

অনুভবে বোধ হইল যেন কায়ারও আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, যেন মৃত্যুর পর নব জীবন। তবে এবারের মৃত্যু প্রথম বারের মত নয়। এটা যে কি করিয়া হইল, তাহা বুঝাইতে পারিব না।

সম্মুখে জ্যোৎস্না-স্নাত শুভ্র অট্টালিকা, যেন শ্বেত প্রস্তরের মন্দির। সম্মুখে উচ্চ চত্বর—সোপান নাই। উঠিবার চেষ্টা করিলাম, পারিলাম না।

চত্বরের উপর উত্তরাস্য বসিয়া এক সৌম্য প্রশান্ত প্রাচীন মানব মূর্ত্তি ; জন-মানব-বিহীন স্থলে সান্ধ্য আকাশে প্রথম তারকার ন্যায় একেশ্বর নর। কৌতূহল বাড়িল।

মূর্ত্তি অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া বলিল "দেবস্থান"। "যাইবার উপায় আছে" ? 'আছে।" "কিরূপে ?"

"অজ্ঞান ঘুচিলে"। 'কিরূপে ঘুচিবে"? "বিবেকের উদয় হইলে,—সম্যক্ জ্ঞান হইলে।" "কিরূপে হইবে?" "নিত্যানিত্যের প্রকৃত অর্থবোধ হইলে"। অপেক্ষা না করিয়া, লাফাইয়া উঠিবার চেষ্টা করিলাম। পড়িয়া যাওয়াতে নিদ্রা বা স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। সে আজ অনেক দিনের কথা, কিন্তু মনে হয় যেন 'হুবাহু' সত্য—কল্যকার ঘটনা।

৩।—কাম (ঊর্দ্ধমুখীন্)।

বয়সের মানদণ্ড আর একটু পশ্চিমে চলিয়াছে। কৃষ্ণা-সপ্তমী; অনেক রাত্রে দিগ্‌বলয় রঞ্জিত করিয়া সুধাংশু পকাশ পাইলেন। ভাগীরথীতীরে বাঁধা ঘাটের প্রশস্ত সোপানের উপর আমরা কয়টী। ভিতরে বাহিরে শান্তিসুধার লহরী উঠিতেছিল, ভিতরে বাহিরে যেন একই রস, একই রূপ ফুটিয়া উঠিতেছিল। কে যেন নীরবে গাহিতেছিল;—"সচ্চিদানন্দরূপোঽহং শিবোঽহং শিবোঽহং"। আজ দীক্ষা হইবে,রাত্র দ্বিপ্রহরের পর; নির্জ্জনে নদীতটে গভীর রাত্রে। আমরা পাঁচটী দীক্ষার্থী, সম্মুখে গুরুদেব। তিনি সন্ন্যাসী, আমাদের সহিত অল্পদিনের পরিচয়। এই অল্পদিনেই তাঁহার উপর শ্রদ্ধা আসিয়াছে, তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছি। ত্রিকালদর্শী, জ্যোতিষ, সামুদ্রিক, দৈব ঔষধ ও অলৌকিক ঘটনায় পারদর্শী বলিয়া তাঁহাকে বোধ হয়। তাঁহার সম্বন্ধে আর কিছু বিশেষ পরিচয় হয় নাই।

নদী বাঁক ফিরিয়া যেন অনন্তের কোলে মিশিতেছে। শ্যাম-নীলাভ তরুরাজি অনন্ত বিস্তৃত, দূর দূরান্তে চলিয়া গিয়াছে। উপরে অনন্ত নীলিমা, অনন্ত তারকাবলী, অনন্ত জলদমালা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে অনন্ত রূপ পরিবর্ত্তন করিয়া, কোথা হইতে আসিয়া যেন কোথায় ভাসিয়া যাইতেছে। আপনার মনে ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে গড়িতে গড়িতে দিশেহারা ভাবে, কোথায় ছুটিয়াছে। নিম্নে নদীবক্ষে অনন্ত ঊর্ম্মিমালা ফুটিতেছে, নিভিতেছে; চন্দ্রকিরণ তরঙ্গের তালে তালে মিশিয়া অনন্ত হীরককণা ছড়াইতেছে। কে জানে কত কাল হইতে এইরূপ হইতেছে—বুঝি অনন্তকাল হইতে ব্যক্ত মূর্ত্তিতে এইভাবে অনন্তের রূপ-কল্পনা চলিতেছে।

উপরে অনন্ত আকাশের দিকে চাহিয়া, সিঁড়ির উপর শুইয়াছিলাম। আমার ভিতরেও ঐরূপ অনন্ত ভাবলহরী উঠিতেছিল; কত কথা, কত তত্ত্ব, কত রূপ, কত স্পন্দন,—ভিতরে বাহিরে অনন্তের খেলা, অনন্ত বিচ্ছুরিত ভাব-লহরীর

মধ্যে ডুবিয়া তন্ময় ভাবে ভাবিতে লাগিলাম। শান্তিতে পূর্ণ হইলাম; এত রূপের বিকাশ, ভাবের ব্যঞ্জনা, বহুত্বের অভিব্যক্তি, দেখিতে দেখিতে নেশার ঘোরের ন্যায় তন্ময়তা আসিতে লাগিল;—এক সুর যেমন পর্দ্দায় পর্দ্দায় উঠিয়া নামিয়া,—তারা, মুদারা, উদারায়,—এক সূর্য্য যেমন কোটি কিরণজাল বিস্তার করিয়া জল স্থল অন্তরীক্ষে ব্যাপিয়া,—একই জীবনী যেমন বাল্যে, যৌবনে, বার্দ্ধক্যে, জনমে, মরণে,—একই চিন্তা যেমন জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তিতে কত লহরীর তরঙ্গ তুলিয়া দেয়,—তেমনি মনে হইতেছিল; যেন এই সমস্তই অনন্তময়ীর অভিব্যক্তি, একেরই শব্দ, স্পর্শ, রূপ, একেরই লক্ষণ ও মহত্ব, গুণ, অস্তিত্ব ও আনন্দ বিলাইতে ছিল।

ভাবিতে ভাবিতে তন্দ্রাতুর ও নিদ্রাবিষ্ট হইলাম। সে নিদ্রাভাব একটু বিচিত্র; সচরাচর যেমন অবশভাবে অজ্ঞাতসারে ঘুমান যায় সেরূপ নয়। যেমন যাতনাহত রোগী ধীরে ধীরে চিরসুপ্তির ক্রোড়ে শয়ন করে, ইন্দ্রিয়াদি বিকল হইবার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে অন্তর্নিহিত হয় ও একটা তৃপ্তিদায়ক শান্তি অনুভব করে,—দৃষ্টিলোপ, বাক্‌রোধ ও স্পর্শশক্তি লুপ্ত হইয়া যায়, তেমনি কেমন এক অন্তর্মুখী ভাবে নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। চাঞ্চল্য বিহীন গভীর সুষুপ্তি; কিন্তু তাহার মধ্যে কি যেন দেখিলাম। স্বপ্নদৃশ্য, অথবা অন্তর্দৃষ্টি—ঠিক বুঝিতে পারিলাম না, ভালরূপ স্মরণও নাই। যতটুকু মনে আছে, চিত্তের সহিত দৃঢ় গ্রথিত আছে,—যেন লোকালয় হইতে দূরে কোলাহল-শূন্য নির্জ্জন পবিত্র স্থান। সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। প্রাচীন বৃহৎ তরুতল; কে বা কাহারা বেদমন্ত্রের ন্যায় ধ্বনি করিতেছে। এক প্রাচীন গৃহের সম্মুখের রোয়াকে আমি ও আর একজন দীর্ঘশ্মশ্রুবিশিষ্ট প্রাচীন, উভয়ে মুখোমুখি বসিয়া আছি।

তিনি যেন আমাকে দীক্ষিত করিলেন,—আর কিছু বিশেষ স্মরণ নাই। কি ভাবে, কিরূপে ও কি বলিয়া দীক্ষা দান করিলেন, তাহার চিহ্ন স্থূল মস্তিষ্কে বা জাগ্রত চৈতন্যে কিছুই নাই। তবে যেন এইটুকু মাত্র বলিলেন "তুমি আজ হইতে আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত হইলে—আমাদেরই একজন হইলে।

কে বা কাহারা তীব্রস্বরে ডাকিল "গুরুদাস এস"। নিদ্রাভঙ্গে দেখি গম্ভীরা রজনী; আমার সতীর্থেরা প্রস্থানোদ্‌যোগ করিতেছেন। বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"দীক্ষা হইবে না?"

"না । শুভমুহূর্ত্তের সন্ধিক্ষণ বহু পূর্ব্বে অতীত হইয়াছে" ।

"ডাকিলে না কেন ?"

"ডাকা হইয়াছিল, তুমি গভীর নিদ্রিত ছিলে। আবিলতাপূর্ণ দেহ, মন, পবিত্র বীজ বপনের উপযুক্ত ক্ষেত্র নয় বলিয়া তোমার হইল না , অপর সকলের দীক্ষা কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল।"

"তবে উপায় ?"

"বোধ হয় এখনও কাল পূর্ণ হয় নাই ।"

বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল , হায় হায়,কেন এ কাল নিদ্রা আসিয়াছিল ! মনে হইল "পৃথিবী দ্বিধা হও ! সর্ব্বসন্তাপহারিণী জাহ্নবী কোলে তুলিয়া লও, সতীর্থেরা আনন্দচিত্তে ইহ-পরকালেব কাজ গুছাইয়া লইল,আর আমিই শুধু রহিনু একা !"

সন্ন্যাসী কালই প্রাতে কুম্ভ মেলায় চলিয়া যাইবেন । আবার কবে এই সুবর্ণ-সুযোগ ফিরিবে কে জানে ? ফিরিবে কি না, কে বলিতে পারে ?

আশা ভঙ্গে নিদারুণ ব্যথিত হইয়া ক্ষুণ্ণ-চিত্তে ভগ্ন-হৃদয়ে বাটী ফিরিলাম ।

৪ ।—মোক্ষ (প্রারম্ভ) ।

কালের স্রোতে আরও ভাসিয়াছি ; স্রক চন্দন বনিতা, রূপ, রস ও মোহের উপভোগে মজিয়া বহুদূর ভাসিয়া আসিয়াছি । হঠাৎ বাধা পড়িল ; কে যেন পশ্চাৎ হইতে রথচক্র টানিয়া ধরিল—স্রোতে বাধা পড়িল ।

আজ দীক্ষিত হইলাম ; পুণ্য ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে, পবিত্র উষালোকে সত্য সত্যই দীক্ষিত হইয়া আমার জীবন জনম ধন্য হইল । সে, কি আনন্দ, কি স্ফূর্ত্তি ! দেহ, মন, ও চিত্ত পূর্ণ, পুণ্য ও ধন্য হইয়া গেল ; নূতন জীবন, নবীন দৃষ্টি, নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইলাম ।

মনে পড়ে একদিন দীক্ষার নাম শুনিলে শরীরে জ্বর আসিত ; ভাবিতাম এ সব কেন ; দীক্ষা ভিন্ন কি উপায় নাই। ব্যবসাদারী কাণে মন্ত্র দিয়া কি হইবে ? আর যদিও কোন প্রয়োজন থাকে ত' এখন নয়; অবস্থা যখন গলিত-দন্ত পলিত-কেশ হইবে, তখন। এখন সুখের—ভোগের কাল।

অনুতাপ হয়, আরও পূর্ব্বে যৌবনের তেজ থাকিতে থাকিতে, কেন শিক্ষা পাইলাম না ?

আর আজ কি আনন্দ! পূর্ব্বে যাহার নামে মুখ ফিরাইতাম, আজ তাঁহারই জন্ত সোৎসুক চিত্তে একাহারী, হবিষ্যাশী হইয়া, কয়দিন ধরিয়া ঈপ্সিত শুভ মুহূর্ত্তের অপেক্ষায় হৃৎ-কমল-মঞ্চে আসন পাতিয়া বসিয়াছিলাম। সমস্ত দিন ধরিয়া পুলকিত নেত্রে শ্রীগুরুপদারবিন্দে নীরবে ভক্তি-মুকুলিত হৃদয়ে বসিয়া আছি; কত উপদেশ, কত অমৃত-মাখা কথা শুনিতেছি। সন্ধ্যা অতীত, গুরুদেব বলিলেন "গুরুদাস, গুরুশিষ্যের সম্পর্ক বড়ই কঠিন ও দায়িত্বপূর্ণ; এখন কিছুদিন তোমাতে আমাতে দূরে থাকিতে হইবে।"

ব্যথিত হইলাম; জিজ্ঞাসা করিলাম 'কবে দেখা হইবে, গুরুদেব!"

"যখন তোমার বিশেষ ইচ্ছা হইবে বা কোন প্রয়োজন হইবে। আমি ত তোমাকে বহুদিন হইতে দেখিয়া আসিতেছি, তুমি কি আমাকে এখনও দেখ নাই?"

বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিলাম। 'কই মনে ত' পড়ে না।'

"কখনও না?" চিন্তাকুল চিত্তে নীরব রহিলাম, গম্ভীরভাবে ভাবিতে লাগিলাম। আশ্রমের সম্মুখস্থ ঘন প্লাবিত বিশাল বট-বিটপীর মধ্য দিয়া কৌমুদী বিক্ষিপ্ত ভাবে নামিয়া আসিতেছে। তরুতলে একদল সন্ন্যাসী তাহাদের বিগ্রহ রাখিয়া উদাত্ত স্বরে আরতি পাঠ করিতেছে;—সম্মুখে স্মিত বদনে গুরুদেব।

হঠাৎ নদীতীরের সেই বিস্মৃত-প্রায় স্বপ্নদৃশ্য মনে জাগিল। সেই কোলাহল-শূন্য প্রাচীন তরুতল, বেদমন্ত্রধ্বনি, গুরুদেব ও আমি মুখোমুখী বসিয়া। উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিলাম "বাবা! চিনেছি, কিন্তু একি! একি সত্য?

বাধা দিয়া বলিলেন, 'আর কখনও দেখিয়াছ কি?" বিস্মিত হইয়া তাঁহার গাম্ভীর্য্যপূর্ণ সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া তন্ময় হইলাম!

হাঁ, বেশ মনে পড়িল; সেই চন্দ্রালোক-বিমণ্ডিত "দেবস্থানের" চত্বরের উপর একেশ্বর নর। বিস্ময়ে, কৌতুকে ও আনন্দে বাক্‌রোধ হইল, মাথার ভিতর যেন ঘুরিতে লাগিল।

গুরুদেব আবার বলিলেন "আর কখনও?" মনে পড়িল না। "বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখ"; বলিয়া উঠিয়া পাইচারী করিতে লাগিলেন। নিবিড়

চিন্তায় আমার মস্তিষ্ক আলোড়িত হইল। একবার বাহিরে, একবার ভিতরে, আবার সেই দণ্ডায়মান আজানু-বাহু প্রশস্ত বক্ষ গুরুদেবের দিকে চাহিতে লাগিলাম।

ওঃ! সে যে বহু পুরাতন কথা, অতীতের কাল গর্ভে কবে ডুবিয়া গিয়াছে। সেই ক্ষণিকের ভ্রান্তির দিনে, যৌবনের অবসাদে, আগ্রায় যমুনা তীরে আলো-আঁধারের মধ্যে প্রশান্ত মূর্ত্তি।

চক্ষের নিমেষে সমস্ত পৃথিবী উল্টাইয়া গেল, নির্ব্বাক্—স্তম্ভিত। নিজেকে, চক্ষুকে, মনকে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। সাষ্টাঙ্গে পদতলে প্রণিপাত হইয়া বলিলাম "বাবা! এ রহস্য বুঝাইয়া দিন।"

যোগী তাঁহার লালিত্যপূর্ণ উদাস চাহনি বিস্তার করিয়া, সৌম্য,প্রশান্ত,স্মিত বদনে, বহুদিনের—বহু পূর্ব্বের লুপ্তপ্রায় স্মৃতিগুলিকে মথিত ও উদ্ভাসিত করিয়া, আমার আকুল প্রাণকে ব্যাকুলিত করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"বাবা, রহস্য বটে, তবে এ রহস্য চির-নূতন, চির-পুরাতন। কথায় বলে 'গুরু মিলে বহুৎ বহুৎ, চেলা না মিলে কোই।' শিষ্যের প্রতি গুরুর যে কি মমতা, তাহা কেমন করিয়া বুঝাইব? মাতৃ-স্তনা যেমন দুগ্ধভার বুকে করিয়া সন্তানের প্রতীক্ষায় থাকে, আমরাও তেমনি অনাদিকাল-সঞ্চিত পবিত্র মাতৃ-স্তন্যের ন্যায় পীযূষধারা বুকে লইয়া, শিষ্যের প্রতীক্ষায়, শুভ মুহূর্ত্তের অবসরে গুরু পরম্পরায় দাঁড়াইয়া আছি।

"শাস্ত্র বর্ণিত গুরুর বাস্তবিকই অভাব নাই, তবে লক্ষণাক্রান্ত সৎশিষ্যের সংখ্যা বড়ই কম। এরূপ শিষ্যের আবির্ভাবের সূচনা দেখিলে, হৃদয় পুলকিত, ধরণী সরস ধন-ধান্যে পূর্ণ হয়, যজ্ঞকুণ্ডে পূর্ণাঙ্গ আহুতি, দিকে দিকে বেদমন্ত্র, মঙ্গল স্তোত্র ধ্বনিত, আরতির বাদ্য বাজিয়া উঠে, ঋষি-সঙ্ঘে আনন্দলহরী ছুটে, ত্রিদিবে পুষ্পবৃষ্টি হয়, অধ্যাত্ম-জগতে কল্লোল বহিয়া যায়।

"তাই বহুদিন হ'তে অলক্ষ্যে তোমাকে দেখিয়া আসিতেছিলাম,—রক্ষা করিতেছিলাম। সেদিন নদী তীরে সে কাল নিদ্রা আমিই আনাইয়াছিলাম; নহিলে সে রাত্রে দীক্ষিত হইলে, ভুল পথে চলিয়া যাইতে।"

আনন্দের আতিশয্যে, কৃতজ্ঞতাভরে, আঁখিনীরে ভাসিয়া, ভূমিতে মস্তক লুটাইয়া প্রাণভরে বলিলাম,—

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তম্ যেন চরাচরং।
তৎপদম্ দর্শিতম্ যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়াঃ
চক্ষুরুন্মিলিতম্ যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
গুরোর্কৃপাহি কেবলম, কৃপাহি কেবলম্॥

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়।

ভাব-লহরী।

সাধ।

তোমার স্বরূপ, সখা! আমার হৃদয়ে
উঠুক উজ্জ্বলি,
মোহ-আবরণ, মম হৃদয় বিকার,
ঘুচুক সকলি॥
বৃথা আশা বক্ষে বহিয়া বহিয়া,
সম্পদ্—খ্যাতির কাঙাল হইয়া,
সব ভুলে গে'ছি।
এস! প্রভু এস কঠোর হইয়ে,
জাগাও সুপ্ত অলস হৃদয়ে
এই ভিক্ষা যাচি"
যা' কিছু আমার আছে, বা - না আছে
ও পদে স'পিয়া সব(ই) মিটে গেছে,
চাহিনা কিছুই,—
এ মোর রিক্ততা যেন চিরদিন,
জেগে থাকে হৃদে, না হয় বিলীন
সাধ মাত্র এই॥
তব আশা হৃদে, রাখি সযতনে,
মম অন্তর মাঝে অতীব গোপনে;
তব ধ্যানে বসি;—
যদি মনে হয়, যদি বুঝ ভাল,
দেখা দিও, সখা! নিমেষে কেবল,—
নহে কিছু বেশী।
সেই ক্ষণেকের তব দরশন,
মুহূর্ত্তের দেখা যুগল চরণ—
যথেষ্ট তাহাই,
সখা! আর কিছু চাহিবনা কাছে,
যুগল চরণ হৃদয়ের মাঝে
ভাবিব সদাই।
শুধু দাস বলে করিহ স্বীকার,
এই আশা টুকু মিটাও তাহার,
কমল-নয়ন!
হৃদয়-কমলে, হে প্রিয়! আমার,
রাখ গো যোগীন্দ্র-পূজিত, তোমার
রাতুল চরণ।

নির্গুণ ভক্তি।

৩।

দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মমমায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে।।

এই গুণময়ী মায়ার অপর পারে যাওয়া সহজ কথা নহে। ভগবান্‌কে এক-মনে ঐকান্তিক ভক্তি দ্বারা আশ্রয় করিলেই, ক্রমে মায়া-সমুদ্রের সীমা দেখা যায়। সে ভক্তি, যে সে ভক্তি নহে।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ॥

লোক ধর্ম্ম, বৈদিক ধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম, সকল ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া এক মাত্র সেই গোপালনন্দনকে যদি আশ্রয় করিতে পার, তবে সেই ভক্তবৎসল কৃষ্ণ গুণময় পাপ হইতে তোমাকে মুক্ত করিবেন, তোমাকে নির্গুণ ভক্তির পথিক করিবেন।

গোপ ও গোপী প্রেমের ফাঁসে কৃষ্ণচন্দ্র বাঁধা গিয়াছিল। কৃষ্ণ তাহাদের লোক, কৃষ্ণ তাহাদের বেদ, কৃষ্ণ তাহাদের কুল, কৃষ্ণ তাহাদের পরম ধর্ম্ম, কৃষ্ণ তাহাদের একমাত্র ধর্ম্ম। তাই কৃষ্ণ তাহাদের গুণের বন্ধন একে একে নষ্ট করিয়াছিলেন।

প্রথম কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য। এ সকল অসুর, শ্রীকৃষ্ণ নিমেষে নাশ করিলেন। বিষধরী পুতনার মনোহারিণী রূপ, তৃণাবর্ত্তের রাজসিক বিক্ষেপ, নবনীত হরণ, যমলার্জ্জুন ভঙ্গ ও সকটাবর্ত্তন তাঁহারি শৈশব লীলা মাত্র। পার্থিব বন্ধনের নাশ হইলেই, পার্থিব গুণের নাশ হয়। কিন্তু কত পৃথিবীর, কত ত্রিলোকীর বন্ধন যে জীবের আছে, তাহা কে জানে?

ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোহধ্যজায়ত। ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ। সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরো অজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধৎ বিশ্বস্যমিষতোবশী। সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ

যখন সৌর জগৎ ছিল না যখন প্রলয়ের একার্ণব জলে সকল মগ্ন ছিল, সে কাল হইতে কি জানি কত ত্রিলোকীর উদ্ভব হইয়াছে, কতশত পৃথিবী বুদ্বুদের

ক্রায় অনন্ত কালসমুদ্রে মিলাইয়া গিয়াছে—কত পৃথিবীর কত বন্ধন জীব সঞ্চয় করিয়াছে, সেই সকল বন্ধন,সেই পর্ব্বতাকার মহৎ অজগর অদ্য বিনষ্ট না হইলে, গোপ সকল কিরূপে গুণের সীমা অতিক্রম করিতে পারে? অঘাসুরের নাশ হইল বটে, কিন্তু সেই অসুরের মুখ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, গোপ বালকেরও মৃত্যু হইল। সাংসারিক সত্ত্বা, পার্থিব সত্ত্বা, ত্রিলোক পরিচ্ছিন্ন সত্ত্বা আর তাহাদের থাকিল না। এবার যে তাহাদের জীবন, শ্রীকৃষ্ণের অমৃত বর্ষণ।

তেনৈব সর্ব্বেষু বহির্গতেষু প্রাণেষু বৎসান্ সুহৃদঃ পরেতান্।
দৃষ্ট্বা স্বয়োত্থাপ্য তদন্বিতঃ পুনর্বক্ত্রান্মুকুন্দো ভগবান্ বিনির্যযৌ ॥ ১০।১২।৩২।

গো-বৎস ও গোপ-বালকের প্রাণ বিনির্গত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ আপনার অমৃতবর্ষিণী দৃষ্টি দ্বারা তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করিলেন। এ জীবন কৃষ্ণের জীবন। গোপ বালকেরা এইবার ত্রিগুণময়ী মায়ার সীমা অতিক্রম করিলেন; এইবার তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিলেন। সৌর জগতের মায়ায় আর তাঁহারা আবদ্ধ থাকিলেন না। বেদের বিধাতা আর তাঁহাদের মহিমার ইয়ত্তা করিতে পারিলেন না। ব্রহ্মার সিংহাসন টলিয়া উঠিল; ব্রহ্মা ব্যতিব্যস্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ কি তবে ব্রহ্মার শাসনের বহির্ভূত। তবে কি তিনি ব্রহ্মাণ্ডের বহির্গত, শত সহস্র ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর, ভগবান। ব্রহ্মা এইবার পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। গোপ-বালক ও গো-বৎস হরণ করিলেন। ব্রহ্মাণ্ডের মায়া কিন্তু পরাস্ত হইল। শ্রীকৃষ্ণের ভাগবতী মায়া—মহামায়া—যোগমায়ার নিকট ত্রিগুণময়ী মায়া মস্তক অবনত করিল। বৈকুণ্ঠের শুদ্ধসত্ত্বে নির্ম্মিত গোপ-বালক কৃষ্ণের জীবনে কৃষ্ণময় হইল।

কে বলে গোপ-কুমারীরা কাত্যায়নী দেবীর অর্চ্চনা করিয়া কৃষ্ণকে পতি স্বরূপে প্রাপ্ত হন নাই? কে বলে শ্রীকৃষ্ণ গোপ-কুমার বেশে তাঁহাদিগের পতি ছিলেন না? কে বলে গোপ-বালকদিগের অস্তিত্ব শ্রীকৃষ্ণে লুপ্ত হয় নাই?

মদ্‌গুণ শ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥ ৩।২৯।১১।

কে বলে সেই গঙ্গাজল সমুদ্রে পতিত হইয়া, সমুদ্র জল বলিয়া পরিগণিত হয় না? কে বলে গুণ সমুদ্রের অপর পারে, সকলই কৃষ্ণময় নহে? কে বলে সেখানে ভেদ আছে, সেখানে নানাত্ব আছে?

যে বলে গোপ-রমণীরা জার, কৃষ্ণে উপগত হইয়াছিলেন, তাহারা মূর্খ। গুণের মধ্যে থাকিয়া জীব নির্গুণ ভক্তির কথা কি জানিবে? "ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন। দ্বিতীয়ের মধ্যে থাকিলেই নানারূপ ভয়ের উদ্ভব হয়। অদ্বিতীয় নির্গুণ শ্রীকৃষ্ণে উপগত হইয়া, গোপীদিগের কোন ভয়ের কারণ ছিল না।

যখন গোপ-বালকগণ কৃষ্ণময় হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের মধ্যে থাকিয়া ইন্দ্রের রাজত্ব হরণ করিলেন। তিনি গোবিন্দ সংজ্ঞা দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া নির্গুণ ভক্তির রাজ্য স্থাপিত করিলেন। এই নির্গুণ ভক্তির রাজ্যে তিনি গোপ-কুমারীদিগের মনোরথ পূর্ণ করিলেন!

শ্রীপূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ এম, এ, বি, এল।

শ্রীশ্রীঅষ্টোত্তর শত নাম রামায়ণম্।

ওঁ শ্রীসীতালক্ষ্মণভরতশত্রুঘ্নহনুমৎসমেতশ্রীরামচন্দ্রপরব্রহ্মণে নমঃ।

বালকাণ্ডঃ।

শুদ্ধব্রহ্মপরাৎপর	রাম	শ্রীমদহল্যোদ্ধারক	রাম
কালাত্মক পরমেশ্বর	রাম	গৌতম-মুনি সংপূজিত	রাম
শেষতল্পসুখনিদ্রিত	রাম	সুরমুনিবরগণ সংস্তুত	রাম
ব্রহ্মাদ্যমর প্রার্থিত	রাম	নাবিক ধাবিত-মৃদুপদ	রাম
চণ্ডকিরণকুল মণ্ডন	রাম	মিথিলাপুরজন মোহক	রাম
শ্রীমদ্দশরথ নন্দন	রাম	বিদেহ-মানস রঞ্জক	রাম
কৌশল্যা-সুখ বর্দ্ধন	রাম	ত্র্যম্বক-কার্ম্মুক-ভঞ্জক	রাম
বিশ্বামিত্র প্রিয়ধন	রাম	সীতার্পিতবর মালিক	রাম
ঘোর-তাড়কা ঘাতক	রাম	কৃত-বৈবাহিক কৌতুক	রাম
মারীচাদি নিপাতক	রাম	ভার্গব-দর্প বিনাশক	রাম
কৌশিকমখ সংরক্ষক	রাম	শ্রীমদযোধ্যাপালক	রাম

অযোধ্যাকাণ্ডঃ।

অগণিতগুণগণভূষিত	রাম	ভরদ্বাজ-মুখানন্দক	রাম
অবনী-তনয়া-কামিত	রাম	চিত্রকূটাদ্রিনিকেতন	রাম
রাকাচন্দ্র সমানন	রাম	দশরথসন্তত চিন্তিত	রাম
পিতৃবাক্যাশ্রিতকানন	রাম	কৈকেয়ীতনয়ার্থিত	রাম
প্রিয়গুহবিনিবেদিতপদ	রাম	বিরচিত-নিজ-পিতৃকর্ম্মক	রাম
তৎক্ষালিত-নিজ-মৃদুপদ	রাম	ভরতার্পিত-নিজ-পাদুক	রাম

অরণ্যকাণ্ডঃ।

দণ্ডকাবনজন পাবন	রাম	খরদূষণমুখ-সূদক	রাম
দুষ্টবিরাধ বিনাশন	রাম	সীতাপ্রিয় হরিণানুগ	রাম
শরভঙ্গ-সুতীক্ষ্ণ-অর্চ্চিত	রাম	মারীচার্ত্তিকৃদাশুগ	রাম
অগস্ত্যানুগ্রহবর্দ্ধিত	রাম	বিনষ্টসীতান্বেষক	রাম
গৃধ্রাধিপ-সংসেবিত	রাম	গৃধ্রাধিপগতিদায়ক	রাম
পঞ্চবটীতটসুস্থিত	রাম	শবরীদত্তফলাশন	রাম
শূর্পণখার্ত্তিবিধায়ক	রাম	কবন্ধ বাহুচ্ছেদন	রাম

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

হনুমৎসেবিত-নিজপদ	রাম	বানর-দূত প্রেষক	রাম
নত সুগ্রীবাভীষ্টদ	রাম	হিতকরলক্ষ্মণসংযুত	রাম
গর্ব্বিত বালি-সংহারক	রাম		

সুন্দরাকাণ্ডঃ।

কপিবরসন্তুত-সংস্তুত	রাম	শিষ্ট হনুমদ্‌ভূষিত	রাম
তদ্‌গতি বিঘ্নধ্বংসক	রাম	সীতাবেদিতকাকাবন	রাম
সীতাপ্রাণাধারক	রাম	কৃতচূড়ামণিদর্শন	রাম
দুষ্ট দশানন-দূষিত	রাম	কপিবর-বচনাশ্বাসিত	রাম

যুদ্ধকাণ্ডঃ।

রাবণ-নিধন-প্রস্থিত	রাম	পুষ্পকযানারোহণ	রাম
বানরসৈন্যসমাবৃত	রাম	ভরদ্বাজাভিনিষেবন	রাম
শোষিত-সরিদীশার্থিত	রাম	ভরত-প্রাণ-প্রিয়কর	রাম
বিভীষণাভয়দায়ক	রাম	সাকেতপুরীভূষণ	রাম
পর্ব্বতসেতু-নিবন্ধক	রাম	সকল স্বীয় সমানত	রাম
কুম্ভকর্ণশিরশ্ছেদক	রাম	রত্নলসৎ-পীঠাস্থিত	রাম
রাক্ষস-সংঘ-বিমর্দ্দক	রাম	পট্টাভিষেকালঙ্কৃত	রাম
অহি-মহি-রাবণ-চারণ	রাম	পার্থিব-কুল-সম্মানিত	রাম
সংহৃত-দশমুখ-রাবণ	রাম	বিভীষণার্পিত রঙ্গক	রাম
বিধি-ভব-মুখ সুরসংস্তুত	রাম	কোশকুলানুগ্রহকর	রাম
খস্থিত দশরথ-বীক্ষিত	রাম	সকল-জীব-সংরক্ষক	রাম
সীতাদর্শন-মোদিত	রাম	সমস্তলোকাধারক	রাম
অভিষিক্ত-বিভীষণ-নত	রাম		

উত্তরাকাণ্ডঃ।

আগত-মুনিগণ-সংস্তুত	রাম	নীতি সুরক্ষিত জনপদ	রাম
বিশ্রুত দশকণ্ঠোদ্ভব	রাম	বিপিনত্যাজিতজনকজ	রাম
সীতালিঙ্গন-নির্বৃত্ত	রাম	কারিত লবণাসুরবধ	রাম

স্বর্গতশম্বুক-সংস্তুত	রাম	ধর্ম্মস্থাপন তৎপর	রাম
স্বতনয় কুশলব নন্দিত	রাম	ভক্তিপরায়ণ-মুক্তিদ	রাম
অশ্বমেধক্রতু-দীক্ষিত	রাম	সর্ব্বচরাচর পালক	রাম
কালাবেদিত সুরপদ	রাম	সর্ব্বভবাময়-বারক	রাম
আযোধ্যকজন মুক্তিদ	রাম	বৈকুণ্ঠালয় সংস্থিত	রাম
বিধিমুখ-বিবুধানন্দক	রাম	নিত্যানন্দ পদস্থিত	রাম
তেজোময় নিজরূপক	রাম	রাম রাম জয় রাজা	রাম
সংসৃতি-বন্ধ-বিমোচক	রাম	রাম রাম জয় সীতা	রাম

প্রণাম।

আপদামপহর্ত্তারং দাতারং সর্ব্বসম্পদাম্।
লোকাভিরামং শ্রীরামং ভূয়ো ভূয়ো নমাম্যহম্॥
রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ।

প্রার্থনা।

নান্যা স্পৃহা রঘুপতে হৃদয়েঽস্মদীয়ে
সত্যং বদামি চ ভবানখিলান্তরাত্মা।
ভক্তিং প্রযচ্ছ রঘুপুঙ্গব নির্ভরাং মে
কামাদি দোষ রহিতং কুরু মানসঞ্চ॥

জন্মান্তরবাদ।

জন্মান্তরে কেন বিশ্বাস করিব? প্রত্যক্ষ যেখানে শেষ দেখিতে পাইতেছি, সেখানে কল্পনা আরম্ভ করিব কেন? কেন এই মাতা পিতার স্নেহ, পত্নীর প্রেম, শিশুর ভক্তি, বন্ধুর ভালবাসা—এই সকল পবিত্র বন্ধন ও মিলনকে অনর্থ কল্পনা করিয়া পার্থিব জীবনকে দুঃসহ মনে করিব? পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন—আশ্চর্য্যের বিষয় এই পুরাকালের ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণের মত সূক্ষ্ম দার্শনিক এই জন্মান্তরবাদটীকে অন্যূন আড়াই হাজার বর্ষ ব্যাপিয়া স্বতঃসিদ্ধ প্রামাণ্যের মত গ্রহণ করিয়াছেন। সাঙ্খ্যকারগণ ঈশ্বরকে অসিদ্ধ বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই; বৌদ্ধগণ বেদের অভ্রান্তত্ব বা অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করেন না; কিন্তু এই অপূর্ব্ব মতের বিরুদ্ধে কেহ একটি কনিষ্ঠাঙ্গুলিও উত্তোলন করেন নাই। অবশ্য শুদ্ধ প্রত্যক্ষবাদী চার্ব্বাকগণ এমত কখনই গ্রহণ করিতে পারেন না। কিন্তু ভারতবর্ষে চার্ব্বাকগণ কখনই প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারেন নাই। ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহারা একদিনও সমাদৃত হন নাই। কেন এমনটা ঘটিল? এই অন্ধ-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে একদিনও কোন তর্ক উঠিল না কেন? প্রতিষ্ঠাবান্ দার্শনিকের মধ্যে একজনও কেন ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে সাহসী হইলেন না? ঋগ্বেদেও নাকি এ বিশ্বাসের অনুকূলে কোন ঋক দেখিতে পাওয়া যায় নাই। উক্ত গ্রন্থের শেষ মণ্ডলের একটি মাত্র মন্ত্রে মৃত আত্মার যে জলে বা বনে গমনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে এই বিশ্বাসের মূল বলিয়া গ্রহণ করিতে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ সম্পূর্ণ নারাজ; কারণ তাঁহাদের মতে এত সুদূরস্পর্শী একটি মত, বৈদিক ঋষিগণের মধ্যে কেবল একজনের একটি সাময়িক উচ্ছ্বাসের উপর নির্ভর করিতে পারে না। অধিকন্তু বৈদিকযুগে কখন কখন হয়ত শবদেহ বনে বা জলে পরিত্যক্ত হইত; তাহাই কবিত্বময়ী ভাষায় ঋগ্বেদের একটি শ্লোকে স্থান পাইয়া থাকিবে এরূপও মনে করা যাইতে পারে।

বিশেষতঃ ভারতবর্ষের বহির্ভাগে আর্য্যগণ যে সকল উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, সে সকল স্থানে জন্মান্তরবাদ আদৌ প্রচলিত নাই। তবে কোথা

হইতে কেমন করিয়া ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণের মনে এ বিশ্বাস একেবারে গ্রথিত হইয়া পড়িল? এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মনীষিগণ স্থির করিয়াছেন,—যে সম্ভবতঃ এ বিষয়ে প্রথম কল্পনা ভারতবর্ষের আদিমনিবাসিগণের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছিল। এখনও দেখা যায় ভারতবর্ষের অর্দ্ধসভ্যজাতিগণের মধ্যে প্রেতাত্মার তরু বা ব্যাঘ্রাদিদেহে প্রবেশের বিশ্বাস প্রচলিত রহিয়াছে। সাঁওতালেরা বলে, সৎলোকের আত্মা মৃত্যুর পর ফলবান বৃক্ষে প্রবেশ করে। এই সকল পাশ্চাত্য মতের সারবত্তা কতদূর, তাহা এ প্রবন্ধের আলোচ্য নহে। আমরা জন্মান্তরে বিশ্বাসের মূলে কোন সত্য—কোন যুক্তি, নিহিত আছে কিনা, তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

পরিদৃশ্যমান জগতের পদার্থগুলিকে সূক্ষ্মভাবে নিরীক্ষণ করিলে আমরা কি দেখিতে পাই? আমরা কোন দ্রব্যকে নিঃশেষ—বিনষ্ট হইয়া যাইতে দেখি না। ভূমি হইতে রস, বায়ু হইতে নানারূপ বায়বীয় দ্রব্য গ্রহণ করিয়া যে বৃক্ষ বর্দ্ধিত হইল, তাহার প্রত্যেক অণু-পরমাণুরও হিসাব থাকে। এই বৃক্ষের জলীয় অংশ বাষ্পে পরিণত হয়; বাষ্প মেঘে পরিণত হয়, মেঘ জলে পরিণত হয়। ইহার পার্থিব অংশ অঙ্গারে পরিণত হয়, অঙ্গার ভস্ম হয়, ভস্ম মৃত্তিকা হয়। এইরূপ ইহার সকল অংশ, প্রকৃতির কোথাও না কোথাও থাকিয়া যায়, সুতরাং ইহার সম্পূর্ণ ধ্বংস কখনই সম্ভব হয় না। আমরা যাহাকে ধ্বংস বলি, তাহা কার্য্যের কারণে পরিণতিমাত্র,—নিঃশেষ সমাপ্তি নহে। তৃণ গো-জঠরে গিয়া দুগ্ধে পরিণত হইতেছে, দুগ্ধ কালে দধিতে পরিণত হইতেছে পরিবর্ত্তনই জগতে অভ্রান্ত সত্য, কিন্তু এ পরিবর্ত্তনেরও শৃঙ্খলা আছে। ইহাকেই ইংরাজ দার্শনিকগণ প্রাকৃতিক সাম্য বা Uniformity of Nature বলেন। এ পরিবর্ত্তনের শেষ নাই, বৃত্তের (circle) বা মালার মত ইহারও একটি অনন্তত্ব আছে। যদি যাবতীয় জড় পদার্থের শেষ আমরা না দেখিতে পাই, তাহা হইলে তাহা অপেক্ষা সমধিক শক্তিশালী চেতন আত্মাকে আমরা অনায়াসে অবিনশ্বর বলিয়া কল্পনা করিতে পারি।

দেহাতিরিক্ত অথবা দেহাবচ্ছিন্ন আত্ম-সত্তার বিষয়ে কোন তর্ক তুলিব না। কারণ এ বিষয়ের সংশয়ীর দল অতি অল্প। অনুভবের বিরুদ্ধে ত' তর্ক চলে না। আত্মানুভব জীবমাত্রেরই হইয়া থাকে। আত্মাকে অবিনশ্বর বলি, কারণ আত্মার

সম্পূর্ণ বিনাশ ত' নাই-ই—পরিণতিরূপ বিনাশও নাই। আকৃতিমানেরই বিকৃতি হইয়া থাকে। আত্মার আকৃতি নাই, সুতরাং তাহার অস্তিত্বের ধ্বংস প্রভৃতি অসম্ভব। আত্মাকে দেহাবচ্ছিন্ন বলিয়াছি, কারণ দেহেই প্রথমে আত্মার উপলব্ধি হয়। যেমন ঘট, পট, গৃহ, মন্দির, বৃক্ষ, পর্ব্বতাদির, দ্বারা আকাশের (Space) জ্ঞান হয়। যেমন জন্ম, মৃত্যু, সন্ধি, বিগ্রহ, গ্রহাদির গতি প্রভৃতির দ্বারা কালের (Time) উপলব্ধি হয়, তেমনি এই দেহের দ্বারা উপলক্ষিত হইয়া, আত্মার উপলব্ধি হইয়া থাকে। আত্মাকে দেহাতিরিক্ত বলিয়াছি, কারণ মৃতদেহে আত্ম-বুদ্ধি হয় না। আত্মা যদি দেহাতিরিক্ত না হইত, তাহা হইলে মৃতদেহে আত্মবোধের ব্যাঘাত হইত না

এখন কথা হইতেছে, পরিণামী দেহের ধ্বংসের পর অধিকারী আত্মার কি হয়? কেহ বলেন মৃত্যুর পরে জীবের আত্ম-সত্তা (ইহাদের মতে যত জীব তত আত্মা) এক স্থলে জমা হয়। এইরূপ জমা থাকিয়া এক মহাবিচারের দিন ইহাদিগকে ঈশ্বর সন্নিধানে লইয়া যাওয়া হয়। সেখান হইতে স্বকৃত পাপপুণ্যানুসারে ইহারা দণ্ড বা পুরস্কার-স্বরূপ অনন্ত স্বর্গে বা নরকে নীত হয়। একি পিতামহীর উপকথা! দেহহীন আত্মার আবার পাপ পুণ্য কি? হস্তহীনের চপেটাঘাত, খঞ্জের গিরিলঙ্ঘন, অন্ধের পরমাণু দর্শনের মত, আত্মার এই পাপ পুণ্য অসম্ভব। দেহেই পাপ পুণ্য হইয়া থাকে। আত্ম-পরিচালিত দেহের পাপ পুণ্যের জন্য, শুদ্ধ আত্মার দণ্ড বা পুরস্কারও ন্যায়ানুমোদিত হইতে পারে না। সুতরাং পাপ পুণ্যের ফলভোগ যদি অবশ্যম্ভাবী হয়, তাহা হইলে আত্ম-পরিচালিত দেহেই হওয়া যুক্তিযুক্ত। আমরা দেখিতে পাই, যে দেহে পাপ পুণ্যের সঞ্চয় হয়, সেই দেহেই তাহার ফলভোগ হয় না। অনেক সময় সৎলোক সৎকার্য্যের জন্য পুরস্কৃত না হইয়া, বরং অতিশয় কষ্টভোগ করেন। অসৎলোকও অসৎকার্য্যের জন্য দণ্ডিত না হইয়া, বরং 'জয়-জয় কারের' সহিত ভবলীলা সাঙ্গ করেন;—এমন দৃষ্টান্ত জগতে বিরল নহে! অতএব ফলভোগ অনিবার্য্য হইলে মৃত্যুর পরে পূর্ব্ব-জাতীয় নূতন ভোগ-শরীরের উৎপত্তি অবশ্য স্বীকার্য্য। যদি এক জন্মে পাপ পুণ্যের সঞ্চয় ও পরজন্মে তাহার ভোগ হইয় সমুদয় লোপ পাইত, তাহা হইলে অচিরে সমগ্র সৃষ্টিও বিলুপ্ত হইত; অথবা প্রত্যহ নূতন নূতন সৃষ্টির আবশ্যক হইত। সৃষ্টি করিতে করিতে ভগবানেরও গলদ্ঘর্ম

উপস্থিত হইত। কাহাকেও খঞ্জ, কাহাকেও অন্ধ, কাহাকেও বধির, কাহাকেও রুগ্ন এইরূপ বিষম সৃষ্টি করিয়া পক্ষপাতিত্বাপরাধ হইতেও তাঁহার নিষ্কৃতি হইত না। আর এই জগতে অন্যায় কষ্টভোগের জন্য যদিই আমরা এই নিষ্ঠুর সৃষ্টি কর্ত্তাটির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিতাম, তাহা হইলে আমাদিগকে তিরস্কার করিবার অধিকার কোন ধর্ম্মযাজকেরই থাকিত না। সুতরাং মৃত্যুর পরে যে শরীরের উৎপত্তি হয়,তাহাতে কেবল ভোগই হইবে, এমন কথাও সম্ভব নহে। সৃষ্টি-ক্রম রক্ষা করিতে হইলে, তাহাতে কর্ম্ম সঞ্চয়ের আবশ্যকতা হয়। এই সংসারে একই জন্মে ফলভোগ ও কর্ম্ম সঞ্চয়ের দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। আমি আমার যে বন্ধুটিকে ভালবাসিয়া অতিরিক্ত বিশ্বাস করিয়াছিলাম সেই বন্ধুটিই আমাকে গোপনে ছুরিকাঘাত করিল। তখন এই বিশ্বাসঘাতকতা কর্ম্ম অর্জ্জন করিবার মত কর্ম্মের অনুসন্ধান করিলে, ইহজন্মে সম্ভবতঃ তাহা খুজিয়া পাই না। আবার এই যে আমি উচ্চাসনে বসিয়া, দীন ব্রাহ্মণ আমার নিকট নত হয় নাই বলিয়া, তাহার সর্ব্বনাশের উপায়োদ্ভাবন করিতেছি, এ জন্মে হয় ত ইহার ফল ভোগ না করিয়াও যাইতে পারি। ঐহিক জীবনে আমরা এ উভয়বিধ প্রক্রিয়া নিরীক্ষণ করিয়াছি।

কতকগুলি কর্ম্ম আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা-প্রণোদিত, তাহা করিতে বা—না করিতে বা অন্য প্রকারে করিতে, আমরা ইচ্ছা করিলেই পারিতাম, ইহাকে বলে সঞ্চিত কর্ম্ম। আর অন্য কতকগুলি যাহার উপর আমাদের কোন হাত নাই বা যাহা অন্যের ইচ্ছাপরতন্ত্র—তাহাকেই বলে ভোগ। একটি active অন্যটি Passive। আমার যাহা কর্ম্ম, তোমার তাহা ভোগ; আবার তোমার যাহা কর্ম্ম, আমার হয়ত তাহা ভোগ। আপত্তি এই যে, এই ভোগের জন্য তোমার বা আমার কর্ম্ম যদি অনিবার্য্য হয়, তাহা হইলে সে কর্ম্মের জন্য তুমি বা আমি ত দায়ী নহি। উত্তর এই ভোগ অনিবার্য্য হইলেও তৎকল্পে তোমার বা আমার কর্ম্ম অনিবার্য্য নহে। আমাদের চেষ্টা ভিন্নও ভোগ হইতে পারে ও হইয়াও থাকে। সুতরাং তুমি আমি স্বকৃত কার্য্যের জন্য দায়ী।

এখন কর্ম্মের ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী কি না ইহাও বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। ইহা একটি দার্শনিক সত্য যে একই কারণে একই কার্য্যের উৎপত্তি হয়। আমরা যে এক কারণের ভিন্ন কার্য্য দেখিয়া থাকি, তাহার কারণ

আমরা সে সকল স্থলে 'কারণ কূট' বা 'কার্য্য-কূট' (collection of causes and effects) গ্রহণ করি নাই। বীজ পুতিলে অঙ্কুর উদ্গত হয়, আবার বীজ পুতিলেও অঙ্কুর হয় না এমনও দেখা যায়। অনুসন্ধান করিলে শেষোক্ত স্থলে অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, অনাতপ, অসার ভূমি, বীজের দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি কোন না কোন প্রতিবন্ধক কারণ বিদ্যমান আছে দেখিতে পাইব। প্রতিবন্ধক কারণ না থাকিলে, বীজ হইতে অঙ্কুর হইবেই। আবার বীজের অঙ্কুর হওয়া বন্ধ করিতে হইলে, প্রতিবন্ধক কারণকে অঙ্কুরোদ্গমের তুল্য পরাক্রমশালী হইতে হইবে। দার্শনিক ভাষায় বলিতে হইলে, "প্রতিবন্ধক কারণ, ফলের পরিমাপক হইবে। প্রতিবন্ধক কারণের তারতম্যে ফলেরও তারতম্য;" সুতরাং সিদ্ধান্ত হইতেছে তুল্য-বল প্রতিবন্ধক কারণের অভাবে কর্ম্ম ফল প্রদান করিবেই। মৃত্যু এরূপ প্রতিবন্ধক কারণ হইতে পারে না; মৃত্যু দেহের নাশ মাত্র। কর্ম্মও দেহের নহে,—দেহাবচ্ছিন্ন আত্মার। মৃত্যুতে দেহের ধর্ম্ম সকলের উচ্ছেদ হইলেও, তাহাতে দেহাবচ্ছিন্ন আত্মার ধর্ম্মের নাশ হইতে পারে না। দেহ ও আত্মার সংযোগ-জনিত কর্ম্ম, দেহ ও আত্মার সংযোগ-নাশে অবশ্য বিনষ্ট হইবে, এমন কথা বলা যায় না; কারণ দেহাবচ্ছেদেই আত্মার কর্ম্ম সম্ভব হইলেও, দেহাবচ্ছেদ কর্ম্মের প্রতি কারণ নহে। সকল দ্রব্য আকাশে অবস্থিত হইলেও, আকাশ যেমন সকল দ্রব্যোৎপত্তির কারণ নহে। কুলাল জনক, মৃত্তিকাবাহী রাসভাদি যেমন ঘটোৎপত্তির সহায়তা করিলেও, তদুৎপত্তির কারণ নহে, পরন্তু অন্যথাসিদ্ধ (accidents) বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে; তেমনি দেহাবচ্ছেদই কর্ম্মের প্রতি অন্যথাসিদ্ধ (accident) মাত্র। দেহাবচ্ছেদই কর্ম্মের প্রতি কারণ হইলে জীবগণ মধ্যে কেহ কর্ম্ম না করিয়া এক মুহূর্ত্তও তিষ্ঠিতে পারিত না। প্রবন্ধ-লেখকের মত নিষ্কর্ম্মা লোকেরা লোকনিন্দার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইত। কিন্তু অভ্যাস করিলে,—সাধনা করিলে, এই দেহে সম্পূর্ণ কর্ম্ম সংযম লাভ ঘটিতে পারে। ভারতবর্ষীয় সাধকগণের মধ্যে অনেকে আপন জীবনে তাহা সপ্রমাণিত করিয়াছেন।

'অগম্যা গুরু' নামক যোগী ইউরোপে কিয়ৎকাল হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বন্ধ রাখিয়া, তত্রত্য চিকিৎসক, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক সমাজকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। হরিদাস সাধুর কথা বোধ করি আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে

হইবে না। আত্মার সহিত দেহের সংযোগ, কর্ম্মের প্রতি কারণ হইলে, কর্ম্ম প্রতিরুদ্ধ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত হইত না। আত্মার দেহান্তর গ্রহণের লৌকিক দৃষ্টান্তও আমরা দেখিয়াছি। আমরা গুটীপোকা হইতে প্রজাপতির উদ্ভব দেখিয়াছি। আমরা শিশুকে কুমার হইতে,—কুমারকে যুবা হইতে,—যুবাকে বৃদ্ধ হইতে দেখিয়াছি। ইহার মধ্যে প্রতি সপ্ত বৎসরে দেহের প্রত্যেক অণু-গুলিতে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয়; ইহা ইউরোপীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্মত। সুতরাং শৈশবে যে দেহ থাকে, কৌমারে সে দেহ থাকে না; কৌমারে যে দেহ থাকে, যৌবনে তাহা থাকে না; আবার যৌবনে যে দেহ থাকে, বার্দ্ধক্যে তাহা থাকে না। অথচ পূর্ব্ব-পূর্ব্ববর্ত্তীকালের দেহাবচ্ছিন্ন আত্মার দোষে বা গুণে, পর-পরবর্ত্তীকালের দেহাবচ্ছিন্ন আত্মা ফলভোগ করে। ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকের মধ্যে অনেকেই জগতের ক্রমবিকাশে (evolution) বিশ্বাসশীল। কেহ কেহ ক্রমবিকাশ (evolution) ও ক্রমাবনতি (involution) জগতে একত্র সংঘটিত হইতেছে, এমন মত প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁহারা জন্মান্তরে বিশ্বাস স্থাপন করিতে নিতান্ত কুণ্ঠিত। তাঁহারা অস্থিচর্ম্ম সার করিয়া অস্থিচর্ম্ম গণিয়া মিলাইয়া যতই কেন স্বমত স্থাপনে চেষ্টিত হউন না, কখনই তাঁহারা উন্নত মহীলতাকে সর্প প্রসব করিতে দেখাইতে পারিবেন না; মহীলতার সন্ততি মহীলতাই হইবে। ভারতবর্ষীয় দার্শনিকগণও এ ক্রমবিকাশ ও ক্রমাবনতি স্বীকার করেন। কিন্তু তাহা সন্তান-সন্ততিক্রমে নহে—জন্মান্তরক্রমে। কোন্ মত অধিক যুক্তিযুক্ত, তাহা সুধীগণের বিচার সাপেক্ষ।

বিষম সৃষ্টির কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার পর, এই যে সেদিন "টাইটানিক" জাহাজ ডুবি হইয়া বহু শত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইল, বহু পরিবার শোক-সাগরে নিমগ্ন হইল, এই অপঘাত মৃত্যু, এই আকস্মিক শোকের প্রযোজক কে? কাপ্তেনের অনবধানতা প্রভৃতিকে কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে চলিবে না। কারণ একজন কেন ঐ জাহাজের টিকিট কিনিয়াও শেষ মুহূর্ত্তে উহাতে আরোহণ করিল না? আবার একজন অকৃতসঙ্কল্প, কেন জাহাজ ছাড়িবার ঠিক পূর্ব্বেই উহাতে যাইবার সঙ্কল্প করিল, অপর একজন যাইতে যাইতে পথে একটি বন্দরে মত পরিবর্ত্তিত করিয়া নামিয়া পড়িল? তাহার

পর সংস্কারের কথা এই যে, বালক 'মদন' সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শিতা দেখাইয়া, আপনাদিগকে বিস্মিত করিয়াছে; এই সঙ্গীতের সংস্কার শৈশবে সে কোথা হইতে আনিয়াছিল? অতি শিশুকেও আমরা কম্পিত হইতে দেখি; তাহার কারণ ভয়,—ভয় আঘাতের সংস্কার। শিশু তখনও আঘাত অনুভব করে নাই; তাহার আঘাতের সংস্কার হয় কেমন করিয়া? অনুভূত বস্তুরই সংস্কার থাকে। এসকল অনুভব কবে হইয়াছিল? জন্মান্তরবাদ স্বীকার করিলে এ সকল প্রশ্নের যে প্রকার সরল সমাধান হইতে পারে, এমন আর কিছুতেই হয় না।

ক্ষুধা তৃষ্ণার মত এগুলিকে শিশুর সহ-জাত সংস্কার (Instinct) বলা যায় না; কারণ তাহা হইলে, এবিষয়ে তারতম্য বা ইতরবিশেষ লক্ষিত হইত না। যাহা সহজ সংস্কার,তাহা প্রত্যেক প্রাণীতে সমভাবে থাকে। কিন্তু আমরা সকল শিশুর একই প্রকার কম্প হইতে দেখি না। কেহ বা দোলাইলে কাঁপে; কেহ বা লুফিলে কাঁপে। এ ভেদের নিয়ামক কে? আবাব যাহা সহজ সংস্কার, তাহা পরিণত বয়সেও উপলব্ধি হইবে। কিন্তু পরিণত বয়সে অননুভূত বিষয়ে ভীতের সংস্কার ত' দেখা যায় না। ইংরাজী মনোবিজ্ঞানে অবশ্য এ গুলিকে Instinct নামে গ্রহণ করা হইয়াছ। কিন্তু জন্মান্তরবাদ স্বীকার করিলে যদি এগুলির হেতু নির্দ্দেশ সম্ভবপর হয়, তবে এক জন্মান্তরবাদের পরিবর্ত্তে এতগুলি নির্হেতুক Instinct স্বীকার করিয়া কল্পনা গৌরব করিতে যাই কেন? পিতৃপুরুষ হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে এ গুলি প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিলে, প্রকৃত হেতুব নির্দ্দেশ হয় না। কেবল প্রশ্নটিকে একটু পিছাই দেওয়া হয় মাত্র। কারণ তখনও জিজ্ঞাস্য থাকে যে, এ সংস্কার পিতৃপুরুষেই বা কেমন করিয়া সঞ্চারিত হইয়াছিল? এই সকল কারণে ভারতবর্ষীয় আর্য্য দার্শনিকগণ স্থির করিয়াছিলেন, যে মৃত্যুর পরও কর্ম্ম ফল প্রদান করিতে পারে, এবং করে। কর্ম্মের শক্তি অনুসারে কেহ বা সদ্য, কেহ বা ৮'দশ মাস পরে ফল প্রদান করে। কোন কর্ম্মের ইহজন্মেই ফল ভোগ হয়, কাহারও বা জন্মান্তরে হয়। এইরূপে সৃষ্টিক্রম রক্ষিত হইতেছে।

ইহাতে একটি আপত্তি আছে, যে পূর্ব্বজন্মের কোন্ পাপের ফল ইহ-জন্মে ভোগ করিতেছি, তাহা না জানিলে সে ফলভোগে চরিত্র ত' সংশোধিত হইতে পারে না; সুতরাং সে ফলভোগ ব্যর্থ হইয়া যায়। এতদুত্তরে বলা যাইতে

পারে, কর্ম্মের স্বভাব ফলে পরিণত হওয়া ; তাহাতে কাহারও চরিত্র সংশোধনের চেষ্টাই নাই। সামাজিক দণ্ডে সংশোধনের চেষ্টা থাকে; কর্ম্মের ফলভোগ সামাজিক দণ্ডের সহিত তুলনীয় নহে; কারণ কর্ম্মভোগের হাত হইতে এড়াইবার 'যো' নাই। ফলে পরিণত হইয়াই ইহার সার্থকতা—চরিত্র সংশোধন করিয়া নহে। আর যদি চরিত্র সংশোধন না হইলে ইহার দ্বারা নৈতিক উন্নতির সম্ভাবনা নাই, এমত মনে করেন, তাহা হইলে ইহার দ্বারা চরিত্র সংশোধিত হইতে পারে তাহাও বলা যায়। কারণ স্বকীয় জ্ঞানে না জানিলেই যে কোন্ কর্ম্মের ফলভোগ করিতেছি তাহা জানা যায় না, এমত নহে। ব্যাধির সময়ে চিকিৎসক আসিয়া যখন বলেন, যে"অমুক দিন তুমি গুরুভোজন করিয়াছিলে বা অমুক দিন ঠাণ্ডা লাগাইয়াছিলে তাই পীড়িত হইয়াছ" তখন আমরা আমাদিগের ব্যাধির কারণ নির্ণয় করিয়া চিকিৎসক সম্মত প্রতীকারে যত্নপর হই। তেমনি তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ কর্ম্মফল সকল নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহাদিগের প্রণীত গ্রন্থাদি হইতে কোন্ কর্ম্মের কি ফল তাহা জানিতে পারি, এবং সাধ্য হইলে তৎপ্রদর্শিত উপদেশ অনুসারে প্রতীকারে যত্নবান্ হই। অধিকন্তু ভারতের আর্য্য ঋষিগণ বিশ্বাস করেন, যে পাপের ফলে এরূপ দেহ পরিগ্রহ হয়, সেই দেহে তদ্রূপ পাপ কবিবার শক্তিটুকুও বিলুপ্ত হয়। জীব যে শক্তিতে পাপার্জ্জন করে, সেই শক্তিতে পুণ্যও অর্জ্জন করিতে পারিত ; কিন্তু শক্তির অভাবেসে পুণ্যার্জ্জন করিতে পারে না; সুতরাং দুঃখ পায়। ইহাই ভোগ ;—পাপ কর্ম্ম করিতে না পাইলে, পাপের সংস্কারটুকু মরিয়া যায়, তখন জীব আবার নূতন করিয়া, ইংরাজীতে যাহাকে বলে with a clean slate জীবনারম্ভ করে। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, জন্মান্তরবাদ স্বীকারে নৈতিক উন্নতির যে কেবল ক্ষতি হয় না তাহা নহে ববং "সামাজিক দণ্ড এড়াইলেও পাপীর নিস্তার নাই"। "পুণ্যের পুরস্কার অনিবার্য্য" ইত্যাদি বিশ্বাসের ভিত্তি স্বরূপ হইয়া, উহা নৈতিক জীবনের উৎকর্ষ সাধনে প্রভূত পরিমাণে সহায়তা করে।

বামদেব প্রভৃতি জাতিস্মরের প্রসঙ্গ এ বিংশ শতাব্দীর স্বাধীন চিন্তার দিনে আপনাদিগের সম্মুখে উত্থাপিত করিতে বস্তুতঃই বড় সঙ্কুচিত হইতেছি। বিশেষতঃ ডুগ্যাল্ড ষ্টুয়ার্ট যখন "সংস্কৃত ভাষাটাই নিষ্কর্ম্মা ব্রাহ্মণদিগের কারচুপি, গ্রীক, লাটিন হইতে জাল করিয়া প্রস্তুত করা" এরূপ কথাও

দম্ভের সহিত প্রচার করিতে পারিয়াছেন, তখন এই জাতিস্মরের কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে ইংরাজ-শিষ্যদিগের কুণ্ঠা হইতেই ত' পারে। যখন বুদ্ধদেব বা বামদেবের জন্মান্তর স্মরণের কথা অযৌক্তিক নহে, তাহা হইলে আপনাদিগকে নিতান্ত credulous বা অবোধ বিশ্বাসী মনে করিবার কোন কারণ নাই। উপসংহারে বক্তব্য যে কোন দর্শন বা স্মৃতি শাস্ত্র বিশেষের মতালোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। ভারতীয় শাস্ত্রকারগণের মধ্যে সকলেই কেন জন্মান্তরে বিশ্বাসশীল, তাহাই যথাসম্ভব সাধারণ ভাবে এই প্রবন্ধে আলোচনা করা গিয়াছে। যাহাতে প্রবন্ধটী ভারতীয় সকল দার্শনিক মতেরই পরিপোষক হয়, সেইদিকে দৃষ্টি রাখিতে গিয়া, কোন কোন স্থলে হয়ত যুক্তির কিছু খর্ব্বতা করিতে হইয়াছে; সুধীগণ এ ত্রুটী অবশ্য মার্জ্জনা করিবেন।

শ্রীনলিনীমোহন মুখোপাধ্যায়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

তৃতীয় অধ্যায়—কর্ম্মযোগ।

অর্জ্জুন কহিলেন,—

কর্ম্ম হ'তে শ্রেয়ঃ বুদ্ধি যদি কৃষ্ণ! * মত তব,
তবে কেন ঘোর কর্ম্মে প্রেরিছ মোরে, কেশব? ১
বিমিশ্র বচনে মম করিছ বুদ্ধি মোহিত?
তাই বল এক, যাহে লভিব শ্রেয়ঃ নিশ্চিত॥ ২

শ্রীভগবান্ কহিলেন—

কহেছি, অনঘ! অগ্রে, দুই নিষ্ঠা ইহলোকে,
জ্ঞানযোগে সাংখ্যদের, যোগীদের কর্ম্মযোগে॥ ৩
কর্ম্মারম্ভ ত্যাগে মাত্র নিষ্কর্ম্ম জীব না লভে।
শুধু সন্ন্যাসেতে কিম্বা সিদ্ধিলাভ নাহি হবে॥ ৪

---

* মূলে 'কৃষ্ণ' স্থলে সম্বোধন পদে আছে, 'জনার্দ্দন'।

বিনা কর্ম্ম, কেহ কভু নহে ক্ষণকাল তরে।
প্রকৃতিজ গুণে বাধ্য হয়ে, সবে কর্ম্ম করে ॥ ৫
কর্ম্মেন্দ্রিয় রোধ করি' বিষয় চিন্তিতে রহে—
মনে যেবা বিমূঢ়াত্মা, তা'রে মিথ্যাচারী কহে ॥ ৬
বিশেষ সেত' অর্জ্জুন,—মনে নিয়মী' ইন্দ্রিয়ে,
অনাসক্ত যেবা সাধে কর্ম্মযোগ কর্ম্মেন্দ্রিয়ে ॥ ৭
নিয়ত করহ কর্ম্ম তুমি, অকর্ম্মত্ব হতে।
শ্রেয়ঃ কর্ম্ম ;—দেহ যাত্রা হয় না বিনা কর্ম্মেতে ॥ ৮
যজ্ঞ-অর্থ-বিনা কর্ম্মে লোকে কর্ম্মবন্ধ আনে।
তদ্ভাবে কৌন্তেয় কর্ম্ম কর অনলস (প্রাণে) ॥ ৯
যজ্ঞসহ প্রজা সৃজি' ক'ন অগ্রে প্রজাপতি ;—
"ইষ্টপ্রদ ইথে হোক্ তোমাদের বহুন্নতি ॥" ১০
"ইহাতে তোমরা কর দেবের বর্দ্ধন,
দেবগণ তোমাদের করুন বর্দ্ধন ,—
"এইরূপে পরস্পর করিয়া বর্দ্ধন,
পরম মঙ্গল উভে করিবে অর্জ্জন ॥" ১১
"যজ্ঞেতে বর্দ্ধিত হ'য়ে সেই দেবগণ,
ইষ্টভোগ তোমাদের করিবে অর্পণ,"
"তাঁ'দিগে তাঁদের প্রাপ্য না করি' অর্পণ,
করয়ে ভক্ষণ যেবা, চোর সেই জন ॥" ১২
যজ্ঞ-শেষ ভোজী সাধু মোচয়ে সকল পাপে।
পাপিষ্ঠ, যে নিজ তরে রাঁধে, খায় সেই পাপে ॥ ১৩
জীবের সম্ভব অন্নে, অন্ন জন্মে বৃষ্টি হ'তে ;
বৃষ্টি হয় যজ্ঞ হ'তে, উদ্ভবে যজ্ঞ কর্ম্মেতে ॥ ১৪
কর্ম্ম জন্মে ব্রহ্মে, জেনো অক্ষরে ব্রহ্ম উত্থিত,
তাই সর্ব্বগত ব্রহ্ম, নিত্য যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত ॥ ১৫
হেন প্রবর্ত্তিত চক্র, ইহে যে না অনুসরে,
বৃথা-জীবী ইন্দ্রিয়সুখী, সে বৃথা প্রাণ ধরে ॥ ১৬

(কিন্তু) যা'র আত্মাতে রতি, আত্মা-তৃপ্তি, যে জনার
সন্তুষ্ট আত্মাতে যেবা, রহেনা কর্ত্তব্য তা'র ॥ ১৭
কৃতকর্ম্মে নাহি অর্থ, অকরণে কিম্বা তা'র ;
সর্ব্বভূতে নাহি কিছু অর্থ বা আশ্রয় তা'র ॥ ১৮
তাই অনাসক্ত সদা কর কর্ত্তব্য করম।
অনাসক্ত কৈলে কর্ম্ম পুরুষ লভে পরম ॥ ১৯
লভিলা সংসিদ্ধি কর্ম্মে, জনকাদি (মহীভৃৎ)।
তাকায়ে লোক সংগ্রহে, তোমার কর্ম্ম উচিত ॥ ২০
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা করে, ইতরে তা'র অনুসরে।
লোক তাহা অনুবর্ত্তে সেই যা প্রমাণ করে ॥ ২১
নাহি মোর, হে পার্থ ! কর্ত্তব্য ত্রিলোকে কিঞ্চিৎ।
অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্য নাই, তবু আমি কর্ম্মকৃৎ ॥ ২২
অনালস্যে নাহি যদি থাকি কর্ম্মে সদা আমি।
সর্ব্বরূপে লোক, পার্থ ! হবে মোর অনুগামী ॥ ২৩
কর্ম্ম না করিলে আমি, হবে লোক উচ্ছেদিত।
শঙ্কর কারক হ'য়ে কৈব প্রজা কলুষিত ॥ ২৪
ফলার্থী অজ্ঞানী যথা করে কর্ম্ম, হে ভারত !
অনাসক্ত জ্ঞানী তথা, লোক সংগ্রহে তেমত ॥ ২৫
কর্ম্মসঙ্গী অজ্ঞের না বুদ্ধিভেদ উপজিবে,
জ্ঞানী যুক্ত হ'য়ে সর্ব্ব কর্ম্মে তারে নিয়োজিবে ॥ ২৬
সর্ব্বথা সাধিত কর্ম্ম, হয় প্রকৃতির গুণে !
অহঙ্কারে মুগ্ধচিত্ত "কর্ত্তা আমি" ভাবে মনে ॥ ২৭
মহাবাহো ! গুণ-কর্ম্ম-ভেদ বুঝি তত্ত্বজ্ঞানী।
হয় না আসক্ত তাহে "গুণে গুণ বর্ত্তে'—জানি" ॥ ২৮
প্রকৃতির গুণে মূঢ় হয় গুণ-কর্ম্মান্বিত !
মূর্খ সে অল্পজ্ঞে সর্ব্বজ্ঞ না করে বিচলিত ॥ ২৯
'সর্ব্ব'কর্ম্ম ন্যসি' আত্মা' তুমি আত্মগত মনে,
নিষ্কাম নির্ম্মম হ'য়ে যুঝ সন্তাপ বিহনে ॥ ৩০

যে মানব মত মম নিত্য করে অনুষ্ঠান ।
শ্রদ্ধাযুত, অনসূয় ; পায় তা'রা কর্ম্মে ত্রাণ ॥ ৩১
অসূয়াতে মোর মত না করে পালন যারা,
'সর্ব্ব'জ্ঞানমূঢ়, নষ্ট, অবিবেকী বুঝ তা'রা ॥ ৩২
জ্ঞানীও আচরে নিজ প্রকৃতি সদৃশ যেবা ।
প্রাণীরা প্রকৃতিগামী ; নিগ্রহ করিবে কিবা ? ৩৩
বিষয়েতে ইন্দ্রিয়ের রাগ কিম্বা হয় দ্বেষ ।
তা' বশে না যাও ; দুই,—পথের বিঘ্ন বিশেষ ॥ ৩৪
স্বধর্ম্ম বিগুণ হলে, তবু তা'রে শ্রেষ্ঠ বলে
সুসম্পন্ন পর ধর্ম্ম হ'তে ।
স্বধর্ম্মে নিধন যদি তবু শ্রেয়ঃ (নিরবধি)
মহাভয় পর-ধর্ম্ম পথে ॥ ৩৫

অর্জ্জুন কহিলেন,—

পুরুষ আচরে পাপ, হ'য়ে প্রবর্ত্তিত কা'য়,
অনিচ্ছাতে, হে বৃষ্ণেয় ! বলে নিয়োজিত প্রায় ? ৩৬

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—

ইহা কাম, ইহা ক্রোধ, রাজোগুণে উপজায় ।
দুষ্পুর, অত্যুগ্র,—তা'রে ইহে জেনো শত্রুপ্রায় ॥ ৩৭
বহ্নিরে আবরে ধূম, দর্শনেরে মলা যথা,
গর্ভকে জরায়ু ; জ্ঞান ইহাতে আবৃত তথা ॥ ৩৮
আবৃত জ্ঞানীর জ্ঞান, এই চিরশত্রু প্রায়,
হে কৌন্তেয় ! কামরূপ দুষ্পুর অনলাভায় ॥ ৩৯
বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়েতে সদা কাম-অধিষ্ঠান !
বিমোহিত করে দেহী ইহাতে আবরি' জ্ঞান ॥ ৪০
ভরতর্ষভ হে ! তাই ইন্দ্রিয়ে করি' শাসন ।
পরিহর এই পাপে জ্ঞান-বিজ্ঞান-নাশন ॥ ৪১

ইন্দ্রিয় কথিত পর ; তা'র চেয়ে পর* মন ;
মন হ'তে বুদ্ধি পর ; বুদ্ধিরো পর সে জন ॥ ৪২
বুদ্ধ্যাতিগ বুঝি তাঁহে, আত্মা করি' স্থির আত্মায়,
দুরাসদ অরি কামে, মহাবাহো ! কর জয় ॥ ৪৩

(ক্রমশঃ)　　শ্রীভবেন্দ্র নাথ দে বি, এ।

মর্ম্ম কথা।

কে তুমি আজ—
খুলেছ মোর দ্বার ?
আল্‌গা হাওয়ার ঝাপটা লেগে,
ঘুম্‌টী আমার গেছে ভেঙ্গে
প্রাণটীও মোর যাচ্ছে বেগে
চায়না আমার ধার।
অসময়ে কে তুমি আজ
খুলেছ মোর দ্বার ?
আমি আমার ঘরটী বেড়ে
ছিলাম বসি একা,
জাল্‌না দুয়ার বন্ধ ছিল
যায়নি কারো দেখা।
কে তুমি আজ আপন মনে,
কোন্ সুদূরের গন্ধ এনে,
ত্বরিত এসে ঘুম্‌টী আমার
করিয়ে দিলে ফাঁকা
সাধের আমার ঘরটী মাঝে,
ছিলাম আমি একা ॥
এ ঘরের এ জাল্‌না দুয়ার
কোথায় সকল গেল ?
এ দেখি এক ঘন আলোক
পরাণ বেড়ি এল।
এক যে পরাণ নীরবতায়,
এক যে অসীম গভীরতায়,
প্রেমের নিবিড় বন্যা আনায় ;
বিশ্ব কোথায় গেল ?
আমার ক্ষুদ্র খেলার ঘরে
কোন দেশ এ-এল ?

শ্রীনরেশভূষণ দত্ত।

---

* 'পর' শব্দে শ্রেষ্ঠ নহে, (Transcendent) অতিগ, যাহা যাহা হইতে 'উছলিয়া' উঠে।

অতীতের একটী স্বপ্ন।

ক্রুদ্ধ দুর্ব্বাসা যখন শকুন্তলাকে অভিশাপ দিয়া আশ্রম ত্যাগ করিয়া যাইতে-ছিলেন, তখন বাণবিদ্ধা কুরঙ্গীর মত অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা স্খলিত চরণে জ্বলন্ত অগ্নিসম দুর্ব্বাসার সমীপে উপস্থিত হইল। সখী দুইজনা ছিন্নপক্ষ পক্ষিনীর ন্যায় সেই ক্রোধারুণ নেত্র ঋষিবরের চরণে লুটাইয়া পড়িল। জ্বলন্ত বহ্নি মধ্যে মনোজ্ঞদর্শনা দুইটী লতা ঝাঁপাইয়া পড়িল। তাহারা ঋষিবরের চরণ দুইখানি নয়নাশ্রুতে প্লাবিত করিয়া নিবেদন করিল, "প্রভু! শকুন্তলা জ্ঞানহীনা অবলা। দুষ্মন্তরাজ আশ্রম হইতে কয়েকদিন মাত্র রাজধানীতে গিয়াছেন। এই নব প্রিয় বিরহে শকুন্তলা বড়ই দুঃখিতা; পতি চিন্তায় তাহার সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র নয়নে কাটিয়া যায়; অশন, ভ্রমণ, কথাবার্ত্তা, আমাদের সহিত পরিহাস করা, সমস্তই এক প্রকার ত্যাগ করিয়াছে। প্রভু! শকুন্তলা ইচ্ছা করিয়া আপনার অবমাননা করে নাই বা কোন নিন্দিত কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়া আপনার প্রতি কর্ত্তব্য ভুলে নাই। পতিব চিন্তা করা ত' নারীর ধর্ম্ম; বিরহে পতির মূর্ত্তি কল্পনার চোখের কাছে রাখিয়া, তাহার সহিত তন্ময় হইয়া মিশিয়া যাওয়া ত' সতীর লক্ষণ। অন্তঃকরণে পতির মূর্ত্তি গড়িয়া তাঁহাকে ভক্তিচন্দন-চর্চ্চিত ভাবকুসুমে পূজা করা ত' আদর্শ-নারীর ধর্ম্ম। আপনি ধর্ম্মবিদ্, সবই ত' জানেন প্রভু! তবে শকুন্তলা কি দোষে আপনার নিকট অপরাধিনী স্থির হইল? কি পাপে তাহাকে আপনি অভিশম্পাত করিলেন? আপনারা ত' মিথ্যা রাগের বশে কাহাকেও শাপ দেন না। আপনারা জিতেন্দ্রিয়; তুচ্ছ কারণে ত' আপনাদের রাগ হয় না। আপনি ক্রোধী ঋষি তাহাও নহেন। লোকে আপনার ভিতরকার উদ্দেশ্য না বুঝিয়া আপনাকে অন্যরূপে রঞ্জিত করে।" দুর্ব্বাসা তখন বলিতে আরম্ভ করিলেন;—"বালিকে! আমি ক্রোধী ঋষি বটে এবং অপরাধীকে দয়া বা ক্ষমা করা আমার স্বভাব নহে। আমি ক্রুদ্ধ হইয়াই শাপ দিয়াছি। শকুন্তলা যে আশ্রম-পালিতা বনমৃগীর মত স্বভাবসরলা,: তাহাও না জানি, এমনঃ নহে। দুষ্মন্ত-প্রণয়-পরবশা শকুন্তলা, দুষ্মন্ত চলিয়া যাওয়ায় বিশেষ কাতরা এবং সে বাহ্য জ্ঞান ভুলিয়া পতি-চিন্তায় নিমগ্না; আমার কথা শুনিতে পায় নাই ইহা সত্য।

দেখ, এই আমার "অয়মহং ভোঃ" শব্দ সমস্ত প্রকৃতির ছিদ্রগুলি প্রপূরিত করিয়া, তপোবনের যাবতীয় জীবগণকে ভয়-চকিত করিয়া উত্থিত হইয়াছিল। আর এই গম্ভীর শব্দ সমস্ত বিশ্বকে জয় করিত, কিন্তু তাহা এই বালিকা

শকুন্তলার অন্তরুত্থিত প্রেম-সঙ্গীতের নিকট কত সামান্য! সেই শব্দ জগতের সমস্ত কোলাহল ডুবাইয়া দিল। ঐ দেখ হরিণেরা এখনও অর্দ্ধ-ভক্ষিত কবল মুখের ভিতর রাখিয়া গিলিতে পারিতেছে না ; ঐ দেখ পক্ষিনীদের বুকের স্পন্দন এখনও থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে ; তরুর নবদলগুলির কম্পন এখনও একেবারে থামে নাই। ঐ দেখ আশ্রম যেন বিভীষিকাময় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এখনও দেখ শকুন্তলার সেই একই ভাব। বাহ্য জগতের অস্তিত্ব আর তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতেছে না—তাহা কি আমি জানি না ?"

"তবে প্রভু! কারণ কি, শুনিলে অপরাধের গুরুত্ব কত বুঝিতে পারিব।"

দুর্ব্বাসা। শোন, প্রেম হৃদয়ের উৎকৃষ্ট বৃত্তি। কারণ এই প্রেম মানুষের কামনা কলুষিত মনকে অনেকটা বিশুদ্ধ করে, জগতে অনেকটা আত্মবিসর্জ্জন শিক্ষা দেয় ; আপনার সুখ অপেক্ষা প্রণয়াস্পদের সুখই অধিক স্পৃহনীয় বোধ করায় ; তাহার ফলে নিজের আকাঙ্ক্ষা, নিজের স্বার্থপর হৃদয়ের অতৃপ্ত পিপাসার লাঘব হয়। আর এই প্রেম অনুশীলনের ফল এত বিস্তৃত — ইহার সৌরভ এত দিগন্তগামী হইয়া পড়ে, যে তাহার দ্বারা মানুষ প্রকৃত মানব-পদবীতে আরোহণ করিতে পারে। এই প্রেমই শেষে ভগবৎ প্রেমে পর্য্যবসিত হইতে পারে। প্রেম যতই কেন বিশুদ্ধ হউক না, মানুষের নিকট তাহা একেবারে কামনাবিহীন, ও লালসা শূন্য হইতে পারে না।

'এই চিন্তা শকুন্তলার প্রেমের পরিচায়ক রহিয়াছে। কিন্তু শকুন্তলার এই স্বভাবোচিত রন্ধ্রটী ক্রমেই বৃহদায়তন হইয়া আসিতেছিল। এই সময়ে শকুন্তলা যদি কিছু দিন আশা ভরসাশূন্য হইয়া কালযাপন করিতে পারে, যদি বহুদিন স্বামী দর্শন না ঘটে—দুষ্মন্তের ব্যবহারে যদি কৃত্রিমতা, কপটতা এবং কর্কশতা বুঝিতে পারে, তবে এই রন্ধ্রটী' ক্রমেই পূর্ণ হইতে থাকিবে। অভীষ্ট প্রাপ্তি বিষয়ে যদি রূপযৌবনের ও ভালবাসার অস্ফুট দাবী থাকে, তবে সে অভীষ্ট-প্রাপ্তি স্থায়ী হয় না ; বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত তাহা বদ্ধমূল রহিবে না। ইহ-পরকালের মধ্যে যে বিশুদ্ধ সম্বন্ধ জন্ম-জন্মান্তরে অটুট থাকে, সেটী ছিন্ন হইয়া যাইবে। এইটী প্রার্থনীয় না যাহাতে প্রেম বদ্ধমূল হয় তাহাই ? রূপ, যৌবন আর তজ্জাত ভালবাসা যে সৌধের বলিয়াছ, তাহা কি স্থায়ী হয় ? এই রন্ধ্রটুকু যদি না থাকিত, তাহা হইলে শকুন্তলার প্রেমে মুহূর্ত্তে দুষ্মন্তকে হস্তিনাপুরী হইতে টানিয়া আনিত ; ঈদৃশ রন্ধ্রশূন্য চিন্তাই

ভগবৎ প্রাপ্তির উপায়। ধ্রুবেরও রন্ধ্র ছিল, তাই তাহার ভাগ্যে ধ্রুবলোক; তাই সে প্রহ্লাদের মত হইতে পারে নাই।

"শকুন্তলা কৈ আর সংসার-স্মৃতি একেবারে ভুলিল, কৈ তাকে সমস্ত কর্ত্তব্য হইতে বিমুক্ত করিল, কর্ম্মের বন্ধন কৈ একেবারে ছিন্ন করিয়া ফেলিতে পারিল? কণ্ব মহামুনি, তিনি দীন প্রতিপালক। এই আশ্রমও অতিথি নিবাস বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। কণ্ব সেই আশ্রমের গুরুভার শকুন্তলাকে দিয়া গেলেন। শকুন্তলা বালিকা—সরলা, কিছুই জানে না ও বুঝে না, তাই কণ্বের মত ঋষি এই গুরুভার বালিকার উপর চাপাইলেন। কণ্ব বালক নহে, বুদ্ধিহীন নহে, তবে কণ্বের এই ধারণা মিথ্যাও নহে। গৌতমীর মত বৃদ্ধা অপেক্ষা শকুন্তলার উপর কণ্বের অধিক নির্ভরতা ছিল। এই নির্ভরতা ছিল, তাই ঋষি আশ্রম ত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন। কণ্বের সে ধারণার কি ফল ফলিল, সে নির্ভরতার কি পরিণাম ঘটিল? আপনার সুখের জন্য—পতি-চিন্তার তন্ময়তাজনিত, অতুল তৃপ্তিলাভের জন্যই ত শকুন্তলা আশ্রম ধর্ম্ম পালন করিল না। কর্ত্তব্য-বিঘ্নকারী চিন্তা ধর্ম্ম নহে; কর্ত্তব্যনাশী প্রেমের মূল্য অল্প।

"স্বামীর ইচ্ছাসত্ত্বে শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা শেষ না করিয়া, স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর চিন্তায় ডুবিয়া যাওয়া ধর্ম্ম নহে। এত টুকুও কি মনকে দমন করিবেনা, বিশেষ কর্ত্তব্য সময়ে সংযম শিক্ষা পাইবে না; পতিচিন্তার সময় আছে। যদি সন্তান না খাইয়া মরে, আর জননী সে সময়ে আপনার পতির চিন্তা করেন, তাহা কি কর্ত্তব্য বলিতে হইবে? ইহা দুর্ব্বলতা, প্রণয়ের প্রথমাবস্থায় এই দুর্ব্বলতা যুবক যুবতীর ঘটে। উহা অসংযত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস।

"তাই শকুন্তলার অদৃষ্টে শাপ ছিল। আমি না আসিলে, আমি শাপ না দিলেও, এই ফলের তারতম্য হইত না। আর এখন যদি এই শাপ প্রত্যাহার করি, তাহা হইলে শত্রুতার কার্য্য করা হইবে। সংসারে সাধারণ অজ্ঞ মানব যাহা ভাবে, লালসামুগ্ধ তরলমতি সুখ-প্রয়াসী যুবক যুবতীরা যাহা অভীষ্ট মনে করে, তাহার পরিণাম সকল সময়ে হিতকর হয় না। এই জন্যই যুবক যুবতীর স্বপ্রণোদিত গান্ধর্ব্ব বিবাহ সৎকর্ম্ম নহে। আর এই দুষ্মন্ত শকুন্তলার গান্ধর্ব্ব বিবাহে যে যুবক যুবতীর উদ্দাম হৃদয়তা ছিল না, তাহা নহে; রিপুর প্রাবল্য, কামের কারচুপী ছিল না তাহাও নহে। তবে এই বিবাহ ধর্ম্মের পক্ষে নিন্দনীয় না হউক, সমাজের চক্ষে পবিত্র নহে,

উপদেশের হিসাবে তত মূল্যবান্ নহে, শিক্ষা হিসাবেও, বরং কুফলপ্রদ। ইহার ফল যদি বর্ত্তমানেও ভাল দেখান যায়, তবে জগতের শিক্ষা ও সমাজের মঙ্গল সাধন করা হইবে না। পরে যখন এই ভালবাসা নিষ্কাম ভাবে, কল্যাণে চরিতার্থ, পুণ্যে সার্থক হইয়া উঠিবে, তপস্যার সহিত মিলিবে—তখনই ঠিক হিতকর মিলন।

"তাই এই শাপ। শকুন্তলার চরিত্র জগতের আদর্শ স্থানীয় হওয়াই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে চিনিতে পারিবেনা, তবে কোন অভিজ্ঞান (অঙ্গুরীয়) দেখিলেই চিনিবে। আমি শকুন্তলার প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী, সাধারণ লোকের ন্যায় হিতাকাঙ্ক্ষী নহি। আমি নিষ্ফল আশীর্ব্বাদ করি না। যে রাখিতে পারিবেনা তাহাকে ধনী করিয়া দেওয়ায় দান হয় না। যাহার মন শুদ্ধ নহে, তাহাকে ব্রহ্ম জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ায় কোন প্রশংসা নাই।" "আমি চলিলাম। ঋষিবর অন্তর্ধান হইলেন।—

আমার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। কোথায় শকুন্তলা, আর কোথায় দুর্ব্বাসা! দেখিলাম আমার হস্তে শকুন্তলা পুস্তক, আমার সম্মুখে দেওয়ালে শকুন্তলার ছবি। শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ।

জহ্নুগিরি

(জঙ্গীরা পর্ব্বতে গৈবীনাথ-মন্দির।)

"পন্থার" ফাল্গুন সংখ্যায় এই পবিত্র মন্দিরের চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ভাগলপুর জেলার সুলতানগঞ্জ ষ্টেসন হইতে প্রায় এক মাইল দূরে, ভাগীরথীর গর্ভে ৭০।৮০ ফিট্ উচ্চ একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতের শীর্ষ দেশে গৈবীনাথের পবিত্র মন্দির বিরাজিত। পর্ব্বতের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া মাতা জাহ্নবী কুলু কুলু স্বরে মহেশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রবাহিতা হইতেছেন। "পর্ব্বতের কটিতটস্থিত শ্যামল পাদপে "তুলিছে বিহগ মধুর তান"। ভাগীরথী-বক্ষে নীরব নির্জ্জন এই গিরিশৃঙ্গ সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব নিদর্শন। চূড়ায় তুষার শুভ্র মহাদেবের মন্দির। ইহার প্রকৃত নাম জহ্নুগিরি। এই নির্জ্জন পর্ব্বত শিখরে মহাতপা জহ্নু মুনির আশ্রম ছিল। সোপান পার্শ্ববর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে শৈলগাত্রে খোদিত গঙ্গাদেবী ও জহ্নু মুনির মূর্ত্তি পাওয়া দেখাইয়া থাকেন। গঙ্গাদেবীর দুই হস্তে দুইটী পদ্ম কোরক, কর্ণে কুণ্ডল; জহ্নু মুনির

হস্তে ত্রিশূল শোভিত। মহাতপা জহ্নু ঋষি এই নির্জ্জন গিরিশিখরে একাকী দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনায় নিরত থাকিতেন বলিয়া ইহার নাম জহ্নু গিরি বা জহ্নু গৃহ। যেমন রাজগৃহের অপভ্রংশ রাজগিরি, সেইরূপ জহ্নু গৃহ এক্ষণে জঙ্গীরা নামে পরিচিত। প্রাচীন সন্ন্যাসিগণের নিকট শুনা যায়, যে জহ্নু গিরি সাধন ভজনের অনুকূল স্থান। এখানে জহ্নু ঋষির সময় হইতেই বহু তাপস তপস্যা করিয়া আসিতেছেন, এখনও ইহার গাত্রে গুহার ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এই পবিত্র আশ্রমে এখনও এরূপ আধ্যাত্মিক শক্তি (magnetism) আছে, যে যাঁহারা সাধনা করেন তাঁহারা এখানে আসিয়া ধ্যান ধারণায় মনোযোগ করিলেই এই স্থানের অপূর্ব শক্তি আজিও অনুভব করিতে পারিবেন। জনপ্রবাদ, যে হরিনাথ ভারতী নামক জনৈক যোগী এই পর্ব্বতে তপস্যা করিতেন। তিনি এক সময়ে জ্যোতির্লিঙ্গ দেবাদিদেব বৈদ্যনাথ দেবকে দর্শন করিবার উদ্দেশে বৈদ্যনাথাভিমুখে রওয়ানা হইলে, পথিমধ্যে স্বপ্নে আদেশ হইল, "বৎস, ভেদ-দৃষ্টি পরিহার কর ; আমি সর্ব্বভূতাত্মক, সর্ব্বস্থানেই বিরাজমান ; আমার স্থূল লিঙ্গরূপ দেখিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়াছ, তোমার ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়াছি। কষ্ট করিয়া দেবগৃহ যাইবার আবশ্যক নাই, এই পর্ব্বত শিখরেই আমার লিঙ্গ মূর্ত্তির দর্শন পাইবে।" সন্ন্যাসী স্বকীয় আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া স্বপ্নাদেশ মত অভীষ্টদেবের লিঙ্গ মূর্ত্তি দর্শন লাভ করিয়া জীবন সার্থক করিলেন। গৈবী অর্থে গুপ্ত। যে নাথ বা দেবতা গুপ্ত ছিলেন,ভক্তানুগ্রহ নিমিত্ত প্রকট হইলেন, তাঁহার নাম গৈবীনাথ। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন :—

গবাং সর্পিঃ শরীরস্থং ন করোত্যঙ্গ পোষণম্।
নিঃসৃতং কর্ম্ম সংযুক্তং পুনস্তাসাং তদৌষধম্॥
এবং সহি শরীরস্থঃ সর্পিবৎ পরমেশ্বরঃ।
বিনা উপাসনা দেব ন করোতি হিতং নৃষু॥

দুগ্ধান্তর্গত ঘৃত গাভীর শরীরে বিদ্যমান থাকিলেও তাহাতে তাহাদের অঙ্গ পুষ্টি হয় না। ঐ দুগ্ধ গাভীর শরীর হইতে নিঃসৃত হইয়া মন্থনাদি কার্য্য দ্বারা ঘৃতরূপে পরিণত হইলে, তাহাদের ক্ষতাদির শান্তির নিমিত্ত ঔষধরূপে উপকার করিয়া থাকে। সেইরূপ পরমেশ্বর ঘৃতবৎ সকলের শরীরে অবস্থিত থাকিলেও উপাসনা ব্যতিরেকে মনুষ্যগণের শ্রেয়ঃ সাধন করেন না।

স্থানীয় জনপ্রবাদ, এই হরিনাথ ভারতী মহাশয় মুসলমান শাসন কালে

বর্ত্তমান ছিলেন, কালাপাহাড় এই শৈলের সম্মুখস্থ গঙ্গাতটস্থ অপর শৈলের* যাবতীয় মন্দির ও দেবমূর্ত্তি ভগ্ন ও বিধ্বস্ত করিয়া, গৈবীনাথের মন্দির ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়া শৈলপাদদেশস্থ কয়েকটী মূর্ত্তি ভগ্ন করেন, এমন সময়ে এই শৈলবাসী এক যোগী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন "কাহার আজ্ঞায় তুমি মন্দিরাদি ধ্বংস করিতেছ? কালাপাহাড় বলিলেন, "দিল্লীর বাদসাহের আজ্ঞায়" যোগীবর কহিলেন, "তুমি একদিনের জন্য এই কার্য্য হইতে বিরত থাক আমি ২।৩ ঘণ্টা মধ্যেই বাদসাহের অনুমতি আনাইয়া দিতেছি।" কয়েক ঘণ্টা পরেই যোগীবর দিল্লীর বাদসাহ প্রদত্ত একটী তাম্র-লিপি দেখান; তাহাতে লিখিত আছে, "কালাপাহাড় তুমি গৈবীনাথ দেবের মন্দির নষ্ট করিও না"। এই তাম্র পত্রে লিখিত ফর্ম্মাণে গৈবীনাথ দেবের সেবার জন্য কতকগুলি ভূসম্পত্তিও প্রদত্ত হয়। ঐ ফর্ম্মাণ নাকি সেবাইতের নিকট বর্ত্তমান আছে। তবে তিনি কাহাকেও দেখাইতে চাহেন না। শৈলগাত্রের চতুর্দ্দিকেই গণেশ, হনুমান, শ্রীকৃষ্ণ, লক্ষ্মী, অনন্তদেব, নরসিংহ, বামনাদি বিষ্ণুর দশাবতার সূর্য্য প্রভৃতি মূর্ত্তি দ্রষ্টব্য। সূর্য্যের মূর্ত্তির নীচে গুপ্ত রাজাদের সময়ের অক্ষরে খোদিত একটী শিলালিপি দৃষ্টে, ক্যানিংহাম সাহেবও অনুমান করেন, এই ক্ষুদ্র পাহাড়টী বরাবরই হিন্দুর অধিকারে আছে। পর্ব্বতের পাদদেশে কতকগুলি মূর্ত্তির নাসিকা হস্ত পদাদি ভগ্ন দেখিতে পাওয়া যায়; এবং গঙ্গাতীরে অসংখ্য ভগ্ন মূর্ত্তি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়া, কালাপাহাড়ের কুকীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। জমীদারীর আয় হইতে দেবাদিদেবের সেবা, পূজার ব্যয় ও অতিথি সেবা হইয়া থাকে। সেবাইত মহান্ত ঠাকুর অতি সদাশয়, অতিথি সেবক ও ভক্ত। বৈশাখ, কার্ত্তিক, এবং মাঘী পূর্ণিমা ও শিবরাত্রির সময় এখানে চারিটী বৃহৎ মেলা হয়। মেলার সময় কোন কোন বৎসর ৪০।৫০ হাজার পর্য্যন্ত যাত্রীর সমাগম হয় তখন এই নীরব নির্জ্জন নদীর তীর, নিভৃত পথ, ঘাট ও গঙ্গা তরঙ্গ মধ্যস্থ নীরব নির্জ্জন গিরিশৃঙ্গ যাত্রীগণের কোলাহলে ও হর হর বম্ বম্ ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠে, এবং ভক্তির একটি অপূর্ব্ব ও অভিনব প্রবাহ যাত্রীগণকে অভিষিক্ত করিয়া সকলের প্রাণ ও মন ঐক্যতানে নিয়মিত করিয়া মহেশ্বরের চরণাভিমুখে ধাবিত করে।

শ্রীপান্নালাল সিংহ।

---

* এই শৈলে একটী মসজিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছে।

সমালোচনা।

১। ব্রহ্মবিদ্যা।—'বেঙ্গল থিয়সফিক্যাল সোসাইটী' হইতে প্রকাশিত মাসিক পত্র। সাম্প্রদায়িক ভাবে লিখিত পত্রিকাদিতে কখনও লোকমঙ্গল সাধিত হইতে পারে না। কিন্তু এক বৎসর ধরিয়া দেখিয়া বলিতে পারা যায়, যে ব্রহ্মবিদ্যায় সে প্রকারের সঙ্কীর্ণতা অল্পই দৃষ্ট হয়। তবে শুধু প্রসারে কিছু হয় না; অন্তর্ম্মুখীনতা ও শক্তির আবশ্যকতা আছে। শ্রদ্ধেয় পুর্ণেন্দু বাবুর প্রবন্ধের সহিত তত্ত্বাংশে সম্পূর্ণ ঐক্য না থাকিলেও, আমরা প্রাণ খুলিয়া তাঁহার মত অন্তর্ম্মুখী প্রবণতায় পরিপূর্ণ লেখকের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। অন্য প্রবন্ধগুলিতে এই প্রবণতা ও স্বাত্মানুভূতির নিদর্শন পাইলে বড় সুখী হইতাম। যেখানে পূর্ণেন্দু বাবু ও হীরেন বাবু সম্পাদকতার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, সে পত্রিকার নিকট আমাদের এ প্রত্যাশা বোধ হয় অসঙ্গত নহে। প্রাণ না ঢালিলে "বাচারম্ভনং বিকার নামধেয়ম্।" আশা করি নূতন বৎসরের পত্রিকায় এ বিষয়ের উন্নতি দেখিতে পাইব। সর্ব্ব ক্ষেত্রে আমরা 'ব্রহ্মবিদ্যার' উন্নতি কামনা করি। রাঃ

২। তপতী।—(নাট্য কাব্য), 'লীলাবসান' প্রণেতা শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম, এ, বি, এল, প্রণীত। মূল্য ১॥০ টাকা। সূর্য্য-কন্যা তপতীর কথা পুরাণবিদ্ মাত্রেই জানেন। তিনি ছায়া-উপহিত সূর্য্য-চৈতন্য। এই তপতীই পাশ্চাত্য জগতে Heat life প্রভৃতি নামে গীত হইতেছেন। লেখক কবি, কবির ভাষায় সম্বরণ ও তপতীর প্রেমগাথা গাহিতেছেন। ছন্দে স্বাভাবিক তরলতা আছে, অথচ কবিত্বের মধ্য দিয়া ধর্ম্ম-ভাবের বিকাশও যথেষ্ট আছে। এক কথায় পুস্তকখানি পাঠেয়। হৃদয়ের সরলতা, ইন্দ্রিয়ের স্তিমিত ভাব ও উর্দ্ধাভিমুখী প্রবৃত্তির বীজ জাগাইয়া তুলে। শুধু কাব্যে চিত্ত প্রসারিত ও শান্ত হয়, কিন্তু যে, কাব্যে ঈশ্বরাভিমুখী প্রবৃত্তি নাই, তাহা অনার্য্য-সেবিত মাদকতা ভিন্ন কিছুই নহে। পুস্তক পাঠে আশা করা যায়, যে পুরাণের মধ্য দিয়া প্রকটিত সার-তত্ত্বগুলি লেখকের সাহায্যে হিন্দুসমাজকে সকল বিদ্যার শেষ—শ্রীভগবানের দিকে চক্ষু ফিরাইতে শিখাইয়া দিবে। রাঃ

অদ্বৈত ব্রহ্মবাদ।

——:*:——

অধিকারি পরিচ্ছেদ।

সূচনা। আলোচ্য 'অদ্বৈতবাদ' এদেশের চিরপরিচিত অতি পুরাতন সামগ্রী, এবিষয়ে, অল্প-বিস্তর খবর রাখেন না, এরূপ লোক শিক্ষিত সমাজে অতি বিরল; সুতরাং 'অদ্বৈতবাদ' কাহাকে বলে, এ বিষয়ের অধিক চর্চ্চা অনাবশ্যক।

সাধারণতঃ বেদান্ত শাস্ত্রে 'অদ্বৈতবাদ' কথাটী যেরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এখানে সংক্ষেপে তাহারই উল্লেখ করা হইতেছে—দ্বিধা ইতং দ্বীতং, তস্য ভাবো দ্বৈতং। "দ্বিধেতং দ্বীতমিত্যাহুস্তদ্ভাবো দ্বৈতমুচ্যতে॥" (বার্ত্তিক-বচন) ন বিদ্যতে দ্বৈতং—দ্বিধাভাবো যত্র, তদদ্বৈতং॥

বঙ্গভাষায় অদ্বৈত-শব্দের অর্থ ব্যক্ত করিতে হইলে বোধ হয় এইরূপ বলিলে অসঙ্গত হইবে না যে, যাহাতে দ্বিধাভাব, অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান কোন প্রকার প্রভেদ নাই, সর্ব্বপ্রকার ভেদবর্জ্জিত সেই এক অদ্বিতীয় বস্তুই অদ্বৈত।

'বাদ' অর্থ সিদ্ধান্ত-বাক্য, সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, নাম-রূপাত্মক বিবিধ দ্বৈতভাব প্রতিষেধপূর্ব্বক এক অখণ্ড নির্ব্বিশেষ বস্তু (ব্রহ্ম) যে সিদ্ধান্তে অবধারিত হইয়াছে, তাহার নাম 'অদ্বৈত-বাদ' বা অদ্বৈত-সিদ্ধান্ত ইংরাজিতে ইহাকে "Monism" বলিলে বোধ হয় অসঙ্গত হয় না।

অদ্বৈতবাদের প্রবর্ত্তক। অনেকে মনে করেন, মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যই এদেশে সর্ব্ব প্রথম বিমল অদ্বৈতবাদের সৃষ্টি ও প্রচার করিয়া যান, তৎপূর্ব্বে ইহার কোন অস্তিত্ব বা প্রচার বিদ্যমান ছিল না, পরবর্ত্তী পণ্ডিতমণ্ডলীর ঐকান্তিক যত্ন ও সমর্থন-ফলে সেই অভিনব অদ্বৈতবাদই দেশের সর্ব্বত্র প্রচারিত ও সমাদৃত হইয়া অনতিকালবিলম্বে আপনার প্রবীণত্ব খ্যাপন করিতে সমর্থ হয়।

বস্তুতঃ এ মতটী সত্য বলিয়া মনে হয় না, ঐতিহাসিক তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে নিঃসংশয়রূপে জানা যে, জ্ঞানগুরু শঙ্করস্বামী প্রাদুর্ভূত হইবার বহু-

শতাব্দী পূর্ব্বেও এদেশে অদ্বৈতবাদের অভাব ছিল না; পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণও এই অদ্বৈতবাদ অবলম্বনে গভীর গবেষণাপূর্ণ বহুতর গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে, মহর্ষি বৌধায়ন, আচার্য্য উপবর্ষ, পণ্ডিত ভর্ত্তৃহরি প্রভৃতি গ্রন্থকারগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা বেদান্তের প্রস্থান-ত্রয়েই (১) বিবিধ টীকা, বৃত্তি, ব্যাখ্যা ও প্রকরণ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া এই অদ্বৈতসিদ্ধান্তেরই ব্যবস্থা ও সঙ্গতি সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। শঙ্করস্বামী ইঁহাদেরই কথার উপর আপনার মন্তব্যটুকু সংযোজিত করিয়াছেন মাত্র।

বিশেষতঃ, বৈদিক উপনিষদের অধিকাংশ স্থানই এই অদ্বৈতবাদে পরিপূর্ণ। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" "একমেবাদ্বিতীয়ং।" "সলীল একো দ্রষ্টা অদ্বৈতঃ। "শান্তং শিবমদ্বৈতং।" "দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি।" "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।" ইত্যাদি ঔপনিষদ বাক্য নিচয় যে, আলোচ্য অদ্বৈতবাদেরই মৌলিকতা প্রকাশ করিতেছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, সেই পুরাতন অদ্বৈতবাদই কিছুকাল (মধ্য যুগে) অমোঘ কাল-চক্রের বিষম বিবর্ত্তনে নিষ্পিষ্ট ও বৌদ্ধবিপ্লবে বিপর্য্যস্ত বা সংকোচদশা প্রাপ্ত হইয়াছিল; শঙ্করমূর্ত্তি শঙ্করাচার্য্য প্রাদুর্ভূত হইয়া সেই সংকোচদশা অপনয়ন-পূর্ব্বক কেবল তাহারই পুনঃ প্রচার ও বিস্তৃতি বিধান করিয়াছিলেন মাত্র; বস্তুতঃ ইহা বেদ-সমকালীন প্রাচীন।

প্রস্তাবিত অদ্বৈতবাদের প্রতিপাদ্য বিষয় প্রধানতঃ তিনটী, প্রথম—একমাত্র সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মের সত্যতা, দ্বিতীয়—জীব ও ব্রহ্মের একতা, তৃতীয়—পরিদৃশ্য-মান স্থূল সূক্ষ্ম জগন্মণ্ডলের মিথ্যাত্ব। (২) ফলকথা, "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব কেবলম্"। ইহাই প্রচলিত অদ্বৈতবাদের মূল বা স্থূল প্রতিপাদ্য।

---

(১) প্রচলিত বেদান্ত শাস্ত্র তিন ভাগে বিভক্ত, (১) উপনিষদ, (২) ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত দর্শন, (৩) ভগবদ্গীতা। ইহার এক একটী ভাগকে "প্রস্থান" বলে।

বেদান্ত-তত্ত্ব বুঝিতে হইলে প্রথমে উপনিষদ্ প্রস্থান, পরে সূত্র প্রস্থান এবং অবশেষে গীতা প্রস্থান পড়িতে হয়, নচেৎ বেদান্ত-রহস্য সম্যক হৃদয়ঙ্গম করা সুকঠিন।

(২) যাহার সত্তা পরাপেক্ষিত বা পরাধীন, তাহাই এখানে 'মিথ্যা' পদবাচ্য। জগতের সত্তা ব্রহ্ম-সাপেক্ষ, সুতরাং জগৎ মিথ্যা। 'পরতঃ সন্নসন্নেব তৎপরাপেক্ষিতত্বতঃ।" (পঞ্চদশী) প্রবন্ধের স্থানান্তরে একথা বিশেষরূপে আলোচিত হইবে।

বেদান্তবেদ্য এই নিগূঢ় রহস্যেরই প্রচার-মানসে অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকগণ বিবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, এবং বিনা যুক্তিযোগে কেবল শ্রুতি-বাক্য দ্বারা ঐ সকল রহস্য তর্ক-প্রিয় লোকদিগের কখনও বোধগম্য ও বিশ্বাস-যোগ্য হইতে পারে না, এজন্য চিৎসুখী, অদ্বৈতসিদ্ধি ও ভেদধিক্কার প্রভৃতি প্রৌঢ় গ্রন্থে শ্রুতি-নিরপেক্ষ কেবল স্বাধীন যুক্তি ও তর্কের সাহায্যে ঐ সকল রহস্য অতি উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

অদ্বৈতবাদের প্রধান আচার্য্য জ্ঞানগুরু ভগবান্ শঙ্করস্বামী; তিনি বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ সমর্থনার্থ সমস্ত শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস ও পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থের যে প্রকার সমন্বয় বা সামঞ্জস্য করিয়াছেন, যে প্রকার যুক্তি ও তর্কের অবতারণা করিয়াছেন, এবং অভিমত অদ্বৈতব্রহ্ম-তত্ত্ব বুদ্ধিস্থ করিবার জন্য যে সমুদয় উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, সে সমুদায়ের স্থূল স্থূল অংশ সকল এই অনতিবিস্তৃত প্রবন্ধে উল্লিখিত হইবে। তন্মধ্যে, অধিকারী (Qualified person), বিষয় (Sublect), প্রয়োজন (Purpose), জ্ঞানোৎপত্তি ও তাহার প্রকার, প্রমাণ-ভেদ এবং অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে ভারতীয় ও বৈদেশিক দার্শনিকগণের মতের পরস্পর সংবাদ ও বিসংবাদ (agreement and disagreement) প্রভৃতি বিষয় গুলি প্রধানতঃ আলোচিত হইবে, এবং আবশ্যকমতে স্থানে স্থানে অন্যান্য জ্ঞাতব্য তত্ত্ব সকলও বিচারিত ও সন্নিবেশিত করা যাইবে।

যদিও ঐ সকল রহস্য আপাত-জ্ঞানে উপস্থিত না হওয়ায়, প্রত্যুত অনুভব-বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হওয়ায়, সহসা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না সত্য, তথাপি সহসা উপেক্ষা করাও উচিত নহে। কারণ, যাহাদের চিত্তবৃত্তি নিতান্ত নির্ম্মল, বিচারশক্তি প্রখর ও পরিমার্জ্জিত, জ্ঞানশক্তি সমধিক সমুন্নত ও তত্ত্বনির্ণয়-নিপুণ এবং বিষয়ানুরাগ তিরোহিত হইয়াছে, তাদৃশ সৎপুরুষেরাই এ রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে এবং আধ্যাত্মিকাদি তাপ-ত্রয় হইতে পরিত্রাণ পাইতে অধিকারী, অন্যে নহে। একথা অদ্বৈতবাদিগণ অতি দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিয়াছেন।

অধিকার-চিন্তা সর্ব্বাদৌ অধিকারি-চিন্তা এ দেশের চিরন্তন প্রথা; কেবল এ দেশের কেন, অধিকারের পার্থক্যবোধ সকল দেশেই সমান, তবে ব্যবহারের

কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম থাকা অসম্ভব নহে। মুখে যিনিই যাহা বলুন, সকলেই ইহার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া থাকেন এবং কার্য্যক্ষেত্রে সকলকেই এই অধিকারের 'মান-দণ্ড' পরিচালন করিতে দেখা যায়।

সামান্য প্রণিধান করিলেই মনে হয় যে, এই অধিকার-সূত্রটী কেবলই মানব-কল্পিত একটা অস্বাভাবিক পদার্থ নহে; স্বয়ং করুণাময় ঈশ্বরই যেন জগতের সুশৃঙ্খলা সম্পাদনার্থ এই অধিকার-সূত্র নির্ম্মাণ করিয়া জগতের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন; তাই সকলে অজ্ঞাত বা পরোক্ষভাবেও ইহার মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছেন। ধর্ম্মরাজ্যের ত কথাই নাই, ব্যবহার জগতেও ইহার অপ্রতিহত প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। দেখা যায়, যাহাতে অপরের অধিকার আছে, তাহাতে আমার অধিকার নাই, অথবা যাহাতে আমার অধিকার আছে, তাহাতে অপরের অধিকার নাই। অধিক কি, এরূপ বিষয় অতি অল্পই আছে, যাহাতে সর্ব্বসাধারণের তুল্যরূপ অধিকার আছে বা থাকিতে পারে।

এই অধিকারের বৈষম্য-বলেই ক্ষীণকায় নরপতিও অমিততেজা বীরবিক্রম প্রজাপুঞ্জের উপর কঠোর শাসনদণ্ড পরিচালন করিতে সমর্থ হন, এবং প্রভুর ইঙ্গিতমাত্রে কার্য্য-সম্পাদনে অপটু ভৃত্যগণ অযাচিত-লব্ধ প্রভুর পাদ-প্রহার নীরবে সহ্য করিয়া থাকে। এই অধিকার-ভেদ অতি পূর্ব্বেও ছিল, বর্ত্তমানেও আছে এবং সুদূর ভবিষ্যতেও থাকিবে, যেহেতু ইহা নৈসর্গিক। যে দিন ইহার অভাব হইবে, সেদিন নিশ্চয়ই এই বৈচিত্র্যময় জগচ্চিত্রেরও অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া সেই অনন্তে বিলীন হইয়া যাইবে।

এখন প্রকৃত কথা এই যে, অধিকারিচিন্তা যখন মানব প্রকৃতির বিশেষত ভারতবাসীর নৈসর্গিক ধর্ম্ম, তখন আলোচ্য 'অদ্বৈততত্ত্ব' জানিবার প্রকৃত অধিকারী কে? কিরূপ লোকই বা এই অদ্বৈতবাদের গূঢ় রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া আপনাকে কৃতার্থ করিতে সমর্থ হইতে পারে? এরূপ চিন্তা নিতান্ত অসঙ্গত বা অস্বাভাবিক হইবে না। বিশেষতঃ অধিকার জ্ঞান না থাকিলে অভিজ্ঞ লোক কখনই আয়াসবহুল কার্য্যসম্পাদনে প্রবৃত্ত হন না এবং হইতেও পারেন না; এই কারণে আচার্য্যগণ প্রথমেই অধিকারের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

তাঁহারা বলেন,—বিবেক (Discrimination between eternal and non-eternal substances), বৈরাগ্য (Indifference to the enjoyment

of reward here or hereafter), শমদমাদিষট্‌সম্পত্তি (১) ও মুমুক্ষা, (Desire for emancipation) এই চতুর্ব্বিধ সাধন-সম্পন্ন শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি অদ্বৈত ব্রহ্ম-তত্ত্ব বুঝিবার প্রকৃত অধিকারী, অন্যে নহে।

একথার অভিপ্রায় এইরূপ—মানবীয় মন কাচের ন্যায় স্বভাবতঃ নির্ম্মল হইলেও তাহাতে ত্রিবিধ দোষ আসিয়া উপস্থিত হয়। দোষগুলি এই—প্রথম দোষ 'মল' (২) (impurities of the Intelligence), দ্বিতীয় দোষ 'বিক্ষেপ' (distraction), তৃতীয় দোষ 'আবরণ' (mental blindness, that which veils the real nature of things) অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধক 'অজ্ঞান'। এই ত্রিবিধ দোষ যে পর্য্যন্ত হৃদয় হইতে অপসারিত না হয়, তাবৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভের আশা সুদূরপরাহত। এই কারণে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ব্যক্তি প্রথমেই কথিত দোষরাশি বিনাশ করিতে যত্নপর হন, এবং দোষ-নিবারণের জন্য কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান, এই ত্রিবিধ উপায় অবলম্বন করেন। তন্মধ্যে নিত্যকর্ম্মাদি (constant rites) দ্বারা মলদোষ, উপাসনা (devotional exercises) দ্বারা বিক্ষেপ বা চাঞ্চল্য দোষ এবং জ্ঞানের দ্বারা 'আবরণ' বা অজ্ঞান দোষ ক্রমে ক্রমে অপনীত হইয়া যায়।

এই কারণে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ব্যক্তির পক্ষে প্রথমেই কাম্য (acts done from a desire of reward) ও নিষিদ্ধ, (forbidden acts) উভয়বিধ কর্ম্মই পরি-বর্জ্জনীয়। কারণ, ঐ উভয়বিধ কর্ম্মই চিত্তের বিক্ষেপ ও বাসনারূপ মালিন্য উৎপাদন করে। মনুষ্য যে পরিমাণে কাম্য কর্ম্মে অনুরাগী ও প্রবৃত্ত হয়, তাহার বাসনাও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। কোন একটী ফল তাহার বাসনায় প্রবৃত্ত হইলেই ফলান্তর-ভোগ কামনায় পুনর্ব্বার অন্য কর্ম্মে প্রবৃত্তি স্বতঃসিদ্ধ। এইরূপে অনন্তকাল কেবল কর্ম্ম ও ভোগ ধারাবাহিকরূপে প্রবাহিত হইতে থাকে. কস্মিন্ কালেও তাহার আর বিরাম হয় না বা হইতে পারে না।

১। শমদমাদির কথা পরে বলা হইবে।

(২) বায়ু-বিক্ষুব্ধ বারিধির ন্যায় মানবীয় মানসে প্রতিনিয়তই কামনাময় তরঙ্গমালা খেলা করিয়া থাকে। যেই একটী কামনা উপস্থিত হইল তাহার বিরাম হইতে না হইতেই আর একটী আসিয়া দেখা দিল, এবং তাহার বিরামের সঙ্গে সঙ্গে আবার আর একটী কামনা আসিয়া পুনর্ব্বার অদৃশ্য হইল, এইরূপে অসংখ্য কামনা (মনোবৃত্তি) এবং ভোগ উৎপন্ন ও বিধ্বস্ত

বিশেষতঃ কাম্য কর্ম্ম ও তাহার ফলভোগে যখন উচ্ছৃঙ্খল বাসনা রাশি বৃদ্ধি বৈ হ্রাস পায় না, তখন কাম্য কর্ম্ম দ্বারা চিত্তের মালিন্য মার্জ্জনা করা কখনও সম্ভবপর হয় না। ভগবান বলিয়াছেন—

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥"

তাৎপর্য্য এই যে, বিষয়োপভোগের দ্বারা কখনও কামনা অর্থাৎ ভোগস্পৃহা প্রশমিত হয় না, পরন্ত ঘৃতসংযোগে অগ্নির ন্যায় বিষয় ভোগে কামনা আরও অধিকতর বৃদ্ধি পাইতে থাকে; সুতরাং ইহা যে তত্ত্বজিজ্ঞাসুর উদ্দেশ্য সিদ্ধির একান্ত বিরোধী; তাহা বলাই বৃথা।

একথাওবলা আবশ্যক যে,শাস্ত্রে যে সকল কর্ম্মে বিশেষ বিশেষ ফলের উল্লেখ আছে, নিষ্কামভাবে অর্থাৎ ফলাভিলাষ-রহিত হইয়া অনুষ্ঠান করিলে সে সকল কর্ম্মও অনুষ্ঠাতার চিত্তকে মলিন না করিয়া নির্ম্মল করিয়া থাকে। এজন্য বিবেকী ব্যক্তি ফলোদ্দেশে বিহিত কাম্য কর্ম্মও নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

তত্ত্বজিজ্ঞাসুর পক্ষে কাম্য কর্ম্মের ন্যায় নিষিদ্ধ কর্ম্মও সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। কারণ, হিংসাদি নিষিদ্ধ কর্ম্ম মাত্রই যে মনকে নিতান্ত কলুষিত ও কুপথগামী করিয়া নরকের দিকে অগ্রসর করে, ইহাতে বোধ হয় কাহারও আপত্তি নাই।

রোগ নিবারণ করিতে হইলে যেরূপ অপথ্য-বর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত ঔষধ সেবন করাও নিতান্ত প্রয়োজনীয়, শুদ্ধ-চিত্ত হইতে হইলে অর্থাৎ চিত্তগত 'মলদোষ' অপনীত করিতে হইলেও সেইরূপ কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম বর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে নিত্য ও নৈমিত্তিকাদি বিহিত কার্য্যগুলির অনুষ্ঠান করা একান্ত আবশ্যক।

হইলেও তাহার সম্বন্ধ একেবারে নষ্ট হয় না, বস্ত্রে চাপা ফুল রাখিয়া পরে ফুলগুলি তুলিয়া লইলেও বস্ত্রে যেরূপ গন্ধ থাকে, সেইরূপ কামনা এবং ভোগ বিনষ্ট হইলেও তাহার বাসনা বা সংস্কার মনোমধ্যে নিহিত থাকে, এই বাসনাই চিত্তের মল। রাগ-দ্বেষাদি অন্যান্য মনোবৃত্তি ও এই মল দোষের অন্তর্গত।

যে কর্ম্ম অনুষ্ঠান না করিলে মনুষ্যকে পাপ-ভাগী হইতে হয়, (১) তাহার নাম "নিত্য কর্ম্ম" (indispensable observances)

ব্রাহ্মণাদির অনুষ্ঠেয় প্রাত্যহিক সন্ধ্যা-বন্দনাদি কর্ম্ম গুলি শাস্ত্রে নিত্য কর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে।

সন্ধ্যাদিকর্ম্মের ফল সম্বন্ধে শাস্ত্রে মতভেদ দেখাযায়। কেহ বলেন, আমরা দিন দিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে সকল পাপাচরণ করিয়া থাকি, শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে সন্ধ্যাদির অনুষ্ঠান করিলে আমাদের দৈনন্দিন সঞ্চিত সেই পাপরাশি বিনষ্ট হয়।

অন্য সম্প্রদায় বলেন, প্রতিদিন যথাবিধি সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে চিত্তে সর্ব্বদা সৎ-প্রবৃত্তি প্রবল থাকায় হৃদয়ে কখনও অসৎ চিন্তা বা অসৎ প্রবৃত্তি আসিতে পারে না; সুতরাং কোন প্রকারে প্রত্যবায় হইবারও সম্ভাবনা থাকে না। (১)

বস্তুতঃ শাস্ত্রোক্ত নিত্যকর্ম্ম দ্বারা চিত্তের নির্ম্মলতা সম্পাদন করাই প্রধান উদ্দেশ্য; তদ্ভিন্ন যেকিছু ফলের উল্লেখ দেখা যায়, তাহা আনুষঙ্গিক মাত্র। নিত্য কর্ম্মের রীতিমত অনুষ্ঠান করিলে চিত্ত যেরূপ প্রণালীতে বিশুদ্ধি লাভ করে, তাহা "নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি" নামক বেদান্ত গ্রন্থে এইরূপে বিবৃত হইয়াছে,—"নিত্য-কর্ম্মানুষ্ঠানাৎ পাপহানিঃ, ততশ্চিত্তশুদ্ধিঃ, ততঃ সংসারাত্ম-যথাত্ম্যবোধঃ, ততো মুমুক্ষুত্বং, ততস্তদুপায়-পর্য্যেষণং, ততঃ সর্ব্বকর্ম্ম-সন্ন্যাসঃ, ততো যোগাভ্যাসঃ, ততশ্চিত্তস্য প্রত্যক্-প্রবণতা, ততস্তত্ত্বমস্যাদিবাক্যার্থবোধঃ, ততোঽবিদ্যো-চ্ছেদঃ, ততঃ স্বাত্মন্যবস্থানং।"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রথমতঃ শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্তের পাপরাশি বিনষ্ট হয়। তখন, নিষ্পাপ—বিশুদ্ধ চিত্তে ক্রমে সংসার ও আত্মার যথার্থ তত্ত্ব অর্থাৎ সংসার অসার, আত্মাই সত্য, এইরূপে উপলব্ধি হইতে থাকে। পরে, ঐহিক ও পারলৌকিক

১। এখানে পাপ অর্থ অনিষ্ট, ব্রহ্মজ্ঞান ইষ্ট এবং তদনুকূল চিত্ত-শুদ্ধিও ইষ্ট। অতএব যাহার সাহায্যে চিত্তের দোষ ক্ষয় ও শুদ্ধির উদয় হয়, তাহার আশ্রয় গ্রহণ না করিলে সাধনত্যাগ জনিত অনিষ্ট—পাপ বা অপরাধ হয়, বুঝিতে হইবে।

(১) ক্ষয়ঃ কেচিদুরাত্তস্য দুরতস্য প্রচক্ষতে। অনুৎপত্তিং তথাচান্যে প্রত্যবায়স্য মন্বতে॥
যদিও সন্ধ্যামুপাসতে যে তু নিয়তং সংশিতব্রতাঃ। বিধৌত-পাপাস্তে যান্তি ব্রহ্মলোকমনাময়ম

বিষয়-ভোগে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, এবং ক্রমে মুক্তি লাভের ইচ্ছা ও তাহার উপায়ান্বেষণ, পরমাত্মার দিকে উন্মুখীভাব, তত্ত্বমসি প্রভৃতি মহাবাক্যার্থ-বোধ ও আত্ম-বিষয়ক অজ্ঞান বিনাশ হয় এবং পরিশেষে সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মভাবে অবস্থিতি উপস্থিত হইয়া থাকে। নিয়মিত ভাবে নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠান করিলে সাধকের চিত্ত যে বিশুদ্ধি লাভ করে, এবিষয়ে উল্লিখিত শাস্ত্র বাক্যও সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

নিত্যকর্ম্মের ন্যায় নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাও তত্ত্বজিজ্ঞাসুর পক্ষে একান্ত আবশ্যক। কোন প্রকার নিমিত্ত বা ঘটনা উপলক্ষে যে সকল কার্য্য অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা "নৈমিত্তিক" কর্ম্ম (occasional observances) চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহণাদি উপলক্ষে স্নান দানাদি কার্য্য এবং পুত্রোৎপত্তি নিবন্ধন "পুত্রেষ্টি" প্রভৃতি কর্ম্ম সকল এই "নৈমিত্তিক কর্ম্মের" অন্তর্গত।

শাস্ত্র-বিহিত নৈমিত্তিক কর্ম্ম যথানিয়মে সম্পাদন না করিলে লোকের পাপ হয়, কিন্তু অনুষ্ঠান করিলে আর সে পাপের আশঙ্কা থাকে না, সুতরাং পাপ-নিবৃত্তি ও চিত্ত-শুদ্ধি উভয়ই নৈমিত্তিক কর্ম্মের ফল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ফলার্থে বিহিত কর্ম্ম সকলও যদি নিষ্কামভাবে বা ঈশ্বর-প্রীতি উদ্দেশে অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা হইলে, সেই সকল কাম্য কর্ম্ম ও চিত্তকে কলুষিত না করিয়া বিমল করিয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত নিত্য, নৈমিত্তিক ও নিষ্কাম কর্ম্মের মুখ্য প্রয়োজন চিত্তশুদ্ধি, তদ্ভিন্ন আরও যে সকল ফলের (পিতৃলোক ও সত্যলোক প্রাপ্তি প্রভৃতির) উল্লেখ দেখা যায়, তাহা আনুষঙ্গিক মাত্র (incidental result)।

ইত্যাদি শাস্ত্রে সন্ধ্যোপাসনার ও ব্রহ্মলোক লাভরূপফলের উল্লেখ দেখা যায়, তাহার তাৎপর্য্য এইরূপ,—

যথাবিধি অনুচিন্তন পূর্ব্বক শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে নিয়ত সন্ধ্যোপাসনা করিলে প্রথমতঃ চিত্ত শুদ্ধ হয়, শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি ধ্যান ও জ্ঞান যোগ প্রভৃতি সাধন বলে অনাময় ব্রহ্মলোকে গমন করে। এবিষয় পরে আরও স্পষ্ট করা হইবে।

তাৎপর্য্য এই যে, ফল-ভোগ বৃক্ষ-রোপণের প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও সঙ্গে সঙ্গে যেরূপ পত্রের ছায়া ও পুষ্পের সৌরভ লাভ প্রভৃতি আরও কতকগুলি আনুষঙ্গিক ফল ভোগ্যরূপে আসিয়া উপস্থিত হয়, সেইরূপ, লোকে চিত্ত-শুদ্ধির উদ্দেশে নিত্য, নৈমিত্তিক ও নিষ্কাম কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলেও তাহা হইতে সঙ্গে সঙ্গে 'পিতৃলোক' 'সত্যলোক' প্রভৃতি বিবিধ আনুষঙ্গিক ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

"কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ," (বৃহদারাণ্যকোপনিষদ্ ১।৫।১৬) অর্থাৎ কর্ম্ম দ্বারা পিতৃলোক লাভ হয়, এই জাতীয় শ্রুতিবাক্যও পিতৃলোক প্রভৃতির প্রাপ্তিকে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ কর্ম্মের আনুষঙ্গিক ফলরূপেই প্রতিপাদন করিয়াছে। কর্ম্ম দ্বারা যে, চিত্তের বাসনাময় মালিন্য অপনীত হয়, তদ্বিষয়ে "কষায়ে কর্ম্মভিঃ পক্বে ততো জ্ঞানং প্রজায়তে।" ইত্যাদি স্মৃতি-বাক্যও স্পষ্টাক্ষরে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

ফলকথা, পূর্ব্বোক্ত কাম্য কর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য (ফল)—স্বর্গাদি-সুখভোগ, গৌণ ফল—চিত্ত-শুদ্ধি। নিত্য কর্ম্মের প্রধান ফল চিত্ত-শুদ্ধি, গৌণ ফল বিষয়-ভোগ। আর, নৈমিত্তিক কর্ম্মের মুখ্য প্রয়োজন—পাপনিবৃত্তি, অবান্তর ফল—পিতৃলোকাদি-প্রাপ্তি। (১)

প্রায়শ্চিত্ত—নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মের ন্যায় শাস্ত্রবিহিত 'প্রায়শ্চিত্ত'ও চিত্ত-শুদ্ধির অন্যতম উপায়। কারণ, অসৎ কর্ম্ম দ্বারা চিত্তে যে সমস্ত পাপ বা দুরিত সঞ্চিত হয়, শাস্ত্র-বিহিত প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত বিনা ভোগে কখনই তাহা বিধ্বস্ত হয় না; সেই সঞ্চিত দুরিতরাশি বিদূরিত না হইলেও চিত্ত নির্ম্মল হয় না, অথচ মলিন চিত্তে কস্মিন্ কালেও জ্ঞানোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই। এই কারণে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুর পক্ষে চিত্ত-শোধনার্থ 'প্রায়শ্চিত্ত' সমাচরণ একান্ত আবশ্যক।

শাস্ত্রে যে সমস্ত কর্ম্ম কেবলই পাপ-ক্ষয়ার্থ বিহিত বা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,

---

(১) একঃ কাম্যোঽপরো নিত্যস্তথা নৈমিত্তিকোঽপরঃ।
প্রাধান্যেন ফলং শুদ্ধিরার্থিকী কাম্য-কর্ম্মণঃ॥
প্রাধান্যেন মনঃশুদ্ধির্নিত্যস্য ফলমার্থিকম্।
কবলং প্রত্যবায়স্য নিবৃত্তিরিতরস্য তু॥ (বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী)

সেই সমস্ত কর্ম্মের নাম প্রায়শ্চিত্ত। শাস্ত্রকারগণ ইহার বিশেষ লক্ষণ এইরূপ করিয়াছেন—

"প্রায়ো নাম তপঃ প্রোক্তং চিত্তং নিশ্চয় উচ্যতে।
তপোনিশ্চয়-সংযুক্তং প্রায়শ্চিত্তং বিদুর্বুধাঃ॥"

তাৎপর্য্য এই যে, 'প্রায়ঃ' অর্থ তপস্যা, আর 'চিত্ত' অর্থ নিশ্চয়; সুতরাং যে তপস্যায় নিশ্চয় বুদ্ধি অর্থাৎ ইহা দ্বারা আমার সঞ্চিত পাপরাশি অবশ্য বিনষ্ট হইবে, এইরূপ দৃঢ় ধারণা থাকে, পণ্ডিতেরা সেই তপস্যাকে 'প্রায়শ্চিত্ত' বলিয়া জানেন।

লোক আপনাকে 'পাপী' বলিয়া মনে করিলেই সেই পাপ-নাশার্থ শাস্ত্রোক্ত প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিবে। পাপ-নিশ্চয় থাকিতেও যাহারা প্রায়শ্চিত্ত বা পশ্চাত্তাপ প্রভৃতি পাপক্ষালনোপায়সমূহ অবলম্বন করে না, তাহারা ঘোর নরকে গমন করে। (১)

কথিত উপায়ে চিত্তগত পূর্ব্বোক্ত 'মল'-দোষ প্রশমিত হইলে চিত্তটী শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় বিমলতা লাভ করে, তখন চিত্তের দ্বিতীয় দোষ—'বিক্ষেপ' নিবারণার্থ উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়।

উপাসনা—পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, উপাসনাই চিত্তের বিক্ষেপ বা চাঞ্চল্য-দোষ প্রশমনের একমাত্র উপায়। 'উপাসনা' অর্থ কোন এক সগুণ বস্তু-বিষয়ে চিত্ত সমর্পণ করা। (২)

রজোগুণ প্রবল হইলে অতি সহজেই মনোমধ্যে বিক্ষেপ বা চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, বিক্ষিপ্ত মন কোন বিষয়েই স্থিরতা লাভ করিতে পারে না; স্থিরতা ভিন্ন কখনও কোন বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান হইতে পারে না; সুতরাং বিক্ষেপ-দোষ-দূষিত মন নির্ব্বিশেষ সূক্ষ্ম ব্রহ্মতত্ত্ব কখনই সাক্ষাৎ করিতে পারে না। অতএব, ধনুর্বিদ্যার্থী যেরূপ লক্ষ্য স্থির করিবার অভিলাষে স্থূল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম বস্তু লক্ষ্য করিতে থাকে, সেইরূপ উপাসকও

---

(১) প্রায়শ্চিত্তমকুর্ব্বাণাঃ পাপেষভিরতা নরাঃ।
অপশ্চাত্তাপিনঃ পাপা নিরয়ান্ যান্তি দারুণান্॥ (মনু)

(২) ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে যে 'শাণ্ডিল্য-বিদ্যা' প্রভৃতির উল্লেখ আছে, তাহা এই উপাসনা-কাণ্ডেরই অন্তর্গত।

চঞ্চল চিত্তকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত প্রথমে স্থূল বিষয় অবলম্বনপূর্ব্বক চিন্তায় প্রবৃত্ত হইবে; অবলম্বিত স্থূল বিষয়ে চিত্ত স্থিরীকৃত বা নিশ্চলতা প্রাপ্ত হইলে ক্রমে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম বিষয় সকল অবলম্বনে চিন্তা করিতে থাকিবে।

আচার্য্যগণ বলিয়াছেন,—

"নির্ব্বিশেষং পরং ব্রহ্ম সাক্ষাৎকর্ত্তুমনীশ্বরাঃ।
যে মন্দাস্তেঽনুকল্প্যন্তে সবিশেষনিরূপণৈঃ॥
বশীকৃতে মনস্যেষাং সগুণ-ব্রহ্মশীলনাৎ।
তদেবাবির্ভবেৎ সাক্ষাদপেতোপাধিকল্পনম্॥"

তাৎপর্য্য এই যে, বুদ্ধির মন্দতা বশতঃ যাহারা নির্ব্বিশেষ পর-ব্রহ্ম সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে অসমর্থ, তাহারা সবিশেষ অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মোপাসনায় প্রবৃত্ত হয়, এবং সগুণ ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা মন বশীকৃত হইলে, তখন সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত সেই ব্রহ্ম আপনা হইতেই তাহাদের মনে প্রকাশিত হন।

উপাসনা সম্বন্ধে এতদ্ভিন্ন আরও যে সমস্ত কথা আছে, তাহা 'প্রয়োজন পরিচ্ছেদে' কথিত হইবে।

সাধন-চতুষ্টয়—উল্লিখিত উপায়ে মনের দ্বিবিধ দোষ (মল ও বিক্ষেপ) অপনীত হইলেও 'আবরণ'-দোষ নিবারিত হয় না, তন্নিবৃত্তির জন্য বিবেক, বৈরাগ্য, শমদমাদি ষট্ সম্পত্তি এবং মুমুক্ষা বা মুক্তিবিষয়ক প্রগাঢ় ইচ্ছা, এই চতুর্ব্বিধ সাধন সংগ্রহের আবশ্যক।

তন্মধ্যে, 'বিবেক' অর্থ—নিত্য ও অনিত্য বস্তুসকল পৃথক্ করিয়া জানা, অর্থাৎ কেবলমাত্র আত্ম-স্বরূপ ব্রহ্মই নিত্য, নির্ব্বিকার ও কূটস্থ সত্য (যাহা কখনও পরিবর্ত্তিত হয় না), আর তদ্ভিন্ন সমস্ত পদার্থই অনিত্য, এই প্রকার পার্থক্য উপলব্ধি করা।

'বৈরাগ্য' অর্থ বৈতৃষ্ণ্য অর্থাৎ ঐহিক ভোগ্য বিষয়সকল যেরূপ অনিত্য—ধ্বংসশীল, পারলৌকিক স্বর্গাদি ভোগ্য বিষয়গুলিও তদ্রূপ অনিত্য—বিনাশশীল; এইপ্রকার দোষ দর্শনপূর্ব্বক ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয়ে ভোগাভিলাষ না

---

* (১) দৃষ্টানুশ্রবিক-বিষয়-বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যং। (পাতঞ্জল সূত্র ১।১৫)।
(২) ব্রহ্মলোক-তৃণীকারো বৈরাগ্যস্যাবধির্মতঃ (পঞ্চদশী)।

করা। (১) দুর্লভ ব্রহ্মলোককে পর্য্যন্ত তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞানে উপেক্ষা করাই হইল বৈরাগ্যের অবধি বা চরম সীমা। (২)

এবম্বিধ বৈরাগ্যোৎপত্তির প্রথম কারণ—ভোগ্য বিষয়ে দোষ-দর্শন। কারণ, যে বিষয়ে সত্য সত্যই দোষ দর্শন হয়, সে বিষয়ে কখনও শ্রদ্ধা বা ভোগেচ্ছা থাকিতে পারে না, সুতরাং সে বিষয়ে আর প্রবৃত্তিও হইতে পারে না।

'শমাদি'—শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধি ও শ্রদ্ধা। 'শম' অর্থ অন্তরিন্দ্রিয়-সংযম। 'দম' অর্থ বহিরিন্দ্রিয়-সংযম, অর্থাৎ প্রতিনিয়ত বাহ্য বিষয়ে ধাবমান বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়বর্গকে তাহাদের নিজ নিজ বিষয়ে যাইতে না দেওয়াই শম ও দম শব্দের প্রকৃত অথ। ইন্দ্রিয়-সংযম করিতে না পারিলে যখন মনুষ্য মাত্রেরই অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী, তখন তত্ত্বজিজ্ঞাসুর আর কথা কি। (১) 'উপরতি' অর্থ শাস্ত্র-বিহিত কর্ম্মসকল শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে পরিত্যাগ করা, ইহারই নামান্তর 'সন্ন্যাস'।

কথিত 'সংন্যাস' দ্বিবিধ, (১) বিবিদিষা-সন্ন্যাস, (২) বিদ্বৎ-সন্ন্যাস। বিবিদিষা-সন্ন্যাসকে 'ক্রমসন্ন্যাস'ও বলা হয়। কারণ, উহাতে ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম-চতুষ্টয়ের ক্রম (পৌর্ব্বাপর্য্য) অপেক্ষিত আছে। প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য, পরে গার্হস্থ্য, তৎপর বানপ্রস্থ, এই আশ্রমত্রয় পরিসমাপ্ত করিয়া অবশেষে ঐ সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হয়।

এই ক্রম-সন্ন্যাস সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন,—ব্রাহ্মণ জন্মমাত্রই ত্রিবিধ ঋণে আবদ্ধ হন। প্রথম ঋষি-ঋণ, দ্বিতীয় দেব-ঋণ, তৃতীয় পিতৃ-ঋণ। তন্মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ঋষি-ঋণ, যাগ-যজ্ঞাদি দ্বারা দেব-ঋণ এবং সন্তান দ্বারা পিতৃ-ঋণ পরিশোধ করিয়া কথিত ঋণত্রয় হইতে বিমুক্ত হইবে। (২)

এ বিষয়ে স্মৃতি-শাস্ত্র আরও একটুকু বিশেষ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন;

---

(১) অকুর্ব্বন্ বিহিতং কর্ম্ম নিন্দিতঞ্চ সমাচরন্।
প্রসজ্জংশ্চেন্দ্রিয়ার্থেষু নরঃ পতনমৃচ্ছতি॥ (মনু)

(২) 'জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভিঃ ঋণবান্ জায়তে, ব্রহ্মচর্য্যেণ ঋষিভ্যঃ, যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ, প্রজয়া পিতৃভ্যঃ। এষ বা অনৃণঃ'' ইত্যাদি শ্রুতি।

স্মৃতি-শাস্ত্র বলেন, অভিজ্ঞ ব্যক্তি প্রথমে পূর্ব্বোক্ত ঋণত্রয় পরিশোধ করিবে, পরে মোক্ষাভিলাষী হইবে; কিন্তু যাহারা ঋণত্রয় পরিশোধের পূর্ব্বেই মোক্ষ-পথে পদার্পণ করিতে ইচ্ছুক হয়, তাহারা মোক্ষপ্রাপ্ত না হইয়া অধোগামী হয়। (৩)

যাহাদের হৃদয়ে তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হয় নাই, বিষয়ের বিষবৎ বিষমচ্ছবিও প্রতিফলিত হয় নাই এবং মায়াময় মোহ-তন্দ্রার অবসান হইতে আরও বিলম্ব আছে, তাহারাই বেদ ও স্মৃতি-বিহিত আশ্রমের ও আর্ষ প্রভৃতি ঋণ-মোচনের জন্য কাল প্রতীক্ষা করিতে বাধ্য; কিন্তু, বিষয়-বহ্নির তীব্র তাপে যাহার হৃদয় দগ্ধ-প্রায় ও তৃষ্ণা-বিষের বিষম জ্বালায় সম্মূর্চ্ছিত হইতেছে এবং নিরতিশয় সৌভাগ্য-ফলে পর-বৈরাগ্যের (১) অমল আনন্দালোক লাভ হইয়াছে, পূর্ব্বোক্ত আশ্রম-ক্রম বা ঋণ-শোধন প্রভৃতি নিয়ম-পাশে কখনও তাহাকে আবদ্ধ রাখিতে পারে না, মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করাও তাহার পক্ষে সম্ভবপর হয় না। এজন্য উদারমহিমা শ্রুতি তাহাদিগকে অবিলম্বে সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিয়া বলিয়াছেন যে, "যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ," অর্থাৎ সাধারণতঃ ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম সমাপ্ত পরেই সন্ন্যাস গ্রহণ করা বিধেয়, কিন্তু ইতোমধ্যেই যাহার হৃদয়ে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়, সে লোক ব্রহ্মচর্য্য হইতেই সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে, আশ্রমান্তরের অপেক্ষা করিবে না। শ্রুতি শুধু একথা বলিয়াই বিরত হন নাই, পুনশ্চ বলিয়াছেন, "যদহরেব বিরজেৎ, তদহরেব প্রব্রজেৎ, অব্রতী বা ব্রতী বা।" অর্থাৎ যেইদিনই বৈরাগ্য লাভ করিবে, সেই দিনই প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) গ্রহণ করিবে, ব্রতধারী (ব্রহ্মচারী) হউক বা নাই হউক, তাহার আর কোন নিয়মের অপেক্ষা নাই। ইহাই প্রকৃত বিদ্বৎসন্ন্যাসের প্রণালী।

বিদ্বৎসন্ন্যাস সম্বন্ধে আরও অনেক শ্রুতিস্মৃতি প্রমাণ আছে; যাহাতে

---

(৩) 'ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ।
অনপাকৃত্য মোক্ষং তু সেবমানো ব্রজত্যধঃ॥" (মনু)

(১) 'তৎ পরং পুরুষখ্যাতে গুণবৈতৃষ্ণ্যম্'। (পাতঞ্জল যোগসূত্র ১।১৬।)
অর্থ, বৈরাগ্য দুই প্রকার, পরবৈরাগ্য ও অপর বৈরাগ্য। তন্মধ্যে পুরুষ-খ্যাতি অর্থাৎ আত্ম-প্রকাশবশতঃ যে প্রকৃতি ও তৎকার্য্যে (জগতে) বিতৃষ্ণভাব—অস্পৃহা, তাহার নাম পরবৈরাগ্য॥

আশ্রমান্তর নিরপেক্ষতা স্পষ্টাক্ষরে প্রতিপাদিত হইয়াছে। (২) ফলকথা, বিবিদিষা-সন্ন্যাসেই ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমান্তরের অনুষ্ঠান অপেক্ষিত, বিদ্বৎসন্ন্যাসে নহে; উহাতে একমাত্র তীব্র বৈরাগ্যের প্রয়োজন। যাহার হৃদয়ে যে পরিমাণে বৈরাগ্যের অভ্যুদয় হয়, তাহার পক্ষে উপরতি বা সন্ন্যাসও সেই পরিমাণে উৎকর্ষ লাভ করে। উপরতির কথা এখানেই সমাপ্ত করা গেল, এখন তিতিক্ষার কথা কথিত হইতেছে—

তিতিক্ষা—'তিতিক্ষা' অর্থ সহিষ্ণুতা, তিতিক্ষা সুসম্পন্ন না হইলে সমাধি-সিদ্ধির চেষ্টা করিতে হইবে। অর্থাৎ শীত উষ্ণাদি দ্বন্দ্ব দুঃখে অভিভূত না হওয়া। (১)

সমাধি—'সমাধি' অর্থ চিত্তের একাগ্রতা অর্থাৎ অপর সমস্ত বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া কোন একটী বিষয়ে চিত্তকে সংস্থাপিত করা; অপর কোনও বিষয় চিন্তা না করিয়া একটীমাত্র বিষয় চিন্তা করা। অভিপ্রায় এই যে, মানবীয় মানস-সাগরে অনবরত যে চিন্তার তরঙ্গমালা খেলা করিতেছে, একটী উত্থিত হইতেছে, অপরটী বিনাশ পাইতেছে, নিরন্তর জন্ম-মরণশীল সেই চিন্তার সহযোগে চিত্ত-প্রদেশ সর্ব্বদাই চঞ্চল বা বিক্ষিপ্ত থাকে। বিক্ষিপ্ত চিত্তে কখনও তত্ত্ব প্রতিভাস হয় না বা হইতে পারে না। একটী নদীর স্রোতকে যদি বহুপথে প্রবাহিত করা যায়, তাহা হইলে যেমন সেই নদীর স্রোতোবেগ মন্দীভূত হইয়া পড়ে, আবার সেই বিভিন্ন পথগুলি বন্ধ

---

(২) কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মায়ং লোকঃ।

(বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৪।৪।)

সংসারমেব নিঃসারং দৃষ্ট্বা সারদিদৃক্ষয়া।
প্রব্রজন্ত্যকৃতোদ্বাহাঃ পরং বৈরাগ্যমাশ্রিতাঃ॥
প্রত্যগ্ বিবিদিষাসিদ্ধৌ বেদানুবচনাদয়ঃ।
ব্রহ্মাবাপ্তৌ শ্রুতত্যাগমীপ্সন্তীতি শ্রুতের্বলাৎ॥

ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতি বাক্য সকলও বিদ্বৎসন্ন্যাসে আশ্রমান্তরের অনপেক্ষার প্রমাণ।

(১) শীত গ্রীষ্ম, সুখদুঃখ ইত্যাদি পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাব দুই দুইটীকে 'দ্বন্দ্ব' বলে। এই দ্বন্দ্বদুঃখে যাহার হৃদয় কাতর বা চঞ্চল হয়, তাহার পক্ষে ব্রহ্মবিষয়ে একাগ্রতা-লাভ কস্মিন্ কালেও সম্ভবপর নহে; এই কারণে মুমুক্ষু ব্যক্তির পক্ষে প্রথমেই দ্বন্দ্বসহিষ্ণু হওয়া একান্ত আবশ্যক।

করিয়া যদি একই পথে স্রোতকে পরিচালিত করা যায়, তাহা হইলে যেমন সেই স্রোতই পুনর্ব্বার প্রখর বেগ ধারণ করিয়া তীব্রতা প্রাপ্ত হয়, ঠিক তেমনি মনোবৃত্তি বহুবিষয়ে ধাবিত হইলে তাহার জ্ঞান বা প্রকাশশক্তি ক্ষীণতা লাভ করে, সূক্ষ্ম বিষয় গ্রহণে অসমর্থ হইয়া পড়ে। চিন্তার বিষয়ীভূত অপরাপর বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া কোন একটীমাত্র বিষয়ে যদি মনঃ সন্নিবেশ করা যায়, তাহা হইলে সেই মনেই আবার জ্ঞানশক্তি সমধিক বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। পূর্ব্বে যে সমস্ত বিষয় অজ্ঞানের অন্ধকারে নিহিত ছিল, তখন সেই সমস্ত বিষয়ই আবার উজ্জ্বল জ্ঞানালোকে সমুদ্ভাসিত হইতে থাকে। চিত্তের প্রকাশ-শক্তি সম্বর্দ্ধনই উক্ত একাগ্রতার উদ্দেশ্য। ক্রমে স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম, বিষয়ে সমাধি সাধন করিয়া পরিশেষে পরতত্ত্ব পর-ব্রহ্মে চিত্ত সমাধান করিতে হয়। সমাধি দুই প্রকার—(১) সবিকল্প (২) নির্ব্বিকল্প। এসম্বন্ধে আরও যাহা বক্তব্য আছে তাহা পরে বলা যাইবে। উক্ত সমাধির পরবর্ত্তী সাধনটীর নাম শ্রদ্ধা।

শ্রদ্ধা—'শ্রদ্ধা' অর্থ আস্তিক্য বুদ্ধি অর্থাৎ গুরুবাক্যে ও শাস্ত্র-বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস, যাহার বলে লোক প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য হয়। চতুর্থ সাধন 'মুমুক্ষুত্ব,' অর্থাৎ, মোক্ষের ইচ্ছা।

উল্লিখিত সাধন চতুষ্টয়ের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধন সকল পরবর্ত্তী সাধন সমূহের প্রযোজক বা প্রবর্ত্তক। অভিপ্রায় এই যে, প্রথমতঃ নিত্য ও অনিত্য বস্তুর বিবেক জন্মে, তাহার পর ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয়োপভোগে বৈরাগ্য বা ঔদাস্য উপস্থিত হয়, তখন বাহ্য ও অন্তরিন্দ্রিয়ের সংযম সহজ-সাধ্য হইয়া থাকে, পরে মুক্তির জন্য বলবতী ইচ্ছা হয়। কেহ কেহ ইহার বিপরীত ক্রমে প্রযোজ্য-প্রযোজক ভাব কল্পনা করিয়া থাকেন।

যে সমস্ত সাধনের কথা বলা হইল, তাহা সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত, এক অন্তরঙ্গ, অপর বহিরঙ্গ; যাহা সাক্ষাৎসম্বন্ধে অভিপ্রেত বিষয়ের (মুক্তির) উপকার সাধন করে, তাহা অন্তরঙ্গ সাধন আর যাহা পরম্পরা সম্বন্ধে অভিপ্রেত সিদ্ধি করে, তাহা বহিরঙ্গ সাধন। তন্মধ্যে, মুমুক্ষু ব্যক্তি ক্রমে বহিরঙ্গ সাধনরাশি অতিক্রম করিয়া অন্তরঙ্গ সাধন সমূহ আয়ত্ত করিতে যত্নপর হইবেন।

এ পর্য্যন্ত যে কয়েকটী সাধনের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার সমষ্টি সংখ্যা,

সাত—বিবেকাদি চতুষ্টয় এবং শ্রবণাদি ত্রয়। তন্মধ্যে বিবেকাদি সাধন চতুষ্টয় শ্রবণাদির সাক্ষাৎ উপযোগী—অন্তরঙ্গ সাধন, শ্রবণাদিও আবার জ্ঞানের সাক্ষাৎ উপকারী—অন্তরঙ্গ সাধন। সুতরাং জ্ঞানের সাধন সম্বন্ধে বিবেকাদি চতুষ্টয় বহিরঙ্গ সাধন এবং শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন কেবল অন্তরঙ্গ সাধন। সাধন সম্বন্ধে অবশিষ্ট জ্ঞাতব্য বিষয় 'প্রয়োজন পরিচ্ছেদে' আলোচিত হইবে।

পূর্ব্বোক্ত উপায়নিচয় এবং বেদ-বিহিত কর্ম্মকলাপ, উভয়ই তত্ত্বজ্ঞানের বহিরঙ্গ সাধন সত্য, কিন্তু কর্ম্মকলাপের অনুষ্ঠানে মনের মালিন্য অপনয়ন ও শুদ্ধি সম্পাদন দ্বারা যেমন জ্ঞানোদয়ের সাহায্য করে, সেই পরিমাণে বিক্ষেপ বা চাঞ্চল্যও সমুৎপাদন দ্বারা চিত্তকে কলুষিতও করিতে পারে; এই কারণে স্থল বিশেষে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানও জ্ঞানোদয়ের অনুকূল না হইয়া বরং সমধিক প্রতিকূল হইয়া থাকে। সেই ভয়ে জ্ঞান-পিপাসু ব্যক্তি আপনিই আপনার শক্তি বুঝিয়া কর্ম্মের আবশ্যকতা অবধারণ করিয়া থাকেন।

অভিপ্রায় এই যে, যজ্ঞাদি কর্ম্ম সমূহ সাধারণতঃ স্ত্রী-পুত্রাদি সহায়-সাপেক্ষ, স্ত্রী-পুত্রাদি স্বজনবর্গ মনের আসক্তি বা অনুরাগবর্দ্ধক, বিষয়াসক্তি আবার একত্বজ্ঞানের (ব্রহ্ম-জ্ঞানের) একান্ত বিরোধী; অতএব সাধন হইলেও যজ্ঞাদি কর্ম্মনিচয় অনেক সময়েই তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার উপযোগী হয় না। সাধক নিজেই তাহা বুঝিয়া, হয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন, নচেৎ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন।

বস্তুতঃ, সূক্ষ্ম বিচার করিয়া দেখিলে সহজেই প্রতিপন্ন হয় যে, পূর্ব্বোক্ত শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনও তত্ত্বজ্ঞানের অন্তরঙ্গ সাধন নহে, বহিরঙ্গ সাধনমাত্র। একমাত্র 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্যই মোক্ষসাধক জ্ঞানের মুখ্য সাধন, (১) অন্য সমস্তই তাহার অঙ্গমাত্র। বেদান্ত-শাস্ত্র-কথিত শ্রবণাদির লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

শ্রবণ—নিম্নলিখিত ষড়্‌বিধ লিঙ্গ দ্বারা সমস্ত বেদান্তবাক্যের অদ্বিতীয় ব্রহ্মবোধ তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণের নাম 'শ্রবণ'।

কোন বাক্য শ্রবণ মাত্রই তাহার তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায়

---

(১) "তত্ত্বমস্যাদিবাক্যোত্থং জ্ঞানং মোক্ষস্য সাধনম্।" বেদান্ত কারিকা।

না, তাৎপর্য্য-নির্দ্ধারণের জন্য (১) 'উপক্রম' ও 'উপসংহার', (২) 'অভ্যাস', (৩) 'অপূর্ব্বতা', (৪) 'ফল', (৫) 'অর্থবাদ' ও (৬) 'উপপত্তি', এই ছয়প্রকার লিঙ্গ (উপায়) অবলম্বন করিতে হয়। (১) উক্ত ষড়্‌বিধ লিঙ্গই বেদান্তের তাৎপর্য্য নিরূপণে মানদণ্ড স্বরূপ।

মনন—বাক্যের তাৎপর্য্য নির্ণীত হইলেও তদ্বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইতে পারে; সেই সংশয় নিবারণের নিমিত্ত 'মননের' আবশ্যক। অনুকূল যুক্তি দ্বারা প্রতিকূল যুক্তি সমূহ খণ্ডিত করিয়া শ্রুত বিষয়ে অসম্ভাবনা (ইহা সম্ভবপর নহে, এইরূপ জ্ঞান) ও বিপরীত ভাবনা (যথার্থ বিষয়ের অন্যথা জ্ঞান) অপনয়ন করার নাম 'মনন'। (২)

এস্থলে একটা শঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে যে, অভ্রান্ত বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্র বাক্যে সন্দেহ করা নাস্তিকের পক্ষে সম্ভবপর হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তত্ত্ব জিজ্ঞাসু আস্তিকের পক্ষে তাহা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না; সুতরা ঐরূপ মননের আবশ্যক কি? বস্তুতঃ এ শঙ্কা যুক্তি যুক্ত হয় না; কারণ সংশয় ধর্ম্মটী মনুষ্যমাত্রেরই স্বভাবসিদ্ধ, আস্তিক, নাস্তিক, সর্ব্বত্রই ইহার তুল্য অধিকার। এইমাত্র প্রভেদ যে, আস্তিক পুরুষ শাস্ত্রবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস

---

(১) ষড়্‌বিধ "লিঙ্গ" এই,—উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতা ফলং। অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্য-নির্ণয়ে॥"

অর্থ এই,—(১) উপক্রম=আরম্ভ ও উপসংহার=শেষ বা সমাপ্তি। (২) অভ্যাস পুনঃ পুনঃ কথন। (৩) অপূর্ব্বতা=অন্যান্য শাস্ত্র ও প্রমাণের অবিষয়ত্ব প্রতিপাদন। (৪) ফল=প্রতিপাদ্য বিষয়ের ফল অর্থাৎ প্রয়োজন নির্দ্দেশ। (৫) অর্থবাদ=কথিত বিষয়ের প্রশংসা বা স্তুতি। (৬) উপপত্তি =কথিত বিষয়ে উপযুক্ত যুক্তি প্রযোগ।

ইহার অভিপ্রায় এই যে, শাস্ত্রীয় কোন প্রকরণে কোন কথার অর্থ বিশেষনির্দ্ধারণ করিতে যদি কোনরূপসংশয় উপস্থিত হয়,তাহা হইলে দেখিতে হইবে যে, সেই প্রকরণের উপক্রম ও উপসংহারে কোন বিষয়টী বর্ণিত আছে, (সাধারণতঃ, উপক্রম ও উপসংহারে একই বিষয় বর্ণিত হইয়া থাকে)। প্রকরণের মধ্যে বারংবার কোন বিষয়ের উল্লেখ আছে। কোন বিষয়ের ফল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এবং কোন্ বিষয়টী প্রশংসা ও যুক্তি দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। যে বিষয়ে এই সমস্ত উপায় বিদ্যমান থাকে, সেই বিষয়ই সেই প্রকরণের তাৎপর্য্য বা প্রাধান্য বুঝিতে হইবে।

(২) "যুক্ত্যা সম্ভাবিতত্বানুসন্ধানং মননং তু তৎ।" পঞ্চদশী।

স্থাপনপূর্ব্বক তাহার তত্ত্বনির্দ্ধারণার্থ শাস্ত্রানুমোদিত তর্কের অনুসরণ করেন, আর নাস্তিক লোক স্বমতের উপর নির্ভর করিয়া স্বকপোলকল্পিত তর্কের সাহায্যে শাস্ত্র-বাক্যের সত্যতা নিরূপণ করিতে যত্নপর হন; কিন্তু শাস্ত্রবাক্যের স্বতঃপ্রামাণ্যে কখনও বিশ্বাস স্থাপন করেন না। আর "নৈষা তর্কেণ মতিরপনেয়া।" অর্থাৎ তর্ক দ্বারা এই তত্ত্ব-বুদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায় না, অথবা অপনয়ন করা উচিত নহে, ইত্যাদি শাস্ত্রে যে, তত্ত্বজ্ঞানে তর্কের অনাদরণীয়তা কথিত আছে, তাহাও এই শেষোক্ত অসার শুষ্ক তর্ক বিষয়েই বুঝিতে হইবে, প্রথমোক্ত তর্ক বিষয়ে নহে; বরং "শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ," ইত্যাদি শ্রুতি এবং "আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা। যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥" (মনু) ইত্যাদি স্মৃতি শাস্ত্র সমূহ অতি স্পষ্টাক্ষরে এই প্রথমোক্ত তর্কের আবশ্যকতা অনুমোদন করিয়াছেন। অতএব, শুষ্ক তর্ক নিষিদ্ধ হইলেও তত্ত্ব-নির্ণয়ার্থ তর্ক করা দোষাবহ নহে। আলোচ্য মনন-কার্য্যে এবম্বিধ তর্কই আদরণীয়, শুষ্ক তর্ক নহে। ফলকথা, তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি অধিগত বিষয়ে সংশয় ও বিপরীত বুদ্ধি অপনোদনের নিমিত্ত অবশ্যই শাস্ত্রানুমোদিত তর্কাত্মক মননের আশ্রয় গ্রহণ করিবে। উক্ত প্রকার মনন দ্বারা শ্রুতার্থ নিঃসংশয়িত হইলে তদ্বিষয়ে নিদিধ্যাসন করা আবশ্যক হয়।

নিদিধ্যাসন—'নিদিধ্যাসন' অর্থ পূর্ব্বোক্ত শ্রবণ ও মননের সাহায্যে নিঃসন্দিগ্ধ বিষয়ে চিত্তের একতানতা অর্থাৎ একাকার বৃত্তিধারা (জ্ঞান প্রবাহ), তন্মধ্যে অন্য কোন বিষয়ের জ্ঞান না থাকা। (৩)

উক্ত ত্রিবিধ উপায়ের মধ্যে শ্রবণ দ্বারা প্রমাণগত সংশয় ও বিপর্য্যয়-জ্ঞান বিনষ্ট হয়, মননের সাহায্যে প্রমেয়-বিষয়ক (জ্ঞাতব্য বিষয়ে) সংশয় ও বিপরীত ভাবনা অপনীত হয়, আর নিদিধ্যাসনপ্রভাবে জ্ঞানগত সংশয় ও বিপর্য্যয় ভাবনা তিরোহিত হইয়া যায়।

---

(৩) "তাভ্যাং নির্ব্বিচিকিৎসেঽর্থে চেতসঃ স্থাপিতস্য যৎ।
একতানত্বমেতদ্ধি নিদিধ্যাসনমুচ্যতে॥" (পঞ্চদশী)

অর্থ—পূর্ব্বোক্ত শ্রবণ ও মনন দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধ বিষয়ে স্থাপিত চিত্তের যে একাগ্রতা, তাহারই নাম 'নিদিধ্যাসন। নিদিধ্যাসন ও সমাধি একই শ্রেণীভুক্ত কার্য্য।

অভিপ্রায় এই যে, বেদান্তবাক্যনিচয় কি অদ্বিতীয় ব্রহ্মবোধক? না অন্য পদার্থ-বোধক? ইত্যাদি সংশয়, কিংবা অন্য কোনপ্রকার ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত উপস্থিত হইলে, শ্রবণের সাহায্যে তাহা অপনোদিত হয়। পরে, বেদান্তে যে, জীব-ব্রহ্মের ঐক্য কথিত আছে, তাহা সত্য কি না? ইত্যাদি প্রকার প্রমেয়-বিষয়ক সংশয় এবং জীব ও ব্রহ্মের ভেদই সত্য, তদুভয়ের ঐক্য কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না; ইত্যাদিরূপ বিপরীত জ্ঞান মননের দ্বারা নিবারিত হইয়া যায়। তাহার পরও জ্ঞানের উপর সংশয় ও বিপরীত ভাবনা উপস্থিত হইতে পারে, অর্থাৎ বেদান্তোক্ত জীব-ব্রহ্মের অভেদ-বোধ বা একত্ব জ্ঞানই সত্য? কিংবা ব্যবহার-সিদ্ধ দেহাত্ম-জ্ঞানের ন্যায় জীব-ব্রহ্মের ভেদ-জ্ঞানই সত্য? এই প্রকার জ্ঞানগত সংশয় ও বিপর্য্যয়-ভাবনা নিদিধ্যাসনের সাহায্যে প্রশমিত হয়।

পূর্ব্বোক্ত অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনা, উভয়ই তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধক। শ্রবণাদি সাধনত্রয় সেই দ্বিবিধ জ্ঞান-প্রতিবন্ধক বিধ্বস্ত করিয়া জ্ঞানোৎপত্তির পথ প্রশস্ত ও নিষ্কণ্টক করিয়া দেয়, তজ্জন্য তাহারাও জ্ঞানের 'সাধন রূপে কথিত ও গৃহীত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ তত্ত্বজ্ঞান সমুৎপাদন করা শ্রবণাদি সাধন ত্রয়ের ফল নহে, উহা একমাত্র "তৎ ত্বম্ অসি" প্রভৃতি মহাবাক্য হইতেই উৎপন্ন হয় এবং আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ দুঃখ বিধ্বস্ত করিয়া সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম-প্রাপ্তিরূপ মুক্তি সম্পাদন করে।

অতএব, অধিকারী ব্যক্তি প্রথমে নিম্নতন বহিরঙ্গ সাধন সমূহে সিদ্ধিলাভ করিয়া ক্রমে সমুন্নত সাধন লাভে যত্নবান্ হইবেন। যাহারা আশু ফল-লাভের প্রত্যাশায় স্বীয় যোগ্যতা বিস্মৃত হইয়া চিরন্তন ক্রমপথ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক প্রথমেই সমুন্নত সাধন-পথে পদার্পণ করিতে প্রয়াস পায়, তাহারা যে নিশ্চয়ই স্বার্থভ্রষ্ট ও বিপদ্গ্রস্ত হইবে, তাহা বলাই অনাবশ্যক।

এ কথাও বলা বাহুল্য যে, জাগতিক অন্যান্য বস্তুর ন্যায় উল্লিখিত অধিকারীর মধ্যেও উত্তম, মধ্যম ও অধম; এই ত্রিবিধ ভেদ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত বৈরাগ্যের তারতম্যই এই প্রভেদের একমাত্র নিদান। বুঝিতে হইবে, যাহার হৃদয়ে যে পরিমাণে বৈরাগ্য-বীজ অঙ্কুরিত হয়, সে লোক সেই পরিমাণেই সিদ্ধির দিকে অগ্রসর হয় এবং উপযুক্ত সময়ে সাফল্য লাভ করে।

সাময়িক ঘটনাচক্রের তীব্রতাড়নাবশে যাহার হৃদয়ে ক্ষণিক বৈরাগ্যের ক্ষীণ রেখা দেখা দেয়; লোকে যাহাকে শ্মশান-বৈরাগ্য (৪) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে; তাদৃশ বৈরাগ্যসম্পন্ন লোক এবিষয়ে অধমাধিকারী; তাহার পক্ষে সিদ্ধি লাভ বহুতর আয়াস ও সুদীর্ঘ-সময় সাপেক্ষ। যাহার হৃদয়ে তদপেক্ষা দৃঢ়তর বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়; তাদৃশ মধ্যমাধিকারীর পক্ষে সিদ্ধি লাভ অপেক্ষাকৃত অনায়াস ও অল্পকালসাধ্য। আর যাহার হৃদয়ে প্রগাঢ় বৈরাগ্য-বহ্নির তীব্র তাপে বাসনাময় বিষতরু সমূলে দগ্ধ হইয়া যায়, তাদৃশ লোক উত্তমাধিকারী, এবং তাহার পক্ষেই ফলসিদ্ধি অতি সন্নিহিত, অর্থাৎ অল্পক্লেশ ও অল্প সময়ে সম্পন্ন হইয়া থাকে (২)। অতএব মুমুক্ষুমাত্রেরই এই তীব্র বৈরাগ্য-লাভে দৃঢ়তর উৎসাহ ও যত্ন করা আবশ্যক।

ফল কথা, জন্ম জন্মান্তরীণ পুণ্যবলে যে লোক দৃশ্যমান জগতের অনিত্যতা ও অসারতা এবং একমাত্র পরম ব্রহ্মের কূটস্থনিত্যতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে; ঐহিক ও পারলৌকিক সর্ব্ববিধ বিষয়-ভোগের তৃষ্ণা ত্যাগ করিতে শক্ত হইয়াছে; বাহ্য ও অন্তরিন্দ্রিয় নিচয়কে নিজের অধীন রাখিয়া শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহনপূর্ব্বক শ্রদ্ধা সহকারে মুক্তি লাভ-লালসায় সংন্যাস গ্রহণে সমর্থ হইয়াছে, এবং পরতত্ত্ব সাক্ষাৎকারাভিলাষ সমাধি-সাধনে মনোনিবেশ করিয়াছে; সেই লোকই অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান লাভের প্রকৃত অধিকারী। উক্তপ্রকার সাধনবিহীন পুরুষের পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা করা কেবলই বিড়ম্বনামাত্র। অধিকারীর কথা এখানেই সংক্ষেপে সমাপ্তকরা গেল, অতঃপর অদ্বৈতবাদের প্রতি-পাদ্য বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

---

(৪) শ্মশান-ভূমিতে শবদেহ দাহ করিতে গেলে অন্ততঃ সেই সময়ের জন্যও লোকের মনে যে একপ্রকার ঔদাস্য উপস্থিত হয়, তাহাকে 'শ্মশান-বৈরাগ্য' বলে।

(২) মহর্ষি পতঞ্জলি "তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ"। (পাতঞ্জল যোগ সূত্র।১।২১।) এই সূত্রে তীব্র অভিনিবেশ সম্পন্ন যোগীর পক্ষেই শীঘ্র ফল লাভের কথা বলিয়া গিয়াছেন।

বিষয়-পরিচ্ছেদ।

ব্রহ্ম সত্য।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে সমালোচ্য অদ্বৈত বাদ শব্দের অর্থ এবং তাহার মৌলিকতা, সারবত্তা এবং তদানুষঙ্গিক আরও অনেক বিষয় বিবেচিত হইয়াছে, অদ্বৈত-তত্ত্ব জিজ্ঞাসার প্রকৃত অধিকারী ও অধিকার-নির্ব্বাহক সাধন বিধি, সে সমুদয়ও সংক্ষেপে সমালোচিত হইয়াছে এবং সাধনের তারতম্যানুসারে অধিকারীর ত্রিবিধ ভেদ এবং তীব্র বৈরাগ্য সম্পন্ন উত্তমাধিকারীর আশু ফলসিদ্ধি প্রভৃতি বিষয় সমূহও যথাযথরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, কথিত অধিকারী পুরুষ যাহার জন্য এত কঠোর সাধন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন; যাহার উদ্দেশে প্রাণসম প্রিয়তম সংসারভোগে জলাঞ্জলি দিয়া বিজন তরুতল আশ্রয় করেন, যে রস আস্বাদের আশায় দুর্লভ স্বর্গ-সুখও উপেক্ষা করিয়া দুর্গম তপোমার্গ অঙ্গীকার করেন, বেদ-বেদান্ত-বেদ্য সেই তত্ত্বটা কি? এবং কি প্রকার? এই জিজ্ঞাসিত বিষয় নির্দ্দেশের জন্য এই বিষয় পরিচ্ছেদের অবতারণা হইতেছে।

প্রচলিত বেদান্ত শাস্ত্র বহু বিস্তৃত ও অনেক শাখায় বিভক্ত। এজন্য যদিও তাহার যথার্থ অর্থ নিষ্কাশন করা সুগভীর পাণ্ডিত্য ও সমধিক যত্ন সাপেক্ষ সত্য, তথাপি আমাদিগের হতাশ বা ভগ্নোদ্যম হইবার কোন কারণ নাই; কারণ, পূর্ব্বতন সদাশয় আচার্য্যগণ তদ্বিষয়ে প্রবেশের অনেক সুগম সরল ও সুপ্রশস্ত পথ আবিষ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বেদান্ত শাস্ত্র-সমুদ্র আলোড়নপূর্ব্বক যে সার সমুদ্ধৃত করিয়াছিলেন, জগতের কল্যাণার্থ তাহা অতি সংক্ষেপে তিনটী কথায় বলিয়া দিয়াছেন "ব্রহ্ম সত্যং জগৎ মিথ্যা, জীবোব্রহ্মৈব নাপরঃ।" ইহাই আলোচ্য অদ্বৈতবাদের মূল ভিত্তি—সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রের প্রধান প্রতিপাদ্য—নিগূঢ় রহস্য।

এই মহাবাক্যার্থই একদিন জ্ঞানগুরু শঙ্করস্বামীর হৃদয়ে জাগরিত হইয়া তাঁহাকে উন্মাদিত করিয়াছিল; তিনিও একদিন এই ধ্রুবসত্য বেদার্থ প্রচার দ্বারা ভারতের মানব-মণ্ডলীর মানস ক্ষেত্রে এক অভিনব বৈরাগ্য-বীজ বপন

করিয়াছিলেন, একদিন এই মহামন্ত্র বলেই ভারতীয় জীব নিবহকে ধর্ম্ম-জলধিগত প্রবল বৌদ্ধ-বাত্যা হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, এবং ইহারই তারধ্বনিতে মায়াময় মোহ-নিদ্রায় অভিভূত সমস্ত জীবের অন্তরে অন্তরে দিব্য চৈতন্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।

(১) "ব্রহ্ম সত্যং (২) জগৎ মিথ্যা (৩) জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।" এই কথাটী সংক্ষিপ্ত হইলেও গভীর গবেষণাময় রহস্যে পরিপূর্ণ। ইহার প্রকৃত ভাব অভিব্যক্ত করিতে হইলে, ব্রহ্ম ও তাঁহার সত্যত্ব, জগৎ ও তাহার মিথ্যাত্ব, এবং জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপ ও অবস্থা প্রভৃতি বিষয়গুলির ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। এইজন্য 'ব্রহ্ম সত্য' 'জগৎ মিথ্যা' ও 'জীব ব্রহ্মেরই স্বরূপ' এই তিনটী মাত্র কথা অবলম্বন করিয়া অবশিষ্ট বিষয়গুলিও পৃথক্ পৃথক্‌রূপে পর্য্যালোচিত হইবে।

ব্রহ্ম কি ?—ব্রহ্মের স্বরূপ জানিতে হইলে প্রধানতঃ শ্রুতি পথের অনুসরণ করিতে হয়; শ্রুতির বিমল উপদেশময় দিব্যালোক ব্যতীত অজ্ঞানান্ধ অর্ব্বাচীন জনের হৃদয়-কন্দরে তাঁহার তত্ত্ব কখনই পরিস্ফুট হইতে পারে না। যুক্তি তর্ক যতই প্রবল বা সুদৃঢ় হউক না কেন, তাহা দ্বারা কেবল 'ব্রহ্ম আছেন কিনা ?' এই সংশয়, অথবা 'ব্রহ্ম নাই' এইরূপ ভ্রম-সিদ্ধান্ত অপনীত হইতে পারে মাত্র, কিন্তু, তাহা দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি

(১) কার্য্য-কারণভাব-মূলক অনুমান এইরূপ,—কার্য্য থাকিলেই তাহার একটী কারণ থাকা আবশ্যক, এই বিশাল জগৎও একটী কার্য্য, সুতরাং, ইহারও একজন কারণ বা কর্ত্তা থাকা আবশ্যক ইত্যাদি। উক্ত প্রকার অনুমানের বিপক্ষেও এই সকল আপত্তি উত্থিত হইতে পারে যে, কোন কার্য্য করিতে হইলে শরীর থাকা আবশ্যক, যাহার শরীর নাই, সে কখনও কোন কার্য্য করিতে পারে না। ঈশ্বর যখন তোমার মতেও অশরীর, তখন তাঁহাকে কর্ত্তা বলা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ যে পদার্থটী কেবলই অনুমানসিদ্ধ—কস্মিন্‌কালেও প্রত্যক্ষ-গোচর হয় না, তদ্বিষয়ে অনুমান প্রযুক্ত হইলেও নিঃসংশয়িতরূপে সে বিষয়ের অস্তিত্ব সাধন করিতে পারে না। মনে কর, সচরাচর মৃন্ময় সমস্ত বস্তুতেই লৌহ দ্বারা অঙ্কণ করা যায় দেখিয়া কেহ যদি অনুমান করে যে, কাচও যখন মৃন্ময়, তখন তাহাতেও লোহার দাগ বসান যাইতে পারে; তাহা হইলে, সেই অনুমানটী নিশ্চয়ই ভ্রান্ত হইবে, কারণ কাচে কখনও লোহার দাগ বসে না। অতএব অনুমিত পদার্থটী যতক্ষণ প্রত্যক্ষ বা শাস্ত্র দ্বারা সমর্থিত না হয়, ততক্ষণ সংশয় ক্ষেত্র—অপ্রমাণ।

করা কস্মিন্ কালেও সম্ভবপর হইতে পারে না, এবং কার্য্য-কারণভাব-মূলক (১) অনুমান সাহায্যেও তাঁহার রূপ নিরূপণের সম্ভাবনা নাই; কাজেই তাঁহার নির্ব্বিশেষ স্বরূপ বিশেষ অবগতির নিমিত্ত নিত্যনির্দ্দোষ স্বতঃপ্রমাণ শ্রুতি-বাক্যের শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন আর উপায় নাই। ঈশ্বর কৃষ্ণ বলিয়াছেন—(১) যে সকল বিষয় অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, 'সামান্যতোদৃষ্ট' অনুমান দ্বারা সেই সকল দুজ্ঞের্য়র বিষয় জানিতে পারা যায়। কিন্তু 'সামান্যতোদৃষ্ট' অনুমানেও যাহা সিদ্ধ হয় না, অর্থাৎ অবগত হওয়া যায় না; তাহা 'আপ্তাগম' অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত নির্দ্দোষ শাস্ত্রবাক্য হইতে জানিতে পারা যায়। তাদৃশ নির্দ্দোষ শাস্ত্র বেদ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না; কেন না, পুরুষমাত্রেই ভ্রম, প্রমাদাদি দোষ থাকা সম্ভবপর; কাজেই পৌরুষেয় বাক্য স্বতঃপ্রমাণ হইতে পারে না; কিন্তু ঈশ্বর নিত্য নির্দ্দোষ; সুতরাং তদ্বাক্য-বেদে আর ভ্রম প্রমাদাদি দোষের সম্ভাবনা নাই, কাজেই বেদকে স্বতঃপ্রমাণ বলিতে হয়। সুতরাং চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ও অনুমানাদি প্রমাণের অবিষয় কোনও বিষয় জানিতে হইলে স্বতঃপ্রমাণ বেদের আশ্রয় গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক। অনুমানাদি প্রমাণের দ্বারা যে ব্রহ্মের স্বরূপ কেন জানা যায় না, কিঞ্চিৎ পরেই তাহা আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝান হইবে।

শ্রুতি অনুসারে অনুসন্ধান করিলে ব্রহ্মের দ্বিবিধ লক্ষণ আমাদের জ্ঞান-পথে পতিত হয়, একটি 'স্বরূপলক্ষণ', অপরটি 'তটস্থ লক্ষণ'। তন্মধ্যে, 'সৎ-চিৎ আনন্দ' তাঁহার স্বরূপলক্ষণ এবং জগৎ-কর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি তাঁহার তটস্থ লক্ষণ। (২) 'চিৎ' ও 'আনন্দের' কথা পরে বলা যাইবে, এখন 'সৎ' শব্দের ব্যাখ্যা করা যাউক,—

'সৎ'—যাহার সত্তা—অস্তিত্ব অব্যাহত, অর্থাৎ কোন কালে কোন

---

(১) "সামান্যতস্তু দৃষ্টাদতীন্দ্রিয়াণাং প্রতীতিরনুমানাৎ।

তস্মাদপিচাসিদ্ধং পরোক্ষমাপ্তাগমাৎ সিদ্ধম্।" ঈশ্বর কৃষ্ণ ষষ্ঠ কারিকা। ৬।

কোন সাধারণ (সামান্য) ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ দ্বারা যে বিজাতীয় অন্য পদার্থের অনুমান, তাহা 'সামান্যতো দৃষ্ট' নামক অনুমান।

(২) "সচ্চিদানন্দময়ং পরং ব্রহ্ম।" (নৃসিংহ পূর্ব্বতাপনী ১।৭)

"সত্যং জ্ঞানমনন্তমানন্দং ব্রহ্ম।" (সর্ব্বোপনিষৎসার।)

"সত্যং জ্ঞানমনন্তমানন্দং ব্রহ্ম।" (তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২।১।১) ইত্যাদি।

দেশে বা কোন উপায়ে কখনও যাহা বাধা কিংবা বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, তাদৃশ নিত্য বস্তুই 'সৎ' শব্দের যথার্থ অর্থ। উক্ত কোন প্রকারেই ব্রহ্মের বাধা হয় না, এজন্য ব্রহ্ম 'সৎ'।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, ব্রহ্ম ও 'সৎ' এবং ব্যবহার-সিদ্ধ ঘট-পটাদি বস্তুও 'সৎ'; কিন্তু ঘটপটাদির বিনাশশীলতা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ; অতএব সৎ-ব্রহ্মের স্বরূপও কি তদ্রূপ? তাহা হইলেত উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র পার্থক্য রক্ষা পায় না, পক্ষান্তরে ঘটপটাদির ন্যায় ব্রহ্মেও অনিত্যতা দোষ আসিয়া পড়ে। একথার উত্তরে বৈদান্তিকগণ বলেন যে, যদিও আপাতজ্ঞানে ব্রহ্মের ও ঘটপটাদির সত্তায় বিশেষ পার্থক্য প্রতীত হয় না বটে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদই বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই প্রভেদ জ্ঞাপনের জন্য তাঁহারা 'সত্তার' তিনটী শ্রেণী নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। প্রথম 'প্রাতিভাসিক', দ্বিতীয় 'ব্যাবহারিক', তৃতীয় 'পারমার্থিক'।

তন্মধ্যে, যে সকল পদার্থ যাবৎপ্রতিভাস, অর্থাৎ যতক্ষণ জ্ঞান বা প্রকাশ, ততক্ষণ মাত্র বর্ত্তমান থাকে, অর্থাৎ 'অস্তি' বা 'সৎ' এই প্রকার প্রতীতির বিষয়ীভূত হয় এবং প্রকৃত জ্ঞান উপস্থিত হইবামাত্র সৌরকর-স্পৃষ্ট নীহারবৎ বিলীন হইয়া যায়, সেই সকল পদার্থ 'প্রাতিভাসিক' সত্তা-যুক্ত। ভ্রমকল্পিত রজ্জু-সর্প ও শুক্তি-রজত প্রভৃতি অসত্য পদার্থ গুলি এই শ্রেণীর সত্তাযুক্ত 'প্রাতি ভাসিক সৎ'।

যে সকল পদার্থ তত্ত্ব-বিচারে অসৎ বা মিথ্যা বলিয়া অবধারিত হইলেও ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার না হওয়া পর্য্যন্ত—ব্যবহার সময়ে 'সৎ' বলিয়া গৃহীত হয়, অথবা 'সৎ' রূপে ব্যবহৃত হয়, সেই সমুদয় পদার্থ 'ব্যাবহারিক' সত্তাযুক্ত। আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য ঘট, পট, গৃহাদি পদার্থ গুলি এই জাতীয় সত্তাযুক্ত, অর্থাৎ 'ব্যাবহারিক সৎ'।

আর যে পদার্থের সত্তা ঘট-পটাদির ন্যায় দেশ কালাদি সাপেক্ষ ও পরিচ্ছিন্ন নহে এবং কোনরূপ বাধযুগ্যও নহে, সেই পদার্থ 'পারমার্থিক' সত্তাযুক্ত।

এই পারমার্থিক সত্তা ব্রহ্ম ভিন্ন অন্যত্র কুত্রাপি নাই; সুতরাং তিনিই একমাত্র 'পরমার্থ সৎ'। ব্রহ্মের এই অবাধিত পারমার্থিক সত্তার সান্নিধ্য

লাভেই অপরাপর অসৎ পদার্থও সৎপদার্থের ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকে। জিজ্ঞাসুগণ সমাধিপ্রভাবে একমাত্র ব্রহ্মের পরমার্থ সত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া আপেক্ষিক ও সাময়িক সত্তা-সম্পন্ন এই চিরসোধিত প্রিয় সংসারকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মভাব লাভে সমুৎসুক ও যত্নপরায়ণ হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ব্রহ্ম ভিন্ন আর কেহই পারমার্থিক সত্ত্বা লাভ করিতে সমর্থ হয় না; কেন না, তত্ত্ব-জ্ঞানোদয়ে ব্রহ্ম ভিন্ন সমস্ত পদার্থই বাধিত—মিথ্যারূপে অবধারিত হইয়া যায়। ব্রহ্ম যে, কেন বাধিত হন না, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রহ্মের এই পারমার্থিক সত্ত্ব-প্রতিপাদন উদ্দেশেই "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ", (ছান্দোগ্য, ৬। ২।) "অসন্নেব স ভবতি, অসদ্ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ। * * * অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ, সন্তমেনং ততো বিদুঃ।" (তৈত্তিরীয়োপনিষৎ। ১। ৬। ১।) "অসতো মা সদ্গময়।" (বৃহদারণ্যক। ১ ৩। ২৪।) "সদ্ব্রহ্মাত্মাহমিত্যেবং বোধে স্বাত্মৈব শিষ্যতে।" (পঞ্চদশী।) "ওঁম্ তৎ সদিতিনির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।" (গীতা ১৭। ২৩) ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতি শাস্ত্র সমূহ ভূয়োভূয়ঃ ব্রহ্মকে 'সৎ' বলিয়া স্পষ্ট কথায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং ইহার বিপরীত জ্ঞানকে "অসন্নেব স ভবতি" বলিয়া তীব্রস্বরে নিন্দা করিয়াছেন। অথচ এ কথার বিরুদ্ধে একরূপ কোনও প্রবলতর যুক্তি দেখা যাইতেছে না, যাহাতে উক্ত সিদ্ধান্তের অসারতা প্রতিপন্ন হইতে পারে; সুতরাং ব্রহ্মের পারমার্থিক সত্তা স্বীকারে কোনই বাধা দেখা যাইতেছে না। বিশেষতঃ এই মতে ব্যবহারিক সত্তা অনুসারে ঘটপটাদির এবং প্রাতিভাষিক 'সত্তা' অনুসারে শুক্তি-রজতাদির 'সত্তা'-ব্যবহারও প্রচলৎ থাকিতে কোন আপত্তি হইতে পারে না। (১) ব্রহ্ম যে বাধিত হন না, তাহা এক প্রকার প্রদর্শিত হইয়াছে; প্রকারান্তরেও তাঁহার অবাধিতত্ব প্রমাণ করা যাইতে পারে।

শাস্ত্র ও তদনুগত যুক্তি অনুসারে জানা যায়, আলোচ্য ব্রহ্মই একমাত্র স্বপ্রকাশ ও অখণ্ড জ্ঞানময় পদার্থ, তদতিরিক্ত জ্ঞান বলিয়া কোনও পদার্থ নাই,

(১) "যদ্বা, ত্রিবিধং সত্ত্বং—পারমার্থিকং, ব্যবহারিকং, প্রতিভাসিকঞ্চেতি। তত্র পারমার্থিকং সত্ত্বং ব্রহ্মণঃ, ব্যবহারিকং সত্ত্বমাকাশাদেঃ, প্রাতিভাষিকং সত্ত্বং শুক্তি-রজতাদেঃ।"

(বেদান্তপরিভাষা, অনুমান পরিচ্ছেদ)

জৈবিক জ্ঞান কেবল তাঁহারই কণিকামাত্র ; ইহা শ্রুতির কথা। (২) এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, সেই অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম বাধিত হবে কাহার দ্বারা ? কোন বস্তু বাধিত হইল কি না, তাহার একমাত্র সাক্ষী জ্ঞান—আত্মা। সকল বাধের সাক্ষীভূত সেই জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মও যদি বাধিত হন, তাহা হইলে তাহার আবার সাক্ষী হইবে কে? সাক্ষিশূন্য (অপ্রামাণিক) ও যুক্তি-বিরুদ্ধ কথা সুধীগণ কখনই বিশ্বাস করিতে পারেন না। এই সাক্ষীর জন্য যদিও জ্ঞানান্তর অর্থাৎ আর একটী পৃথক্ জ্ঞান স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলেও শাস্ত্র-বিরোধ এবং অনিবার্য্য 'অনবস্থা' দোষ আসিয়া উপস্থিত হয়। (১) বিশেষতঃ জ্ঞান ভিন্ন আর কেহই কখনও জ্ঞানের বাধা ঘটাইতে পারে না ; এই কারণেই শুক্তিতে যখন রজতভ্রম হইয়া থাকে, তখন একমাত্র শুক্তি-জ্ঞান দ্বারাই (ভ্রান্ত) সেই রজত জ্ঞানের বাধা হইতে দেখা যায়। ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, তদ্ভিন্ন আর দ্বিতীয় জ্ঞান পদার্থ নাই, জ্ঞানান্তর মানিলেই 'অনবস্থা' দোষ উপস্থিত হয়। আর নিজেও যখন নিজের বাধক হয় না বা হইতে পারে না, তখন নিঃসংশয়রূপে অবধারিত হইতেছে যে, ব্রহ্ম অবাধিত—পরমার্থ সৎ। 'সৎ' শব্দের অর্থ এ স্থলেই শেষ করা হইল, এখন, 'চিৎ' ও 'আনন্দ' শব্দের অর্থ আলোচনা করা যাউক।

ব্রহ্ম চিৎস্বরূপ—'চিৎ' অর্থ চৈতন্য, জ্ঞান বা প্রকাশস্বভাব। জগতে আমরা সাধারণতঃ দুইপ্রকার পদার্থ অনুভব করিয়া থাকি, এক চিৎ বা চেতন, অপর অচিৎ বা জড়। চিৎ জড, জ্ঞান অজ্ঞান, এবং চেতন অচেতন, এসমস্ত কথা ঐ দুইটী ভাবেরই প্রকাশকমাত্র। তন্মধ্যে চিৎ পদার্থটী স্বয়ংপ্রকাশ, ও পরপ্রকাশক, আর অচিৎ পদার্থমাত্রই নিজে অপ্রকাশ ও চিৎ প্রকাশ্য। স্ফটিক যতই স্বচ্ছ হউক না কেন, আলোকের সাহায্য ব্যতীত যেমন কখনই প্রকাশ পায় না, তেমনই জড় পদার্থ যতই উৎকৃষ্ট হউক না কেন, চৈতন্যের সংস্পর্শ ভিন্ন কখনই আপনার অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতে সমর্থ হয় না।

---

(২) "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং, তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।"

(১) যেরূপ যুক্তির অবতারণা করিলে তর্কের শেষ হয় না, তাদৃশ তর্ক প্রণালীকে "অনবস্থা দোষ' বলে। এই স্থলে জ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্মের বাধ-সাক্ষী অন্য জ্ঞান আবার তাহার বাধ-সাক্ষী অন্য জ্ঞান, এই রূপে অনবরত পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞানধারা স্বীকার করিতে হইলে সেই অনবস্থা দোষ ঘটে।

চৈতন্যের স্বভাব যেরূপ, জড়ের স্বভাব ঠিক তাহার বিপরীত; আলোক ও অন্ধকারের মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ, চিৎ-জড়ের মধ্যেও ঠিক সেইরূপ সম্বন্ধ নিহিত আছে। স্বয়ংপ্রকাশ চৈতন্য যদি না থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই বিশাল জগৎ অজ্ঞানের অবিজ্ঞেয় গর্ভে চিরদিনের জন্য লুক্কায়িত থাকিত, অথবা কস্মিন্‌কালেও অস্তিত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইত না।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, সেই চৈতন্য পদার্থটী এক? কি অনেক? এবং নিত্য কি অনিত্য? তদুত্তরে অদ্বৈতবাদিগণ বলেন,—যেখানে একটীমাত্র পদার্থ স্বীকার করিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, সেখানে অকারণ অধিক কল্পনা করা যুক্তি-সম্মত হইতে পারে না; সুতরাং চৈতন্যের বহুত্ব স্বীকার অনাবশ্যক। আপাত দৃষ্টিতে প্রতিপুরুষে চৈতন্যের—জ্ঞানের বহুত্ব প্রতীত হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহা যে এক বৈ বহু নহে, তাহা নিম্নলিখিত উপায়ে প্রমাণিত হইতে পারে।

সচরাচর আমরা যাহাকে জ্ঞান বলিয়া মনে করি, প্রকৃতপক্ষে তাহা ব্রহ্ম-চৈতন্য নহে; উহা অন্তঃকরণের এক প্রকার পরিণামমাত্র। সৌরালোক-সম্পর্কবশতঃ দর্পণে যেরূপ সাময়িক আলোক স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে, উহাও তদ্রূপ—বুদ্ধি-দর্পণে আত্ম-চৈতন্যের ক্ষণিক প্রতিভাস মাত্র। ঘটপটাদি বিবিধ বিষয় সংস্পর্শে অন্তঃকরণের নানাপ্রকার বৃত্তি উপস্থিত হয়; সুতরাং সেই বৃত্তিভেদে একই জ্ঞানের পার্থক্য প্রতীতি হইয়া থাকে; যথা—ঘট, পট ও মঠ এই তিনটী পরস্পর ভিন্ন পদার্থ, কাজেই তদ্বিষয়ক অন্তঃকরণের বৃত্তিও ভিন্ন ভিন্ন, এবং তৎপ্রতিফলিত জ্ঞানও বিভিন্নাকারে প্রতিভাত হইয়া থাকে। এখন জ্ঞান হইতে যদি ঐ ঘট, পট ও মঠ, এই বিষয় তিনটীকে সরাইয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ জ্ঞানত্রয়ের স্বরূপগত কোনই প্রভেদ থাকে না, সকলই একাকার একই পদার্থ—জ্ঞানস্বরূপ হয়, তখন উহাদের সেই আরোপিত ভেদ অন্তর্হিত হইয়া যায়, সুতরাং ঐ তিনই এক অভিন্ন হইয়া পড়ে। এইরূপ, দিন, মাস, বৎসর যুগাদি যে কোন সময়ে হউক, সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইবে বিষয়ের ভেদনিবন্ধনই জ্ঞানের ভেদ, নচেৎ জ্ঞান স্বরূপতঃ এক—অনন্ত অখণ্ড পদার্থ। আর এ কথাও ধ্রুব সত্য যে, অন্য বস্তুর সম্বন্ধ ব্যতীত কস্মিন্ কালেও যাহাদের ভেদপ্রতীতি হয় না, প্রকৃতপক্ষে তাহারা পরস্পর ভিন্ন নহে—এক অভিন্ন পদার্থ,

জ্ঞানের জ্ঞেয় ঘট পটাদির ভেদনিবন্ধনই যখন জ্ঞানের ভেদ, তখন সেই জ্ঞান সর্ব্বদাই এক—কখনও বহু হইতে পারে না।

উক্ত নিয়মানুসারেই বিভিন্ন পুরুষগত জ্ঞানেরও অভেদ সাধন করিতে হইবে।

এখন চিৎ বা জ্ঞান পদার্থটী নিত্য কি অনিত্য, এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হয় যে, জ্ঞান নিত্য—হ্রাস বৃদ্ধি রহিত এবং উৎপত্তি-বিনাশ বর্জ্জিত, নির্ব্বিকার স্বরূপ।

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত দৃশ্য পদার্থের সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধ সংঘটিত হইলেই দৃশ্যানুসারে অন্তঃকরণের একপ্রকার পরিণাম বা অবস্থান্তর উপস্থিত হয়। স্বচ্ছ অন্তঃকরণের সেই পরিণতিকেই 'বৃত্তি' আখ্যা প্রদান করা হইয়া থাকে। আত্ম-চৈতন্য সেই অন্তঃকরণবৃত্তিতে প্রতিফলিত হয়, এই প্রতিফলন বা প্রতি-বিম্বনকেই আমরা 'জ্ঞান' শব্দে ব্যবহার করিয়া থাকি। চৈতন্যাভিব্যঞ্জক এই বৃত্তিটী বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগবশতঃ জন্ম লাভ করে এবং পরক্ষণেই আবার বিনাশগ্রস্ত হইয়া যায়; এই কারণে বৃত্তি উৎপত্তিবশতঃ তদাভিব্যক্ত জ্ঞানেরও উৎপত্তি ধ্বংস ও হ্রাস-বৃদ্ধি ব্যবহার হইয়া থাকে; বস্তুতঃ ঐ জ্ঞানের জন্ম, নাশ কিংবা হ্রাস বৃদ্ধি কিছুই নাই। বিশেষতঃ কোন পদার্থের নিত্যত্ব সম্ভব থাকিতেও যে অনিত্যতা কল্পনা করা, তাহা কেবল কার্য্য-কারণ ভাবের গৌরব বৃদ্ধি করা ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব জ্ঞানের যে উৎপত্তি-বিনাশাদি ব্যবহার, তাহা কেবল তদভিব্যঞ্জক অন্তঃকরণবৃত্তির উৎপত্তি-বিনাশাধীন, বস্তুতঃ জ্ঞান পদার্থটী কূটস্থ নিত্য ব্রহ্মস্বরূপ; তাহার উৎপত্তিও নাই ধ্বংসও নাই। এ বিষয়ে আরও যাহা কিছু বক্তব্য রহিল, তাহা তৃতীয় পরিচ্ছেদে বলা হইবে। এখন 'ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ,' এ কথার আলোচনা করা যাউক।

ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ—আনন্দ অর্থ সুখ বা প্রীতি। আমাদের দৈনন্দিন আনন্দের সহিত এ আনন্দের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। আমাদের সুখ সাধারণতঃ বিষয়-বিশেষের সংযোগে সমুৎপন্ন হয় এবং সময়ে বিনষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু ব্রহ্ম সম্পূর্ণ তদ্বিপরীত—উৎপত্তি-বিনাশ রহিত—নিত্য। আমাদের সুখ একপ্রকার মনোবৃত্তি মাত্র, প্রিয় বস্তুর সমাগমে উৎপন্ন হয়, আবার তাহার বিয়োগে বা সমকালেই বিনষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু ব্রহ্মানন্দ জন্ম-মৃত্যু বর্জ্জিত—নিত্য, অখণ্ড ও প্রকাশময়।

ব্রহ্মের এই যে তিনটী রূপ নিরূপিত হইল, আপাতদৃষ্টিতে পার্থক্য বোধ হইলেও বস্তুতঃ এই তিনই এক—অভিন্ন; কেবল নাম মাত্র ভিন্ন (২)। এই কারণেই ব্রহ্ম সৎ-চিৎ-আনন্দময় হইয়াও দ্বৈত-ভাব হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন এবং অখণ্ড অদ্বৈতভাব রক্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই জন্য "একমেবাদ্বিতীয়ম্," শ্রুতিও তাঁহার একত্ব ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন—যে, ব্রহ্ম নিশ্চয়ই এক ও অদ্বিতীয়।

এখানে 'এক,' 'এব' ও 'অদ্বিতীয়' এই তিনটী বিশেষণ দ্বারা ব্রহ্মকে বিশেষিত করা হইয়াছে, এবং অপরাপর পদার্থের ন্যায় ব্রহ্মেও যে ত্রিবিধ ভেদের সম্ভাবনা ছিল, ঐ বিশেষণত্রয়ের সাহায্যে সেই ত্রিবিধ ভেদ—সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে।

কথাটা এইরূপ—জাগতিক যে কোন বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়, দেখিতে পাওয়া যায়, প্রত্যেক বস্তুতেই তিন প্রকার ভেদ বিদ্যমান রহিয়াছে, (১) সজাতীয় ভেদ, (২) বিজাতীয় ভেদ, (৩) স্বগত ভেদ। উক্ত ত্রিবিধ ভেদে অসংস্পৃষ্ট বস্তু জগতে নাই বা থাকিতে পারে না। একটী বৃক্ষের যে বৃক্ষান্তর হইতে ভেদ, তাহা তাহার সজাতীয় ভেদ, প্রস্তরাদি হইতে যে ভেদ, তাহা বিজাতীয় ভেদ, আর ঐ একই বৃক্ষে শাখা-পল্লবাদি প্রত্যেক অংশে যে, পরস্পর ভেদ, তাহা তাহার স্বগত ভেদ। এই ত্রিবিধ ভেদ লইয়াই জগৎ, তদতিরিক্ত কোন প্রকার ভেদ নাই বা থাকা সম্ভব নহে। ব্রহ্মও যখন একটী বস্তু, তখন তাহাতেও উক্ত ত্রিবিধ ভেদ থাকা সম্ভবপর, তাই "একং এব অদ্বিতীয়ং" শ্রুতিটী সেই আশঙ্কিত ভেদত্রয় প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। শ্রুতির অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মের সমান জাতীয় অন্য ব্রহ্ম নাই, সুতরাং তাঁহাতে সজাতীয় ভেদ থাকিতে পারে না। (১) ব্রহ্ম স্বয়ং সৎস্বরূপ; তাঁহার বিজাতীয় পদার্থ

---

(২) "আনন্দো বিষয়ানুভবো নিত্যত্বঞ্চেতি সন্তি ধর্ম্মা অপৃথক্ত্বেঽপি চৈতন্যাৎ পৃথগিবাবভাসন্তে।" (পরিভাসাধৃতভামতী)

(১) বৃক্ষস্য স্বগতো ভেদঃ পত্র পুষ্পফলাদিভিঃ। বৃক্ষান্তরাৎ সজাতীয়ো বিজাতীয়ঃ শিলাদিতঃ তথা সদ্বস্তুনো ভেদত্রয়ং প্রাপ্তং নিবার্য্যতে। ঐক্যাবধারণ দ্বৈত প্রতিষেধৈ স্ত্রিভিঃ ক্রমাৎ (পঞ্চদশী, ভূতবিবেক ১৫—১৬)

মাত্রই অসৎ; অসৎ পদার্থ কিছুই নহে—মিথ্যা; যাহা অসৎ অর্থাৎ নাই বা অবিদ্যমান, তাহার সহিত আর ভেদের সম্ভাবনা কি? অতএব ব্রহ্মের বিজাতীয় ভেদও সম্ভব হয় না। ব্রহ্ম নিরবয়ব (অংশহীন) সুতরাং তাঁহাতে অংশ-ঘটিত পূর্ব্বোক্ত স্বগত-ভেদ থাকাও সম্ভবপর নহে। অতএব কোন মতেই ব্রহ্মে উক্ত ভেদত্রয় থাকিতে পারে না; সুতরাং ব্রহ্মের একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্ব অবিসংবাদিত হইতেছে।

প্রকারান্তরেও ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব প্রমাণ করা যাইতে পারে। আমরা স্থূল পদার্থ হইতে যতই সূক্ষ্মের দিকে অগ্রসর হইতে থাকি, দেখিতে পাই, জাগতিক বস্তুর প্রকৃতিও যেন ততই সূক্ষ্ম একত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছে, ক্রমশঃ যেন প্রচলিত সর্ব্ববিধ নাম-রূপাদি বিভাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক একীভাব অবলম্বন করিতেছে। বিভিন্ন-প্রকার স্থূল মৃন্ময় ঘট-পটাদির তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই, সে সমস্তই এক মৃত্তিকা, কেবল নাম ও আকৃতি মাত্রের পার্থক্য। আরও অগ্রসর হইলে দেখিতে পাই, সেই একত্বই যেন আরও সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্ম-তমরূপে একীভাব অবলম্বন করিতেছে,—সমস্তই এক পরমাণুরূপ কিংবা তদপেক্ষাও সূক্ষ্মতর ভাব ধারণ করিতেছে। এইরূপে যতই অগ্রসর হওয়া যায়, একত্বের সূক্ষ্মচ্ছায়া যেন ততই সুস্পষ্ট প্রতীতির বিষয় হইতে থাকে। এইরূপে অগ্রসর হইতে হইতে যেখানে একত্বের বিশ্রাম হয়, অর্থাৎ যাহার পর আর একত্বের কোনরূপ প্রতীতি থাকে না, এবং যে একত্ব কেবলই অনুভব-গম্য পরম সত্য, তাহাই "এক-মেবাদ্বিতীয়ম" শ্রুতির প্রতিপাদ্য একত্ব। বলা আবশ্যক যে, কেবল একত্ব সংখ্যা অবলম্বনে যেমন দ্বিত্বাদি সংখ্যা সমূহ প্রাদুর্ভূত হয়, তেমনই সেই ব্রহ্মৈকত্ব বা একমাত্র ব্রহ্ম সত্তাকে আশ্রয় করিয়াই এই বিভিন্নপ্রকার বিশাল জগৎ প্রকাশ পাইতেছে এবং জীবেশ্বরাদি বিভাগও তাহা হইতেই অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই কারণেও ব্রহ্মকে এক, অদ্বিতীয় ও অনন্ত স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

ব্রহ্মে ত্রিবিধ ভেদাভাব সাধন উপলক্ষে আরও একটী বিষয়ের আলোচনা করা যাইতে পারে। সেই বিষয়টী হইতেছে ব্রহ্মের অনন্তত্ব। কোন বস্তুর অন্ত বা সীমা ত্রিবিধ উপায়ে সংঘটিত হইতে পারে; সে উপায় আর কিছুই নহে—দেশ,

---

সবস্তু সজাতীয়ভেদ-রহিতং ভবিতু মর্হতি উপাধি-পরামর্শমন্তরেণ অবিভাব্যমান ভেদত্বাৎ গগনবৎ। (পঞ্চদশী, ভূতবিবেকভাষ্য—২০)

কাল ও বস্তু। মনে কর, যেমন একটী বৃক্ষ; আশ্রয় স্থান ভিন্ন সর্ব্ব স্থানেই সেই বৃক্ষের অভাব আছে; ইহা তাহার দেশকৃত অন্ত বা পরিচ্ছেদ। সেই বৃক্ষটী উৎপত্তির পূর্ব্বেও ছিল না, এবং ধ্বংসের পরেও থাকিবে না, ইহা তাহার কালকৃত অন্ত। সেই বৃক্ষই আবার অপরাপর বস্তু হইতে পৃথক্, অর্থাৎ অন্যান্য বস্তুতে তাহার অভাব বা ভেদ আছে; সেই ভেদই তাহার বস্তু অন্ত।

উক্ত প্রণালী মতে এক বৃক্ষেই দেশ, কাল ও বস্তু দ্বারা অন্ত বা পরিচ্ছেদ হইতে পারে; কিন্তু প্রস্তাবিত ব্রহ্মে তাহার নিতান্ত অসদ্ভাব। কারণ, তিনি সর্ব্বব্যাপী—কোথাও তাঁহার অভাব নাই; (১) সুতরাং পূর্ব্বোক্ত দেশকৃত পরিচ্ছেদ তাঁহাতে ঘটিতে পারে না। তিনি নিত্য—উৎপত্তি ও ধ্বংসবিবর্জ্জিত, এজন্য কালের দ্বারাও তাঁহার সীমা হইতে পারে না। তিনি সর্ব্বময়—সর্ব্বাত্মক কোন বস্তুই তাঁহা হইতে পৃথক্ নহে; সুতরাং কোন বস্তু দ্বারাও তাঁহার অন্ত বা পরিচ্ছেদ হওয়া অসম্ভব। অতএব তিনি সর্ব্বতোভাবে অনন্ত। পঞ্চদশীকার এ বিষয়টী অতি সুস্পষ্ট যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

"ন ব্যাপিত্বাং দেশতোঽন্তো নিত্যত্বাৎ নাপি কালতঃ।
ন বস্তুতোঽপি সর্ব্বাত্ম্যাৎ আনন্ত্যং ব্রহ্মণি ত্রিধা॥" (দ্বৈত-বিবেক।)

পূর্ব্বেই ইহার তাৎপর্য্য বর্ণিত হইয়াছে। এখন বুঝিতে হইবে, যখন দেশ কাল ও বস্তু দ্বারা তাঁহার অন্ত বা সীমা কখনই সম্ভবপর হয় না, তখন তাঁহার অনন্তত্ব স্বীকারেও কোনরূপ সংশয় হইতে পারে না। এখানে বলা আবশ্যক যে, যাহা সৎ, তাহাই চিৎ ও আনন্দস্বরূপ, এবং যাহা চিৎ ও আনন্দাত্মক, তাহাই সৎ; এই তিনটীই এক—অভিন্ন পদার্থ, কেবল নামে মাত্র ভিন্ন। সৎ ও সত্যের মধ্যে ব্যবহারগত যৎ কিঞ্চিৎ পার্থক্য প্রতীতি থাকিলেও বস্তুতঃ ঐ উভয়ই এক পদার্থ। এখন পূর্ব্বকথিত 'ব্রহ্ম সত্য'-পদার্থের আলোচনা করা যাউক।

ব্রহ্ম সত্য—'সত্য' অর্থ অবাধিত,—যাহা কোন কালে, কোন দেশে বা

---

(১) ব্রহ্মের নিত্যত্ব ও ব্যাপকত্ব বিষয়ে শ্রুতি,—"আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ।" তিনি আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত ও নিত্য। (সর্ব্বোপনিষৎসার ৪৫)

এবং "নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং।" অর্থাৎ তিনি নিত্য, বিভু (ব্যাপক), সর্ব্বগত এবং অতিসূক্ষ্ম। (মাণ্ডুক্যোপনিষৎ। ১।১।৬)

কোন উপায়ে বাধিত অর্থাৎ 'মিথ্যারূপে' নিশ্চিত না হয়, তাহাই সত্য। (১) আর যাহা কখনও কোন প্রকারে বাধিত হয়, তাহা মিথ্যা—অসৎ। শুক্তিতে রজত, রজ্জুতে সর্প আপাত-দর্শনে (যতক্ষণ ভ্রম থাকে, ততক্ষণ) সত্যবৎ প্রতীতি হইলেও পরক্ষণেই শুক্তি ও রজ্জুর প্রকৃত জ্ঞান (ইহা রজত নহে—শুক্তি (ঝিণুক) এবং ইহা সর্প নহে—রজ্জু, এই প্রকার জ্ঞান) উৎপন্ন হইবা মাত্র পূর্ব্বদৃষ্ট রজত ও সর্প অন্তর্হিত হইয়া যায়; তখন তদুভয়ের আর সত্তা উপলব্ধি হয় না; এই কারণে ঐ রজত ও সর্প মিথ্যা বলিয়া অবধারিত হয়। ব্রহ্মে কিন্তু ঐরূপ বাধা কোন কালেই সংঘটিত হয় না বা হইতে পারে না; এজন্য তিনি চিরকালই 'সত্য'। পক্ষান্তরে, যাহা বাধিত অর্থাৎ 'মিথ্যা' রূপে অবধারিত হয়, তাহা কখনই 'সৎ' বা 'সত্য' শব্দেও অভিহিত হইতে পারে না।

শাস্ত্রানুসারী যুক্তির অনুসরণ করিলেও ব্রহ্মের সত্যতা সুব্যবস্থিত হইতে পারে। ভ্রান্তি পরিকল্পিত স্থূল-সূক্ষ্ম জগৎপ্রপঞ্চ 'অসৎ' বা মিথ্যা বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। মিথ্যা রজত বা মিথ্যা সর্প যেরূপ শুক্তি রজ্জু প্রভৃতি কোন একটী সত্য বস্তু অবলম্বন ব্যতীত প্রকাশ পায় না; তদ্রূপ এই মিথ্যা জগৎও কোন একটী সত্য বস্তুর আশ্রয় ব্যতীত যে, প্রকাশ পাইতে পারে না, ইহা স্থির। (২) অতএব, সেই মিথ্যা জগতের আশ্রয় বা অবলম্বনীভূত বস্তুকে কখনই মিথ্যা বা অসত্য বলিয়া পরিকল্পনা করা যাইতে পারে না, পক্ষান্তরে, তাহার আশ্রয় ও আবার আর একটী সত্য পদার্থের কল্পনা করিতে হইলেও দুরন্ত 'অনবস্থা' দোষ উপস্থিত হইয়া পড়ে; সুতরাং জগতের আশ্রয়ীভূত ব্রহ্মকে সত্য ও নিত্য বলিয়া গ্রহণ করাই আবশ্যক। বিশেষতঃ তিনি সর্ব্বদা নিত্য সত্যরূপে বিদ্যমান আছেন বলিয়াই এই ভ্রম-কল্পিত মিথ্যা জগৎ তাঁহার আশ্রয়ে সত্তালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহাও অস্বীকার্য্য হইতে পারে না।

---

(১) "সত্যত্বং বাধরাহিত্যং জগদ্বাধৈকসাক্ষিণঃ॥" যিনি সমস্ত পদার্থের বাধসাক্ষী—ব্রহ্ম, তাহার ও বাধ হইলে সাক্ষী হইবে কে? যে কাধর কেহ সাক্ষী বা দ্রষ্টা নই, সেই মিথ্যাত্ব অপ্রমাণ।

(২) জগতের মিথ্যাত্ব যেরূপে সাধিত হইতে পারে, তাহা কিছু পরেই "জগৎমিথ্যা" প্রস্তাবে প্রদর্শিত হইবে॥